

দ্য প্যারিস গেটে

সিত ব্যারি

BanglaBook.org

রূপান্তর : রাকিব হাসান



১৮২১ সালে মৃত্যু হয় নির্বাসিত সন্দ্রাট নেপোলিয়ন বোনাপোটের। তিনি কবরে সাথে করে নিয়ে যান এক গোপন তথ্য। লুট-পাট করা অজস্র সম্পদ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি- সে তথ্য অনেক চেষ্টা করেও তার জীবন্দশায় জানতে পারেনি ত্রিপ্তিশরা। বলা হয়, তার উইলেও তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন অপারেটিভ কটন ম্যালন চায় নির্বাঙ্গাট জীবন। কিন্তু তার কোপেনহেগেনের বাইয়ের দোকানের কাঁচ ভেঙে প্রবেশ করা আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট সে সুযোগ দিল কই? বাধ্য করল ওকে অন্ত হাতে নামতে। ম্যালনের বন্ধু থ্রাল্ডসেনও জড়িয়ে পড়ল এতে। কিন্তু ডেনিশ এই ধরী ব্যবসায়ীর আসল উদ্দেশ্যটা কি?

কঠিন এক সিদ্ধান্তের সামনে এসে দাঢ়াল ম্যালন, কাকে বেছে নেবে ও? রাষ্ট্রের চেয়ে কি বন্ধুত্ব বড়? বর্তমানের চেয়ে অতীত?

ডেনমার্ক যে যাত্রার শুরু, তার শেষ হলো প্যারিসে এসে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো তো?

যেমন রোমাঞ্চ...তেমন উভেজনা...এবং সাথে ঝড়ো-গতি...অসাধারণ এই সিরিজে দূর্দান্ত এক সংযোজন।

-উইচিটা ফলস্ টাইমস রেকর্ড নিউজ

ঘটনার ক্রমপর্যায়ী বিন্যাস, ব্যাণ্ডি, গতিময়তা, ইতিহাস- ব্যারি'র সবগুলো উপকরণই বিদ্যমান এখানে। সাথে যোগ হয়েছে প্রতিটা সেকেন্ডের শ্বাসরুদ্ধকর টানটান উভেজনা। লেখক আমার ভীষণ পছন্দের একজন।

-লী চাইন্ড, #১ নিউইয়র্ক টাইমস বেস্ট-সেলিং লেখক।

চমকে ঠাসা দারুণ এক গল্প নিয়ে আবারো উপস্থিত কটন ম্যালন।

-পাবলিশার্স টাইকলি

“প্যারিস ভেঙ্গেটা পড়া শুরু করতেই ঘট্টাগুলো কিভাবে পার হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। আরও একবার ব্যারি'র জানুকরী লেখার মাঝে হারিয়ে গেলাম।

-জেমস্ রোলিন, নিউইয়র্ক টাইমস্ বেস্ট সেলিং লেখক।

প্যারিস ভেঙ্গেটা এখনো পর্যন্ত ব্যারি'র সেরা কাজ।

হারল্যান কোবেন, #১ নিউইয়র্ক টাইমস্ বেস্ট সেলিং লেখক।

ব্যারি'র প্রতিটা নতুন বই পূর্বেরগুলো থেকে ভাল হচ্ছে, দ্য প্যারিস ভেঙ্গেটায় মুঝ সবাই পরবর্তী বইয়ের জন্য অপেক্ষায় থাকবে।

-হাফিংটন পোস্ট

ব্যারি'র লেখা থিলার একবার ধরলে সেটা শেষ না করে উপায় থাকে না।

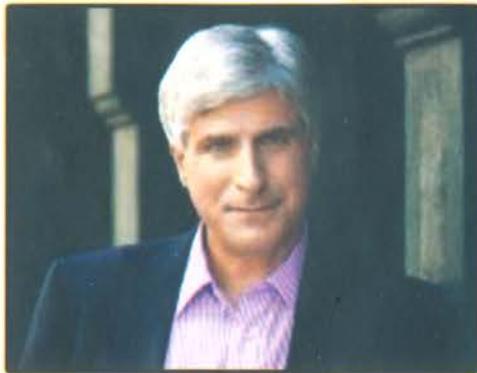
-রোম্যান্টিক টাইমস (৪.৫/৫)



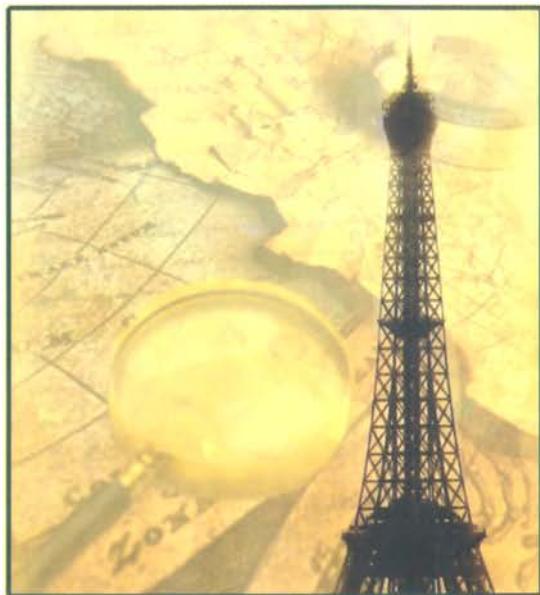
ISBN 978 984 91917 9 7



9 78984 9191797



নিউইয়র্ক টাইম্স বেস্টসেলিং লেখক স্টভ ব্যারির জন্ম আমেরিকায়, ১৯৫৫ সালে। তিনি বিশ্বের প্রথম সারির খ্রিস্টান লেখকদের মধ্যে অন্যতম। তার *The 14th Colony*, *The Patriot Threat*, *The Lincoln Myth*, *The King's Deception*, *The Columbus Affair*, *The Jefferson Key*, *The Emperor's Tomb*, *The Charlemagne Pursuit*, *The Venetian Betrayal*, *The Alexandria Link*, *The Templar Legacy*, *The Third Secret*, *The Romanov Prophecy* এবং *The Amber Room*- সবগুলোই তাকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে। চল্লিশটির-ও বেশী ভাষায় বিশ্বের একান্নটা দেশে দুই কোটি কপিরও বেশী বিক্রি হয়েছে তার বই। জর্জিয়াতে জন্ম নেওয়া স্টভ পড়াশুনা শেষ করেন Mercer University Law School থেকে। বর্তমানে তিনি জর্জিয়াতে বসবাস করছেন স্ত্রী এলিজাবেথের সাথে এবং তার পরবর্তী কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন।



রাকিব হাসানের জন্ম ২৯ অক্টোবর, খুলনার গিলাতলা গ্রামে। বাবা প্রবাসী, মা গৃহিণী। তিনি ভাই-বোনের মাঝে তিনি বড়। পেশায় একজন শিক্ষক। শিক্ষকতার পাশাপাশি খুলনা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের কো-অরডিনেটর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। লেখালেখির সাথে খুব বেশি সম্পৃক্ত না থাকলেও পড়তে ভালবাসেন। অনুবাদ করছেন নিজের ভালোলাগা থেকে। জেমস রোলিসের আমাঞ্জনিয়া তার অনুদিত প্রথম গ্রন্থ। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। দ্য প্যারিস ভেঙ্গেটা তার অনুদিত দ্বিতীয় গ্রন্থ।

বর্তমানে তিনি খুলনায় বসবাস করছেন।

দ্য প্যারিস ভেন্ডেটা
স্টিভ ব্যারি
রূপান্তর-রাকিব হাসান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশক

নাফিসা বেগম

আদী প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ঢাকা-১১০০

ফোন 01626282827

প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ২০১৬

© অনুবাদক

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ সামিউল ইসলাম অনিক

অনলাইন পরিবেশক www.rokomari.com/adee

মূল্য ৪২০ টাকা

Paris Vendetta Translated by Rakib Hasan

Published by Adee Prokashon

Islamia Tower, Dhaka-1100

Printed by Adee Printers

Price 420 Tk. U.S. 16 \$ only

ISBN 978 984 91917 9 7

লেখকের কৃতিত্ব

আমার এজেন্ট, Pam Ahearn-আরও একটা বিন্দু শৃঙ্খা তার জন্য। অনেকটা পথ পাড়ি দিলাম একসাথে, তাই না Pam? Mark Taviani, Beck Stvan সহ Random House Promotions and Sales এর সকল কুশলীকে আবারো ধন্যবাদ দিতে চাই তাঁদের কল্পনাতীত সহযোগিতার জন্য। তোমরা সবাই, প্রশংসনীতভাবেই, সবচেয়ে সেরা।

একটা খুব বিশেষ ধন্যবাদ দিছি সুলেখক, উপন্যাসিক, আমার বক্তু James Rollins-কে। কয়দিন আগে Fijian pool এ ডুবেই যেতাম আমার এই বন্ধুটি না থাকলে। কৃতজ্ঞতা জানাই Laurence Festal এর প্রতি, যিনি ফরাসী ভাষার পাণ্ডিত্য নিয়ে উদান্তভাবে সহযোগিতা করেছেন আমায়। এবং আমার স্ত্রী, Elizabeth ও Barry Ahearn-কে। বইয়ের নামটা তারই আবিষ্কার।

পরিশেষে, বইটা উৎসর্গ করছি Gina Centrello, Libby McGuire, Kim Hovey, Cindy Murray, Christine Cabello, Carole Lowenstein এবং Rachel Kind-এই সাত বিশ্বয়কর নারীকে। পেশাদার ও একই সাথে আন্তরিক

তাদের প্রজ্ঞা, ধারাবাহিক নেতৃত্ব এবং স্পন্দনময় সৃজনশীলতা আমার প্রতিটা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। কোনো লেখকেরই এর থেকে বেশি কিছু চাওয়ার থাকে না। তোমাদের দলের একজন হতে পেরে সত্যিই গর্বিত আমি।

আর এটা শুধুই তোমাদের।

-স্টিভ ব্যারি

ভূমিকা

আলহামদুল্লাহ,

অনুবাদক অনুবাদ করেন; পাঠকেরা পড়েন। কিন্তু এই দুইয়ের মাঝে আরও কিছু মানুষ
এই কাজে যুক্ত থাকেন, থাকেন পর্দার আড়ালে। আর আমি বিশ্বাস করি সেই
মানুষগুলোর সম্পৃক্ততা না থাকলে এই কাজ শেষ হত না, বা হলেও এভাবে হত না

বইটার প্রকাশক-আদী প্রকাশনের কর্ণধার-শ্রদ্ধেয় সাজিদ ভাই বইটা পছন্দ
করেন অনুবাদের জন্য, কিন্তু আমার কাছে প্রস্তাব আসে জামিল ভাইয়ের মাধ্যমে, যিনি
সাজিদ ভাইয়ের কাছ থেকে বই নিয়ে আমায় দেন। তাই, প্রথম ধন্যবাদটা আমি
জামিল ভাইয়ের জন্য তুলে রেখেছি।

বেশ কয়েকবার বই জমা দেওয়ার তারিখ পিছিয়েছি, সাজিদ ভাই ধৈর্য ধরেছেন।
বারবার এমন হওয়াতে আমি আন্তরিকভাবে দৃঢ়ঘৃত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বইটা
প্রকাশ করছেন, সেজন্য তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

কাজের যখন প্রায় মাঝামাঝিতে আমি, তখন কম্পিউটারটা নষ্ট হলো, সাজিদ
ভাই আবারো এগিয়ে এলেন, কিন্তু আমি সবকিছুর সম্বয় করতে পারলাম না। কাজ
বন্ধ হলো। তখন আমার শ্রদ্ধেয় খালু (ও একই সাথে মামা) আবুস সাভার নিজের
ল্যাপটপ পাঠিয়ে দিলেন। যেটা এখনো আমার কাছে, এই লেখাগুলোও লিখছি সেটায়।
আমি কৃতজ্ঞ তার কাছে। ধন্যবাদ খালুমা!

অনুবাদের সময়ে দু-এক জায়গায় বুঝতে যখন বেশ বেগ পেতে হয়েছে, তখন
আমার দুই কানাডিয়ান ক্লায়েন্ট-Asante এবং R. Bilokraly সেগুলো সহজ করে
দিয়েছেন। ধন্যবাদ তাদেরকেও।

মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ এই মানুষটার কথা লিখে শেষ করা যাবে না। তার
কাছ থেকে আমি যে সহযোগিতা পেয়েছি, সেটা আমার বাকি জীবনেও খুব কাজে
আসবে। আমি অবাক হয়ে যাই তার জ্ঞান ও কাজের গতিময়তা দেখে। আমি ভাগ্যবান
ফুয়াদ ভাইয়ের সম্পৃক্ততায়। অনেক-অনেক ধন্যবাদ জানাই তাকে, সাথে তার প্রথম
মৌলিক খ্রিলার রাত এগারটার (আদী প্রকাশন) জন্য শুভকামনা।

পরিশেষে আশরাফুল সুমনকে জানাই ধন্যবাদ কষ্ট করে প্রফ দেখে দেয়ার জন্য
সেই সাথে সবাইকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাই। অফিসার মাহবুব (ভাই),
সৌরভ আতিক ভাই সহ আরও অনেকেই খোঁজ-খবর নিয়েছেন বই সম্পর্কে, তাগিদ
দিয়েছেন দ্রুত শেষ করার। ধন্যবাদ তাদেরকেও। অনিক ভাইয়ের প্রচন্দ সবার ভালো
লাগবে আশা করি। অনুবাদ ভালো লাগলে সেটার কৃতিত্ব সবার মাঝে ভাগ করে দিতে
চাই। ভালো না লাগলে সব দায় আমার।

ধন্যবাদ

রাকিব হাসান

খুলনা

২২/০১/১

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

টাকার কোনো মাত্তুমি নেই;
বিভ্বানেরা দেশপ্রেম ও শিষ্টাচার বিবর্জিতঃ
মুনাফা অর্জনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

-Napoleon Bonaparte

ইতিহাস সাক্ষী যে মানিচেঞ্চাররা সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে ক্ষমতার অপব্যবহার,
চক্রান্ত, জোচুরি, উগ্রতা-সংস্থাব্য সব রকম পছাই ব্যবহার করে আসছে ;
-James Madison

আইন যারা বানায়, তাদের আমি গোগায় ধরব না, শুধু সেই দেশের অর্থের দায়িত্ব ও
নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে দাও।
-Mayer Amschel Rothschild

পূর্বকথা

গিজা মালভূমি, মিশর
অগস্ট, ১৭৯৯

ঘোড়া থেকে নেমে একটু দূরেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পিরামিডের দিকে তাকাল
জেনারেল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। কাছেই আরও দুটো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এটার
সুবিশালতা ছাড়িয়ে গেছে সবাইকে।

কত অমূল্য এক পুরস্কার এনে দিয়েছে তাকে এবারের বিজয়টা!

কায়রো থেকে দক্ষিণমুখী ঘোড়সওয়ারীর এই দলটা কাদাভরা ফসলের সীমানা
মাড়িয়ে, বালি-ওড়া বাতাসের ভেতর দিয়ে একটু আড়াআড়ি পথে একযোগে এক ভ্রমন
শেষে এখানে এসে পৌছেছে গতকাল। অন্তে সজ্জিত দুশো সৈন্যের এক দল এসেছে
জেনারেলের সাথে, এত দূরের এই নতুন ও বৈরি পরিবেশে একা আসতে চাওয়াটা
হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই না। মাইলখানিক দূরে বাকি সৈন্যরা ক্যাম্প ফেলেছে
আগের দিন। দিনটা যেমন শুক্র, তেমন উষ্ণ ছিল, তাই সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে
সে যাত্রা শুরুর আগে।

ঠিক পনের মাস আগে আলেকজান্দ্রিয়ার কাছেই তার রণতরী বহর নোঙ্গর
ফেলেছিল। সাথে ছিল চৌত্রিশ হাজার সৈন্য, এক হাজার বন্দুক, লাতশো ঘোড়া, এবং
এক লক্ষ রাউড গোলা-বারুদ। বিলম্ব না করেই সে দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে রাজধানী
কায়রো দখল করে নেয়। তার প্রথম লক্ষ্য ছিল তার আক্রমণের বিরুদ্ধে যে কোনো
রকমের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠার আগেই তার দুর্বল ক্ষিপ্ততা ও অতর্কিত হামলা
দিয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেলা। তারপর যুদ্ধে লিঙ্গ হস্ত আক্রমণ-দাস-ম্যামলুকদের সাথে, সেটাও
এখান থেকে বেশি দূরে হবে না। মহিমান্বিত মুদ্রিটা ছিল, তার ভাষায়, ব্যাটল অফ
পিরামিড-পিরামিডের যুদ্ধ। ওই তুর্কি ক্রীতদাসেরা মিশরীয়দের শাসন করেছে পাঁচশো
বছর। আর এখানে এসে অঙ্গুত এক দৃশ্য দেখতে হলো জেনারেলকে-হাজারে হাজার
তুর্কি যোদ্ধা, সবাই রঙিন পোশাকে ঢাকা, দাপটের সাথে তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে চড়ে
বেড়াচ্ছে। সে দিনের সেই চির এখনো চোখে ভাসে তার-বাতাসে পোড়া বারুদের
গৰ্ব, কামানের হুক্কার, বন্দুকের গর্জে উঠার শব্দ, মৃত্যুমুখী মানুষের আর্তনাদ-সবই।
তার সৈন্যরাও কম গেল না, সাহসিকতার সাথে লড়ে গেল সাথে বেশ কিছু ইটালিয়ান
চৌকস যোদ্ধাদের নিয়ে। তার নিজের প্রায় দুশো ফ্রেঞ্চ সৈন্য মারা গেলেও বলতে
গেলে গোটা ম্যামলুক আর্মিদের সে বন্দী করে ফেলে। নিম্ন-মিশরের প্রায় পুরোটাই
তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এক সাংবাদিক লিখেই ফেলল যে মুষ্টিমেয় কিছু ফ্রেঞ্চ গোটা
জগতের এক-চতুর্থাংশ দমিয়ে দিল।

যদিও এটা কাঁটায়-কাঁটায় সত্য না, তবু শুনতে ঘন্দ লাগল না।

স্থানীয়রা তাকে সুলতান-আল-কাবির উপাধিতে ভূষিত করল-খুব সম্মানের নাম
এটা। পরের চৌদ্দ মাস ধরে প্রধান কমান্ডার হিসেবে এই জাতিকে পরিচালনা করতে

গিয়ে নেপোলিয়ন আবিষ্কার করল যে অন্যান্যরা যেখানে সমুদ্র ভালবাসে, সেখানে তার ভালবাসা বাড়তে থাকে মরুভূমিকে ঘিরে। মিসরীয়দের জীবন-যাপনও ভালো লেগে যায় তার, যেখানে চরিত্র ছাপিয়ে যায় সম্পত্তির প্রাচুর্যকে।

তারা দৈব বা আধ্যাতিক বিষয়েও বিশ্বাস করে।

যেমন করে নেপোলিয়ন নিজেও।

“স্বাগতম, জেনারেল। বেড়াতে আসার পক্ষে এর থেকে চমৎকার সন্ধ্যা কি আর হয়?” গ্যাস্পারড মঙ্গে তার স্বভাবসূলভ ঢঙ্গে বলে উঠল।

নেপোলিয়ন তার এই খ্যাপাটে জ্যামিতিবিদের উপস্থিতি ভালোই উপভোগ করে। মানুষটা বয়সে বেশ বড় তার থেকে। প্রশংস্ত মুখ, গভীর এক জোড়া চোখ, আর পুরু একটা নাক। তার বাবা ছিল একজন ফেরিওয়ালা। মঙ্গের শিক্ষা-দীক্ষা বেশ ভালো পর্যায়ের থাকলেও রাইফেল আর মদের বোতল দুটোই সাথে থাকে তার। কী বিপ্লব, কী যুদ্ধ, দুটোই সমানে টানে তাকে। বিদ্বান, বিজ্ঞানী ও শিল্পীদের নিয়ে ১৬০ জনের বিশেষ একটা দলের সদস্য সে। সংবাদপত্রগুলো একটা নামও দিয়েছিল ওদের-স্যাভান্ট। যারা সুদূর ফ্রাঙ্ক থেকে নেপোলিয়নের সাথে মিশরে এসেছে, তাদেরকেই এই মহাপণ্ডিত উপাধি দেয়া হয়েছিল। এর কারণও একটা ছিল। এটাতো শুধু একটা ~~দেশ~~ বিজয়ের অর্থণ ছিল না, জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোরও সফর নিঃসন্দেহে। ~~নেপোলিয়ন~~ সর্বদা একজনকে তার আধ্যাতিক গুরু মানেন, তিনি আরেক বীর-আক্রমজাতার দ্য হেট। তিনিও পার্সিয়া আক্রমণের সময়ে তার সাথে বিচক্ষণ লোকদেরকে সাথে নিয়েছিলেন। নেপোলিয়নের সাথে মঙ্গে এর আগেও সফর করেছে ইটালি~~আক্রমণের~~ সময়ে তখন সে তার প্রজ্ঞা দিয়ে নেপোলিয়নকে প্রত্যক্ষ সহায়~~করেছিল~~ ওই দেশে হরিলুট চালাতে। তাই তখন থেকেই তার প্রতি নেপোলিয়নের এমন বিশ্বাস সৃষ্টি হয় অন্তত কিছু বিষয়ে তো বটেই।

“আসলে কী, তুমিতো জানো, গ্যাস্পারড, যে আমি ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের উপর পড়াশোনা করতে চাইতাম। প্যারিসে, বিপ্লবের সময়টাতে, রসায়নের উপর দেওয়া বেশ কয়েকটা বক্তৃতায় আমি হাজির হয়েছি, শুনেছি সব মন দিয়ে। খুব উপভোগ করতাম ওগুলো, কিন্তু কপাল! পরিস্থিতি আমাকে আর্মি অফিসার বানিয়ে দিলো।”

নেপোলিয়নের ঘোড়াটা এক মিসরীয় দূরে বেঁধে রাখার জন্য নিয়ে যেতে উদ্যত হতেই ঘোড়ার পিঠ থেকে চামড়ার একটা থলে তুলে নিল নেপোলিয়ন।

“কয়েকদিন আগে,” সে বলল, “আমি একটা হিসাব করলাম। দেখলাম যে এই তিনটে পিরামিড যে পরিমাণ পাথর খেয়ে বসে আছে তা দিয়ে গোটা প্যারিসকে এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলা যাবে, আমি শতভাগ নিশ্চিত।”

কথাটা মঙ্গেকে ভাবিয়ে তুলল মনে হলো। “বিষয়টা সত্যিও হতে পারে, জেনারেল।”

বাকচতুরী উত্তর শুনে একটু হাসল সে। “গণিতবিদের সন্দেহ কাটেনি মনে হচ্ছে।”

“আসলে সেরকম কিছু না। এই ইমারতগুলো নিয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা খুব অবাক করল আমাকে। এগুলো যে ফারাও স্ম্যাটদের সাথে সম্পৃক্ত বা এগুলোর মাঝে যে অনেক গুলো সমাধি আছে, অথবা এর বিশ্যয়কর স্থাপত্য কৌশল, কোনো কিছুই আপনাকে আকর্ষণ করল না! এগুলোকে ঠিকই ফ্রাঙ্গ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন আপনি।”

“আসলে যা ভাবি তা না করতে পারাটা আমার জন্য কষ্টের। বাকি সব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই।”

নেপোলিয়ন ফ্রাঙ্গ ছেড়ে আসার পর পরই গোটা ফ্রাঙ্গই একটা ভয়াবহ বিশ্বজ্বলার মধ্যে পড়ে। এক সময়ের শক্তিশালী নৌবহর গুড়িয়ে দেয় ব্রিটিশরা, নেপোলিয়নকে এক রকম বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এই মিশরে। হোমরা-চোমরা শাসকদের অভিপ্রায় যেন একটাই-তাবৎ রাজতন্ত্রগুলোর সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়া। স্পেন, প্রসিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং হল্যান্ড চক্ষুশূলে পরিণত হলো তাদের। এই সংঘাতগুলোকে তারা দেখল তাদের ক্ষমতার পরিধি বাড়ানোর একটা পথ আর যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ক্ষৈতি হয়ে আসা জাতীয় কোষাগারকে আবারো স্ফীত করার একটা সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে।

হাস্যকর

গণতন্ত্র একটা নিরেট ব্যর্থতার নাম।

ইউরোপে যে কয়টা সংবাদপত্র সচল ছিল তার মাঝে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে মিশরে আসা একটা পত্রিকা রীতিমত ভবিষ্যৎবাদী ক্ষেত্রেই ফেলেছে যে ফাল্সের সিংহাসনে রাজা হিসেবে নতুন আরেকজন লুইস ক্ষেত্রে দেখা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

বাড়ি তাকে ফিরতেই হবে।

তার প্রতিটা স্বপ্ন যেন খানখান হয়ে যাচ্ছে।

“ফাল্সের আপনাকে প্রয়োজন,” মঙ্গে বলল।

“এবার কিন্তু তোমার কথায় সত্যিকারের বিপ্লবের গন্ধ পাচ্ছি।”

হাসল তার বন্ধুটি। “আপনিতো আমার সবই জানেন।”

সাত বছর আগে, ত্যাইলেরি রাজপ্রাসাদ ঘিরে যে বিপুর চলেছিল, সেটাকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিল নেপোলিয়ন। রাজা ষোড়শ লুইসকে সেই বিপ্লবে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এই ঘটনার পর তৎকালীন গণতান্ত্রিক সরকারের হয়ে নেপোলিয়ন টুলনের যুদ্ধে অংশ নেয়, এবং পরে তাকে বিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নিত করা হয়। খুব বেশি দিন না যেতেই আবারো পদোন্নতি, এবার পূর্ব-ফাল্সের আর্মি জেনারেল। এবং সরশেষে কমান্ডার হিসেবে ইটালির দায়িত্ব। সেখান থেকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উত্তরের দেশ অষ্ট্রিয়া দখল করে। এরপর প্যারিসে যখন সে ফিরল, ততদিনে সে জাতীয় বীর দেশের মানুষের কাছে। আর এখন, বয়সের কোঠা ত্রিশ

পেরোনোর আগেই, পূর্ব-প্রাচ্যের আর্মি জেনারেল হিসেবে মিশ্র জয় করে ফেলেছে সে।

কিন্তু তার নিয়তিতে যে ফ্রাঙ্গ শাসন করার অধ্যায় থাকার কথা!

“কী অপূর্ব সুন্দর স্থাপনা এগুলো!” সুবিশাল পিরামিডের প্রশংসা আবারো তার মুখে।

ক্যাম্প থেকে আসার পথে চুপচাপ দেখেছে সে কিছু মানুষ বালিতে অর্ধেক ডুবে থাকা স্ফিংসটা পরিষ্কার করছে। এই কৃচ্ছ, নিরলঙ্ঘন অভিভাবককে বালিমুক্ত করে দৃষ্টিনন্দন করার আদেশ নেপোলিয়ন নিজেই দিয়েছে, আর এখন শ্রমিকদের কাজে সে যারপরনাই সন্তুষ্ট।

“এই পিরামিডটা কায়রোর দিক থেকে সবচে কাছে, তাই এটাকে এক নম্বর বলতে পারি আমরা,” বলল মঙ্গে। এরপর পাশেরটার দিকে দেখাল। “ওটা দুই নম্বর। আর ওই দূরেরটা তিন নম্বর। যদি হায়ারোগ্লিফিক্সগুলো পড়া যেত, তাহলে হয়ত এগুলোর আসল সিরিয়ালটা জানতে পারতাম।”

সায় দিলো জেনারেল। এই অদ্ভুত চিহ্নগুলোর পাঠোদ্ধার কেউই করতে পারেনি, আর এগুলো বলতে গেলে প্রায় সবগুলো প্রাচীন স্থাপনাতেই দেখা গিয়েছে। এগুলোর অনুলিপি তৈরির আদেশ দিয়েছে সে, যা পালন করতে গিয়ে ফ্রাঙ্গ থেকে আনা গাদাগাদা পেন্সিল ক্ষয় করছে আঁকিয়েরা। মঙ্গে অবশ্য তার দাকণ স্বীকৃত কর্মসূচী দিয়ে একটা উপায় বার করে ফেলেছে। নীল নদের পাড়ে যে তলাখেগড়া হয়, সেগুলোর ডেতের পেন্সিলের লেড গলিয়ে ঢেলে দিয়ে নতুন একরকম স্বেচ্ছার উপকরণ তৈরি করে ফেলেছে। ফ্রাঙ্গ থেকে পেন্সিলের সরবরাহ না হলেও কুজ্জচলে যাবে তের।

“অবশ্য আশা এখনো ফুরিয়ে যায়নি,” নেপোলিয়ন বলল।

বলেই মঙ্গের সহমত প্রকাশভঙ্গিটা দেখতে পেল।

তারা দুজনেই জানে যে কালো রঙের একটা কদাকার পাথর পাওয়া গেছে রোজেটার এক জায়গায়। সেটার গায়ে তিন ভাষায় খোদাই করে কিছু লেখা। একটা হায়ারোগ্লিফিক্স যেটা প্রাচীন মিশরের ভাষা, দ্বিতীয়টা ডেমোটিক, মিশরের বর্তমান ভাষা আর শেষেরটা গ্রীক। এগুলো হয়তো একটা কুলকিনারা করে দেবে। গত মাসে নেপোলিয়ন নিজের গড়া ইনসিটিউট ইজিপ্ট-এর একটা বৈঠকে যোগ দিয়েছিল যেখান থেকেই এই আবিষ্কারের ঘোষণাটা করা হয়। স্যাভান্টসদের মাঝে উদ্দীপনা জাগাতে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম আয়োজন করা হয় এই ইনসিটিউটে।

কিন্তু আরও বিস্তর গবেষণা দরকার এখনো।

“আমরাই প্রথম একটা নিয়মমাফিক, গোছানো জরিপ করছি এই জায়গাটার,” মঙ্গে বলল “আমাদের পূর্বে যারাই এসেছে এখানে, লুটেপুটে সাবাড় করেছে যা পেয়েছে সামনের মাথায়। আমাদেরও উচিং যা পাব তা স্মরণীয় করে রাখা।”

আরও একটা বৈপ্লবিক চিন্তা বৈকি! ভাবল নেপোলিয়ন। আর এটা মঙ্গের সাথেই ভালো যায়।

“ভেতরে নিয়ে চল আমাকে,” আদেশ করল সে।

তার বন্ধুটির পেছন-পেছন এগিয়ে গেল নেপোলিয়ন। পিরামিডের উত্তর পাশের দিকে প্রায় কুড়ি মিটার উঁচু একটা প্লাটফর্ম আছে যেটার উপর দুইজন উঠল মই বেয়ে। এতটা সে এর আগেও একবার এসেছিল মাসখানেক পূর্বে, সাথে কয়েকজন কমান্ডারও ছিল। পিরামিডের অস্তিত্ব তখনই জানতে পারে প্রথম। কিন্তু তখন সে এটার ভেতর ঢোকার সুযোগটা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল শুধুমাত্র তার অধীনস্তদের সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসে হামাগুড়ি দিয়ে চুক্তে হবে বলে। এবার সেই অহং দমাতে হয়েছে, কারণ এক মিটার উঁচু ও সম্পরিমাণ চওড়া পাথরের দেওয়াল তো আর নেপোলিয়নের জন্য প্রসারিত হবে না। সে কুঁজো হয়ে এক মিটার উঁচু ও সমান পরিমাণ প্রশস্ত একটা করিডোরের ভেতর দিয়ে নিজেকে নিয়ে যেতে লাগল। করিডোরটা ক্রমেই ঢালু হয়ে গিয়ে পিরামিডের কেন্দ্রের সাথে মিশেছে। নিচু হয়ে থাকার কারণে চামড়ার ব্যাগটা গলা থেকে নিচের দিকে ঝুলে আছে। কিছুটা নামতেই আরেকটা করিডোরের মুখে এসে পড়ল তারা। এটা উপর দিকে চলে গেছে। মঙ্গে আবারো এগিয়ে গেল সামনে, নতুন করিডোরে। এবারের ঢালু পথটি বেশ কিছুটা উপরে গিয়ে একটা উজ্জ্বল ও খোলা একটা জায়গায় গিয়ে মিশেছে।

করিডোরে ঢোকার পর তারা একটু দাঁড়াতে পারল পায়ে জুড়ে দিয়ে। এই বিশ্বয়কর স্থানটা নেপোলিয়নের মাঝে তীব্র একটা শ্রদ্ধাবোধ জন্মত করল। টিমটিম করে জ্বলতে থাকা আলোতে অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটো দিয়ে আশ্চর্যের ওপরটা দেখে নিল সে। ছাদটা প্রায় দশ মিটারের মতো উঁচুতে হবে। ঘেরে ঘেরে ধরে উঁচুতে উঠে গেছে আনাইট পাথরের গাঁথুনির মাঝে দিয়ে। অধিক্ষিণ দেওয়ালগুলো একসারি খিলানের উপর ভর দিয়ে আছে যেগুলো মাঝের এই জায়গাটাকে একটা সরু ভল্টের মতো তৈরি করেছে।

“অসাধারণ!” ফিসফিস করল নেপোলিয়ন।

“আমরা এটাকে গ্র্যান্ড গ্যালারী নামে ডাকা শুরু করেছি।”

“একদম উপযুক্ত নাম।”

উভয় পাশের দেওয়ালের নিচের অংশে আধ মিটার প্রশস্ত একটা পাথরের ঢাল তৈরি করা হয়েছে যেগুলো গ্যালারীর পুরোটা জুড়েই দেখা যাচ্ছে। এই দুই ঢালের মাঝে দিয়ে প্রায় এক মিটার চওড়া আরেকটা পথ চলে গেছে সোজা উপর দিকে, কোনো খাদ বা সিঁড়ি নেই তাতে।

“লোকটা কি উপরে?” নেপোলিয়ন জিজেস করল মঙ্গেকে।

“হ্যাঁ, জেনারেল ঘণ্টাখানেক আগেই এখানে এসেছে সে, তারপর আমি তাকে কিংস চেম্বার পর্যন্ত দিয়ে এসেছি।”

“বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো আমার জন্য।” চামড়ার ব্যাগটা এখনো গলায় ঝুলছে তার।

প্রস্থানের জন্য ঘুরে গিয়ে আবারো থামল মঙ্গে। “আপনি কি আসলেই কাজটা একা-একা সারতে চান?”

দৃষ্টিজোড়া তার স্থির হয়ে আছে গ্র্যাউন্ড গ্যালারীর অপর প্রান্তে। মিশরীয় গল্প সে আগেও শুনেছে। বলা হয়ে থাকে যে এই রহস্যময় পথ এমন এক প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে যেখানে কোনো মানুষ পৌঁছাতে পারলে সে আর তখন মানুষ থাকে না, হয়ে যায় গড়। আলোকিত, প্রজ্ঞাময় এক ভ্রমণের পথ এটা। এটা ঠিক একটা “দ্বিতীয় জন্মের স্থান”, “রহস্যময়তা ভরা এক গর্ভাশয়”, এমনটাই শুনেছে সে। তার স্যাভান্টের বিজ্ঞ লোকেরা এটা ভেবে কূল পায় না যে কী এমন শক্তি তখনকার মানুষকে অনুপ্রাণিত করল এমন দুঃসাধ্য সাধন করতে। কিন্তু নেপোলিয়নের কাছে এর সম্ভাব্য একটা ব্যাখ্যা আছে, আর সে এটাও জানে যে তার এই ব্যাখ্যাটা একটা বদ্ধমূল ধারণার উপর ভেঁকে বসে আছে। আর সেটা হলো, মানুষের মরণশীলতার বিনিময়ে আলোকিত জ্ঞান অর্জনের চিরস্তন অভিলাষ। তারা মৃত্যু নামের এ জগতের সবচে চূড়ান্ত এই সীমাবদ্ধতাকে জয় করতে চেয়েছে অনাদিকাল থেকে। নেপোলিয়নের অধীনে যারা বৈজ্ঞানিক আছে, তারাও মেনে নিয়েছে যে এটা এই বিশ্বের সবচে নিখুঁত স্থাপনা। যেন সত্যিকারের নৃহ নবীর কিশ্তি। হয়তো, সকল ভাষা, বর্ণমালা, ওজন ও পরিমাপের উৎপত্তিস্থলও পাথরের এই বদ্ধ কুঠুরি!

কিন্তু নেপোলিয়নের কাছে না

তার কাছে এটা যেন চিরস্তন জগতে যাবার একটা রাস্তা। “শুধুমাত্র আমিই সেই ব্যক্তি যে এটা করতে পারবে,” অবশ্যে বিড়বিড় করল সে।

মঙ্গে চলে গেল।

নিজের পোশাক থেকে পাথর-বালি ঝেড়ে নেপোলিয়ন, তারপর পা বাড়াল সামনের সরু ও খাড়া পথটার দিকে। ওটা বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে নেপোলিয়ন অনুমান করল, পথটা প্রায় ১২০ মিটার দীর্ঘ হবে

এই দূরত্বটুকু পাড়ি দিয়ে সে যখন শীর্ষে পৌঁছাল, ততক্ষণে তার গলদণ্ড অবস্থা। দম নিয়ে চারদিকে একবার চোখ বুলাল সে, তারপর উঁচু একটা পাথরের ধাপে হেঁটে চলে গেল তুলনামূলক নিচু ছাদের একটা গ্যালারীতে যেটা একটা খালি কক্ষে গিয়ে মিশেছে। কক্ষটার তিন ধারে গ্রানাইট পাথরের মসৃণ দেওয়াল।

একটু দুরেই কিংস চেম্বারের খোলা মুখটি দেখা যাচ্ছে, চারদিকে পালিশ করা লাল পাথরের আরও উপস্থিতি চোখে পড়ছে তার। পাথরের বিশাল ব্লকগুলো একটার পর একটা এমনভাবে রাখা যে সংযোগস্থলে বড়জোর একটা চুল চুক্তে পারে। চেম্বারটা ত্রিভুজাকৃতির, প্রস্থে দৈর্ঘ্যের অর্ধেক, আর এটা বানানো হয়েছে পিরামিডের একেবারে কেন্দ্রের পাথরগুলো সরিয়ে। মঙ্গে অবশ্য এটাও বলেছে যে এই চেম্বারের পরিমাপের সাথে সময়কেন্দ্রিক গণিতিক কিছু ধ্রুবকের একটা ভালো সম্পর্ক রয়েছে।

অভিজ্ঞ গণিতজ্ঞের পর্যবেক্ষণ নিয়ে নেপোলিয়নের কোনো সন্দেহ নেই।

দশ মিটার উপরে মসৃণ ও সমান গ্রানাইটের একটা ছাদ। পিরামিডের উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে দুটো ছিদ্র করা হয়েছে যেগুলোর উপর প্রাত্ন এসে শেষ হয়েছে এই কিংস চেম্বারে। জল চুইয়ে আসার মতো আলো আসছে ওই আলোর নালামুখগুলো থেকে। গ্রানাইটের একটা অমসৃণ, অসমাপ্ত ঢাকনাবিহীন শবাধার, ও একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু নেই চেম্বারটিতে। পূর্বযুগের শ্রমিকেরা পাথরের এই কফিনটাতে তাদের সনাতনী ডিল মেশিন আর করাতের তীক্ষ্ণ দাঁতের খোঁচায় যে গভীর চিহ্ন রেখে গেছে, সেকথাও নেপোলিয়নকে জানিয়েছে মঙ্গে। আর এটা যে সত্যিই, সেটা চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়েছে মঙ্গে। এই চেম্বারে আসা উর্ধ্বমুখী করিডোরটার প্রস্থ থেকে এই কফিনটার প্রস্থ প্রায় এক সেন্টিমিটার কম। তার মানে হলো, এটা এই করিডোর সহ পিরামিডের বাকি অংশ তৈরির আগেই এখানে আনা হয়েছিল।

দেওয়ালের দিকে যুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি ধীরে-ধীরে ঘুরে গেল নেপোলিয়নের দিকে।

তার আকৃতিহীন দেহটা মুড়ে আছে একটা ঢিলেচালা আলখাল্লায়, মাথাটা মোড়ানো উলের পাগড়ীতে, স্কার্ফের মতো এক টুকরো কাপড় ঝুলছে এবং স্কাঁধে। তার পূর্বসূরীরা যে মিশরীয়, সেটা চেহারায় স্পষ্ট, তবে সমান কপাল, চোয়ালের উঁচু হাড়, ও তার প্রশস্ত নাক অন্য সংস্কৃতির কথাও জানান দিচ্ছে।

গভীর বলিবেখায় ভোঁ মুখটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিছে আছে নেপোলিয়ন।

“প্রত্যাদেশটা কি এনেছ?” লোকটি জিজ্ঞেস করল।

চামড়ার ব্যাগটি নেড়ে দেখাল সে। “আমার কম্বলটি আছে।”

পিরামিড থেকে বের হলো নেপোলিয়ন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ভেতরে ছিল সে, আর এদিকে অন্ধকার আরও গ্রাস করে নিয়েছে গিজার সমভূমিকে। জায়গাটা ছেড়ে যাবার আগে আলখাল্লা পরা মিশরীয়কে পিরামিডের ভেতরেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছে নেপোলিয়ন।

গায়ের ইউনিফর্ম থেকে আরও ধুলো-ময়লা ঝোড়ে নিয়ে চামড়ার ব্যাগটা আরও শক্ত করে ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। নিচে নামার জন্য মইটা খুঁজে পেল কোনোমতে-এদিকে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে তাকে; গত একটা ঘণ্টা যা ঘটেছে, সেটা তার জন্য ভীষণ ভয়ঙ্কর

নিচে মঙ্গে একা অপেক্ষা করছে, নেপোলিয়নের ঘোড়ার লাগামটা হাতে ধরা তার।

“কাজটা ঠিকঠাক মতো হয়েছে, জেনারেল?”

স্যাভান্টের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। “শোন, গ্যাস্পারড, আজকের রাত নিয়ে আর কখনো কোনো কথা হবে না। আমার কথা বোঝা গেল? কেউ কখনো জানবে না যে আমি এখানে এসেছিলাম।

জেনারেলের এমন কঠ শুনে একেবারে হতচকিত হয়ে গেল তার বন্ধুটি।

“কিছু মনে করবেন না, আমি শুধু একটু জানতে...”

একটা হাত উঁচিয়ে ধরল নেপোলিয়ন। “এই বিষয়ে আর একটা কথাও না। আমার কথা বোঝা যাচ্ছে না?”

গণিতজ্ঞ বন্ধুটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল, আর তখনই নেপোলিয়ন খেয়াল করল, তার বন্ধুটি তাকিয়ে আছে পিরামিডের ভেতর অপেক্ষায় রেখে আসা মিশরীয়টার দিকে, যে এখন মইটার অপরপ্রান্তে পিরামিডের উঁচু প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে নেপোলিয়নের চলে যাবার অপেক্ষায়।

“শুট হিম,” ফিসফিস করে মঙ্গেকে বলল সে। “গুলি কর, এক্ষনি!”

প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়ার এক অভিব্যক্তি ঝুটে উঠল মঙ্গের চোখে-মুখে। নেপোলিয়ন এবার নিজের মুখটা তার এই সভ্য জগতের বন্ধুটির কানের কাছে নিয়ে এল এক টানে।

“বন্দুক সাথে নিয়ে ঘুরতে তো ভালোই লাগে তোমার, আবার যুদ্ধও করতে চাও, তাহলে এটাই সময়। সৈন্যরা তাদের কমান্ডারকে মান্য করে, এটা জানো নিশ্চয়ই। আমি চাই না এই লোকটা এখান থেকে চলে যাক। নিজের যদি গুলি করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে অন্য মানুষ দিয়ে করাও। কিন্তু একটা কথা আবারো মনে করিয়ে দেই, এই মানুষটা যদি কাল পর্যন্তও বেঁচে থাকে, তাহলে গৌরবান্বিত প্রজাতন্ত্রের হয়ে আমরা যারা এই মিশনে এসেছি, তাদের সবাই একজন দক্ষ গণিতজ্ঞ হারানোর শোকে ভুগবো।”

মঙ্গের চোখে এবার ভয়ের স্রোত দেখতে পেল নেপোলিয়ন।

“আমরা দুজনে একসাথে অনেক কিছুই করতে পারি।” আরও পরিষ্কার করে কথা বলছে জেনারেল। “আমরা সত্যিই একে অপরের বন্ধু। তথাকথিত গণতন্ত্রের ভাই-ভাই। কিন্তু তাই বলে আমার কথার অমান্য তুমি করতে পার না। কথনোই না।”

তাকে আলগা করে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলো নেপোলিয়ন।

“আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, গ্যাস্পারড। ফ্রান্সে। আমার চূড়ান্ত নিয়তি যেখানে। আশা করি, তুমি তোমার ভাগ্যটা খুঁজে নেবে, এখানে কোথাও, এই নিরানন্দ, বন্ধ্যা মরুর দেশে।”

প্রথম খণ্ড

এক

কোপেনহেগেন,
রবিবার, ডিসেম্বর ২৩, বর্তমান সময়
রাত ১২.৪০

বুলেটটা কটন ম্যালনের একেবারে বাঁ কাঁধে গিয়ে বিধেছে।

ব্যথা-ট্যাথা খেয়ালে না এনে সে মনোযোগ দিলো প্লাজার দিকে। মানুষগুলো ছুটছে, এদিক-ওদিক সবদিক। হৰ্ন বেজে উঠেছে তীব্র জোরে। অগণিত টায়ারের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ চারদিকে। কাছের অ্যামেরিকান অ্যাম্বসীতে ডিউটিরত মেরিন গার্ডো হটগোল শুনে ছুটে আসছে ঠিকই, কিন্তু তারা এখনো বেশ খানিকটা দূরে। নিখর হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে কয়েকজন। কত হবে? আট? দশ? নাহ। আরও বেশী। বয়সে তরুণ এক পুরুষ ও এক নারী পড়ে আছে কাছেই বাঁক নেওয়া শৈকটা পথের ধারে, পিছিল পিচের উপর। পুরুষটার চোখ দুটো খোলা, ভয় আৰু আতঙ্ক উপচে পড়ছে সেখানে। আর মেয়েটা পড়ে আছে উপুড় হয়ে, মুখটাও নিচৰ্ক্ষণদিকে, রক্ত ছুটছে ফিনকি দিয়ে। দুঁজন বন্দুকধারীকে দেখল ম্যালন, আর সামনেসাথেই শুট, পড়ে গেল দুজনেই। কিন্তু তিন নম্বর বন্দুকধারীকে চোখে মেলাতে প্রস্তুত না সে। এই হারামিটাই মাত্র এক রাউন্ড গুলি ফুটিয়ে ম্যালনকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে, আর এখন আতঙ্কিত মানুষের ছোটাছুটিকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালাতে চাইছে।

ড্যামিট, ক্ষতস্থানে যন্ত্রণা করছে। সাথে ভয়ও কোথা থেকে এসে যেন আগুনের হলকার মতো পুড়িয়ে দিচ্ছে সারা চোখ-মুখ। ডান হাতটা ওঠাতে গিয়ে সে আবিক্ষার করলো, দুটো পা-ই অসাড় হয়ে পড়েছে। কয়েক আউপ্সের ছোট বেরেটা পিস্টল ঠেকছে যেন কয়েক টন ওজন।

যন্ত্রণা তার অনুভূতিকে ভেঁতা করে দিচ্ছে। শেষবারের মতো চেষ্টা করার আগে সে বুক ভরে সালফার মিশে থাকা বাতাস টেনে নিল, এবং ট্রিগারে চাপ দিলো। টুস করে একটু শব্দ হলো মাত্র, কোনো গুলি ছুটল না।

অদ্ভুত তো!

আরও একবার চেষ্টা করতেই আবারো সেই টুস-টাস শব্দ শুনতে পেল সে।

পরক্ষণেই সারা জগতটা আঁধারে ডুবে গেল।

জেগে উঠলো ম্যালন, মাথা থেকে স্বপ্নের কথাটা সরিয়ে দিলো। এই একটা দৃশ্যাই সে গত দুই বছর ধরে দেখে আসছে। নতুন কোনো উদ্দেশ্যনা নেই এতে-এমনটা ভাবতে-ভাবতে বিছানার পাশে রাখা ঘড়িটা দেখে নিল সে।

ରାତ ୧୨:୪୩ ।

ନିଜ ଏପାର்டମେନ୍ଟେର ବିଛାନାର ଉପର ଶୁଯେ ଆହେ ମ୍ୟାଲନ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆଗେ ବିଛାନାୟ ଏସେହେ ସେ, ଆର ତତ୍ତ୍ଵା ସମୟ ଧରେ ନାଇଟସ୍ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲ୍ୟାମ୍ପଟୋଓ ଝଳିଛେ ।

କିନ୍ତୁ ଏକଟା ତାକେ ଜାଗିଯେ ଦିଯେଛେ ବଲେ ମନେ ହଲୋ ତାର । ଏକଟା ଶବ୍ଦ ହ୍ୟାତୋ । ମେଞ୍ଚିକୋ ସିଟିର ସେଇ ଦୁର୍ବିଷ୍ଵାସ ସ୍ଵପ୍ନଟାର ଅଂଶଓ ହତେ ପାରେ ଏଟା, ଆବାର ନାଓ ହତେ ପାରେ । ଶବ୍ଦଟା ଆବାରୋ ହଲୋ ।

ପରପର ତିନବାର ଚିର୍ଚି ଶବ୍ଦ ।

ଯେ ବିଲିଙ୍ଗଟାଯ ସେ ଥାକେ, ସେଟା ଶତେରଶ ଶତକେର, କିନ୍ତୁ କହେକ ମାସ ଆଗେଇ ଏଟାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନତୁନ କରେ ସାଜାନୋ ହ୍ୟେଛେ ଭେତରେ-ବାହିରେ । ତିନତଳା ଥେକେ ଚାରତଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠେର ନତୁନ ସିଙ୍ଗିଣ୍ଗଲୋ ଯେନ ଘୋଷଣା କରେଛେ ଯେ ତାଦେରକେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାୟଗାତେଇ ଲାଗାନୋ ହ୍ୟେଛେ, ଯେମନ ପିଯାନୋର ଉପର କୀ-ଗୁଲୋ ଲାଗାନୋ ଥାକେ ।

ତାର ମାନେ କେଉ ଏସେଛିଲ, ବା ଏଖନୋ ଆହେ ଏଖାନେ ।

ଦେରୀ ନା କରେ ବିଛାନାର ନିଚ ଥେକେ ଛୋଟ ରାକସ୍ୟାକଟା ବେର କରଲୋ, ଏଟା ସେଇ ବିଲେତେ ଥାକାକାଲୀନ ସମୟ ଥେକେ ସବସମୟ କାହେ ରାଖେ ସେ । ବ୍ୟାଗଟା ବେର କରତେ ଯତଟା ଦେରୀ-ମୁହୂର୍ତ୍ତେଇ ଡାନ ହାତଟା ଢୁକିଯେ ଦିଯେ ବେରେଟା ପିଣ୍ଡଲଟା ମୁଠୋର ମାଝେ ଟ୍ରେସେ ନିଲ । ମେଞ୍ଚିକୋ ସିଟିର ସେଇ ଘଟନାର ସମୟେଓ ଏଇ ପିଣ୍ଡଲଟାଇ ଛିଲ । ଏକଟା ରାର୍ଜିଭ ଗୁଲିଓ ଲୋଡ କରା ଛିଲ ।

ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟାଓ ଯେ ସେ ଧରେ ରେଖେଛେ ସେ ଜନ୍ୟ ନିଜେରେ ଏକଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲୋ ମନେ-ମନେ ।

ଶୋବାରଘର ଥେକେ ହାମାଗୁଡ଼ି ଦିଯେ ବେର ହଲୋ ତାରପରି

ପାଂଚତଳାୟ ତାର ଏପାର୍ଟମେନ୍ଟଟି ଆଯତନେ ଏକହଜାର କ୍ଷୟାର ଫିଟେରେ କମ ହବେ । ଶୋବାର ଘରେର ପାଶେଇ ଏକଟା ନିର୍ଜନ ଘର, ତାଙ୍କ ସାଥେଇ ରାନ୍ନାଘର, ଗୋସଲଖାନା ଆର କହେକଟା ଖାସକାମରା । ନିର୍ଜନ ଘରଟିତେ ଆଲୋ ଝଳିଛେ, ଯେ ଆଲୋତେ ସିଙ୍ଗି ଅବଧି ଯାଓଯାର ରାତ୍ରାଟା ପରିଷକାର ଦେଖା ଯାଚେ, ତାର ମାନେ ଘରଟିର ଦରଜାଟା ଖୋଲା । ଏକେବାରେ ନିଚେର ତଳାଟା ଥେଯେ ଫେଲେଛେ ତାର ଗାଦା-ଗାଦା ବହିୟେ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ତଳାଟା ବିଶେଷଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରା ହ୍ୟ ମାଲାମାଲ ରାଖା ଓ କାଜେର ଜାୟଗା ହିସେବେ ।

ଦରଜାଟା ଖୁଁଜେ ନିଯେ ଭେତରେ ଫ୍ରେମଟା ଧରଲ ଶକ୍ତ କରେ ।

ଧୀରେ, ଖୁବ ହାଲକା ଭାବେ ପା ଦୁଟୋ ଫେଲିଛେ କାର୍ପେଟେର ଉପର, ତାଇ କୋନୋ ଶବ୍ଦଟି ହଚ୍ଛେ ନା ତାର ନଡ଼ାଚଢ଼ା ଥେକେ । ଗତକାଳେର ପୋଶାକଟି ଏଖନୋ ଗାୟେ ଜଡ଼ାନୋ ତାର କ୍ରିସମାସ ଆର କଦିନ ବାଦେଇ, ତାଇ ବ୍ୟକ୍ତତାଓ ବେଶୀ । ଗେଲ ଶନିବାରେ ସାରା ଦିନ-ରାତ କାଜ କରେ ଏମେ ରୋବବାରେଓ ଅନେକ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଜ କରତେ ହ୍ୟେଛେ । ବିକିକିନିର କାଜଟା ଭାଲୋଇ ଚଲିଛେ ଖାତା-କଲମେ ଏଟାଇ ଏଖନ ତାର ପେଶା । ତାହଲେ ଏଇ ରାତ-ଦୁପୁରେ ହାତେ ବନ୍ଦୁକ ନିଯେ ଗୋୟେନ୍ଦାଗିରି କରାର ମାନେ କୀ? ତାହଲେ କି ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଲି ନିକଟ କୋନୋ ବିପଦେର ଆଗାମ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଚେ?

একটু ঝুঁকি নিয়ে মাথাটা উঁচু করে দরজার ওপাশের পথটা দেখে নিল ম্যালন। সিঁড়িগুলো নেমে গিয়ে মাঝপথে বাঁক নিয়ে আবারো নিচে নেমে গেছে আর পাঁচ-দশটা সিঁড়ির মতো। রাতে ঘুমোতে যাবার আগে নিচের সবগুলো বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল সে, আর ওগুলো জ্বালানোর জন্য দ্বিতীয় কোনো সুইচ নেই কোথাও। নিজের উপর খানিকটা রাগ হলো তার এমন বিকল্প কোনো সুইচ না রাখতে, কদিন আগেই সবকিছু নতুন করে করা হলো, কেন যে তখন মনে পড়লো না। তবে নতুনের মধ্যে সিঁড়ির রেলিং এর বাইরের প্রান্তে লাগানো ধাতব খুঁটিগুলো চোখে পড়লো তার।

এপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে সিঁড়ির মসৃণ রেলিংরে উপর বসে সড়াৎ থেয়ে বাঁক নেওয়া ল্যাভিংটায় নামলো সে। কাঠের সিঁড়িগুলোতে সামান্য একটু ক্যাচক্যাচ শব্দ ছাড়া তার উপস্থিতি জানানোর মতো আর কোনো শব্দ হলো না।

খুব সতর্কতার সাথে নিচে, তারপর সিঁড়ির পরবর্তী অংশের দিকে তাকাল।

কিছুই নেই ওখানে, এক রকম ঘুটঘুটে অঙ্ককার শুধু

একইভাবে সিঁড়ির বাকিটুকুও নামলো সে, তারপর এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে সুবিধামত একটা জায়গায় নিজেকে স্থির করলো যেন ওখান থেকে চতুর্থ তলাটা ভালো করে দেখা যায়। কোপেনহেগেন সিটি সেন্টারের একেবারে কেন্দ্রেই তার এপার্টমেন্টটা হবার সুবাদে বিখ্যাত হয়ে রাঙ্গের হলদে-বাদামী রঙের আলো তার বিল্ডিংরে স্মারনের জানালা গলে দরজাটার পেছনের বেশ খানিকটা জায়গা আলোকিত করে রেখেছে। কেমন যেন কমলা রঙের আভায় রূপান্তর হয়েছে ঘরে ঢোকার পর, ম্যালনের কাছে সেরকমই মনে হলো। মালামালের সব রকম তালিকা ওখানেই রাখে সে। প্রতিদিন কৃত্তশত বই বেচতে আসে মানুষজন, এমনভাবে বইগুলো বাক্স ভরে টেনে-হিচড়ে নিয়ে আসে যেন ওগুলো থেকে মুক্তি চায় তারা। আর ম্যালনও সেগুলো খুশি মনে নিয়ে নেয়। তার একটাই নীতিঃ “প্যাসায় কেনো, টাকায় বেঁচো।” পুরনো বইয়ের ব্যবসা ক্ষমতে এটাই আসল কথা। যতটা পার কেনাবেচা করো, আর টাকায় বাক্স ভরো। দিনে দিনে খুব জমে উঠছে তার এই ব্যবসা। খুব অল্প সময় পরপর নেট আর কয়েনগুলো বাক্সের ভেতর ভরে রাখে, তারপর সময় সুযোগ মতো সেগুলো তৃতীয় তলায় একটা তালাবদ্ধ ঘরে রেখে আসে। এখন কথা হলো, যদি না কেউ ত্রুটি করে আসে, তাহলে তারতো আর সেই ঘরে যাওয়া লাগছেনা। তারমানে তিনতলায় তার কাজ নেই, আসতে পারে এই চারতলায়।

শেষ রেলিংটা ধরেও সড়াৎ থেয়ে নামলো সে তবে মেঝেতে পা দুটো স্পর্শ করার আগেই দরজাটার ওপাশে কেউ আছে এব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়ে গেল। আগন্তক যে ঘরটায় রয়েছে সেটা আয়তনে চল্লিশ বাই কুড়ি ফিট, বইপত্রে বোঝাই তবে সবগুলোই ছোট-বড় নানা আকৃতির বাস্তুর মধ্যে।

“কি চাও তুমি?” জিজেস করল ম্যালন, বাইরের দেওয়ালের সাথে পিঠ চেপে দাঁড়িয়ে আছে সে, পাশেই খোলা দরজাটা।

ওগুলো তার স্থপ্তের কারসাজি কিনা তা সে নিজেই বুঝতে পারলনা, হতেও পারে ঘুমের মাঝেই শব্দ শনে সেটাকেই তার বাস্তব মনে হচ্ছে। বারোটা বছর ধরে বিচারবিভাগে কাজ দ্ব্য প্যারিস ভেঙ্গে- ২

করে তার মন্তিক্ষের যে বারোটা বাজেনি সেটাই বাঁ কে বলবে? আর গত দুইটা সপ্তাহ তাকে এমন ভোগান্তি দিয়েছে যেটা পাওয়ার জন্য কোনো দর কষাকষি তাকে করতে হয়নি, সত্ত্বের পুরক্ষার হিসেবে তা পেয়েছে।

“কথা বলনা কেন?” ম্যালন বলল, “আমি উপরে ফিরে যাচ্ছি, তুমি যে-ই হও বাপু, যদি কিছু চাওয়ার থাকে, তাহলে উপরে আস, আর সেরকম কোনো ধান্দা না থাকলে ভালোয় ভালোয় আমার দোকান থেকে কেটে পড়।”

আরও নীরবতা।

সে ফিরতি পথ ধরতে ঘুরে দাঁড়াতেই...

“আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি,” একটা পুরুষকষ্ট ভেসে এল বইয়ের স্তুপের আড়াল থেকে।

থেমে গিয়ে মানুষটার কষ্টের ভাঁজগুলো পড়ে নিল ম্যালন। বয়সে তরুণ, বয়স বিশের শেষ বা ত্রিশের কোটায়। আমেরিকান, কষ্টে সামান্য অঙ্গলিক টান। আর সঙ্গত কারণেই, শান্ত প্রকৃতির।

“তাই বলে আমার দোকান ভেঙ্গে চুকতে হবে?”

“উপায় ছিল না কোনো।”

এবার কষ্টটা আরও কাছে, দরজার ঠিক ওপাশেই এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে ঘুরে বন্দুকটা তাক করল ম্যালন, অতিথি নিজেই দেখা দেন্তে এমন অপেক্ষায়।

ছায়াময় একটা অবয়ব আবির্ভূত হলো দরজায়।

মাঝারি উচ্চতার, ছিপছিপে গড়নের একজন। কোমর স্তুর্যধি কোটে ঢাকা, চুলগুলো ছেট। হাত দুটো দুপাশেই, খালি। রাতের অন্ধকারটা মুখের ক্ষেত্রে দেখতে দিল না।

বন্দুকটা এখনো তাক করা। “নাম কী?”

“স্যাম কলিন্স।”

“আমার কাছে কী কাজ?”

“হেনরিক থ্রাল্ডসেন বিপদে পড়েছেন”

“পুরনো কথা, নতুন কিছু আছে?”

“তাকে খুন করতে আসছে ওরা।”

“কারা?”

“হেনরিকের কাছে যেতে হবে আমাদের।”

বন্দুক এখনো সেখানে স্থির, আঙুলটা ট্রিগারেই স্যাম কলিন্স যদি একটু নড়াচড়া দিয়েও ওঠে, শুলি চালাতে দেরী হবে না তার। কিন্তু একজন এজেন্ট হিসেবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তাকে বলছে যে ছেলেটা মিথ্যে বলছে না।

“কারা, বললে না?” আবারো জিজ্ঞেস করল ম্যালন।

“এখনি হেনরিকের কাছে যেতে হবে।”

কাঁচ ভাঙার শব্দ এলো নিচতলা থেকে।

“আর...” স্যাম বলল, “ঐ লোকগুলো আমার পেছনেও লেগেছে।”

দুই
বাস্তিয়া, কর্সিকা
রাত ১.০৫

প্রেস দে লা লিবারেশন ভবনের ছড়ায় দাঁড়িয়ে শান্ত পোতাশ্রয়টা দেখে মুক্ষ হলো গ্রাহাম অ্যাশবি। চারপাশের ফিকে রঙের ঘর-বাড়িগুলো মনে হচ্ছে যেন চার্টের মাঝে জড়ে করে রাখা ছোট-ছোট বাস্তুর সারি। বহু পুরনো এই কাঠামোগুলো ছাপিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মসৃণ পাথরে গড়া এই ভবনটা, যার শীর্ষে দাঁড়িয়ে তার মনে হচ্ছে, সে যেন নিজের সিংহাসনে, বাকিরা সবাই নতজানু। আধিকিলো দুরেই ভিউ পোর্টে নোঙ্গর করা তার প্রিয় ইয়ট-আর্কিমিডিস। রূপালী জলে ওটার মসৃণ দেহের আবছায়া অবয়বটা দৃষ্টি জুড়াল তার। শীতের দ্বিতীয় রাতটা ঠাণ্ডা ও শুষ্ক একটা বাতাস ছড়াচ্ছে উত্তর দিক থেকে, যেটা সমগ্র বাস্তিয়াকে ধূয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ছুটির দিনের সুনসান নীরবতাটা আরও গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ, আর দুদিন বাদেই ক্রিসমাস। কিন্তু গা ভাসিয়ে দেবার সময় তার নেই।

এই টেরো নোভা এক সময়ে সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রবিন্দু ছিল, আর এখন সেটা রূপ নিয়েছে একটা কোয়ার্টারে, যেখানে সুউচ্চ এক্সিউটিমেন্ট আর হাল-আমলের সব পণ্যের পরিপাতি দোকানগুলো গড়ে উঠেছে পার্শ্ব বাধানো আঁকাবাঁকা ধাঁধাময় রাস্তার দু'ধারে। বছর কয়েক আগে, অ্যাশবি এখানে বড় রকমের একটা বিনিয়োগ করেই ফেলেছিল প্রায়, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করে ফেলে। মাথাচড়া দিয়ে ওঠা এই বাণিজ্যিক এলাকাটায় রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করাটা বোকামি হবে না, এমনটাই ভেবেছিল সে, কিন্তু এই ক্ষেত্রসায় আগে থেকেই আছে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরের উপকূল বরাবর যেগুলো আছে সেগুলোর ডেতরের খবর ঘাঁটতে গিয়ে দেখা গেল, যে মূলধন তারা বিনিয়োগ করেছে, তা আর ফেরত আসেনি।

উত্তর-পূর্ব কোণে, জেতে দুয় দ্রাগন নামের একটা মনুষ্য নির্মিত জাহাজ-ঘাটের দিকে দৃষ্টি দিলো অ্যাশবি। এটা বানাতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের বিশাল আকৃতির একটা পাথর অপসারণ করতে হয়েছিল। ওটা অনেকটা সিংহের মতো দেখতে, তাই স্থানীয়রা নাম দিয়েছিল লিও। বাস্তিয়ার পোতাশ্রয়ে আসা যাওয়ার পথে একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পাথরটা। বেশ খানিকটা দূর থেকেও ওটার গায়ের শত বছরের পুরনো বহু খোদাইকর্ম দেখা যেত। ঘণ্টা-দুয়েক আগে আর্কিমিডিস যখন ওটার নির্ধারিত জায়গায় নোঙ্গর ফেলেছিল, তখনই তার এই সুউচ্চ প্রাসাদটি চোখে পড়ে, যেটা উপর এখন সে দাঁড়িয়ে। চতুর্দশ শতকে দ্বিপের জেনোয়ার তৎকালীন গৰ্ভনররা এটা তৈরি করেছিলেন। আর্কিমিডিসের উপর থেকেই প্রাসাদটিকে মুক্ষ হয়ে দেখছিল আর ভাবছিল আজ রাতটাই যদি তার কাঙ্ক্ষিত সেই রাতটি হত।

সে অবশ্য আশাবাদী এখনো ।

তার প্রিয় স্থানগুলোর মাঝে কর্সিকা পড়ে না । কী আছে এখানে একটা উঁচু পাহাড় ছাড়া? ১১৫ মাইল দীর্ঘ, ৫২ মাইল প্রশস্ত, সব মিলিয়ে প্রায় ছ’হাজার বর্গমাইলের একটা দ্বীপ । ব্যস, এটুকুই । উপকূলটা অবশ্য বেশ দীর্ঘ, প্রায় ছয়শ মাইল । এর ভৌগলিক রূপটা বেশ মিশ্র । একদিকে উঁচু-উঁচু আল্লাইনের সারি, অন্যদিকে গোলক ধাঁধাময় গভীর গিরিখাত । পাইন গাছের বনও আছে কিছু, সাথে বিভিন্ন জায়গায় হেসিয়ারের বরফ গলা জলের লেকও চোখে পড়ে । সবুজ তৃণভূমি বা উর্বর উপত্যকা এসবও পাওয়া যায় এখানে । বাদ, থাকে মরুভূমি, তাও কিছু উপস্থিত এই দ্বীপে । কখনো গ্রীক, কখনো কারথাজিনিয়াস, এমনকি রোমান, আরাগোনিজ, ইটালিয়ান, বিট-সবাই কালে-কালে দখল করেছে এই ভূখণ্ডকে । ফ্রান্সও আছে এই তালিকায় । তবে এই দ্বীপের মানুষের বিদ্রোহী চেতনাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি কোনো শাসকই ।

কারণ আরও একটা আছে এই দ্বীপে বিনিয়োগ না করার । এখানকার ফরাসি হোমরা-চোমরা যারা আছে এরা খুবই বেয়াড়া, মোটেই বাগে আনা যায় না ।

শাসকদের মধ্যে জেনোয়ানরা খুব পরিশ্রমী ছিল, ওরাই এই বাস্তিয়ার স্থপতি । এই জায়গাকে রক্ষা করার জন্য ১৩৮০ সালে এখানে বেশ কিছু দুর্গ তৈরি করেছিল ওরা যেগুলোর মধ্যে এই একটাই টিকে আছে এখনো, যেটার শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাশবি । ১৭৯১ সাল অবধি এই বাস্তিয়া ছিল রাজধানী, সে সময়ে নেপোলিয়ন সিদ্ধান্ত নিলেন তার জন্মভূমি অ্যাজাশিও-ই হবে রাজধানী । তাই রাজধানীটা পুরুন থেকে দক্ষিণে চলে যায় তখন স্থানীয়রা যে এই অর্বাচীন স্থানের এমন কৃতিকে ক্ষমা করেনি, সেটা স্থানের অজানা ছিল না ।

আরমানী ওভারকোট্টার বোতামগুলো আঁটিকে দিয়ে মধ্যযুগের এই দুর্গটার দেয়ালের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল অ্যাশবি । তার আটান্ন বছরের দেহটা জড়িয়ে আছে দামি কাপড়ে বানানো জামা, ট্রাউজার এবং সোয়েটারে । একটা নিশ্চয়তা ভরা অনুভূতি মন্টাকেও উষ্ণ করে দিচ্ছে । পাঁচমিশালি পোশাকের পুরো সেটটা সে কিনেছিল কিংস্টন অ্যান্ড নাইট শপিংমল থেকে, যেখান থেকে তার বাপ-দাদারাও কেনা-কাটা করত এক সময়ে । গতকাল বিলেতি এক নরসুন্দর পাক্কা আধঘন্টা ধরে তার ধূসর রঙের বাবরি চুলগুলো ছেঁটে ছেট করেছে, ফ্যাকাশে চুলে অমন ঢেউ খেলানো থাকলে আরও বুড়ো-বুড়ো লাগে । ঘষেমেজে এই মৌবনভূরা একটা তেজস্বী ভাব ফিরিয়ে আনতে পেরে ভেতরে-ভেতরে সে বেশ গর্বিত বোধ করছে । সে যেন আজ আসল পুরুষ । এই সুখানুভব আরও গাঢ় হচ্ছে যখন আঁধারে ঘেরা বাস্তিয়ার চারিপাশে চোখ বুলাচ্ছে সে, দুরেই তিরেনিয়ান সাগর তার আনন্দের মাত্রাটা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে । সত্যিকারের এক মানুষ আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন একটা সন্তুষ্টির আশাদান তার ভেতর-বাহিরে ।

ঘড়িটা একনজর দেখে নিল অ্যাশবি ।

একটা রহস্যের সমাধান করতে আজ সে এখানে ; এমন এক রহস্য যেটা ষাট বছরেও বেশি সময় ধরে গুণ্ঠন অনুসন্ধানকারীদেরকে দৌড়ের উপর রেখেছে। কিন্তু তার এমন দেরি করাটা মোটেই ধাতে সহ না ।

কারো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কাছের সিঁড়িটা থেকে যেটা নিচ থেকে বাঁক নিয়ে সোজা কুড়ি মিটার উপরে উঠে এসেছে। দিনে-মানে দর্শনার্থীরা এতটা উপরে উঠে এসে নিচের সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে হা করে, ছবিও তোলে প্রচুর। কিন্তু এই সময়ে এদিকে কোনো দর্শনার্থীর পা পড়ার প্রশ্নই আসে না ।

টিমটিমে আলোতে একটা মানুষের অবয়ব দেখা গেল ।

ছোট-খাটো গড়ন, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। নাকের উপর থেকে মুখ পর্যন্ত গভীর দুটো কাটা দাগ। গায়ের রঙ ঠিক আখরোটের খোসার মতো বাদামী। এমন গৌরবর্ণের মাঝে চোখে পড়ছে শুধু পেকে যাওয়া গোফজোড়া ।

আর গায়ে জড়িয়েছে পদ্মীর পোশাক ।

মানুষটা এগিয়ে আসতেই বাতাসে তার আলখাল্টাটা একটু শব্দ করে দুলে উঠলো ।

“লর্ড অ্যাশবি, আমার দেরির জন্য ক্ষমা চাইছি, আসলে কিছুই করার জ্ঞান না ।”

“এতো দেখি পুরাদন্তর পদ্মী !” আলখাল্টাটার দিকে দেখিয়ে বলল ।

“জি, ভাবলাম যে রাতে ছদ্মবেশ নেওয়াই নিরাপদ। কেউ প্রমাণ করবে না ঐ বিষয়ে ।” পরপর কয়েকটা দম নিল লোকটা, সিঁড়ি ভেঙ্গে হাঁকিয়ে উঠেছে সে ।

রাতের এই ক্ষণটা খুব হিসাব-নিকাশ করে পঁজুন্ত করেছে অ্যাশবি, এবং ইংরেজদের মতো করে একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় মিস্টারিত সময়ে হাজির হয়েছে এখানে। কিন্তু সব যেন ভেস্তে যাচ্ছে গত আধুনিক শুরু ।

“দেখো, রাগারাগি আমার পছন্দ না,” সে বলল, “কিন্তু মাঝে-মাঝে সরাসরি, খোলামেলা কথা বলাটা দরকার হয়ে পড়ে ।” একটা আঙুল তুলল সে পদ্মীর পোশাক পরা মানুষটার দিকে। “তুমি মানুষটা একজন মিথ্যুক ।”

“হ্যাঁ, সেটা স্বীকার করি আমি ।”

“টাকার টাকা আর সময়, দুটোই খসিয়েছ আমার, যেগুলোর একটাও আমি খরচ করতে চাই না ।”

“দুঃখজনক হলেও সত্যি, লর্ড অ্যাশবি, এই দুটোরই অভাব চলছে আমার ।” একটা বিরতি নিল পদ্মীর পোশাক পড়া লোকটা। “আর এটাও জানি আমি যে আমার সাহায্য আপনার খুব দরকার ।”

গতবার এই লোকটাকে একটু বেশিই লাই দেওয়া হয়ে গিয়েছে। অনেক কিছু জেনে গেছে সে এখন ।

খুবই ভুল হয়েছে এটা ।

১৯৪৩ সালের ঘটনা, এই বছর সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখে এই কর্সিকায় কিছু একটা ঘটেছিল ইটালি থেকে ছয়টা বাস্তু এই পশ্চিমে আনা হলো কেউ বলল, ওগুলোকে

বাস্তিয়ার ধারে-কাছে কোনো জায়গা থেকে সমুদ্রে ফেলা হয়েছে, আর কাবো বিশ্বাস যে ওগুলো টেনে তীর পর্যন্ত এনেছে কেউ। তবে উভয় পক্ষ এটা নিশ্চিত ছিল যে এই কাজে পাঁচজন জার্মান অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে চারজনকে কোর্টমার্শালে দেওয়া হলো এমন মূল্যবান ধনভাণ্ডার এমন জায়গায় নিয়ে আসার জন্য যেটা খুব দ্রুতই মিত্র বাহিনীর হাতে চলে যাবে। গুলি করে মারা হয় চারজনকেই। খালাস দেওয়া হয় পাঁচ নম্বর ব্যক্তিকে। প্রাণে বেঁচে গেলেও বাক্সগুলো যে শেষ পর্যন্ত কোথায় লুকানো হয়েছিল, তা সে জানত না। তাই, বাকিটা জীবন অঙ্ককারে সুই খোঁজার মতো হন্তে হয়ে খুঁজে গেছে সে বাক্সগুলোকে।

আরও যে কত মানুষ এটা করেছে।

“এই মিথ্যেরাই আমার জীবনের একমাত্র অস্ত্র,” পরিষ্কার ভাষায় কথা বলছে কর্সিকান মানুষটা। “আপনার মতো প্রভাবশালী মানুষদেরকে কোণঠাসা করতে চাইলে এই অস্ত্রের বিকল্প নেই।”

“শোন বৃদ্ধ—”

“একটু সাহস করেই বলছি, আপনার মতো বুড়ো এখনো হইনি আমি, যদিও আমার মান-মর্যাদা আপনার মতো অতটা না। সত্যি বলতে, অনেক নাম-ডাক কুড়িয়েছেন আপনি, লর্ড অ্যাশবি।”

মাথা নেড়ে এমন পর্যবেক্ষণকে স্বীকার করে নিল সে। একটা ভালো ইমেজ একজন মানুষকে কোথায় যে তুলে দিতে পারে, সেটা সে জানে। গত তিনশো বছর ধরে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে পুরনো সুদের কারবারিদের সম্প্রেক্ষণ্যবসা করে আসছে তার বাপ-দাদা, ও তারও আগের কয়েক পুরুষ। অ্যাকাউন্টেন্টগুলো সুদের টাকায় ফুলে-ফেঁপে একাকার। উত্তরাধিকারী বলতে সে এক। বিটেজেজ সংবাদমাধ্যম একবার তাকে নিয়ে প্রশংসাসূচক লেখা প্রকাশ করেছিল। তার দীপ্তিমালি ধূসর চোখ, রোমানদের মতো নাক এবং স্মিত হাসিকে ওরা আখ্যা দিয়েছিল- আভিজাত্য ভরা এক মুখ। এইতো বছর কয়েক আগেই এক সাংবাদিক তাকে মহান তকমা দিয়েছে, আরেকজন দিয়েছে শ্যামবর্ণ ও স্বভাবগঠিত। অবশ্য তাকে এমন কালো বলায় সে মনে কিছু করেনি। আর গায়ের রঙটা পেয়েছে সে তার আধা-তুর্কি মায়ের কাছ থেকে। কিন্তু এই রঙের অর্থ যদি এভাবে করা হয় যে সে একজন বিষণ্ণ, গোমড়ামুখো, তাহলে এটা আসলেই তাকে পীড়ি দেয়।

“শোন, একেবারে মন থেকেই বলছি,” বলল সে। “আমাকে একটুও ভয় করতে হবে না তোমার।”

হেসে উঠলো কর্সিকান লোকটি। “আমি করতেও চাই না। ঐসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে স্বেচ্ছ ক্ষতি ছাড়া কিছুই হয় না। সে যাই হোক, আসল কথা হলো যে আপনি রোমেলের গুপ্তধন, সোনার বাক্স খুঁজছেন, আর আমি জানি সেটা কোথায় অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।”

যেমন জেদি, তেমনি সজাগ এই কর্সিকানটা। কিন্তু তারপরও সে একজন স্বঘোষিত মিথ্যক ।

“তুমিতো আমায় পুরো কানাঘুলি দিলে আজকে !”

আঁধারে দাঁড়ানো অবয়বটা হাসল। “আপনি বড় চাপাচাপি করছিলেন। মানুষ একবার জেনে গেলে পরে তা আমি সামলাতে পারব না। আর জানবে না তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। দ্বিপটা একেবারে এইটুকুন, যদি আমরা গুণ্ধনটা খুঁজেও পাই, তাহলে আমার ভাগে যা পাব, সেটা আমারই তো হজম করার পথ রাখতে হবে।”

অ্যাজাশিওর ঠিক বাইরে, অ্যাসেম্বলে দে করসেতে এই লোকটা কাজ করে। কর্সিকার স্থানীয় সরকারের একটা ছোট-খাটো কর্মকর্তা, যে কিনা অবাধে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য জেনে নিতে পারে নিজের ক্ষমতাবলে।

“আমরা যা পেলাম, তা কারা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে?” জিজ্ঞেস করল অ্যাশবি।

“এখানকার লোকজন, এই বাণিয়ার লোকজন, যারা এখনো খুঁজে যাচ্ছে। আর ফ্রান্স আর ইটালিতে তো এরকম লোকের সংখ্যা আরও বেশি।”

এই বোকাটা দৃশ্যতই চাইছে যেন কথোপকথনটা ধীরে এগোয়, আর কঢ়ার মাঝে না আছে কোনো সূত্র, না আছে কোনো কাজে লাগার মতো পরামর্শ, কিসিব ভুজুংভাজুং দিয়ে সময় পার করতে চাইছে।

কিন্তু অ্যাশবির হাতে এতো সময় নেই।

সে ইশারা করতেই সিঁড়িয়ুথের দরজা দিয়ে একজন এগিয়ে এলো। শরীরে মোড়ানো কয়লা রঙের ওভারকোটটার সাথে মাথার শক্ত ধূসর চুলগুলো বেশ মনিয়েছে। চোখ দুটো যেন তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা পুথের দু'পাশ সরু হয়ে সুঁচালো থুনিতে এসে মিশেছে। লোকটা সোজা হেঁটে এসে কর্সিকান মানুষটার কাছে থামলো।

“ইনি মিস্টার গিল্ডহল,” অ্যাশবি বলল। “গতবারের খ্যাপ দেওয়ার কথা মনে আছে তোমার? থাকলে তো তোমার চেনার কথা।”

নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিলো কর্সিকান লোকটা, কিন্তু পকেট থেকে হাত বের করল না গিল্ডহল।

“হ্যাঁ, মনে আছে,” আলখাল্লা পড়া কর্সিকানটা বলল। “কখনো হাসেন ইনি?”

মাথা ঝাঁকাল অ্যাশবি। “সে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। কয়েক বছর আগে এক তুমুল বাগড়া-ঝাটিতে জড়িয়ে পড়ে মিস্টার গিল্ডহল, এক পর্যায়ে কেউ একজন ধারালো ছুরি দিয়ে মুখ আর গলায় সজোরে পেঁচ দেয়। প্রাণে বেঁচে গেলেও স্নায়কোষগুলো স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মুখের মাংসপেশিগুলো ঠিক মতো কাজ করে না আর। তাই, দেখো, কোনো হাসি নেই ওখানে।”

“যে লোকটা এমন করলো তার কী হলো?”

“এইতো! দারুণ প্রশ্ন। সে তো মরেছে তখনই, ঘাড় মটকে গিয়েছিল ব্যাটার।”

সে যা বোঝাতে চেয়েছে তা সে বোঝাতে পেরেছে বলে মনে হলো তার, তাই সে ঘুরে গেল গিল্ডহলের দিকে। “বল, কী খবরা-খবর?”

লোকটি তার পকেট থেকে ছোট আকৃতির কিছু একটা বের করে অ্যাশবির হাতে দিলো। মৃদু আলোতেও জিনিষটার উপরের লেখাটা পড়তে পারল সে। ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া কিছু অক্ষর, ফরাসি ভাষায় লেখা-

Napoleon, From the Tuilleries to St. Helena.

অসংখ্য স্মতি-বিজড়িত ঘটনার বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল বিভিন্ন ছাপার মাঝে ১৮২১ সালে নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর।

“কিভাবে... ওটা পেলেন কিভাবে?” কর্সিকানের প্রশ্ন।

একটু হাসল অ্যাশবি। “তুমি যখন আমাকে এই ছাদের উপর অপেক্ষায় রাখলে, সেই সময়ে মিস্টার গিল্ডহল তোমার বাড়িতে একটু তল্লাশি চালিয়েছে আরকি। আমি একেবারেই আহাম্মক না, বুঝলে?”

কাঁধজোড়া ঈষৎ উঁচু করলো কর্সিকান লোকটা। “একটা নিরস ক্ষেত্রে কিছু নেই ওটা, নেপোলিয়নের উপরে অনেক পড়াশোনা করেছি আমি, ওটাতে তেমনো কিছু নেই।”

“তোমার দলের ষড়যন্ত্রকারীও ঐ একই কথাই বলেছে।”

অ্যাশবি বুঝতে পারল, শ্রোতার পূরো মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে সে। “সেই লোক, আমি আর মিস্টার গিল্ডহল দারুণ কিছু পর্যবেক্ষণ করেছি।”

“গুস্তাভের কথা জানলেন কী করেন?”

কাঁধ ঝাঁকাল সে “বুঝে নেওয়াটা কঠিন নহ। তুমি ও গুস্তাভ দু’জনেই রোমেলের বাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছ বহুদিন ধরে। বলা যায় তোমরা দু’জনেই এই বিষয়ের উপর সব থেকে বেশি জানা মানুষ।”

“আপনি কি তার কোনো ক্ষতি করেছেন?”

প্রশ্নের মাঝে ভয়ের একটা সংকেত স্পষ্ট। “আরে নাহ! মাথা কি খারাপ তোমার? সে তো খুব ভালো লোক, আর আমাকে কি তোমার ভিলেন মনে হয়? আমাদের বৎশে কেউ এমন ছিলও না। খুব সম্ভাস্ত পরিবারের মানুষ আমি, এলাকায় আমিই প্রধান। সবাই আমাকে খুব সম্মানের চোখে দেখে, আমার মোটা অংকের টাকার বিনিয়োগের কথা জানে। আমাকে এমন ত্রাস মনে করছ কী হিসেবে? যদিও তোমার ঐ গুস্তাভও আমার কাছে যিথে বলেছে, তোমার মতোই

কজিটা হঠাত মোচড় দিয়ে ধরেই গিল্ডহল লোকটার মাথাটা তার বগল আর বাহুর মাঝে চাপ দিয়ে ধরল, আরেক হাত দিয়ে লোকটার একটা পা আলখাল্লা থেকে এক ঝটকায় টেনে বের করে এনে উপর দিকে ঠেলে দিয়ে ধরে রাখল শক্ত করে। কর্সিকানের ছোট দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে খানিকটা উপরে উঠে গেল

গিন্ডহলের শক্ত করে ধরে রাখার কারণে। তারপর তাকে ভাসানো অবস্থায় পাথরের দেয়ালের প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে ধরে রাখল সে। তার মাথা নিচের দিকে, পা দুটো শক্ত করে দু'হাতে ধরে আছে গিন্ডহল। ছেড়ে দিলেই কুড়ি ফিট নিচের পাথুরে রাস্তার উপর গিয়ে পড়বে ঝুলন্ত মানুষটা।

বাতাস এসে আলখাল্লায় আছড়ে পড়তেই শব্দ হতে লাগল পতাকা ওড়ার মতো করে।

অ্যাশবি একটু এগিয়ে এসে তার মাথায় মৃদু টোকা দিয়ে দেওয়াল থেকে আরও একটু দূরে মাথাটা সরিয়ে দিলো। “দুঃখজনক বিষয় হলো এই, মারামারি খুনো-খুনির ব্যাপারে আমি যে সংযমটা পালন করি, মিস্টার গিন্ডহল কিন্তু ততটা করেন না। তাই বলছি আরকি, তোমার মুখ থেকে যদি কোনো টু-শব্দটি করো, এখান থেকে ফেলে দিতে একটুও দেরী করবে না সে। বুঝতে পেরেছ?”

প্রাণটা যেখানে সুতোয় ঝুলছে, তখন না বুঝে আর উপায় কী! ঘপাঘপ মাথা নাড়ল সে উপর নিচে।

“বাহ, তারমানে তোমার সাথে এবার কাজের কথায় আসতে পারি।”

তিন কোপেনহেগেন

স্যাম কলিঙ্গের সাদামাটা চেহারার দিকে চেয়ে আছে ম্যালন। নিচের থেকে আরও কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ ভেসে আসছে।

“মনে হয় ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চায়,” কলিঙ্গ বললে।

“খেয়াল করেছ কিনা জানি না, আমিও কিন্তু বন্দুক ধরে আছি তোমার দিকে।”

“মিস্টার ম্যালন, আমাকে হেনরিক পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।”

যেকোনো একটা বেছে নিতেই হবে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক আপদ, আর দু'তলা নিচে এক বিপদ।

বন্দুকটা নামাল সে। “ঈ লোকগুলোকে তুমিই এ পর্যন্ত এনেছ, তাই না?”

“কী করবো বলেন, আমার তো বাঁচতে হবে, আপনার সাহায্য দরকার। বড় কথা হলো, হেনরিক নিজেই আমাকে আসতে বলেছেন এখানে।”

পরপর তিনটা গুলির শব্দ হলো নিচে, সবকটাই চাপা শব্দ। তারপর ওপাশ থেকে সজোরে ধাক্কা দেওয়ায় মূল দরজাটা ঝুলে গেল। পায়ের শব্দ ভেসে আসছে কাঠের মেঝে থেকে।

হাতের বন্দুকটা দিয়ে একটা দিকে দেখাল ম্যালন “ওদিকে চল।”

প্রাণ বাঁচাতে থার্ড ফ্লোরের স্টোরেজ রুমে টুকল দু'জন, বাস্কের পেছনে লুকিয়ে থাকাই এখন ভরসা। ম্যালন বুঝতে পারছে যে গুগুগুলো প্রথমেই যাবে একেবারে ওপরতলায়, যেহেতু ওখানে আলো ঝুলছে কিন্তু ওখানে কাউকে না পেয়েই খোঁজাখুঁজি

শুরু করে দেবে ওরা। এখন সমস্যা হলো, ওরা সংখ্যায় ঠিক কতজন, সেটা সে জানে না।

একটু ঝুঁকি নিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে ম্যালন দেখল, একজন থার্ডফ্লোর থেকে ফোর্থ ফ্লোরে যাবার জন্য বাঁক নিয়েছে। খুব ধীরে, কলিঙ্গকে নিয়ে বের হলো ম্যালন, তারপর আগের মতো করেই সিঁড়ির ব্রাস রেলিং এর উপর চেপে বসে দুই সিঁড়ির মাঝের জায়গায়টায় নামলো। কলিঙ্গও নামলো একইভাবে। তারপর দু'জনেই খুব সতর্কতার সাথে বাকি সিঁড়িটুকুও আগের মতো করে পার হয়ে পা রাখল একেবারে নিচতলায়, যেখানে ম্যালনের মূল দোকানটা।

কলিঙ্গ বেসমেন্টে নামার সিঁড়ির দিকে ছুটতেই হাতটা ধরে ফেলল ম্যালন, তারপর মাথা দোলাল। সে এখনো বুঝতে পারছে না এই অর্বাচীন বালকটি হাঁদারাম, নাকি খুব সেয়ানা। মাথার উপর এতগুলো বন্দুকধারী ঝুলছে, সেখানে নির্বুদ্ধিতা হোক আর চালাকি হোক, কোনোভাবেই বেসমেন্টে যাওয়াটা নিরাপদ না।

গায়ের কোটটা খুলে ফেলার ইশারা করলো ম্যালন।

অঙ্ককার সত্ত্বেও তার মুখে ফুটে ওঠা ইতস্তত ভাবটা ঠিকই বুঝতে পারল সে। এক মুহূর্ত সময় লাগল এমন অনুরোধটা হজম করতে, তারপর একেবারে ~~ক্ষণ~~ অন্তরে ছেলের মতো ওটা খুলে ম্যালনের হাতে দিলো সে। উলের কোটটা দেখা করে ধরে নিয়েই নিচে যাবার সিঁড়ির রেলিং চড়ে বসলো, থামল মাঝের লম্পস্টং এ। ডান হাতে বন্দুকটা শক্ত করে ধরে নিয়ে, অপর হাতটা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁড়ে দিলো কোটটা।

আর সাথে-সাথেই বেশ কিছু বুলেটে বাঁজরা হয়ে গেল ~~সেটা~~।

বাকি অংশটুকুও নেমে গেল সে, তারপর রেইলিং থেকে নেমে প্রধান কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। বন্দুকগুলো এখনো গর্জে ~~ঝুঁঝু~~ চারপাশে।

একটা জায়গার দিকে দৃষ্টি স্থির করলো ম্যালন।

একজন শুটারকে দেখতে পেয়েছে সে, ডানদিকে সামনের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, হিস্টি অ্যাস্ট মিউজিক ক্যাটাগরির কালেকশনগুলো ওখানেই শেলফ ভর্তি করে রাখা।

দেরী না করে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসেই একটা রাউন্ড গুলি ছুড়ল সে ওদিকে।

“জলদি,” হাঁক দিলো কলিঙ্গের দিকে। ছেলেটাও বুঝতে পারছিল কী ঘটতে যাচ্ছে, কালবিলম্ব না করে সিঁড়িগুলো একরকম উড়াল দিয়ে পার হয়েই কাউন্টার পার হলো সে।

ম্যালন ভালো করেই জানে এখানে আরও বন্দুকধারী ভদ্রলোকেরা এসে পড়বে যেকোনো সময়ে, তাই সে বাঁ দিকে হামাগুড়ি দিলো। তার ভাগ্য ভালো, কোণঠাসা হয়ে পড়েনি তারা। ভেতরের সব নতুন করে সাজানোর সময়ে ইচ্ছে করেই কাউন্টারটা দু'দিকে খোলা রেখেছিল সে। কয়েক সেকেন্ড আগে তার গুলিটা সাইলেন্সার বিহীন অবস্থায় ছোঁড়ার কারণে বেশ ভালোই শব্দ হয়েছে, তাই বাইরে যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে শব্দটা তার কান পর্যন্ত পৌছান অসম্ভব কিছু না, ভাবল ম্যালন। তবে সত্যি

বলতে, এই হয়বু প্লাই মাঝরাত থেকে ভোর পর্যন্ত একরকম বিচ্ছিন্ন, ভূতুড়ে হয়ে থাকে। তাই কোনো শব্দ কারো কানে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে কিছু আসে যায় না।

কাউন্টারের শেষ মাথায় গেল সে, পাশে কলিঙ্গ তার দৃষ্টি আটকে আছে সিঁড়ির উপর, নিশ্চিত একটা ঘটনা ঘটার অপেক্ষায়। অঙ্ককার একটা অবয়ব দেখতে পেল ম্যালন, ধীরে বড় হতে-হতে নিচে নেমে আসছে, হাতের বন্দুকটা তাক করা ঘরের কোণের দিকে।

গুলি ছুঁড়ল ম্যালন, লাগল কজির একটু ওপরে।

একটা গোঙানি শোনা গেল, তবে আরও কিছু গুলি ছোঁড়ার শব্দে ঢাকা পড়লো সেটা।

ম্যালনের বন্দুক থেকে বের হওয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেশ তীব্র থাকায় তাদের অবস্থানটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা।

যা যা হলো ও যা যা হতে পারে তা একটু বিশ্লেষণ করে নিল ম্যালন। ধরাশায়ী হওয়া লোকটার হাতে বন্দুক ছিল, ছিল ম্যালনের কাছেও। তবে লোকগুলোর কাছে আরও বেশী গোলাবারুদ থাকাই স্বাভাবিক, কেননা সে তার বেরেটার জন্য অতিরিক্ত কোনো ম্যগাজিন আনতে পারেনি। কিন্তু এই কথাতো আর তারা জানে না।

“ওদেরকে আরও একটু খোঁচাতে হবে,” ফিসফিস করে বলল কলিঙ্গ।

“ওদের বলতে কতজন?”

“মনে তো হয় দুই।”

“আমরা নিশ্চিত না।” আবারো সেই পুরনো স্বপ্নেন্দু কথা মনে পড়লো তার, গোণার একটু ভুল হবার কারণে তিন নম্বর আততায়ীর প্রদ্রুতেই ধরাশায়ী হয়েছিল সে।

“এখনে বসে থাকলে সমাধান হবে?”

“তোমাকে আমি ওদের হাতে তুলে দিয়ে দিব্য ঘূমাতে যেতে পারতাম।”

“পারতেন, কিন্তু জানি সেটা করবেন না।”

“এতো নিশ্চিত হয়েনা, হে।”

কলিঙ্গের কথাটা এখনো মনে পড়ছে তার। হেনরিক থ্রভান্ডসেন বিপদে পড়েছে।

কলিঙ্গ খুব ধীরে কাউন্টারের পেছনে আগুন নেভানোর জন্য রাখা এক্সটিংগুইশারের সিলিন্ডারের কাছে গিয়ে থামল। ম্যালন দেখল সিলিন্ডারটা ছাড়িয়ে নিয়েই সেফটিপিনটা খুলে দিলো কলিঙ্গ। তাকে যে কিছু বলবে সে সুযোগ না দিয়েই কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘন কুয়াশা ছড়াতে-ছড়াতে দৌড়ে কাউন্টারটা পার হয়ে গেল সে। বইয়ের একটা তাককে বর্ম হিসেবে ধরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সে বন্দুকধারীরগুলোর দিকে।

কাজটা খারাপ হয়নি, তবে-

চারটা গুলির শব্দ হলো।

শাঁই করে ছুটে এসে সেগুলোর কোনোটা কাঠের মেঝে, কোনোটা পাথরের দেওয়ালে গিয়ে বিধ্বে।

নির্দিষ্ট কাউকে না দেখতে পেলেও ওদের দিকে একটা রাউণ্ড খালি করলো
ম্যালন।

কাঁচ ভাঙার তীক্ষ্ণ শব্দ চরম মাত্রায় পৌছেছে, আর তার পরক্ষণেই দৌড়ের শব্দ।
দূরে যাচ্ছে ক্রমেই।

ঠাণ্ডা বাতাসের হলকা এসে লাগল তার চোখে-মুখে সে সহজেই বুঝতে পারছে
যে লোকগুলো সামনের জানালা ভেঙ্গে পালিয়েছে।

এক্সটিংগুইশারটা নামিয়ে রাখল কলিস। “ওরা ভেগেছে।”

তার আরও নিশ্চয়তা দরকার, তাই সে উচ্চবাচ্য করল না কোনো, কাউন্টার
থেকে একটু সরে গিয়ে খুব সাবধানে নিজেকে তাকগুলোর ওপাশে আড়াল করে ক্রমেই
ক্ষীণ হয়ে আসা ধোঁয়ার মাঝে দিয়ে একটা ছুট দিলো। অপর প্রান্তে পৌঁছেই একটু ঝুঁকি
নিয়ে সব দেখে নিল তারপর। কাঁচ ভাঙার সুবাদে ঘরের ধোঁয়া বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে
গিয়ে মিশছে জানালা দিয়ে।

মাথাটা একটু দোলাল সে। আবারো একটা ঝামেলা এসে গেল।

কলিস এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। “ওরা সবাই পেশাদার।”

“তুমি জানো কিভাবে?”

“আমি জানি কে ওদেরকে পাঠিয়েছে।” হাতের এক্সটিংগুইশারটা পেঁয়েতে রাখল
সোজা করে।

“কে?”

মাথা দোলাল কলিস। “হেনরিক বলেছিলেন এটা তিনিই আপনাকে বলবেন।”

আবার কাউন্টারে ফিরে এলো ম্যালন, ফোনটা হাতে নিয়ে ডায়াল করলো
ক্রিস্টালগেডে জায়গাটা কোপেনহেগেন থেকে মাইল উত্তরে, হেনরিকের পৈত্রিক
সম্পত্তি ওখানেই কয়েকবার রিং হলো। সাধারণত হেনরিকের গৃহধ্যক্ষ ফোন ধরে
থাকে, তা সে যত রাতই হোকনা কেন।

ফোনটা বেজেই চলেছে।

বিষয়টা ভালো ঠেকছে না।

ফোনটা রেখে দিয়ে সব গোছগাছ করে নেওয়ার মনস্তির করলো ম্যালন।

“ওপরে যাও,” কলিসকে বলল সে। “গিয়ে দেখবে বিছানার উপর একটা
রাকস্যাক আছে, নিয়ে আসো জলনি।”

ঐ-ব্যাগটাই যথেষ্ট এখন তার জন্য।

কলিস ছুটে গেল উপরে, কাঠের সিঁড়িগুলোর উপর থেকে একটা সমান তালের
ধপ ধপ শব্দ ভেঙ্গে আসছে।

সময়টা কাজে লাগাতে আরও একবার ক্রিস্টালগেডে ফোন দিলো ম্যালন,
আবারো সেই উত্তর নেই অবস্থা।

কলিস ঝড়ের গতিতে নেমে এলো নিচে

কয়েক ব্লক পরেই, এই পুরনো শহরের ঠিক বাইরেই ম্যালনের গাড়িটা পার্ক করা। জায়গাটা ক্রিস্টিয়ানবুর্গ স্ট্রেটের একেবারে কাছেই। কাউন্টারের নিচ থেকে সেলফোনটা তুলে নিল সে।

“তাহলে যাওয়া যাক।”

চার

এলিজা বুবতে পারছে যে সফলতার একেবারে দোরগোড়ায় রয়েছে সে এখন, যদিও তার সঙ্গীটি পুরো বিষয়টাকে জটিল করে দিয়েছিল। তবে মেটের উপর তার আশাটা এমন যে তড়িঘড়ি করে নেওয়া এই বিদেশ ভ্রমণটা সময়ের অপচয় হবে না অস্তত।

“নামটা হলোঃ প্যারিস ক্লাব,” ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল মেয়েটা।

উন্নত আটলান্টিক থেকে পনেরো হাজার মিটার উচ্চতায় ওড়ার শাখটা সে দমাতে পারল না, উদ্দেশ্য একটাই- নতুন কেনা এই অতীব ব্যয়বহুল গালফস্ট্রিম জিখো বিজনেস জেট প্লেনের রাজকীয় কেবিনের ভেতর বসে শেষবারের মতো এই যান্টার সক্ষমতার প্রদর্শন। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে বানানো এই বিমানটা নিয়ে প্রত্যেক শেষ নেই এলিজার। অবশ্য তার কারণও আছে। এরকম বিমানের মধ্যে এটা একেবারে প্রথম সারির ভেতরের সুবিশাল জায়গায় আঠারো জন বসতে পারে, দামি প্লাশ লেদার সিটে। আছে একটা গ্যালারী, বড়-সড় এক ওয়াশরুম, চকচকে মেহগনির আসবাব, ধূমধাঢ়াকা গতির ইন্টারনেট ভিডিও মডিউল যেটা সম্মিলিত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিচের জগতের সাথে যুক্ত রাখে যাত্রীদেরকে। উচ্চতার সাথে পাণ্ডা দিয়ে বাড়ছে গতি, তবে ভেতরের মানুষগুলো নিশ্চিন্ত আছে, যান্টেজন নির্ভরশীল এই বাহনটা। সাঁইত্রিশ মিলিয়ন ইউরো খরচ হয়েছে এর পেছনে, যার প্রতিটা ইউরোই এখন কথা বলছে

“আমি ভালো করেই চিনি ঐ সংস্থাটা,” রবার্ট ম্যন্স্ট্রয়ানি বলল, নিজের আঞ্চলিক ভাষায় “ধনী দেশগুলোর হোমরা-চোমরারা মিলে নিজেদের জন্য ওটা বানিয়েছে, টাকা-পয়সা নিয়েই ওদের কাজ-কাম। ঝণ দেওয়া-নেওয়ার কার্যকরী ফন্ডি-ফিকির থেকে শুরু করে ঝণ মডুকুফ, সবই করে ওরা। ঝণের ভাবে জর্জিরিত দেশগুলোর মাঝে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ঢালে ওরা যেন তারা ঝণ পরিশোধ করতে পারে। যখন আমি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে ছিলাম, তাদের সাথে বেশ কয়েকবার কাজ করতে হয়েছে আমার, তখনই জেনেছি এসব।”

তথ্যটা জানে মেয়েটা।

“১৯৫৬ সালে যখন আর্জেন্টিনা দেউলিয়া হয়ে গেল, তখন দাতাদের সাথে আর্জেন্টিনার একটা বৈঠক হয়, ঠিক ওই সময়েই এই প্যারিস ক্লাবের জন্ম। প্রতি ছয় সপ্তাহ পরপর ফ্রান্সের অর্থ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ে সব সদস্যরা সভা করে যেটার সভাপতিত্ব করে ফ্রান্সের রাজস্ব বোর্ডের একজন উর্ধ্বর্তন কর্মকর্তা। তবে ঐ সংস্থা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে নেই আমার এখন।” বলল সে

“এটাও কি তোমার কোনো এক রহস্য?” জিজ্ঞেস করলো ম্যন্ট্রিয়ানি, কঠে সমালোচনার টান।

“তোমার ভেতর এতো পঁয়াচ কেন, বলতো?”

“কারণ হতে পারে এটা যে আমি আসলেই জানি তুমি কিসে বিরক্ত হও।”

ম্যন্ট্রিয়ানির সাথে গতকালই পরিচয় হয়েছে তার, নিউইয়র্কে। প্রথম থেকেই লোকটা যে তার প্রতি সন্তুষ্ট তা না, তবুও গত রাতের ডিনারটা একসাথেই বাইরে সেবেছে দু'জন। তারপর আবার, এলিজা যখন এই আটলান্টিকে উড়তে আসার প্রস্তাবটা করলো, সেটাও সাদরে গ্রহণ করেছে লোকটা। এতে ভারী অবাক হয়েছে এলিজা। হয় সে ভাবছে, এটা তাদের শেষ কথোপকথন, নাহয় হাজার কথোপকথনের শুরু।

“থামলে কেন, বলে যাও, এলিজা। আমি শুনছি তো। আর সত্যি বলতে তোমার কথা শোনা ছাড়া আর কিছু করারও তো নেই আমার। আর আমার এখন এও মনে হচ্ছে যে এটাও তোমার পরিকল্পনা।”

“তাই? এরকম যদি বুঝেই থাক তাহলে আমার সাথে বাড়ির পথ না ধরলেই পারতে।”

“যদি আমি তোমার প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিতাম, কী লাভ হত? তোমার সাথে আমার এমনিতেই আবারও দেখা হয়ে যেত। এখন হিসাব করলাম যে তোমার সাথে কথা-বার্তা সারাটা তো জরুরী, আবার বাড়িতে ফিরতে হচ্ছে তাই তোমায় সময় দেওয়ার বিনিময়ে বাড়ি ফেরার সুযোগটা নিলাম এই বিষয়ে চড়ে। সিন্ক্লিভটা ঠিকই ছিল, ভালোই আরামে আছি দেখছি। এখন দয়া করে বলেও যাও সব কিছু।”

দাঁতে দাঁত চেপে রাগটা সামলে নিল এলিজা, তারপর বলল, “বহুল ব্যবহৃত একটা সত্যি কথা প্রচলিত আছে, ইতিহাস বলে, ‘যদি কোনো সরকারের যুদ্ধ মোকাবেলা করার সামর্থ্য না থাকে, তবে সেই সরকার বা শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়।’ আইনের শাসন, জনগনের সমৃদ্ধি, সচ্ছলতা—এই সকল মৌলিক বিষয়াদি অকাতরে বিলিয়ে দিতে হয় যখন ঐ জাতি বা দেশের অস্তিত্ব ভুক্তির মুখে পড়ে।”

তার শ্রোতা একটুখানি শ্যাম্পেন টেনে নিল মুখে।

“এখানে আরও একটা বাস্তবতা আছে,” বলে গেল এলিজা। “যুদ্ধ প্রতিটা সময়েই ঝণের টাকায় চলে। যুদ্ধে যে যত বড়, ঝণের বোঝা তার তত বেশী।”

হাত নেড়ে থামিয়ে দিলো তাকে ম্যন্ট্রিয়ানি “পরের অংশটা আমি জানি, এলিজা। যেকোনো জাতিই যদি যুদ্ধে নামতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাদের একটা বিশ্বাসযোগ্য শক্রপক্ষ থাকতে হবে। যাদেরকে আসলেই শক্রদের দলে ফেলা যায়। শক্র হতেও যোগ্যতা লাগে, জানো নিশ্চয়ই?”

“অবশ্যই। আর যদি এমন দল থাকে, তাহলে আর কী লাগে? সোনায় সোহাগা।”

“যদি ধরো, শক্রপক্ষ আছে একটা,” বলে গেল এলিজা, “কিন্তু সামরিক শক্তির ঘাটতি আছে সেখানে, তখন তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত টাকা ঢালা যেতে পারে। আর যদি আদৌ কোনো শক্রই না থাকে, তাহলে—” হাসল সে, “—শক্র বানিয়ে নেওয়া যায় এক তুড়িতে।”

ম্যন্ত্রযানি হেসে দিলো এটা শুনে। “শয়তানি বুদ্ধি তো ভালোই আছে তোমার।”

“মানে কী? তোমার নেই তাই বলছ?”

খটমট দৃষ্টিতে তাকাল লোকটা। “না, এলিজা। ওসব আমার নেই।” ম্যন্ত্রযানি এলিজার থেকে বয়সে পাঁচ বছরের মতো বড় হবে, অর্থবিত্ত দুঁজনেরই সমান পরিমাণে। যদিও লোকটা একটু বিরক্তিকর, তবু সব মিলিয়ে বেশ চমৎকারই বলা চলে। কয়েক ঘণ্টা আগেই তারা একসাথে বসে খাবার খেয়েছে। প্রতিটা আইটেমই রসালো ছিল, মাখনের মতো স্বর্ণ আলু, মচমচে সবুজ শিমের বিচি আর ছিল একটু ঝোল-ঝোল করে ভুনা করা গরুর পিঠের মাংস-আঁশহীন ও নরম, মুখে নিলেই গলে যায়। একজন ইটালিয়ান হয়েও ঝাল-রশন বা কোনো মসলা ছাড়াই এমন খাবার খাওয়ায় অভ্যন্ত হওয়াটা একরকম স্বতন্ত্র বলা চলে, অবশ্য এর বাইরেও এই কোটিপতির আরও বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু সেগুলো বিচারক্রান্তির সে-ই বা কে? তার নিজেরই ব্যতিক্রমী দিকগুলো সে লুকিয়ে রেখেছে একবুকচা!

“প্যারিস ক্লাব আরও একটা আছে,” বলল এলিজা। “বেশ পুরনো ওটা। সেই নেপোলিয়নের যুগের।”

“এই তথ্যটা আগে তো কখনো উল্লেখ করনি।”

“আগে তো কখনো জানতেও চাওনি, তাই।”

“আমি কি একটু খোলামেলা কথা বলতে পারিয়ে?”

“অবশ্যই।”

“তোমাকে আমার পছন্দ হয় না। সোজা কথা। আরও ভালো করে বলতে গেলে, আমি তোমার ব্যবসায়ীক বিষয় বা এর সাথে যুক্ত কাউকেই পছন্দ করি না। একেবারেই অকাজের সবাই, কথার সাথে কাজের কোনোই মিল নেই। অদ্র ভাষায় বললে বলতে হয়, তোমার কিছু-কিছু বিনিয়োগ প্রশংসিত। আর খারাপ ভাষায় বললে, সেগুলো স্বেফ বেআইনি। প্রায় এক বছর ধরে আমার কাছে ধর্ণা দিয়ে আসছ কিসব সোনার হরিণ মার্কা গুণ্ডনের গল্ল নিয়ে, কিন্তু নিজের দাবির পক্ষে সেরকম কোনো তথ্যই উপস্থাপন করতে পারনি হয়তো এটার কারণ তোমার ভেতরের অর্ধেক কর্সিকান সন্তাটা, যেটা তুমি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পার না। তাই এমন করাটা তোমার সহজাত।” এলিজার মা ছিলেন একজন কর্সিকান, বাবা ফরাসি অল্প বয়সেই তাদের বিয়ে হয়, আর তারপর থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশী তাদের সংসার জীবন পার করেন তারা। উভয়েই গত হয়েছেন আরও বেশ কিছু বছর আগে। উত্তরাধিকার বলতে সে একাই। বংশ নিয়ে অহংকার করাটা তার কাছে নতুন কিছু না-এর আগেও এই বোধের মুখোমুখি হতে হয়েছে বহুবার-কিন্তু তার মানে এই না যে সে এটা খুশি মনেই মেনে

নিয়েছে, নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এলিজা, এবং ডিনার প্লেটগুলো সরাতে শুরু করলো। তার একটা হাত ধরে ফেলল ম্যন্ট্রিয়ানি। “আমাকে তোমার আপ্যায়ন করতে হবে না

কথার ধরণ ও হাত ধরে রাখা দুটোতেই তার রাগ হলো বেশ, কিন্তু তারপরও প্রতিবাদ করল না কোনো। উপরন্তু সে মুখে হাসি ফুটিয়ে ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো। “তুমি আমার অতিথি, আর এগুলো তো আমাকেই করতে হবে।” আস্তে করে ছেড়ে দিলো সে তার হাতটা।

পুরো জেটিয় মাত্র দু'জন পাইলট রেখেছে সে, যারা দুজনেই সামনের কক্ষিটের দরজার ওপাশে বসা। যে কারণে সে নিজেই খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত। রান্নাঘরে নোংরা প্লেটগুলো রেখে ছেট রেফ্রিজারেটর থেকে খাবারের শেষ আইটেম ডেজার্ট বের করলো। দুটো মজাদার চকোলেট টার্ট। ম্যন্ট্রিয়ানি খুব খায় এটা, তাকে বলা হয়েছিল। তাই আগের সন্ধ্যায় এগুলো ম্যানহাটনের রেস্টুরেন্ট থেকে কেনা হয়েছিল।

তার মুখের ভাবভঙ্গিটা বদলে গেল যখন এই খাবারগুলো তার সামনে রাখা হলো।

মুখোমুখি বসলো এলিজা।

“তুমি আমায় বা আমার লোকজনদের পছন্দ করো বা না করো, তাতে এখানে কিছু আসে যায় না, রবার্ট। এটা একটা ব্যবসায়ীক প্রস্তাবনা। এমন একটা সুযোগ যেটা আমি ভেবেছিলাম তোমার ভালো লাগবে। আর এই কাজের পেছনে কোনো মানুষ দরকার, সেটার নির্বাচন আমি খুবই বুঝে-গুনে, যত্তের সাথে করবেছি। ইতোমধ্যে পাঁচজন বেছে নেওয়া হয়েছে, এই তালিকায় আমি আছি ছয় নামের, তুমি সাতে।”

সামনে রাখা ডেসার্টের দিকে দেখাল ম্যন্ট্রিয়ানি। “কান্সাতে রেস্তুরাঁ থেকে ফেরার আগে ওয়েটারের সাথে কী নিয়ে আলাপ করছিলে তা ভুবেছিলাম আমি।”

এলিজার কথা এড়িয়ে যাচ্ছে সে, নিজের বানানে একটা খেলায় মন্ত সে এখন।

“এই ডেজার্ট যে তুমি খুব পছন্দ কর, সেটা দেখলাম কাল।”

স্টারলিং সিলভারের চকচকে একটা কাঁটাচামচ তুলে নিল সে হাতে। দৃশ্যত মনে হচ্ছে, তার ব্যক্তিগত অপছন্দের ব্যাপারটা মেয়েটার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকলো, সেটা না পড়লো খাবারে, না পড়লো জেট বিমানে, অথবা টাকা কামানোর সম্ভাবনাময় প্রস্তাবে।

“একটা গল্প শুনবে? বলি?” জানতে চাইলো এলিজা। “মিশরের। ১৭৯৮ সালে যখন তৎকালীন জেনারেল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশর আক্রমণ করেছিলেন সেই সময়ের ঘটনা।”

মুখে ভরা চকোলেটের স্বাদ নিতে-নিতেই মাথা নাড়ল সে। “আমি না বললে সেটা যে তুমি মেনে নেবে, তা মনে হয় না আমার, তাই, বলে যাও।”

দক্ষিণের যাত্রার দ্বিতীয় দিনে ফরাসি সৈন্যদের দলটিকে নেপোলিয়ন নিজেই নিয়ে যাচ্ছে নেতৃত্ব দিয়ে। এল বেদাহ নামক জায়গার কাছেই অবস্থান করছে তারা, আর

কয়েক ঘণ্টা এগুলেই পরের গ্রামে পৌঁছে যাবে। বেশ গরম পড়েছে, আর রোদ যেন আরও পুড়িয়ে দিচ্ছে সব কিছু। গতকালকে আরবরা তার সামনে এগিয়ে থাকা রক্ষীদের উপর অতর্কিত হামলা করেছে। জেনারেল দেসাই প্রায় ধরা পড়েই গিয়েছিল ওদের হাতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে গেলেও একজন ক্যাপ্টেন ও এক আজুট্যান্ট জেনারেল ধরা পড়ে যায় ওদের হাতে। মুক্তিপন সাধা হয়েছিল ওদেরকে, কিন্তু আরবরা সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে, আর তারপরেই এক বন্দিকে মাথায় গুলি করে মারে ওরা। যিশর যে আসলেই একটা ভয়ঙ্কর জায়গা, সেটা ধীরে-ধীরে প্রমাণিত হচ্ছে। এদেরকে জয় করা সহজ, কিন্তু বশে আনা কঠিন। আর যত দিন যাচ্ছে, প্রতিরোধের দেওয়াল মজবুত হচ্ছে ওদের।

সামনেই, ধূলো ঢাকা পথের অপর প্রান্তে, এক মহিলাকে দেখতে পেল সে, সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এক হাতে একটা ছোট বাচ্চাকে জাপটে আছে সে, অপর হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হাঁটছে, যেন ওটা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইছে, বা সামনের বাতাসটাকে পড়তে চাইছে-করছেটা কী সে এখানে? এই জ্বলন্ত মরুভূমিতে?

একটু এগিয়ে গেল নেপোলিয়ন, তারপর দোভাস্মী মারফত জানতে পারল যে মহিলার স্বামী তার দু'চোখ তুলে নিয়েছে। শুনে তো নেপোলিয়ন থ হয়ে গেল। কেন এটা করলো সে? কোনো অভিযোগ করার সাহস হলো না হতভাস্মীটার, সে শুধু তার সন্তানের জন্য একটু আশ্রয় চাইলো। বাচ্চাটার অবস্থা ও সংকটজনক। নেপোলিয়ন দ্রুত আদেশ দিলেন যেন দু'জনকেই জল-রুটি দেওয়া হয়। ভূদেশ দেওয়া শেষ হতেই কাছের বালিয়াড়ি হতে এক লোক উদয় হলো আচমকা ঝুঁপ ও ঘৃণা যেন উপচে পড়ছে চোখে-মুখে। সৈন্যরা সব সতর্ক হয়ে গেল। লোকটা দৌড়ে এসেই মহিলাটার কাছ থেকে জলখাবার কেড়ে নিল

“না, এটা করবেন না,” চিৎকার দিলো লোকটা। “এই মহিলা মারাত্মক অপরাধী, পাপী, নিজে তো শেষ হয়েছেই, আমার মান-মর্যাদাও ধূলোয় মিশিয়েছে এই বাচ্চা আমার কলঙ্ক। এই কালনাগিনীর পাপের ফসল।”

ঘোড়া থেকে নামলো নেপোলিয়ন, তারপর বলল, “তুমি তো পাগলের মতো বকেই যাচ্ছ হে, বন্দ উন্মাদ হলে নাকি?”

“আমি এর স্বামী, আমার যা ভালো লাগে, তা করার অধিকার আমার আছে।”

নেপোলিয়ন কিছু বলার আগেই লোকটা তার আলখাল্লার নিচ থেকে বড় একটা ঝুরি বের করেই সজোরে আঘাত করলো মহিলাটাকে। তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার দিয়ে নিষ্ঠেজ হয়ে গেল সে।

সবাই আরও স্তুষ্টি হয়ে গেল যখন লোকটা বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে শুন্যে উঠিয়ে এক ঝটকায় সজোরে মাটির উপর আছাড় দিলো।

একটা শব্দ হলো পেছন থেকে, মুহূর্তেই লোকটার বুকটা বিস্ফোরিত হয়ে গেল, তারপর শুকনো বালির উপর গিয়ে ধ্বনি করে পড়ে গেল। ক্যাপ্টেন লে মিরেয়াগ নেপোলিয়নের পেছনে ঘোড়ায় বসেই এই অনাকাঙ্ক্ষিত নাটকের ইতি টানল।

উপস্থিত সকল সৈন্য এমন নৃশংসতা দেখে একেবারে বাকরুন্দ।

নিজের হতবিহবলতা ঢাকতেই বেগ পেতে হচ্ছে নেপোলিয়নের। এমন স্নায়ু চাপের মাঝে কয়েকটা মুহূর্ত যেতেই, কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সবাইকে আবারও এগিয়ে যাবার আদেশ দিলো সে। কিন্তু নিজের ঘোড়ায় চড়ার ঠিক আগমুহূর্তে তার চোখে পড়লো কিছু একটা পড়ে আছে মাটিতে, জিনিসটা এই মৃত লোকটার চাদরের ভেতরেই ছিল বোঝা যাচ্ছে।

প্যাপিরাস পাতার একটা মোড়নো রোল, খুব শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা।

বালি থেকে তুলে নিল সে ওটা।

সেই সন্ধ্যায় তার দখলকৃত এক আমোদখানায় উঠে নেপোলিয়ন। বাড়িটা তার পরিচিত শক্রদের মধ্যে একজনের ছিল। লোকটা মিশরীয়, কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে মরুভূমিতে, মাসখানেক আগে, ম্যামলুক আর্মিদের সাথে। আর এদিকে সবরকমের আরাম-আয়েশ করার উপাদান ফেলে গেছে ফরাসীদের জন্য। বাড়িটা ভেতরটা পুরোটুকুই বলতে গেলে পশমি কার্পেটে মোড়া, সাথে ভেলভেটের কুশন। তারপরও জেনারেল অস্থিরতায় ভুগছে অমানবিকতার যে ভয়ঙ্কর এক চিত্ৰ দখল নিজ চোখে, সেটা ভেবে।

তাকে পরে বলা হয়েছিল যে লোকটা তার স্ত্রীকে ছুতাবে ছুরি মেরে আসলেই অন্যায় করেছে। কিন্তু ঈশ্বর যদি ঐ মহিলার ব্যভিচারক্ষমা করত, তাহলে হয়তো এতক্ষণে কোনো সহনযোগী ব্যক্তি তাকে বাড়ি ভিয়ে দিয়ে চিকিৎসা করত। তবে যেহেতু এমনটা হয়নি, আরবের আইনও তার স্ত্রীকে বেঁচে থাকলেও জোড়া খনের জন্য কিছুই বলতে পারত না।

“তাহলে তো আমরা ভালো কাজই করেছি ওকে মেরে,” ঘোষণা দিলো নেপোলিয়ন।

রাতটা বেশ চুপচাপ রকমের, আর কেমন একফেয়ে লাগছে জেনারেলের, তাই কুড়িয়ে পাওয়া প্যাপিরাসের রোলটা একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাইলো সে। তার স্যাভান্টসরা আগেই তাকে জানিয়েছে যে স্থানীয়রা কী পরিমাণে চুরি-চামারি করে আশেপাশের যেসব পরিত্র বা পুরনো স্থাপনা রয়েছে সেগুলোতে। যা বিক্রি করা যাবে সেগুলো থেকে শুরু করে যা নিজের কাজে লাগানো যায়, সবই সাবাড় করে দেয় ওরা। সম্পদের কী অপচয়! এই দেশে সে এসেছে এদেশের অতীতকে আবিষ্কার করতে, সেটাকে ধ্বংস করতে না।

সুতোটা ছিঁড়ে রোলটা খুলে ধরল নেপোলিয়ন। মোট চারটে পাতা ওখানে, লেখার ভাষা দেখে মনে হলো গ্রীক। কর্সিকান ভাষায় সে অনুর্গল কথা বলতে পারে,

ফরাসীটাও একেবারে সেই রকমের দখলে না থাকলেও কাজ চলে যায় দিব্যি, কিন্তু এই ভাষাগুলোর বাইরে, আর সব ভাষাই তার কাছে দুর্বোধ্য, রহস্যময়।

তাই সে তার দোভাষীদের মধ্য থেকে একজনকে ডাকল।

“এটা তো কপটিক,” দোভাষী বলল।

“পড়তে পারবে এটা?”

“অবশ্যই, জেনারেল।”

“কি ভয়ানক কাণ্ড,” ম্যন্টেনানি বলল। “বাচ্চাটাকেও মেরে ফেলল!”

মাথা নেড়ে সায় দিলো এলিজা। “মিশর ক্যাম্পেইনের চূড়ান্ত বাস্তবতাটা এরকমই ছিল। রক্ত ঝরানো, কঠিন সংগ্রামের বিনিময়ে পাওয়া এক অর্জন। তবে আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, ওখানে যা ঘটেছিল সেই ঘটনার জের ধরেই কিন্তু আজকে তোমার-আমার এই আলোচনা।”

পাঁচ

স্যাম কলিঙ্গ বসে আছে পেছনের আসনে, দেখছে কেমন করে ম্যালন ক্ষিপ্র গতিতে কোপেনহেগেন পার হয়ে ডেনিশ উপকূলের হাইওয়ে ধরে উত্তর দিকে ছুটেছে।

মনে-মনে যেমনটা সে ভেবেছিল, বাস্তবে কটন ম্যালন ঠিক সুরক্ষিত। খুব শক্ত মনের, সাহসী, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, নিজের দিকে ছাঁচে মেঝেওয়া চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত, এবং যখন যা করার দরকার তা করতে মোটেই দেরো করে না। এমনকি যেরকম শারীরিক গঠনের বর্ণনা ওকে দেয়া হয়েছিল, সেটা ও ক্ষেত্রে এক! লম্বা গড়ন, চকচকে সোনালী চুল, মুখে আবেগ ফাঁকি দেওয়া এক চিলতে হাসি। তার জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের বারো বছরের অভিজ্ঞতার কথা জুড়ে স্যাম। জর্জিটাউন থেকে লিগ্যাল এডুকেশন, চুম্বকের মতো স্মৃতিশক্তি, বইয়ের প্রতি ভালবাসা-সবই জেনেছে সে; কিন্তু আজ লোকটার কারিশমা সচক্ষে দেখতে পেল।

“কে তুমি?” জিজেস করলো ম্যালন।

কলিঙ্গ মনস্তির করলো, নিজের সম্পর্কে কিছুই লুকাবে না। ম্যালন যে বেশ সন্দেহপ্রণ, সেটা সে ভালোই টের পেয়েছে। তবে এর জন্য দোষ দেয়া যায় না তাকে। একজন অচেনা-অজানা মানুষ রাত-দুপুরে তার দোকান ভেঙ্গে চুকবে, পেছনে গুটিকয়েক বন্দুকধারী-সন্দেহ যার না হবে, সে নিজেই অসুস্থ। “ইউএস সিক্রেট সার্ভিস। বা ঠিক করে বললে, ক'দিন আগপর্যন্তও ছিলাম। আমার মনে হয়, আমাকে বরখাস্ত করেছে তারা।”

“কেন করলো?”

“কারণ আমার কথা শোনার মতো কেউ নেই ওখানে। অনেক চেষ্টা করেছি বলার, কিন্তু কেউই শুনতে চাইলো না।”

“হেনরিক কেন শুনল তোমার কথা?”

“আপনি কিভাবে ভাবলেন—” কথার মাঝখানে কথা বলল সে।

“কিছু মানুষ আছে যারা বেওয়ারিশ প্রাণীদের আশ্রয় দেয়। হেনরিকও সেরকম একজন, মানুষকে উদ্ধার করে। এখন তুমি কেন তার সাহায্য চাও সেটাই জানার বিষয়।”

“কে বলল আমি তার দারস্ত্র হয়েছি?”

“এত সংকোচ করো না হে, ঠিক আছে? আমিও একবার তার আশ্রয়ে ছিলাম।”

“সত্যি বলতে, সাহায্য আমার প্রয়োজন না, হেনরিকের প্রয়োজন। তিনি-ই আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন।”

মাজদার গিয়ারটা পাঁচ নম্বের ঠেলে অঙ্ককারে ডুবে থাকা হাইওয়ে ধরে ছুটে চলছে ম্যালন। থ্রেসাদ সৈকত থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে তারা।

কিছু বিষয় পরিষ্কার করা দরকার স্যামের। “সিক্রেট সার্ভিসে আমার কাজ হোয়াইট হাউসে ডিউটি দেয়া ছিল না, আমি কাজ করতাম অর্থ ও মুদ্রা জালিয়াতি সেকশনে।”

সে সব সময়ই হলিউডি ছবিতে প্রেসিডেন্টের চারপাশে কালো ফোন্টেক ঢাকা, সানগ্লাস পরা, গায়ের রঙের সাথে মেলানো এয়ারফোন কানে এমন এজেন্ট দেখে হাসিঠাটা করে এসেছে। তার মতো বেশিরভাগ এজেন্টেরাই কাজ করে গোপনে, দেশের আর্থিক বিষয়াদির নিরাপত্তা দিতে ব্যস্ত। এটাই মূলত সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, অন্তত প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত। ১৮৬৫ সালে প্রতিষ্ঠা হবার ৩৫ বছর পর প্রেসিডেন্টে নিহত হওয়া তখন ওদের বোধোদয় হয় যে প্রেসিডেন্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে তাদের নিরাপত্তার আওতায় আনা উচি�ৎ।

“তো আমার বইয়ের দোকানে এলে কেন তুমি?” জিজেস করলো ম্যালন।

“আমি শহরেই উঠেছিলাম। হেনরিক আমাকে একটা হোটেলে পাঠালেন গতকাল। আমার মনে হয়, কোথাও একটা গুগোল আছে। তাই হয়তো তিনি চেয়েছেন আমি শহর থেকে দূরে থাকি।”

“ডেনমার্কে আছ কত দিন?”

“সপ্তাহখানেক। আপনি তখন ছিলেন না, কয়েকদিন হলো ফিরেছেন।”

“তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো।”

“ঠিক সেরকম না। আমি শুধু জানি আপনি কটন ম্যালন। নৌবহিনীর সাবেক অফিসার। কাজ করতেন ম্যাগেলান বিলেতে। এখনো অবসর নেননি।”

তার দিকে একনজর তাকাল ম্যালন, বোঝাতে চাইছে যে তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এতো প্যাচাল যে সে পাড়ছে, তা শোনার মতো ধৈর্য কিন্তু ফুরিয়ে আসছে।

“আমি একটা ওয়েবসাইট চালাই,” বলল স্যাম। “যদিও আমাদের মতো এজেন্টদের এই ধরনের কাজ করা উচি�ৎ না, তবু আমি ঝুঁকিটা নিয়েছিলাম ওয়ার্ল্ড

ফিন্যাঞ্চিয়াল কল্যান্স-পুঁজিবাদীদের একটা ষড়যন্ত্র। আমি এরকমই নাম দিয়েছিলাম ওয়েবসাইটে। আমার সাইটের নামঃ *moneypash.net*。”

“এবার বুঝতে পারছি যে তোমার উপরের লোকজন কেন তোমার শখ নিয়ে অসন্তুষ্ট।”

“কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। আমিতো আমেরিকায় থাকি, তাই না? ইচ্ছামতো কথার বলার অধিকার তো আমার থাকতেই পারে।”

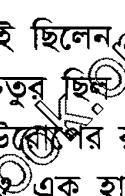
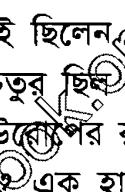
“তা পারে। কিন্তু তুমি ফেডারেলের খাবে-পরবে, ওদের ব্যাজ সাথে নিয়ে ঘূরবে, আবার ওদেরই গোমর ফাঁস করবে, তা হয় কিভাবে?”

“হ্ম, ওরাও এমনটাই বলেছিল।” কঢ়ে পরাজয়ের ছাপটা লুকোতে পারল না সে।

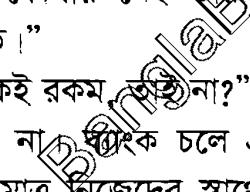
“যা-ই হোক, তুমি তোমার সাইটে কী লিখেছিলে?” জিজেস করলো ম্যালন।

“আমি সত্য কথাই বলেছিলাম, একেবারে মেইয়ার অ্যামচেল রথচাইল্ডের মতো করে।”

“নিজের বাক স্বাধীনতার প্রকাশ দেখাচ্ছিলে?”

“কী আসে যায় তাতে? এ লোকটা তো আমেরিকানই ছিলেন  কাড়িকাড়ি টাকা ছিল শুধু। কিন্তু তার পাঁচ ছেলে তার থেকে যথেষ্ট চতুর ছিল। তারা ভালোই জানতো কিভাবে ঝণকে সৌভাগ্যে রূপান্তর করতে হয়। ইউনিপের রাজা-গোজাদের টাকা ধার দিত তারা। আপনি বলেন, কোথায় নেই তার  এক হাতে তারা টাকা ঢালত, অন্য হাতে আরও বেশী তুলে নিত।”

“অ্যামেরিকানদের পদ্ধতিও তো একই রকম, কুন্তু না?”

“তারা তো আর ব্যাংকার ছিলেন না  একে চলে গ্রাহকের জমা টাকায় বা সরকারের রাখা টাকায়। কিন্তু তারা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থেই টাকা ধার দিত, আর সুদের হারও ছিল মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো।”

“আমি এখনো বুঝতে পারছি না যে এতে সমস্যা কোথায়?”

নিজের আসনে একটু নড়েচড়ে বসলো সে। “এই পদ্ধতিতে কাজ করেই তারা তাদের প্রাপ্য শাস্তিকু এড়িয়ে গেছে। লোকে বলে, ‘তো কী হয়েছে? টাকা দিয়ে টাকা বানানোর অধিকার তাদের আছে।’ কিন্তু না, আসলে বিষয়টা সেরকম না।” ভেতরে যেন ক্রোধের আগুন তার। “যুদ্ধের পেছনে টাকা বিনিয়োগ করে রথচাইল্ডরা আরও ধনী হয়েছিলো, সেটা কি জানেন আপনি?”

কোনো উত্তর দিল না ম্যালন।

“আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে বিনিয়োগ ছিল দু’পক্ষেই। কী পরিমাণ ঝণ দিচ্ছে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না তাদের! কেননা ঝণের বিনিময়ে তারা এমন বিশেষ কিছু হাতিয়ে নিত যেগুলো আরও বেশি পরিমাণে লাভে পরিণত হত। যেমন ধরেন, খনি উন্ডেলনের অধিকার। আইনের ভাষায় যেটাকে মাইনিং কসেশন বলা হয়। তারপর আছে মনোপলি করার অধিকার, যেন এক চেটিয়া বাজারটা ওদের দখলে

থাকে। আর ইচ্ছেমত পণ্য আমদানি করার ক্ষমতাও নিত তারা। এমনকি কখনো-
কখনো নির্দিষ্ট কিছু ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্বও তারা নিত তাদের ধার দেওয়া টাকা
ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টি হিসেব।”

“এগুলো তো কয়েকশো বছরের আগের ঘটনা। তাহলে সমস্যা কী?”

“যদি বলি এখনো এটা চলছে?”

বেশ কঠিন একটা বাঁক নিতে গাড়িটার গতি একটু কমাল ম্যালন। “তুমি কিভাবে
জানো সেটা?”

“রাতারাতি যারা বড়লোক হয়ে যায়, তাদের সবাই তো আর বিল গেটসের মতো
মহৎ না।”

“কারা এদের সাথে জড়িত? তাদের নাম বা কোনো প্রমাণ আছে?”

চুপ করে রইলো স্যাম।

ম্যালন তার এই উভয় সংকট অবস্থা বুঝতে পারল। “না, নেই তোমার কাছে
কোনো প্রমাণাদি। শুধু-শুধু সব ষড়যন্ত্রের বস্তাপচা কথাবার্তা তোমার সাইটে পোস্ট
করেছ, যে কারণে তোমার চাকরি গেল।”

“এগুলো মোটেই গাল-গল্প না,” খুব দ্রুত বললো সে। “ঐ লোকগুলোই আমাকে
খুন করতে এসেছিল।”

“তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এতে তুমি সন্তুষ্টই হয়েছ।”

“তা না, তবে আমার ধারণা যে সঠিক, সেটা এতেই প্রমাণ হয়।”

“হ্ম, এটা অবশ্য বিবেচনা করতেই হবে। এখন বলেছি ঠিক কী হয়েছিল।”

“আমি আমার হোটেল রুমে একরকম আটকা পড়েছিলাম বলা যায়, একদেয়ে
লাগছিল বেশ, তাই একটু হাঁটতে বের হলাম। দুঃজন লোক আমার পিছু-পিছু আসতে
শুরু করলো। আমিও একটু তাড়াতাড়ি ছুটতেই তারাও গতি বাঢ়াল। ঠিক তখনই আমি
আপনার আন্তানাটা পেয়ে যাই হেনরিক আমাকে হোটেলেই থাকতে বলেছিলেন
পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত, কিন্তু যখন ঐ দুঃজন মানুষকে দেখলাম, আমি
ক্রিস্টিনাগোড়ে ফোন দিলাম হেনরিকের সাথে কথা বলতে। জেস্পার বলল দ্রুত
আপনার ওখানে চলে যেতে, তাই শেষমেশ আপনার দোকানের দিকে রওনা হই।”

“ভেতরে চুকলে কী করে?”

“পেছনের দরজাটা ঠেলে খোলা যায়। একেবারে সহজ। আপনার একটা অ্যালার্ম
ব্যবহার করা উচিত।”

“থাক, কেউ যদি পুরনো বই-পত্র চুরি করতে চায়, তো করুক।”

“বুঝলাম, কিন্তু ঐ দরজা দিয়ে তো মানুষও চুকল আপনাকে মেরে ফেলতে, তার
কী হবে?”

“ওরা আসলে আমাকে না, তোমাকে মারতে এসেছিল। তবে যা-ই হোক, ওভাবে
তোমার ঢোকাটা বেশ বোকামি হয়েছে, আমি আরেকটু হলে গুলি চালাতাম।”

“আমি জানতাম আপনি সেটা করতেন না।”

“বুশি হলাম যে তুমি এটা জানতে, কিন্তু আমি এটা জানতাম না।”

এরপর চুপচাপ কয়েক মাইল পথ পেছনে ফেলে এলো তারা। ক্রিস্টিয়ানগেড খুব কাছেই এসে পড়েছে। গত বছরে স্যাম বেশ কয়েকবার এখানে এসেছে।

“খ্রিস্টানসেন...” কথা শুরু করলো স্যাম। “নানান রকম সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু তিনি যার পেছনে লেগেছেন, সে মহা ধূরন্ধর।”

“হেনরিকের মাথায় মগজ আছে।”

“কী জানি আছে কিনা, তবে যে যেমন, তার সাথে তেমনই মেশে।”

“বয়স কত তোমার?”

হঠাতে প্রসঙ্গের এমন পরিবর্তনে অবাক হলো সে। “বত্রিশ।”

“চাকরির বয়স কত হলো?”

“চার বছর।”

ম্যালনের এমন প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য ধরতে পারল স্যাম। কেন হেনরিক তার মতো একজন তরুণ, অনভিজ্ঞ সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করলো যে কিনা একটা আজগুবি ওয়েবসাইট চালায়? “অনেক লম্বা ঘটনা।”

“আমার সময় আছে শোনার,” বলল ম্যালন।

“সত্যি বলতে, সেই সময় আপনারও নেই। একটা ঝামেলাকে হেনরিক আরও এতো জটিল করে ফেলেছেন যে সেটার এখনি একটা সমাধান ক্ষেত্রে দরকার। তাকে এখন সাহায্য করতেই হবে।”

“এটা কি একজন কূটনীতিবিদের কথা, নাকি একজন এজেন্টের?”

ম্যালন গুলির বেগে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাজদুর প্রাস্তা একেবারে সোজা, ডানেই আরও গাঢ় আঁধার চেকে আছে সাগরের জলকে দৈগন্ত রেখায় দূরের সুইডেনের জেগে থাকা আলোর ছটা স্পষ্ট।

“আমি তার বন্ধু হিসেবেই বলছি।”

“তাহলে ভয় কিসের?”

বেশ কিছুটা সময় চুপ থাকলো সে। এই একটা প্রশ্ন সে নিজেকেও করে আসছে গত কয়েক মাস ধরে। একটু দম নিল, তারপর সঠিক উত্তরটা দিল অবশ্যে। “হেনরিক খ্রিস্টানসেন যার পেছনে লেগেছেন...”

“নামটা কি বলবে তুমি এবার?”

“লর্ড গ্রাহাম অ্যাশবি।”

ছয় কর্সিকা

নিজের ইয়ট আর্কিমিডিসে ফিরে এলো অ্যাশবি, তারপর ছেট্ট একটা লাফ দিয়ে নৌকাটার পেছনের প্লাটফর্মে নামলো সে। কর্সিকান লোকটাকে নিজের সাথেই নিয়ে এসেছে। টাওয়ারের উপর ফেলে তাকে যেভাবে চাপ দেওয়া হয়েছে, তাতে তার সোজা হয়ে যাবার কথা। পরনের অড্ডুত আলখাল্লা ফেলে দিয়েছে তারা, আর লোকটাও কোনো ঝামেলা করেনি।

“লিভিং রুমে আটকে রাখ একে,” আদেশ দিল অ্যাশবি
গিল্ডহল এসে তাদের অতিথিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেল।

“তার আরামের যেন ঘাটতি না থাকে।”

কাঠের তিনটা ধাপ পেরিয়ে উপরে উঠে গেল সে নিচের জলে শহরের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন এসে দাঁড়াল সামনে।

“উত্তরের দিকে যাবে, উপকূল ধরে, একেবারে সর্বোচ্চ গতিতে,” হুকুম দিল অ্যাশবি।

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন, তারপর নিজের কাজে চলে গেল।

সন্তুর মিটার দীর্ঘ চকচকে কালো রঙের আর্কিমিডিস চলে দুইটা স্কার্ফিশালী ডিজেল ইঞ্জিনে। পঁচিশ নটিক্যাল মাইল বেগে ছুটতে পারে এটা আর ইঞ্জ-আটলান্টিকও পাড়ি দিতে পারে বাইশ নটিক্যাল মাইলে, আসলেই সমীক্ষ করেছিস্তেন। মোট ছয়টা ডেকে তিনটা থাকার ঘর, একটায় মালিকের নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট, একটা খুব উন্নতমানের রান্নাঘর, শরীর গরম করার জন্য একটা বিশেষ সুন্দরী, একটা জিম সহ একটা বিলাসবহুল জাহাজে যা যা আশা করা হয়, তার সবই আছে এখানে ইঞ্জিনটা গর্জে উঠল নিচে।

সেই ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরের সেই রাতের কথা মনে পড়ে গেল তার আবারও।

সব বকম সংবাদেই সাগর নিরুত্তাল থাকার কথা বলেছিল, সাথে আকাশটাও পরিষ্কার থাকবে। বাস্তিয়ার মাছ ধরা নৌকাগুলো নিরাপদেই নোঙ্গর করা ছিল। শুধুমাত্র একটা ছেট-খাটো জাহাজ ইঞ্জিনে ভর করে এসে ভিড়ল তীরে। কেউ-কেউ বলেছিল যে জাহাজটার গোলো নদী ধরে-কেপ সাদ-এ যাবার কথা ছিল, যে জায়গাটা কেপ করস এর দক্ষিণের কেন্দ্রে অবস্থিত, যেটা আবার কর্সিকার সবচেয়ে উত্তরের অঞ্চল। দূর থেকে জায়গাটাকে মনে হয় সাগরের মাঝে একটা আঙুল সোজা করে রাখা, যেগুলো আসলে উত্তরের দূর ইটালির দিকে মুখ করে থাকা খাড়া পাহাড়ের সারি। তবে বাকি যারা ছিল তারা বলেছিল, জাহাজটা উত্তর-পূর্ব উপকূলের দিকে যাচ্ছিল। চারজন জার্মান সৈন্য তোলা হয়েছিলো জাহাজে, আর ঠিক তারপরেই দুটো অ্যামেরিকান P-39 যুদ্ধবিমান উপর থেকে আক্রমণ করে জাহাজের পাটাতন্টা একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়।

একটা বোমাও ফেলা হয়েছিলো, কিন্তু সেটা সৌভাগ্যবশত জাহাজের উপর পড়েনি। বিমান দুটোর পাইলট হয়তো ভেবেছিল যে খেল খতম, তাই ওরা আর আক্রমণ না করে চলে গিয়েছিল। এরপর দ্রুত ছয়টা কাঠের বাক্স লুকিয়ে ফেলা হয় যেগুলো ঐ জাহাজে ছিল। হয়তো কর্সিকা বা কর্সিকার কাছেই কোথাও লুকানো আছে। তাদের জন্য পাঁচ নম্বর জার্মান অপেক্ষা করছিলো তীব্রে, কাজ শেষ করেই সে বাকি চারজনকে সাহায্য করেছিল পালাতে।

চলতে শুরু করেছে আর্কিমিডিস।

আধুনিকতাও লাগবে না ওখানে পৌছতে।

আরেকটা ধাপ পার হয়ে সে গ্র্যান্ড স্যালুনে পৌছাল। এটাও রাজকীয়তায় ভরা বলা যায়। সাদা চামড়ায় মোড়া আসবাব, স্টেইনলেস স্টিলের জিনিসপত্র, নিচে ক্রিম বার্বার কাপেট। আর এই সবকিছুই মেহমানদের আরাম দেওয়ার জন্য। অ্যাশবির বাপ-দাদার ভিটেমাটি ঘোলশ শতকের আদি আমলের জিনিসে ভরা থাকলেও, এই ছেট্ট তরীকে সে আধুনিকভাবেই সাজিয়েছে।

সোফাগুলোর একটায় বসে আছে কর্সিকান লোকটা, হাতে মদের গ্লাস ধরা শক্ত করে।

“আমার রাম থেকে কিছুটা দেবো নাকি?” জিজেস করলো অ্যাশবির।

মাথা নাড়ুল সে, আপত্তি নেই তার। লোকটা এখনো স্বাভাবিক হতে পারেনি। প্রায় মরতে বসেছিল আজ।

“এটা আমার সবচে প্রিয় মদ। একেবারে প্রথমবার ক্ষেত্র হওয়া রস দিয়ে বানানো হয় এটা।”

জাহাজটা এগিয়ে চলছে সামনে। যত গতি ব্যবহৃত হচ্ছে, সামনের সূচালো অংশটুকুও পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে আরও দ্রুত গতিতে।

হাতে ধরে রাখা নেপোলিয়নের বইটা ছুঁড়ে কর্সিকানের পাশে ফেলল সে। “তোমার সাথে সর্বশেষ কথা বলার পর থেকেই বেশ ব্যস্ত ছিলাম আমি, এখনো আছি; তাই পুরনো প্যাচাল পেড়ে তোমাকে আর বিরক্ত করব না। এখন কথা হলো যে, আমি জানি মোট চারজন সেই জাহাজে করে রোমেলের গুণ্ঠনের বাক্সগুলো নিয়ে এসেছিল ইটালি থেকে। পঞ্চমজন এখানেই অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। কিন্তু ঐ চারজন মিলে নিজেরাই সেই বাক্সগুলো লুকিয়ে ফেলে। পরে ওরা ধরাও পড়ে, কিন্তু গুলো কোথায় রাখা সেটা বলে যায়নি। গেস্টাপো ওদেরকে দায়িত্ব অবহেলার কারণে গুলি করে মারে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পঞ্চম ব্যক্তিকেও জানতে দেওয়া হয়নি যে গুলো কোথায় আছে। সেই আমল থেকেই তোমার মতো কর্সিকানরা সেগুলো হন্তে হয়ে খুঁজে আসছে, কিন্তু একই সাথে তোমরা আবার এই ঘটনা সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে আসছ মানুষদেরকে, যেন অন্য কেউ তোমাদের পথে এসে সুবিধা করতে না পারে। এমন একগাদা গাঁজাখুরি গল্ল বানিয়ে তোমরা মানুষকে এমনভাবে শুনিয়েছ, যেটা আসলে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে মানুষকে, এ ছাড়া আর কিছুই হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায়

তুমিও আমার কাছে মিথ্যে বলেছ গতবার।” একটু থেমে গেল সে। “এবং গুস্তাভও একই কাজ করলো।”

আরও খানিকটা রাম গিলে নিয়ে কর্সিকান লোকটার মুখোয়াখি বসলো সে সোফায়। কাঠ ও কাঁচে বানানো টেবিলটা মাঝে শুধু। বইটা তুলে নিয়ে সেটা সামনের টেবিলে রাখল সে, “সে যা-ই হোক, যা গেছে...গেছে, এখন কথা হলো যে এই ধাঁধাটার উত্তরটা বের করে দাও তো। আমি জানি তুমই এটা পারবে, তাই অনুরোধটা করছি আরকি।”

“আমি যদি এটা পারতামই, তাহলে অনেক আগেই করতাম।”

বড় একটা হাসি দিল অ্যাশবি। “কিছুদিন আগে পড়লাম যে নেপোলিয়ন যখন রাজা হলেন, তখন তার প্রশাসনিক পর্ষদ থেকে যত কর্সিকান ছিল, সব বাদ দিলেন। কোনো কর্সিকান থাকতে পারল না তার দ্বীপে। ওরা নাকি খুবই অবিশ্বস্ত, তিনি বলেছিলেন।”

“নেপোলিয়ন নিজেও তো একজন কর্সিকান ছিলেন।”

“তা বটে, কিন্তু চাঁদু, তুমি তো একজন মিথ্যুক। আমি জানি তুমি এটার জট খুলতে পারবে, তাই কথা না বাড়িয়ে এটা করো জলদি।”

গ্লাসের বাকি রামটুকু মুখে ঢেলে দিল সে। “আপনার সাথে আমার কাজ করতে আসাই ঠিক হয়নি।”

কাঁধজোড়া ঈষৎ উঁচু করলো অ্যাশবি। “তুমি তো এসেছ আমার টাকার লোভে। আর, বুঝতে পারছি যে, আমারও তোমাকে দলে টানাটা ঠিক হয়নি।”

“টাওয়ারে ফেলে আপনি আমায় মেরেই ফেলতে প্রয়োগছিলেন।”

হাসল আবারও সে। “তা করতে যাক কেন? আমি শুধু তোমাকে পুরো মনোযোগটা এদিকে দেওয়াতে চেষ্টা করছিলাম।”

কথাটা কর্সিকানের মনে ধরল কিনা, তা বোঝা গেল না। “আপনি আমার কাছে এসেছিলেন শুধু একটাই কারণে। আপনি জানতেন যে আমার কাছে এর উত্তর আছে।”

“তাহলে আর কথা কী? সেই সময়টা তো এসেই গিয়েছে, এখন তোমার কাজটা তুমি শুরু করো।”

পাক্কা দুই বছর অ্যাশবি ব্যয় করেছে এর পেছনে, সংগ্রহ করা প্রতিটা সূত্র ধরে এগিয়ে যেতে চেয়েছে, এই ঘটনার দ্বিতীয় সারির জীবিত সাক্ষীদের সাথে কথা বলেছে, প্রশ্ন করেছে নানা রকম অনুসন্ধানে অংশ নেওয়া প্রথম দিককার·মানুষের মাঝে কেউই বেঁচে নেই বলতে গেলে। তবে একটা জিনিস সে জানতে পেরেছে যে রোমেলের গুপ্তধনের অস্তিত্বের কথা কেউই নিশ্চিত করে জানে না। এটার উৎপত্তি, ও এটাকে আফ্রিকা থেকে জার্মান পর্যন্ত নিয়ে আসা নিয়ে যতগুলো গল্প সে শুনেছে, তার প্রতিটাই স্বতন্ত্র, তার মানে হলো, সবই মুখে বানানো গল্প। তবে সবচে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাটা বলছে যে স্বর্ণ-ভাণ্ডারটির উৎপত্তি হয়েছিলো তিউনিশিয়ার গেইবস নামক জায়গায়। এলাকাটা লিবিয়ার বর্ডার থেকে একশো ষাট কিলোমিটার দূরে। জার্মান-আফ্রিকা কর্পস

যখন ঐ অঞ্চল দখল করে নিয়ে তাদের প্রধান ঘাঁটি বানিয়েছিল, তখন সেখানকার বসবাসরত তিন হাজার ইহুদিকে বলা হলো যে যদি তারা “ষাট হান্ডেডওয়েট সোনা (১ হান্ডেডওয়েট = ৫০.২ কেজি)” জোগাড় করে দিতে পারে, তো তাদেরকে প্রাণে বাঁচতে দেওয়া হবে। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া হলো এই প্রায় তিন টন পরিমাণের মুক্তিপণ জোগাতে। তারপর সেগুলোকে এক জায়গায় করে আটটা কাঠের বাস্ত্রে ভরা হলো, এবং উত্তরের ইটালিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সে জায়গা তখন গেস্টাপোর নিয়ন্ত্রণে চার জার্মান ওখানে পৌঁছা মাত্র সেখান থেকে তাদেরকে সোনা সমেত পশ্চিমের কর্সিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখনো পর্যন্ত কেউ জানতো না যে ওগুলোর ভেতর কী আছে। কিন্তু যেহেতু গেইবস এর ইহুদীরা যথেষ্ট সম্পদশালী ছিল, আর স্থানীয় সিনাগগটাও বেশ বিখ্যাত ছিল তীর্থযাত্রীদের কাছে, তাই শত-শত বছর ধরে এই সিনাগগ উপাসনালয় বহু মূল্যবান রত্ন-পাথরের মজুদ হয়ে ওঠে। ইহুদীরা নিজের জীবন বাঁচাতে বাস্ত্রের ভেতর দামি জিনিসই ভরে দিয়েছিল-এ কথা ধরে নেওয়া যেতেই পারে।

কথা হলো, ওগুলো কি সোনা ছিল?

বলাটা কঠিন।

কিছু থাকুক বা না থাকুক, একটা নাম কিন্তু ঠিকই জুটিয়ে নিয়েছে-রোমেলের সোনা। এই রোমেল ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন ফিল্ড মার্লেস, যাকে বলা হয় সর্বশেষ গুপ্তধনের মালিকদের মধ্যে একজন।

কর্সিকানটা নিজের খালি গ্লাসটা উঁচু করে ধরল, এবং সেটা ভরে দিতে উঠে দাঁড়াল অ্যাশবি। নিজের এমন কার্য হাসিল করতে একটু প্রত্যেক প্রশ্ন দেওয়াই যায়, তাই সে বড় এক টাম্বলারের তিন-চতুর্থাংশ রাম ভর্তি করে নিয়ে এলো সামনে।

খুব তৃষ্ণির সাথে দীর্ঘ এক চুমুক দিল কর্সিকানটা।

“এই সাইফারটা আমি চিনি ভালো করে,” অ্যাশবি বলল “সত্যি বলতে, বেশ উভাবনী চিত্তার ছাপ আছে এতে। তথ্য লুকিয়ে রাখার দারুণ এক পদ্ধতি। যতদূর জেনেছি, একে মুরস নট বলে।”

প্যাস্কুয়েল পাওলি নামে একজন কর্সিকান মুক্তিযোদ্ধা ছিল আঠারোশ শতকে, বর্তমানে যে একজন জাতীয় বীর, সে-ই এই নাম দিয়েছিল। তার মিত্রদের সাথে যোগাযোগ করার একটা কার্যকরী উপায় দরকার হয় তার, এমন পদ্ধতি, যেটা একই সাথে গোপনীয়তাও রক্ষা করবে, তাই সে-একটা কার্যকরী মাধ্যম দাঁড় করিয়ে ফেলে যেটা স্থানীয় উপকূলীয় জলদস্য মুরসদের কাছ থেকে শিখেছিল সে।”

“এসব ক্ষেত্রে একই রকম একজোড়া বই ব্যবহার করা হয়।” ব্যাখ্যা করলো অ্যাশবি। “একটা রাখবে তুমি, আর বাকিটা পাঠিয়ে দেবে যার কাছে বার্তা পাঠাতে চাও, তার কাছে। বইয়ের ভেতর থেকে বার্তার জন্য সঠিক শব্দগুলো বেছে নিতে হবে এরপর সেই শব্দ, পৃষ্ঠা নাম্বার, লাইন, এবং শব্দের সংখ্যাকে এক সারি সংখ্যায়

রূপান্তর করে পাঠিয়ে দাও প্রাপকের কাছে। এখন কারো কাছে যদি শুধু নামার থাকে, তাহলে তা কোনোই কাজে আসবে না, যদি তার কাছে সঠিক বইটা না থাকে।”

রামের গ্লাস্টা টেবিলে নামিয়ে রাখল সে, তারপর পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে সেটাকে টেবিলের কাঁচের উপর রাখল সমান করে। “দেখো, এই জিনিসটাই তোমাকে দিয়েছিলাম গতবার।”

অ্যাশবির বন্দীটি কাগজটা ভালো করে দেখতে লাগল।

“এগুলোর কোনো অর্থই নেই আমার কাছে,” কর্সিকান লোকটা বলল।

মাথাটা দোলাল অ্যাশবি, কথাটা বিশ্বাস হয়নি তার। “এবার অন্তত এসব বন্ধ করো। ভালো করেই বুঝতে পারছ যে রোমেলের সোনাগুলোর অবস্থান দেওয়া আছে এখানে।”

“লর্ড অ্যাশবি, এবার আমাকে কিছু বলতে দিন। আজ রাতে আপনি আমায় খুবই অপমান করেছেন। টাওয়ারের উপর থেকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমাকে মিথ্যেবাদীও বলেছেন। আরও বললেন যে গুস্তাভও মিথ্যে বলেছে আপনাকে। আচ্ছা, হ্যাঁ, বইটা আমার কাছে ছিল, তো? আর এখন এই নামারগুলো আমায় দেখাচ্ছেন, বলছেন যে সমাধান করতে। এগুলো একেবারেই মূল্যহীন। কোথায় যাচ্ছেন এখন? আপনি সে সম্পর্কেও কোনোই ধারণা নেই আপনার। যে রাম আপনি খাওয়ালেন, তা খুব সুস্থাদু, বোটটাও অসাধারণ, সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমি আপনার সাথে কাজ করছি, আপনার সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি?”

যৌবনের প্রায় পুরোটা জুড়েই অ্যাশবি গুপ্তধনের খেজে করে বেড়িয়েছে। যদিও পৈতৃক সম্পত্তির পরিমাণ অগাধ, তারপরও এই জমাতে^১ সম্পদ নেড়ে-চেড়ে আয়েশ করে না খেয়ে হারিয়ে যাওয়া সম্পদ খুঁজে বেঁকে ফেলার চ্যালেঞ্জটাই তাকে সব সময়ে আকর্ষণ করেছে আর এই খেলা খেলতে গিয়ে অনেক ঝক্কিও পোহাতে হয়েছে কখনো-কখনো। আবার কখনো বা খুব চড়া দামে শুধু কিছু তথ্যই কিনতে হয়েছে তাকে করো কাছ থেকে। তবে ঠিক আজকের মতো এমনও হয়েছে কয়েকবার, যখন কাঙ্ক্ষিত সমাধানের উপর সে নিজেই গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছে।

“সবকিছু ব্যাখ্যা করে বলতে আমার খুবই ভালো লাগবে।”

সাত

ডেনমার্ক, ডোর ১.৫০

বন্দুকের বুলেট ক্লিপটা আরও একবার দেখে নিল হেনরিক থ্রিভাল্ডসেন। সব ঠিক আছে দেখে খুশি হলো মনে-মনে, তারপর সেটা খাবারের বড় টেবিলটার উপর রাখল। পুরনো একটা বিশাল বাড়ির ভেতরে সে বসে আছে, উপরে ওক কাঠের সিলিঙ্গ, আর চারপাশে আদিকালের সব বর্ম এবং কিছু পেইন্টিং এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যেন তার

আসনটা একটা খুব উঁচু মর্যাদার। তার পূর্বপুরুষের প্রত্যেকেই এই আসনে বসেছিল, গত প্রায় চারশো বছর ধরে।

আর মাত্র তিন দিনেরও কম বাকি আছে ক্রিসমাসের।

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের কথা মনে পড়লো তার। সাই এই টেবিলের উপর কী করছিলো সেদিন?

“থাম বলছি, সাই,” আদেশের সুরে তার স্ত্রী বলল, “এক্ষনি নেমে এস।”

টেবিলের দীর্ঘ খোলা জায়গার উপরে ছেট্ট পা দুটো দিয়ে কী সুন্দর ছেটাছুটি করছে ছেলেটা! হাত দুটো দিয়ে একবার টেবিলের এপাশে একবার ওপাশের চেয়ারগুলোর উঁচু হেলান দেওয়া অংশের উপরে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। টেবিলের ঠিক মাঝখানে শোভাবর্ধনের জন্য একটা সেন্টারপিস রাখা। প্রভাসেন দেখল, চকচকে সোনালী রঙের এই আসবাবটিও খুব সাবধানে পাশ কাটিয়ে গেল ছেলেটা, তারপর এক লাফ দিয়ে তার মেলে ধরা বাহু দুটির মাঝে এসে পড়লো।

“নাহ, এত যন্ত্রণা দিতে পারো বাবাতে আর ছেলেতে,” তার স্ত্রী বলল। “আর পারি না।”

“আহা, এমন করছ কেন, লিজেট? এখন ক্রিসমাস। একটু খেলুন না।” তাকে কোলের দিকে আরও একটু টেনে নিয়ে বলল সে। “কেবল সাত মিনিট বয়স হলো ওর। আর টেবিলটা তো আজকের না, বহু দিন হলো আছে এখানে।”

“বাবা, এবার নিসে আসবে না?”

সাই এই দুষ্টু বামনটাকে খুব পছন্দ করে। রূপকল্পনা বর্ণনা অনুযায়ী এই প্রাণীটার গায়ে ধূসর উলের পোশাক থাকে, মাথায় থাকে প্রাপ্তি আকৃতির নরম একটা টুপি, পায়ে লাল একজোড়া মোজা আর সাদা রঙের খড়ম। পুরনো খামারবাড়ির চিলেকোঠায় থাকে ওটা, এবং নানান রকমের বামেলা পাকিয়ে আনন্দ পায়।

“আমাদের কিছু পরিজ লাগবে, বাবা...” ছেলেটা বলল তাকে, “ওর হাত থেকে বাঁচার জন্য।”

হাসল প্রভাসেন। একই গল্প সে তার মায়ের মুখেও শুনেছে যে এক বাটি পরিজ ক্রিসমাসের আগের দিন বাইরে রাখা হলে দুষ্টু নিসের হাত থেকে অনেকাংশেই রেহাই পাওয়া যায়। তবে সেই দিনগুলো অবশ্যই নার্সি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ শুরুর আগের কথা। প্রভাসেন বৎশের প্রায় সবাইকেই শেষ করেছে হিটলারের এই বাহিনী। এমনকি তার বাবাও বাঁচতে পারেনি তাদের হাত থেকে।

“ঠিক কথা। পরিজ তো রাখতেই হবে আমাদের,” লিজেট বলল। “সাথে হাঁসের রোস্ট, লাল বাঁধাকপি, বাদামী আলু, আর একটু দারুচিনি দেওয়া ভাতের পুড়ি।”

“জাদুর কাজুবাদাম থাকবে তো?” জিজেস করল সাই, তার কঠো উদ্দেশ্যনা।

ছেলেটার বাদামী রঙের পাতলা চুলে হাত বুলিয়ে দিল তার মা। “হ্যাঁ, সোনা। জাদুর কাজুবাদামও থাকবে। আর একবার যদি তুমি সেটা খুঁজে পাও, দারুণ একটা

পুরক্ষার পাবে।”

সে এবং লিজেট দুজনেই জাদুর বাদাম এমনভাবে রাখতো যেন সাই সেটা খুঁজে পায়। যদিও সে নিজে ইহুদি, খ্রিস্টানসেনের বাবা ও স্ত্রী দুজনেই ক্রিশ্চিয়ান, তাই এমন উৎসবগুলো তার জীবনে আলাদা একটা জায়গা করে নিয়েছে। প্রতি বছর সে এবং লিজেট মিলে ক্রিসমাস ট্রি সাজাত, তাতে সুগন্ধি দিত, কাঠ ও খড় দিয়ে বাড়িতে বানানো নানার রঙের বল ঝুলাত, আর এতো কিছু তারা করত সবই সাইয়ের অগোচরে, কিছুই বুঝতে দেওয়া হত না তাকে ক্রিসমাসের দিনের ডিনারের আগ পর্যন্ত। তারপর সবাই এক জায়গায় হয়ে ক্রিসমাসের গান গাইত।

আহা, কী দারুণ ক্রিসমাস কাটাত সে!

তারপর লিজেট মারা গেল।

তারও দু'বছর পর, যখন সাই খুন হলো, সব উৎসব থেমে গেল তার জীবনে। এই ক্রিসমাস সহ গত তিনটা ক্রিসমাস তার জীবনে একরকম যন্ত্রণার নাম। প্রতি বছর সে এই চেয়ারে বসে থাকে, একেবারে টেবিলের শেষ প্রান্তে, আর ভাবে, জীবন কতটা নির্মম হতে পারে।

তবে এই বছরটা হয়তো একটু ভিন্ন হতে পারে।

খুব আলতো করে কালো বন্দুকটার ধাতব গায়ে হাত বুলাল স্টে। এমন খুনে অ্যাসল্ট রাইফেল ডেনমার্কে নিষিদ্ধ, কিন্তু আইন থোড়াই কেয়ার করে সে।

বিচার।

এই একটা জিনিসই চাই এখন তার।

চুপচাপ বসে আছে সে। এমনকি একচত্ত্বর কম্পক্ষে বিশাল এই ক্রিস্টানগেডের বাড়ির কোথাও একটা বাতিও জ্বলছে না।

আলোবিহীন এই জগতে তার সব ভাবনাই আনন্দ দিচ্ছে তাকে। এখানে তার ভাঙ্গা মেরুদণ্ড নিয়ে বসে থাকাটা কারোরই চোখে পড়বে না, দেখবে না তার মুখাবয়বটিও ঝাঁকড়া দেওয়া রূপালী চুল আর ঘন, এলোমেলো ভুজোড়া যেমন আছে তেমন থাকুক, কেটে-ছেঁটে ছোট করারও প্রয়োজন নেই। এখন শুধুমাত্র তার ইন্দিয়গুলো সজাগ রাখাই শুরুত্তপূর্ণ।

আর তার সেগুলো দারুণ ভাবেই জেগে আছে।

বড় হলকুমটার ভেতর আঁধারের মাঝেই চোখ বুলিয়ে আনল সে, যেন তার মনে কিছু একটা বারবার ভেসে উঠছে।

তার চোখে সাই যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে। আছে লিজেটও। অপরিমেয় সম্পদ, ক্ষমতার মালিক সে, আর খুবই প্রভাবশালী। হাতে গোনা কিছু হোমরা-চোমরা আর দু-একজন রাজা ছাড়া কেউই কখনও তার অনুরোধ ফেলতে পারেনি। বিশ্বের নিষ্কলঙ্ক খ্যাতিমান মানুষের মাঝে সে একজন। মনে-প্রাণে ইহুদী ধর্ম কখনই অনুসরণ না করলেও, ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। গত বছর তো প্রায় সব কিছুই বিসর্জন দিতে বসেছিল এই পবিত্র ভূমিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে। আড়ালে থেকেই সে দেশের

জন্য বিশ্বব্যাপী তহবিল সংগ্রহের কাজে সাহায্য করেছে, চেলে দিয়েছে পারিবারিক সঞ্চয় থেকে বিপুল পরিমাণে ইউরো।

কিন্তু থ্রিভাল্ডসেন বংশের সে-ই সর্বশেষ পুরুষ।

দূরসম্পর্কের কিছু আত্মীয় আছে এখনো, তবে একেবারেই হাতেগোনা তাদের সংখ্যা। তারমানে, কয়েকশ বছর ধরে চলে আসা এই পারিবারিক ধারাটা একেবারেই থেমে যেতে চলেছে।

কিন্তু ন্যায়বিচার পাওয়ার আগ পর্যন্ত সেটা হতে দেওয়া যায় না।

একটা দরজা খোলার শব্দ কানে এলো তার, কেউ একজন হেঁটে আসতেই পায়ের শব্দ প্রতিফলিত হচ্ছে হলুক জুড়ে।

কাছেই কোথাও ঘড়িটা বেজে উঠে জানান দিল, এখন ২ টা বাজে।

কয়েক মিটার দুরেই থামল পায়ের আওয়াজ, তারপর একটা কর্ষ শোনা গেল। “সেগুলোতে এইমাত্র কিছু ধরা পড়েছে।”

দীর্ঘদিন ধরে জেস্পার তাদের সাথে আছে, সুখের যেমন সাক্ষী সে, তেমন দুঃখেরও। তাই থ্রিভাল্ডসেন ভালো করেই জানে, ভালো-মন্দ ঘটাই থাকুক এতদিনে, তার এই বন্ধুও সমান পরিমাণেই অনুভব করেছে সেগুলো।

“কোন দিকের?”

“দক্ষিণ-পূর্ব দিকের, সমুদ্রের কাছে। দু'জন ঢুকে পড়েছে, একজনেই আসছে।”

“তোমার কিন্তু এটা করার দরকার নেই,” জেস্পারকে বলল সে।

“আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।”

হাসল সে, পুরনো বন্ধু তাকে দেখতে পাচ্ছে না ক্ষেত্রে ভালো লাগল তার। গত দুই বছর ধরে সে প্রায় বিরতিহীনভাবেই ভেতরে ভেতসন্তার সাথে যুদ্ধ করে আসছে। এক মনে হন্যে হয়ে কিছু খোঁজে, আরেক মনে ভাবে, এই খোঁজাখুঁজির কি-ই বা কারণ। তবে এতকিছুতে কাজের কাজ বলতে যেটা হয়েছে সেটা-এই ব্যস্ততা তার যন্ত্রণা, কষ্ট, বিষণ্ণতাকে সাময়িক সময়ের জন্যে হলেও দূরে রেখেছে।

“স্যামের কোনো খবর?” জিজেস করলো সে।

“তার ফোন দেওয়ার পর থেকে আর কোনো খবর নেই। কিন্তু ম্যালন ফোন দিয়েছিল দু'বার। আমিও না ধরে বাজতে দিয়েছি, আপনার কথামতো।”

তার মানে হলো, হেনরিক যেমনটা চেয়েছিল, ম্যালন তেমনটাই করেছে।

ঝুব সতর্কতার সাথেই ফাঁদটা পেতেছে সে। আর এবার তার সমান সতর্কতার সাথে সেটা টানতে হবে।

রাইফেলটার দিকে হাত বাড়াল সে।

“তাহলে মেহমানদের স্বাগত জানানো যাক।”

আট

এলিজা একেবারে মুখোমুখি হয়ে বসেছে তার সীটে রবার্ট ম্যন্ট্রিয়ানির পরিপূর্ণ মনোযোগটা তার ধরে রাখা দরকার।

“শোলশ উননকই থেকে আঠারোশ পনেরো পর্যন্ত, সব মিলিয়ে মোট তেষটি বছর যুদ্ধে করেছে ইংল্যান্ড। প্রতি দুই যুদ্ধের মাঝের বছরগুলো তারা ব্যয় করতো পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য। কোনো ধারণা আছে যে কী পরিমাণ খরচ হত এতে তাদের? আর বিষয়টা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না সে সময়ে ইউরোপীয়রা যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য এমনটাই করে বেড়াতো।”

“যার থেকে, তুমি বলছ যে, অনেক মানুষের লাভ হত?” ম্যন্ট্রিয়ানি জিজ্ঞেস করলো।

“ঠিক তাই। আর ঐ যুদ্ধগুলো জেতা না জেতায় কিছু আসতো যেত না, কারণ যুদ্ধ হলেই সরকার ফতুর হত, সাথে খণ্ডের বোঝাও বাঢ়ত, কিন্তু যারা অর্থ-লঘু করতো যুদ্ধের পেছনে, তারা তো লালে লাল। সব লুটেপুটে নেওয়ার বিরাট সুযোগ কজা করে নেওয়ার বৈধতা নিয়ে নিত আগেই। ঠিক আজকের দিনে ওষুধ কোম্পানিগুলো যা করে থাকে। রোগের লক্ষণগুলো দূর করার ওষুধ বানায়, বিক্রি করে। কিন্তু সেই রোগ নির্মূল করার ওষুধ বাজারে ছাড়ে না, রোগ বেঁচে থাকে, টাকা আসতে থাকে!”

চকোলেট টার্টের শেষটুকু মুখে দিল ম্যন্ট্রিয়ানি। “এমন তিনটা ওষুধ কোম্পানির স্টক কেনা আছে আমার, অনেক টাকা বিনিয়োগ করেছি।”

“তাহলে তো ভালোই জানো যে সব ঠিক বললাম কিন্তু—”

কঠিন দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে এলিজা তার দিকে। সেও একই রকম দৃষ্টি দিল, কিন্তু মনে হলো না এলিজার কথার উত্তর দেবে।

“টার্ট অসাধারণ লাগল খেতে,” বলল লোকটা। “সত্যি বলতে কী, মিষ্টি দেখলে লোভ সামলাতে পারি না।”

“আরেকটা এনে দেই?”

“এবারের এটা নির্ধাত ঘূষ!”

“সেটা পরে হিসেব করো। কিন্তু এখন আমি চাইছি যে সামনে যা ঘটতে চলেছে, তুমিও সেটার অংশ হও।”

“কেন এমন চাওয়া?”

“কারণ তোমার মতো মানুষেরা একেবারে দুর্লভ গোছের। মানে তোমার সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব, সবই আছে প্রচুর পরিমাণে। তুমি বুদ্ধিমান, উদ্ভাবনী ক্ষমতাও আছে তোমার। আমাদের মতো তুমিও তোমার উপার্জনের বড় একটা অংশ লোভী আর আনাড়ি সরকারকে দিতে-দিতে ক্লান্ত।”

“হ্রম, তো কী যেন ঘটবে বলছিলে? রহস্য না করে খুলে বল, এলিজা।”

এতটা অবধি বলতে নারাজ এলিজা, অন্তত এখন তো নয়ই। “দেখি, নেপোলিয়ন সম্পর্কে আরও কিছু বলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় কিনা। বলতো, তুমি ওর সম্পর্কে কতটুকু জানো?”

“ছেট-খাটো ভদ্রলোক! মাথায় অঙ্গুতুড়ে এক হ্যাট! কোটের পকেটে সব সময় একটা হাত চুকানো।”

“এটা কী জানো, যে জিসাস ক্রাইস্টের পর ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মাঝে নেপোলিয়নকে নিয়েই সবচে বেশী বই-পত্র লেখা হয়েছে?”

“আগে বুঝিনি কখনো, যে তুমি এমন ইতিহাসবেতা।”

“আমিও বুঝিনি যে তুমি এমন ঘ্যাচড়া।”

কয়েক বছর ধরেই ম্যাস্ট্র্যানিকে চেনে এলিজা। একজন বন্ধু হিসেবে যতটা না, তারও বেশী একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী অংশীদার হিসেবে। বিশ্বের সবচে বড় অ্যালুমিনিয়াম প্ল্যান্ট সম্পূর্ণ তার দখলে। গাড়ি প্রস্তুতকারী জগতেও শক্ত অবস্থান তার। আরও আছে উড়োজাহাজ মেরামত কারখানা, এবং সর্বশেষ তার ভাষ্য অনুযায়ী, আছে ওষধের ব্যবসা।

“আর কত ঘুরাবে আমায়?” বলল ম্যাস্ট্র্যানি। “একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। কানের কাছে কোনো মহিলার ঘ্যানর-ঘ্যানর আর ভালো লাগছে না। তুমি কী চাও, কেন চাও, তার কিছুই বলনি এখনো।”

আরও কিছুটা সময় কথা গায়ে লাগাবে না, ভাবল এলিজা। “ফ্লাটের একটা লেখা আমার খুব ভালো লাগে। ইতিহাস হলো অতীতকে দেখে ভবিষ্যৎকরণ করা।”

এবারের হাসিতে দাঁত দেখা গেল রবার্টের। “ফরাসিদের নয়ে তোমার এই অঙ্গুত দর্শনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এতে আমি যতবার এটা নিয়ে জ্ঞাবি ততবারই বিরক্ত হই এটা চিন্তা করে যে কিভাবে ফরাসিরা সংঘাতগুলো মিটিয়ে ফেলত। যেন ওদের মহিমান্বিত অতীত উড়ে এসে বর্তমানের সব ঝামেলা মিটিয়ে মিয়ে যাবে।”

“তোমার কথা আর কী বলবো, আমি তো আধা কর্সিকান, আমার কাছেই এটা অঙ্গুত লাগে। তারপরও, কোনো-কোনো যুদ্ধের আড়ালে কিন্তু বিশেষ কিছু তথ্যও লুকানো থাকতে পারে।”

“হ্যাম, তারপর বল, এলিজা, নেপোলিয়নের কী হলো।

এলিজার ক্লাবে এই বেপরোয়া ইটালিয়ান রবার্টকে খুব ভালো মানাবে, শুধু সেজন্যাই গল্লের পরের অংশটুকু বলছে তার কাছে। না হলে তার এমন সৃষ্টি পরিকল্পনার মাঝে কারো বাঁ হাত দেওয়ার মতো স্পর্ধা মোটেই মেনে নেয়নি, বা নিতও না-সে।

“রোমানদের পর নেপোলিয়নের মতো এমন বড় সাম্রাজ্য আর কেউ গড়তে পারেনি। তার একার নিয়ন্ত্রণেই প্রায় সাত কোটি মানুষ। ঠাণ্ডা মাথায় একই সাথে বন্দুকবাজি করেছে। আবার সারা জায়গা থেকে মূল্যবান বিভিন্ন নথিপত্রও সংগ্রহ করেছে। সে কিন্তু নিজেকে নিজেই সম্রাট উপাধি দিয়েছিল ভাবতে পার? বয়স তখন টেনেটুনে পঁয়ত্রিশ, এই বয়সেই পোপকে রীতিমত তোয়াক্ত না করে রাজমুকুট নিজের মাথায় বসিয়েছে।” নিজের কথাগুলো একটু হজম করার সময় দিল সে। তারপর বলল, “এমন অহংকারের কারণেই, নেপোলিয়ন

নিজের জন্য দুইটা স্মৃতিসৌধের মতো বানিয়েছিল, দেখতে ছেট-খাটো থিয়েটারের মতো যেগুলোর একটাও আর ঢিকে নেই।”

“আরও যে বিল্ডিং বা স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়েছিল, সেগুলো তাহলে কিসের জন্য?”

“একটাও তার সম্মানে না, এমনকি তার নামেও না। বেশীরভাগ ভবনগুলোই অসম্পূর্ণ পড়ে আছে তার মৃত্যুর এত বছর পরও। এমনকি সে প্লেস দে লা কনকর্ড-এর নাম বদলে প্লেস নেপোলিয়ন নাম রাখার পক্ষে ভোট দিয়েছিল।”

এলিজা খেয়াল করলো যে ম্যন্ত্রয়ানি এসব তথ্য হজম করছে ধীরে, ভালো লক্ষণ। উপর্যুক্ত সময়টা ঘনিয়ে আসছে।

“রোমে থাকাকালীন সময়ে, ফোরাম অ্যান্ড প্যালাটাইনকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করিয়েছে নেপোলিয়ন। ইট-পাথরের জঙ্গলে ভরা ছিল ওটা। তারপর প্যান্থেনেনটিও সংস্কার করে সে। তবে আলাদাভাবে বিশেষ কিছু যোগ করেনি তাতে, যেমন কোনো ফলক বা ওরকম কিছু, যা দেখে বোৰা যায় সে এগুলো করিয়েছে। ইউরোপের অসংখ্য দেশে এমন হাজারো সংস্কার, উন্নয়ন করিয়েছে সে, কিন্তু তারপরও তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে কোনো কিছুই বানানো হয়নি। বিষয়টা কি অদ্ভুত না?”

চুপ আছে ম্যন্ত্রয়ানি। বোতল থেকে মুখে পানি নিয়ে চকোলেট লেগে ~~খেঞ্চ~~ টুকরাটা পরিষ্কার করলো সে।

“তবে এখানে কাহিনী আছে,” বলে চলেছে এলিজা। “নেপোলিয়ন কখনো ঝণের মধ্যে জড়াতে চাইত না শুধু তাই না, যেসব বিভিবানেরা টাকা ঝণ দিত, তাদেরকেও ভালো চোখে দেখত না সে। কারণ এসব লেনদেনের কর্মসূচী মূলত ফরাসি প্রজাতন্ত্রের বেশকিছু জায়গায় অর্থনৈতিক ঘাটতি দেখা দেয়। তবে যখনই সুযোগ বা ক্ষমতা এসেছে, সেটা কাজে লাগিয়ে মানুষের টাকাকড়ি ইচ্ছেমুক্ত জ্ঞানদখল করে নিজের করায়ত্ব করে নিয়েছে সে। এমনকি সেই অর্থ প্রয়োজনে ব্যাংকেও রেখেছে, তবে টাকা ঝণ করার কথা আসলে সে নারাজ। এইদিক থেকে নেপোলিয়ন একেবারেই আলাদা ছিল তার পূর্ব...পর...সব শাসক থেকে

“নীতিটা তো ঠিকই আছে,” বিড়বিড় করে বলল ম্যন্ত্রয়ানি। “প্রত্যেকটা ব্যাংকারই একেকটা রক্তচোষা।”

“ওদের থেকে রেহাই চাও না তুমি?”

আহ্মানটা বেশ সুখকর মনে হলেও, তার অতিথি কোনো উত্তর দিল না

“ঠিক, নেপোলিয়ন বেঁচে থাকলে তোমার কথায় সে খুশিই হত একেবারেই তার মনপুত কথা বলেছ,” বলল এলিজা। “অ্যামেরিকা থেকে নেপোলিয়নকে প্রস্তাৱ কৰা হয়েছিল, ওদের নিউ অরলিওন অঙ্গরাজ্যটা কিনে নিতে। সে তো এটা করেইনি, উপরন্তু তার দখলে থাকা সমগ্র লুইজিয়ানা রাজ্যাংশটাই বিক্রি করে দিল। তারপর সেই বিক্রি থেকে পাওয়া কোটি-কোটি টাকা খরচ করলো সে তার আর্মিদের পেছনে, আরও শক্তিশালী দল গড়তে। তার জায়গায় অন্য যেকোনো শাসকই জায়গাটা হাতছাড়া করত না, প্রয়োজনে

সেই তোমার রক্ষচোষাদের কাছ থেকে ঝণ নিত, আর যুদ্ধ হলে তো সেই ঝণের টাকা সুদে-আসলে আদায় হয়েই যেত ঝণদাতাদের। আর কী চাই!”

“নেপোলিয়ন মারা গেছে অনেক দিন,” বলল ম্যন্ত্রিয়ানি। “আর দুনিয়াটাও বদলে গেছে অনেক। আজকের অর্থনীতিতে টাকাই সব।”

“বিষয়টা পুরো সত্যি না। তুমি দেখ, রবার্ট, নেপোলিয়ন এই প্যাপিরাসের পাতাগুলো থেকে যা শিখেছে, তা আজও প্রাসঙ্গিক।”

এলিজা খেয়াল করলো যে সে যতই মূল আলোচনার দিকে যাচ্ছে, ততই তার শ্রেতার আকর্ষণ বাড়ছে।

“কিন্তু তারপরও,” বলল ম্যন্ত্রিয়ানি, “তোমার প্রস্তাবে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি তো আর সেটা জানতে পারছি না। কি, তাই না?”

এলিজা বুঝতে পারল যে তার এমন খোলাসা করে কথা না বলাটা পুরো ঘটনাকে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে। “আচ্ছা, তাহলে আমি তোমায় বরং অন্য একটা জিনিস বলছি। আশা করছি এতে তোমার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ হবে।”

“যে মেয়ে আমায় এতো আরামদায়ক বিমানে চড়িয়ে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে, সেরা মানের মাংস আর খাবার-দাবারের আয়োজন করেছে, সেরা শ্যাস্পেন গ্লাসে দেশে দিয়েছে, আর অবশ্যই এতো দারুণ চকোলেট টার্ট খাইয়েছে, তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া কিভাবে?”

“আবারো বলি, রবার্ট, আমায় যদি তোমার ভালো না-ই লাগেক, তাহলে কি আর এখনে আসতে?”

তার চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে এলিজার উপর। “ভ্রাম এসেছি, কারণ আমার কৌতুহল হচ্ছে, তাই। তুমি জানো যে আমি এমনই কৌতুহলী।” একটু দম নিল সে। “হ্যাঁ, আমি ব্যাংক ও সরকার, দুটো থেকেই মুক্তি জাইগুলি।

উঠে দাঁড়ালো এলিজা, তারপর সোফার শেষ প্রান্তে রাখা লুইস ভ্যান্ডের ব্যাগটা হাতে নিয়ে সেটা খুলল সে। ওটার ভেতর চামড়া বাঁধানো ছোট্ট একটা ভলিউম, একটা বই, যেটা আঠারশ বিরাশি সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। The Book of Fate, নেপোলিয়নের মালিকানায় থাকা ও তাঁর ব্যবহৃত বই।

“এটা আমি পেয়েছি আমার কর্সিকান নানীর কাছ থেকে, সে আবার পেয়েছিল তার দাদীর কাছ থেকে।” টেবিলের উপর বইটা রাখল সে। দেখতে ওটা পাতলা হলেও ওজন আছে। “দৈববাণীতে বিশ্বাস কর তুমি?”

“না করার মতোই।”

“এটা কিন্তু আর পাঁচটার মতো না। ধারণা করা হয় যে এটা লুক্সের কাছে ভ্যালী অফ কিংসের কোনো এক রাজার সমাধিতে পাওয়া। আর পেয়েছিল নেপোলিয়নের এক স্যাভান্ট। পুরোটাই হায়ারোগ্রাফিক্সে লেখা। তো, যে এটা পেল, সে দেরী না করেই নেপোলিয়নের কাছে এটা দিয়ে দিল। নেপোলিয়ন এটার পাঠোন্ধারের জন্য সেই সময়ের মিসরিও ক্রিশ্চিয়ান চার্চের এক কপটিক প্রিস্টের সাহায্য নিল যে কিনা মৌখিক অনুবাদ করে দিল নেপোলিয়নের সেক্রেটারির কাছে, সে আবার এটা জার্মান ভাষায় তরজমা করলো

গোপনীয়তা রাখার জন্য, তারপরে এসে নেপোলিয়নের কাছে হস্তান্তর করা হলো।” একটু বিরতি নিল এলিজা : “সবই মিথ্যে গল্ল।”

একটু হাসল ম্যন্ট্রিয়ানি। “শুনলাম, কিন্তু অবাক হতে পারলাম না।”

“মূল লেখাটা কিন্তু মিসরেই পাওয়া গিয়েছিল, কথা সত্য। কিন্তু আমি যে প্যাপিরাসের কথা বললাম একটু আগে, সেটার মতো না—”

“যেটা নিয়ে কথা বলতে গিয়েও আবার থেমে গেছ তুমি,” বলল রবার্ট।

“তোমার থাকার বিষয়টা পাকাপাকি না হওয়া পর্যন্ত আমি ভরসা পাচ্ছি না।”

আরও একটু হাসি। “তোমার প্যারিস ক্লাবে তো দেখছি রহস্যের ছড়াছড়ি।”

“একটু সতর্ক না হয়ে পারছি না, রবার্ট।” টেবিলে রাখা বইটার দিকে দেখাল সে। “আসল লেখাটা ছিল গ্রীক ভাষায়, যেটা সম্ভবত বিলুপ্ত হওয়া আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীতে ছিল। এরকম শত-সহস্র প্যাপিরাসের ক্রল এই লাইব্রেরীতেই জমা ছিল, কিন্তু পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে সেগুলো সব ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এটা সত্য যে নেপোলিয়ন এই লেখার একটা অনুলিপি তৈরি করিয়েছিল, তবে সেটা জার্মান ভাষায় না কোনোভাবেই। ঐ ভাষা সে জানতই না। সত্যি বলতে, বিদেশী ভাষাগুলোতে তার কোনো দখলই ছিল না। তাই, অন্য ভাষা ছেড়ে লেখাটাকে সে নিজের কর্সিকান ভাষায় লিখিয়ে নিয়েছিল। আর আরপর থেকে পাখুলিপিটা সে সব সময় নিজের কাছে রেখেছে, একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে। এভাবে চলল আঠারোশ পনের সাল পর্যন্ত। তারপর সেই সর্বনাশা লেইপজিন্স যুদ্ধের পর যখন নেপোলিয়নের সত্রাজ্যের প্রথম পতন শুরু হলো, তখন বাক্সটা ছাড়া হয়ে যায় তার। লোকে বলে যে নেপোলিয়ন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝুলেও ওটা আবার ফেরত পেতে মারিয়া ছিল কিছুকাল পরে, বাক্সটা একজন প্রশিয়ান অফিসারের হাতে পড়লে সে সেটা এক বন্দী ফরাসি জেনারেলের কাছে বিক্রি করে দেয়। সেই জেনারেল ভালো করেই চিনতে পারে যে এটার আসল মালিক কে ছিল। তো জেনারেল মনস্তির করলো যে এটা সে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেবে, কিন্তু তা করার আগেই সে মারা যায়। তৎকালীন ক্যাবিনেট পরে সিদ্ধান্ত নিল যে ওটা তাহলে নেপোলিয়নের দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে পৌছে দেওয়া হোক, এবং তা করাও হলো। রাণী মারিয়া লুইস অর্থাৎ নেপোলিয়নের দ্বিতীয় স্ত্রী, স্বামীকে জোরপূর্বক সেন্ট হেলেনা দ্বাপে নির্বাসন দেওয়ার সময় কিন্তু তার সাথে নির্বাসনে যায়নি। এরপর যখন আঠারোশ একুশ সালে নেপোলিয়ন মারা গেল, কিরচেনহফার নামের এক লোক দাবি করলো যে লেখাটাকে রাণী নিজেই তাকে দিয়েছে বই হিসেবে প্রকাশ করতে।”

বইটা মেলে ধরে খুব সাবধানে প্রথম লাইনগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল এলিজা।

“উৎসর্গটা দেখ। মহিমান্বিত, মাননীয়া ফ্রাসের সাবেক রাণীকে।”

এতে কিছু যায় আসে না জাতীয় একটা ভাব ম্যন্ট্রিয়ানির চোখে-মুখে।

“একটু নেড়েচেড়ে দেখবে না কি?” জিজেস করলো এলিজা।

“এটা দিয়ে কী কাজ হবে?”

“তোমার ভবিষ্যৎ জানতে পারবে

স্যাম কলিসকে নিয়ে ম্যালনের প্রাথমিক ধারণাটা ঠিক ছিল। বয়সটা ত্রিশের সামান্য বেশী, উদ্বিগ্ন মুখটায় সরলতা ও সংকল্প মিশে আছে একসাথে। লালচে-হলুদ রঙের পাতলা চুল ছেঁটে ছোট করে মাথার সাথে জট পাকিয়ে রাখা হয়েছে পালকের মতো। ছেলেটা অস্টেলিয়ান বা নিউজিল্যান্ডের হবে, কথার বাচনভঙ্গিতে এটা খুব ভালোই ধরতে পেরেছে ম্যালন। তবে শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠন, পুরোটাই অ্যামেরিকান ঢঙে। ছেলেটা একটু বেশিই অস্থির, সাথে বেশ ধৃষ্টতাপূর্ণ আত্মবিশ্বাসও আছে। ত্রিশের কোঠার বেশীরভাগ মানুষ যেমন হয় আরকি, ম্যালন নিজেও এই বয়সটা পার হয়েই এসেছে। সে জানে যে এই বয়সের লোকেরা চায় যে তাদেরকে যেন মাঝবয়সীদের মতো বিজ্ঞ মনে করা হয়।

সমস্যা একটাই।

তারা সবাই বাকি কুড়ি বছরের ভুলগুলো থেকে কিছু শেখার কথা চিন্তাও করেনি। ম্যালনেরও একই অবস্থা ছিল।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে স্যাম কলিস তার সিক্রেট সার্ভিসের চার্ল্স্টন হুঁড়েই ফেলে দিয়েছে, আর ম্যালন এটা বেশ ভালোই জানে যে যদি কেউ ~~নিয়া~~পত্তা শাখায় কোনো কাজে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে সাহায্য করার মতো কেউই ~~এন্সে~~আসে না।

আরও একটা কঠিন বাঁক নিল ম্যালনের মাজদাটি। পথে~~অ~~ এখন উপকূল ছেড়ে আরও গভীর আধাৰময় জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। এখানে থেকে শুরু করে সামনের কয়েক মাইল পর্যন্ত রাস্তা ও সাগরের মাঝের জায়গাকে ম্যালিক তার বন্ধু থ্রিভাল্সেন। চার একর জায়গা আছে এখানে ম্যালনের যেটা ~~স্টে~~ একরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে তার ডেনিশ বন্ধুটির কাছ থেকে পেয়েছে মাস কয়েক আগে।

“তুমি তাহলে বলছ না যে এই ডেনমার্কে তোমার কী কাজ? তাই তো?”
কলিসকে প্রশ্ন করলো ম্যালন।

“এগুলো কি থ্রিভাল্সেনের সাথে আলোচনা করা যায় না? আমি নিশ্চিত যে আপনার সব প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন।”

“এগুলোও কি হেনরিকের শিখিয়ে দেওয়া?”

একটু ইতস্তত করলো সে, তারপর বলল, “হ্যম, যদি প্রশ্নটা করেই থাকেন, তবে উত্তরটা এমনই দিতে বলেছেন তিনি।”

ম্যালন তাকে নিয়ে এমন সৃক্ষ ফাজলামো করাতে সে বেশ বিরক্ত হলো, তবে থ্রিভাল্সেন এমনই সে জানে। কিছু জানতে হলে সেটা নিজের কষ্ট করেই জেনে নিতে হবে। গাড়ির গতিটা কমিয়ে আনল সে। দুটো সাদা রঙের কটেজের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেল গাড়িটা, তার মানে ক্রিস্টিনাগেডে ঢোকার দরজাটা পার হয়েছে তারা। এই স্থাপনাগুলো চারশ বছরের পুরনো। শতকে থ্রিভাল্সেনের আদিপুরুষরা পচা পিট থেকে জ্বালানি উৎপাদনের দারুণ একটা উপায় বের করেছিল যেটা দিয়ে তারা

চমৎকার চিনামাটির বাসনপত্র বানানোর ব্যবসা শুরু করে। উনিশ শতকে অ্যাডেলগেট গ্লাসভেরকারকে রাজ পরিবারের একমাত্র বাসন সরবরাহকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নামটা এখনো ধরে রেখেছে তারা, এদের বানানো গ্লাস ও চিনামাটির তৈজসপত্র সারা ইউরোপ জুড়ে রাজত্ব করছে।

শীতে পাতা ঝরে যাওয়া গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে সমান সারিতে ম্যালন এগিয়ে চলেছে ঘাসে মোড়া পথের উপর দিয়ে। বিশাল খোলা জায়গার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে অসাধারণ কারুকার্য খচিত বিশাল ডেনিশ বাড়িটি। এটাকে জমিদারবাড়ির একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে। বেলেপাথর ও ইটের গাঁথনি তিন তলা ভবনের পুরোটা জুড়েই। ছান্দটা মোড়া পুরু তামার পাত দিয়ে, তিনের ঘরের ছাউনির মতো করে। একটা চালের মুখ সাগরের বিপরীতে ডাঙ্গার দিকে, আরেকটা সাগরের দিকে। কোনো জানালা থেকেই কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না। এতো রাতে যেমনটা থাকার কথা আরকি।

তবে, সামনের দরজাটা আধখোলা অবস্থায় পাওয়া গেল।

অস্বাভাবিক!

গাড়িটা পার্ক করে নামল ম্যালন। তারপর দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলেন্সে, হাতে বন্দুক।

পেছনে আসছে কলিস।

ভেতর থেকে উষ্ণ একটা বাতাস ভেসে এলো, সাথে এলেন সেন্দু টমেটো ও জলস্ত সিগারেটের গন্ধ। এগুলো বেশ পরিচিত ম্যালনের কাছে, শক্ত দুই বছরে অসংখ্যবার সে তুঁ মেরেছে এদিকটাতে।

“হেনরিক,” পেছন থেকে হাঁক দিয়ে উঠল কলিস।

ঝট করে পেছনে তাকাল ম্যালন, “তুমি কি মাথামোটা নাকি?” ফিসফিস করে বলল সে।

“আমরা যে এসেছি, সেটা তাদেরকে জানান দেব না?”

“তাদের বলতে কাদের বোঝাচ্ছো?”

“কিন্তু দরজাটা তো খোলা।”

“তা আমার হিসেবে আছে। এখন মুখ বন্ধ রাখ আর দেখ কী করি।”

চকচকে পাথরের মেঝের উপর দিয়ে খুব ধীরে এগুচ্ছে ম্যালন। শক্ত কাঠের দরজাটা পেরিয়ে করিডোর ধরে প্রশস্ত হলরুমের দিকে এগিয়ে গেল সে। একে-একে পার হয়ে গেল কাঁচের কনজারভেটরি ও বিলিয়ার্ড খেলার কক্ষ, তারপর নেমে গেল নিচতলায়। শীতের এক ফালি চাঁদের কল্যাণে যা একটু আলো আছে চারদিকে।

একটা জিনিস পরীক্ষা করতে হবে ম্যালনকে।

খুব সাবধানে আসবাবপত্রের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেল সে। তার মনোযোগ এখন বন্দুকের শেলফের দিকে। খুব দামি ম্যাপল কাঠের কাঠামোর মাঝে শোভা পায় নানান রকমের বন্দুক, রাইফেল। ঘরের পুরোটা জুড়েই ম্যাপল আর ম্যাপলে মোড়।

শেলফের সামনে পৌঁছানোর আগে থেকেই সে জানে যে ওখানে না হলেও এক ডজন শিকারের রাইফেল, একটা ক্রসবো, আর তিনটা খুনে অ্যাসল্ট রাইফেল আছে।

শেলফের কাঁচের ঢালু দরজাটা খোলা পড়ে আছে। ওদের মধ্য থেকে একটা অটোমেটিক রাইফেল উধাও, সাথে আরও দুটো শিকারের রাইফেলও নেই। একটা পিস্টল নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল ম্যালন। একটা ওয়েলবি টার্গেট রিভলবার-নীলচে আবরণ দেওয়া, ব্যারেলটা ছয় ইঞ্চি লম্বা। সে-জানে, এই অস্ট্রিটিকে থ্রিভাল্ডসেন কী পরিমাণ ভালবাসে। উনিশশ পঁয়তাঙ্গিশের পর আর বানানো হয়নি ওগুলো। একটা তেল পোড়া কটু গন্ধ নাকে এলো। বন্দুকের সিলিভারটা দেখে নিল সে। ছটা বুলেট, পুরো লোড করা আছে। থ্রিভাল্ডসেন কখনোই খালি বন্দুক সাজিয়ে রাখে না।

রিভলবারটা কলিসের হাতে দিল ম্যালন। চালাতে পার তো এটা? কোনো শব্দ না করে ঠোঁট নেড়ে জানতে চাইল সে।

তরুণ সঙ্গীটি মাথা নাড়ল। পারি।

সবচে কাছের দরজাটা দিয়ে ঘর থেকে বের হলো তারা।

এ বাড়ির নাড়ী-নক্ষত্র সব জানে বিধায়, ম্যালন দ্রুত আরেকটা করিডোর ধরে ছুটতে থাকল, থামল আরও কিছু করিডোর এসে মিশেছে এমন একটা চৌকাঠাম্ব।

দু'পাশের দরজার চৌকাঠগুলোর আকার ও একটা থেকে আরেকটার দ্রুত দেখে সহজেই বোঝা যায় যে দরজাগুলোর অপর প্রান্তে যে ঘরগুলো রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিশাল আকৃতির।

একেবারে শেষ প্রান্তে পেডিমেন্টেড প্রবেশ পথটা দেখত্ব যাচ্ছে, ত্রিভুজ আকৃতির একটা জায়গা ওটা, যেটা পেরুলেই প্রধান শোবার ঘর।

সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে ওঠাটা থ্রিভাল্ডসেনের প্রয়োগেরই অপচন্দ। তাই, সে বহুদিন ধরেই একেবারে নীচ তলায় থাকছে।

দরজাটার কাছে গিয়ে থামল ম্যালন, খুব ধীরে নবটা ঘোরাল সে, তারপর একেবারে নিঃশব্দে ঢালু কাঠের মসৃণ দরজাটা ভেতর দিকে ঠেলা দিল।

খুব ধীরে, ভেতরে চোখ দিল ম্যালন, হালকা আলোর বিপরীতে ঘরের সব আসবাবপত্রের আলাদা গঠন ও ছায়াগুলোকে খুব ভালো করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলো সে, ভারী পর্দাগুলো সরিয়ে রাখা হয়েছে। মেঝের মাঝখানে একটা কম্বল পেতে রাখা, যেটা পর্যন্ত পৌঁছাতে একেবারে ঠিকঠাক পাঁচবার পা ফেলতে হবে, অর্থাৎ পাঁচ পা দূরে। অনুসন্ধানী দৃষ্টিটা এবার গিয়ে পড়ল বিছানার উপর। একটু খেয়াল করতেই সে দেখতে পেল, নরম বিছানার একটা জায়গায় কারো শরীরের আকারের মতো একটা অংশ একটু দেবে আছে—তারমানে, এখানে আসলেই কেউ শুয়ে আছে।

কিন্তু কিছু একটা ঘাপলা আছে।

ডান দিক থেকে কিছু একটা আসছে; মুহূর্তেই সজাগ ম্যালন ঘুরে গেল সেদিকে।

দরজায় একজনকে দেখা গেল।

তীব্র আলোয় ভরে গেছে ঘরটা

একটা হাত উঁচু করে তীব্র আলো থেকে চোখ দুটো বাঁচাতে চাইল সে, ঠিক তখনই, শ্রুতিসেনের চোখে চোখ পড়ে গেল তার।

জেম্পারও এগিয়ে এলো কাছের ক্লোজেটের আড়াল থেকে, হাতের রাইফেল তাক করা তাদের দিকে।

ঠিক তখন, ম্যালনের চোখে পড়ল আরও কয়েকজনকে।

মোট দু'জন, বিছানা থেকেও খানিকটা দূরে, মেঝেতে পড়ে আছে।

“ওরা আমাকে নির্বোধ ভেবেছিল,” বলল শ্রুতিসেন।

যদিও কোনো ফাঁদে পা দিয়ে ধরা পড়াটা ম্যালনের পছন্দ না। আটকা পড়া ইঁদুরের কি আর আনন্দ আছে? “আমাকে এখানে আনার আদৌ কোনো কারণ আছে কি?”

হাতের অন্তর্টি নামাল শ্রুতিসেন। “তোমার তো কোনো খবরই নেই।”

“নিজের ব্যবসা নিয়ে ছিলাম আরকি।”

“হ্ম, জানি। স্টেফানির সাথে কথা হয়েছিল আমার, সব শুনেছি। যাই হোক, আমি দৃঢ়ঘিত, কটন। সব একেবারে বিছিরি অবস্থায় চলে গিয়েছিল।”

তাকে নিয়ে তার বন্ধুর এমন উৎকর্ষাকে ম্যালন শ্রদ্ধা জানাল। “নং^{ট্রিপ্ল} আছে, সব তো মিটেই গেল।”

ডেনিশ বন্ধুটি তার বিছানায় বসে পড়ল, তারপর একটানে চুম্বক সরাতেই শুধু বালিশগুলো বেরিয়ে পড়ল।

“তবে দুঃখের কথা হলো যে এই ধরণের ল্যাঠা কখনো চুকে যায় না।”

মৃতদেহ দুটোর দিকে ঘুরে তাকাল ম্যালন। “নং দু'জনই তো আমার বইয়ের দোকানে হামলা করেছিল, তাই না?”

মাথা নেড়ে সায় দিল শ্রুতিসেন, আর তখন তার চোখের দীর্ঘ ক্লান্তি ধরা পড়ল ম্যালনের চোখে।

“আমার দুই দুটো বছর চলে গেছে, কটন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি আমার ছেলের খুনিদেরকে খুঁজে পেয়েছি।”

দশ

“নেপোলিয়ন দৈববাণী, তারপর ভবিষ্যৎবাণী এগুলোতে খুব বিশ্বাস করত,” এলিজা বলল তার আকাশপথের এই সঙ্গীকে। “বিশ্বাসটা এসেছিল তার কর্সিকান শেকড় থেকেই, তার বাবা একবার তাকে বলেছিল যে ভাগ্য এবং নিয়তি আকাশে লেখা থাকে। আমার মনে হয়, ঠিকই আছে তার কথা।”

ম্যান্ত্রিয়ানিকে টানল না কথাটা।

কিন্তু মেয়েটা তো আর হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী না।

“নেপোলিয়নের প্রথম স্তৰী জোসেফিন ছিল একজন ক্রেওল, মানে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে জন্ম নেওয়া সাদা চামড়ার ইউরোপীয়। তো, জোসেফিনের জন্ম ক্যারিবিয় দেশ মারটিনিকে জায়গাটা জাদুবিদ্যা আৰ ঐন্দ্ৰজালিক কাজ-কৰ্মেৰ তীৰ্থস্থান। ঐ দ্বীপ হেড়ে ফ্রাসে আসাৰ আগে সে তাৰ ভাগ্যটা গণনা কৱিয়ে নিয়েছিল। গণনায় বলা হয়েছিল যে জোসেফিনেৰ বিয়ে হবে অন্ন বয়সে, অসুখী হবে, বিধবাও হবে, এবং পৰবৰ্তীতে ফ্রাসেৰ রাণীৰ থেকেও মৰ্যাদাপূৰ্ণ হবে।” একটা বিৱতি নিল সে। “তাৰ বিয়ে হলো পনেৰ বছৰ বয়সে, চৰম অসুখী জীবন যাপন তাৰ, স্বামীও হারাল। আৰ শেষে, ঠিক কী বলব, রাণী না হলেও ফ্রাসেৰ জাতীয় বীৰ, সন্ত্রাট নেপোলিয়নেৰ স্তৰী হিসেবে সন্ত্রাঙ্গীৰ মৰ্যাদাটা ঠিকই পেয়েছিল।”

কাঁধ জোড়া একটু উঁচু কৱলো রবার্ট। “সেই পুৱনো স্বভাৱ ফৱাসিদেৱ মতো, কিছু হলেই অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি।”

“হয়তো বা। তবে আমাৰ মা কিন্তু সারাটা জীবন এই বইয়েৰ বাণীৰ ওপৱেই নিৰ্ভৰ কৱেছে। আৱে আমিও একসময় তোমাৰ মতোই ছিলাম, এসবে বিশ্বাস কৱতাম না। কিন্তু আমাৰ চোখ খুলে গেছে এখন।”

পাতলা বইটা মেলে ধৰল সে। “এখানে মোট বত্ৰিশটা প্ৰশ্ন আছে। একটা খুব সাধাৱণ আমি কি বুড়ো হওয়া পৰ্যন্ত বাঁচবো? রোগীটা কি সুস্থ হুৰে? আমাৰ কি কোনো শক্তি আছে? বাপ-দাদাৰ সম্পত্তি কি পাব? কিন্তু অন্য প্ৰশ্নগুলো বেশ নিৰ্দিষ্ট রকমেৰ একটুখানি সময় দিয়ে শুধু প্ৰশ্নটা নিজেৰ মতো কষে আজিয়ে নাও, দৱকাৰ হলে দু-একটা শব্দ পৱিবৰ্তন কৱে নিয়ে নিজেৰ শব্দগুলো ক্ষেত্ৰাও।” বইটা বাড়িয়ে দিল তাৰ সামনে। “একটা প্ৰশ্ন বেছে নাও, যেটাৰ উপৰ কৃষ্ণিতিমধ্যে জানো এমন কিছু আৰ দেখ এটাৰ ক্ষমতা।”

আবাৰো কাঁধটা ঝাঁকিয়ে চোখ দুটো পিটিপিট কৱলো রবার্ট, যেন কোনো সন্তা বিনোদন!

“আৱে একবাৰ কৱেই দেখ না।”

হাৰ মানল তাৰ অতিথি, এবং প্ৰশ্নগুলোৰ ভেতৰ দিয়ে চোখ বুলাতে-বুলাতে একটায় এসে থামল। আঙুল দিয়ে দেখাল সে এলিজাকে। “এই যে, এটা। আমাৰ কি ছেলে হবে, না মেয়ে?”

এলিজা জানে যে সে গত বছৰ বিয়ে কৱেছে। বউ নাম্বাৰ তিন। বয়সে কুড়ি বছৰেৰ বড় তাৰ থেকে। আৱ যতদূৰ মনে পড়ে, মেয়েটা মৱেকোৱ।

“আমি জানি না কিছুই। সে কি সন্তান সংস্কাৰ?”

“দেখি, তোমাৰ এই দৈববাণী কী বলে?”

ক্র উঁচিয়ে সন্দেহ ভৱা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সে এলিজার দিকে।

এলিজা একটা নোটপ্যাড দিল রবার্টকে। “পেসিলটা নিয়ে এখানে এক সারি সোজা দাগ দাও, কমপক্ষে বারটা। হয়ে গেলে ওখানেই থেমে যাবে।”

অডুত চোখে তাকাল সে।

“এটা এভাবেই কাজ করে,” এলিজা বলল।
তার কথামতো কাগজে দাগ কাটতে লাগল সে।



“এবার আরও চারটি এরকম লাইন আঁক, তবে একটার নিচে আরেকটা। আগামাথা কিছু ভেব না, শুধু করে যাও যেমনটা বললাম।”

“এবারও কি বারোটা করেই আঁকিব?”

মাথাটা দোলাল এলিজা। “না, ইচ্ছেমতো।”

আবারো উলম্ব দাগের চারটা সারি এঁকে ফেলল সে। এলিজা দেখল চৃপচাপ।



“এবার প্রত্যেকটা সারির দাগগুলো গুনে ফেল। যদি জোড় সংখ্যা হয়, তাহলে পাশে দুইটা ডট দেবে। আর বেজোড় হলে একটা ডট একটু সময় নিয়ে হিসাবটা করে ফেলল সে, তারপর পাঁচটা সারির পাশে বিন্দুগুলো বসাল

•
•
••
••
••

ফলাফলটা ভালো করে দেখল এলিজা “দুটো বেজোড়, তিনটা জোড়। বেশ এলোমেলোই বলা চলে, নাকি?”

মাথা নাড়ল রবার্ট।

পৃষ্ঠা উল্টে বই থেকে একটা ছক বের করলেন এলিজা।

“আচ্ছা, তুমি যে প্রশ্নটা নিয়েছিলে সেগুলো বত্রিশ নম্বর সে একেবারে নিচের বত্রিশ নম্বর দেওয়া লাইনটা দেখাল ১৫ থানে দেখ, একেবারে উপরে ডটগুলোর মান

Digitized by srujanika@gmail.com

দেওয়া আছে। এখন তুমি যে কম্বিনেশনটা নিয়েছ, মানে দুটো বেজোড় আর তিনটা জোড়, সেটার মান বত্রিশ নম্বর প্রশ্নের জন্য হলো R।”

সে এবার পৃষ্ঠাগুলো উল্টাতে লাগল, তারপর একটায় এসে থামল যেটার উপরে বড় হাতের R লেখা।

“উত্তরমালার পৃষ্ঠাতেও একই কম্বিনেশন আছে। তোমার হলো দুটো বেজোড় আর তিনটে জোড়ের কম্বিনেশন। তাহলে, এই যে এটা, তিন নম্বর ভবিষ্যতবাণীটা তোমার, দেখ।”

বইটা নিয়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে পড়তে শুরু করলো রবার্ট, মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। “এতো অসাধারণ!”

একটু সম্প্রতির হাসি দেখা গেল এলিজার ঠোঁটের কোণে।

“একটা পুত্র সন্তানের জন্ম হবে, যে হবে তোমার হাজারো সমস্যার স্তুরণ, যদি কিনা সময়মত তাকে ঠিক না করে নেওয়া হয়। সত্যিই আমার একটা পুত্র সন্তান হতে চলেছে। আর এটাও সত্যি যে আমরা এটা জেনেছি মাত্র কয়েক দিন আগে। কিন্তু ওর একটা সমস্যা ধরা পড়েছে ওর মায়ের ও বাচ্চার স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়ে। ডাক্তার বলছে যে সমস্যাটা যদি জন্মের আগেই দূর না করা হয়, তাহলে দিপদ। বলা যায়, মা-ছেলে দু'জনেই ঝুঁকির মাঝে আছে। আমরা এটা এখনে রেফারেন্সে জানাইনি, আর এটার চিকিৎসা করানো নিয়ে এখনো সিদ্ধান্তে আসতে হোরিনি।” চোখে-মুখে সাময়িক ভর করা আতঙ্কটা কেটে গেল। “এটা কিভাবে সম্ভব?”

“ভাগ্যের লিখন।”

“আমি কি আরেকবার পরীক্ষা করতে পারি?” জিজ্ঞেস করলো সে।

না-স্বচক মাথা নাড়ল এলিজা। “এখানে সতর্ক করে দেওয়া আছে যে কোনো প্রশ্নকারী ঐ একই চান্দ্রমাসের একই দিনে দুটো প্রশ্ন করতে পারবে না। শুধু তাই না, প্রশ্ন চাঁদের আলোতে করা হলে উত্তরটা সঠিক হবার সম্ভাবনাও বেশী। এখন এখানে মাঝেরাত, যেহেতু পূর্ব দিকে যাচ্ছি, তাই কিছুক্ষণ পরেই সূর্যটা দেখা যাবে।”

“তার মানে আরও একটা দিন দ্রুতই এগিয়ে আসছে?”

হাসল মেয়েটা।

“না বলে পারছি না, এলিজা, আমি সত্যিই অবাক হয়েছি। আমার প্রশ্নের সম্ভাব্য বিকল্পটা উত্তর আছে এখানে। তারপরও হট করে আমি যেটা বেছে নিয়েছি, সেটাই একেবারে মিলে গেল।”

প্যাডটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টে নতুন আরেক পৃষ্ঠায় গেল এলিজা। “আমি এখনো আমারটা পরীক্ষা করিনি আজকে।”

সে বেছে নিল আটাশ নম্বর প্রশ্নটা।

আমি কি আমার নতুন কাজে সফল হব?

“তারমানে, এটা দিয়ে কি আমাকে বোঝানো হচ্ছে?” কষ্টটা স্পষ্টভাবেই কোমল হয়ে উঠল রবার্টের।

মাথা নাড়ল মেয়েটি। “আমি নিউ ইয়র্কে আসলামই তোমার সাথে দেখা করতে।” সমান্তরালে নামিয়ে আনল তার চোখ দুটো। “তুমি আমাদের দলে যোগ দিলে সেটা আসলেই অসাধারণ একটা ব্যাপার হবে। আমি সব সময়ই খুব বুবো-শুনে লোক বাছাই করি, আর তোমাকেও বুবোই নিশ্চি।”

“তুমি আসলেই একটা সীমার নির্দয় মহিলা। কম বলা হয়ে গেল—তুমি একই সাথে নিষ্ঠুর আর চক্রান্তকারী।”

কাঁধজোড়া একটু উঁচু করলো এলিজা। “দুনিয়াটা এক কঠিন জায়গা। তেলের দাম কোনো কারণ ছাড়াই, কোনো ঘোষণা ছাড়াই উঠছে-নামছে। মুদ্রাক্ষীতি বল, বা মন্দা, দুটোই খুব বাজেভাবে পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। সরকারের কথা আর নাই বললাম, আঙুল চোষার দল। তাদের সামনে তো পথ দুইটা, বেশী-বেশী টাকা ছাপা, এটা করলে মুদ্রাক্ষীতি, আর দ্বিতীয়টা হলো অর্থের পরে লাগাম টানা, এটায় আবার মন্দা আসে। তাহলে? আসলে কী, সব নিয়ে একটা সুন্দর সাম্যাবস্থা বলতে যা ছিল তা অতীতে, বর্তমানে-না। তবে আমার কাছে এমন এক উপায় আছে, যাতে এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।”

“কাজ হবে তো?”

“হবে, আমার বিশ্বাস।”

তার শ্যামবরণ মুখে ইস্পাতের মতো কাঠিন্য নেমে এসেছে।^১ কৌতুহলী চোখ দুটোয় অবশ্যে খেলা করছে চাতুরী। জগতের এইসব সংকট-বড়মনার কারণে এই কেটিপতি ব্যবসায়ীও এলিজা সহ আরও অনেকের মতে^২ ক্ষতিগ্রস্ত। একটা আঘূল পরিবর্তন দরকার এই পৃথিবীর। কিছু একটা করতেই হবে। আর সেটা তার সামনে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা মেয়েটার কাছে আছে হ্যাঙ্গে।

“দলে ঢোকার একটা ফি আছে,” বলল ~~এলিজা~~। “কুড়ি মিলিয়ন ইউরো, মাত্র।”

কাঁধ ঝাঁকাল সে। “তাতে সমস্যা ~~নেই~~^৩ কিন্তু তুমি নিশ্চিত যে এর থেকেও বেশী উঠে আসবে?”

মাথাটা নাড়ল এলিজা। “বিলিয়ন আসবে। কেউ দেখেওনি, ছোঁয়ওনি সেগুলো।”

ভবিষ্যতবাণীতে ভরা বইটার দিকে দেখাল রবার্ট। “ওটা শেষ কর, দেখি তোমার প্রশ্নের উত্তর কী আসে।”

চট করে পেসিলটা নিয়ে এলিজা দ্রুত হাত চালিয়ে পাঁচ সারি দাগ টেনে সেগুলো গুনে নিয়ে জোড়-বেজোড় সংখ্যাগুলো বের করে সেই অনুযায়ী ডট দিল। তারপর সেগুলোর মান বের হলো Q। তারপর উত্তর বের করতে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাটা বের করলো।

একটা আনন্দের হাসি খুব কষ্টে সামলে নিল মেয়েটা, যখন দেখল তার অতিথির সব ইন্দ্রিয়গুলো কেমন যেন উদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছে। “তুমি চাও যে আমি তোমায় পড়ে শেনাই?”

পলকেই মাথাটা নাড়ল সে।

“তোমার সহযোগীর মনোভাবটা খুব কঠিনভাবে পরীক্ষা করে নাও, যদি সেটা তোমার মতোই হয়, তাহলে ভয় নেই কোনো, এগিয়ে যাও। সুখ তোমাদের পায়ে এসে গুটাবে।”

“যেন এটা জানে যে আমাকে কী করতে হবে,” বলল রবার্ট।

চুপচাপ বসে আছে এলিজা, জেট ইঞ্জিনগুলোর গর্জন কমার অপেক্ষায় আছে। এই সন্দেহ ভরা ইটালিয়ান এইমাত্র যেটা শিখল, সেটা সে জ্ঞান হ্বার পর থেকেই শুনে আসছে। তার কর্সিকান মা আর নানী তাকে শিখিয়েছে, যে জ্ঞান সরাসরি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে আসে, সেই জ্ঞানই সবচে শক্তিশালী।

নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল ম্যান্স্রয়ানি।

দুটো হাত এক হতেই ঝাঁকুনি খেল, এলিজা অনুভব করলো যে তার হাতটা বেশ শক্ত ও একটু ঘেমে আছে।

“তুমি তোমার ইচ্ছেমত আমায় তোমার কাজে লাগাতে পার।”

কিন্তু মেয়েটি আরও কিছু জানতে চায়, “এখনো কি আমায় পছন্দ হলো না তোমার?”

“সে প্রশ্নের উত্তর না হয় ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা যাক।”

এগার

ম্যালন ভাবল যে প্লাজা দিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করে এলে ভালো লাগবে, সেই কথন আদালত বসেছে আর এখন দুপুর গড়িয়ে গেল, তবু মূলতবির নাম ক্ষুধা নেই পেটে, কিন্তু একটু তেষ্টা পেয়েছে। একটু দূরেই একটা ক্যাফে পড়ল তার। এবারের আইনি লড়াইটা তার জন্য সহজই বলা চলে শুধু ক্ষেত্রকান খোলা রাখতে হবে যেন মাদক চোরাকারবারি থেকে খুনিতে পরিণত হওয়া আসামীটি কোনো ঝামেলা ছাড়াই দোষী প্রমাণিত হয়। উত্তর মেঞ্চিকোতে অ্যামেজনার মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থায় চাকরী করা একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মাথার প্রেস্তুনে করে গুলি করে মেরেছে এই লোকটি, তাও হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকা অবস্থায় খুন হওয়া ভদ্রলোকটি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ড্যানি ডানিয়েলসের বন্ধু ছিল, তাই ওয়াশিংটন এ বিষয়টা খুব গুরুত্বের সাথে দেখছে বিচারিক কাজ চলছে এই চার দিন হলো, সম্ভবত আগামীকালই শেষ হবে। আইনজীবীরা বেশ ভালোই লড়ে চলেছে এখন পর্যন্ত। আসামীর দোষ প্রমাণ হয় এমন একগাদা নথিপত্র জমা পড়েছে। ম্যালনকে গোপনে এটাও বলা হয়েছে যে মেঞ্চিকোতে এই আসামীর সাথে বেশ কিছুদিম ধরে তার কিছু প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষমতার লড়াই চলছিল। গভীর জলের এমন দু-চারটে পরতোজীকে কাঠগড়ায় তোলা মানেই হলো অন্ন জলের চুনোপুঁটিদের পথের কাঁটা দূর হওয়া, বিষয়টা কোনো দিক দিয়েই মন্দ না

কাছেই কোথাও ঘটাঘর আছে, যেখান থেকে তাল-লয় বিহীন খুব বাজে রকমের শব্দ ভেসে আসছে, তবে সেটা এই মেঞ্চিকো সিটির হাজারো রকমের গুঞ্জনের কাছে

পানসে। ঘাসে ঢাকা প্লাজা ছুঁড়ে অনেক মানুষ বসে আছে—বেশীরভাগই ঝাঁকড়া দেওয়া গাছগুলোর নিচে। নানান রকম সবুজের সমারোহে চারপাশের কালচে বিভিন্নগুলোর কাঠখোটা ভাব অনেকটাই কমে গিয়েছে। নীল মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটা জলের ফোয়ারা তীব্র বেগে ফেনার মতো জল উপরে ছুঁড়ে মারছে গরম বাতাস তেদে করে।

টাস করে একটা শব্দ হলো। তারপর আরেকটা।

কালো স্কার্ট পরা চার্চের এক নান লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আরও দুটো শব্দ হলো।

আরেকজন নারী পড়ে গেল মাটিতে।

চিৎকার শুরু হয়েছে চারদিকে।

লোকজন যে যেদিকে পারছে ছুটছে, যেন আকাশ থেকে সবার উপর আক্রমণ করা হচ্ছে।

আরও কিছু ছোট-ছোট মেয়েদের দেখা গেল, গায়ে ধূসর পোশাক। তারপর আরও কিছু নান দেখা গেল। উজ্জ্বল রঙের স্কার্ট পরা নারী, কালচে বিজনেস স্যুট পরা পুরুষও।

সবাই ছুটছে শুধু

ম্যালন দ্রুত খুঁজতে লাগল হাঙ্গামার উৎসটাকে। খুব বেশীক্ষণ লাগল না পেতে। তার থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিটার দুরেই, সে দেখল দু'জনকে, বন্দুক হাতে। একজন হাঁটুতে ভর দিয়ে, অপরজন দাঁড়িয়ে, গুলি ছুঁড়ে সমানে।

আরও তিনজন পড়ে গেল মাটিতে

মুহূর্তেই জ্যাকেটের ভেতর হাত চালিয়ে বেনেস্টি^১ বের করে আনল ম্যালন। এখানে যতদিন আছে, এই অস্ত্রটা সাথে রাখায় মন্ত্রিকানদের কোনো আপত্তি নেই। চট করে ওটা তাক করেই দু'রাউণ্ড বুলেট ছুঁড়ল সে। দু'জনই পড়ে গেল কিছু বুরো ওঠার আগেই।

আরও কিছু মানুষ পড়ে থাকতে দেখল সে। কেউ কারো সাহায্যে এগিয়ে আসছে না, সবাই নিজের জান বাঁচাতে ব্যস্ত।

সবাই শুধু জানে যে দৌড়াতে হবে, তাই দৌড়াচ্ছে।

বন্দুকটা নামাল সে।

তখনই আরও একটা শব্দ হলো, সাথে-সাথেই ম্যালন টের পেল, তার কাঁধে কিছু একটা বিধেছে। প্রথমে কোনো অনুভব হয়নি ওখানে, তারপরই মনে হলো যেন সারা শরীরে বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে গেল, সাথে তীব্র যন্ত্রণা যেন মস্তিষ্কটাকে খেয়ে ফেলছে। মাথাটা ঘুরে উঠল।

গুলি লেগেছে তার।

সামনের মানুষগুলোর ভেতর থেকে একজনকে চোখে পড়ল, তবে খুব স্পষ্টভাবে না। কালো চুলগুলো কোঁকড়ান, মাথায় একটা পুরনো, দুর্মড়ে-মুচড়ে যাওয়া হ্যাট।

ব্যথা আরও তীব্র হচ্ছে। কাঁধ থেকে রক্ত আসছে স্নোতের মতো, শার্টের প্রায় পুরোটাই ভিজে গেছে। যে কাজে সে এসেছে, এখানে সেটা খুব কম ঝুঁকির একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল—অপরাধী আটক আছে, হাতে দোষী প্রমাণ করার পর্যাপ্ত উপকরণ। কিন্তু কিসব ঘটছে এখানে? রাগ হচ্ছে প্রচণ্ড, আর এই রাগই তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করছে এখন। তাকে আক্রমণ করা লোকটির চোখে নির্লজ্জ ভাব ফুটে উঠেছে, মুখে একটা ব্যাঙ্গাত্মক হাসি, মনে হচ্ছে যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যে বাকি কাজটুকু শেষ করবে, নাকি এই হৃড়োভূড়ির ভেতর পালিয়ে যাবে।

অবশ্যে প্রস্তানেই মুক্তি, ভাবল সে।

ম্যালন আর নিজের ভারসাম্য ধরে রাখতে পারছে না, তবু নিজের বাকি শক্তিটুকু এক করলো এবং ট্রিগারে চাপ দিল।

তার এখনো ঠিক করে মনে পড়ে না যে সে আসলেই গুলিটা চালাতে পেরেছিল কিনা। তাকে অবশ্য পরে বলা হয়েছিল যে তিন রাউন্ড গুলি করেছিল সে, যার মধ্যে দুটো তিন নম্বর আততায়ীর গায়ে লাগে।

সবশেষ হিসেব-সাতজন নিহত, নয়জন আহত।

সাই থ্রিভাল্সেন, ডেনিশ মিশনের একজন তরুণ কৃটনেতিক প্রতিষ্ঠানে এলেনা রেমিরেজ রিকো নামের এক মেঞ্জিকান আইনজীবী প্রাণ হারায় সেদিম প্লাজার এক গাছের নিচে বসে আয়েশ করে লাখও সারছিল তারা।

এই ঘটনার দশ সপ্তাহ পর একদিন মেরুদণ্ড বেঁকে যাওয়া এক ভদ্রলোক আসে আটলান্টায় তার সাথে দেখা করতে। ম্যালনের আস্তানায় বসে তারা। তবে ম্যালন আর এটা জিজেস করেনি যে হেনরিক থ্রিভাল্সেন তার ঠিকানাক্রিভাবে পেল।

“আমার ছেলের খুনিদেরকে যে মেরেছে আমি তার সাথে দেখা করতে চাই,”
থ্রিভাল্সেন বলল।

“কি কারণে, জানতে পারি?”

“ধন্যবাদ দিতে চাই।”

“ডেকে পাঠালেই হতো।”

“আমি জানি তুমি প্রায় মরতে বসেছিলে।”

কাঁধ বাঁকাল সে।

“আর এটাও জানি যে তুমি তোমার সরকারি চাকরিটা ছেড়ে দিছ। নিজেকে কমিশন থেকেও সরিয়ে নিছ মিলিটারি থেকে একেবারেই অবসরে চলে যাচ্ছ।”

“আপনি তো অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন

“জ্ঞান হলো সর্বশ্রেষ্ঠ উপভোগ্য বিষয়।”

ম্যালনের অতটা মনে ধরল না তাকে। “যা-ই হোক, সাবাস বলে পিঠ চাপড়ানোর জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু জানেন তো, আমার কাঁধটা ফুটো হয়ে গেছে গুলিতে। বেশী চাপড়ালে ওখানে ব্যথা পাব। তাই বলছি, আপনার তো কাজ শেষ, শান্তি পেলেন, এবার কি উঠবেন?”

ওঠার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না থ্রিভান্ডসেনের ভেতর। চুপচাপ বসে খিলান ঢাকা করিডোরের ভেতর দিয়ে চোখ বুলাচ্ছে চারদিকে। এমন কোনো দেওয়াল নেই যে সেটায় বইয়ের তাক ঝুলছে না। এটাকে বাড়ি না বলে বইয়ের তাকের জাদুঘর বলাই শ্রেয়।

“বই আমিও ভালবাসি,” তার অতিথি বলল। “সারাজীবন আমিও বই সংগ্রহ করেছি।”

“কী চাই সরাসরি বলুন তো?”

“ভবিষ্যতের কথা কিছু ভেবেছ?”

একটু নড়েচড়ে পুরো ঘরটা দেখল সে। “ভাবছিলাম, একটা পুরনো বইয়ের দোকান খুলবো। বেচার মতো আছে বেশকিছু।”

“চমৎকার পরিকল্পনা। আমারও একটা দোকান আছে বিক্রি করার মতো, যদি তোমার পছন্দ হয়।”

কিছুক্ষণ নাহয় লোকটার সাথে তাল মিলিয়ে দেখা যাক, ভাবল ম্যালন। তবে এই প্রবীণ অতিথির চোখে যেরকম দৃঢ়তা কাজ করছে, তাতে ম্যালন নিশ্চিত যে এ মানুষটা ফাজলামো করছে না। পেশীবহুল হাতটা স্যুটের পকেটের ভেতর থেকে একটা কার্ড বের করে আনল, তারপর সেটা সোফার উপর রাখল। থ্রিভান্ডসেনের বিজনেস কার্ড ওটা।

“আমার ব্যক্তিগত নাম্বার আছে এখানে যদি ইচ্ছা হয় কোল দিও

ঘটনাটা দু'বছর আগের। আর এখন সে তাকিয়ে আছে হেনরিক থ্রিভান্ডসেন নামের সেই মানুষটির দিকে। তারা এখন আগের থেকে অনেক বেশী কাছের। তবে তাদের ভূমিকাটা উল্টে গেছে শুধু। তার এই বন্ধনটি এখন সমস্যায় পড়েছে

থ্রিভান্ডসেন এখনো তার বিছানায় সোজা হয়ে বসে আছে, কোলের উপর অ্যাসল রাইফেল, চোখে-মুখে চরম পরাজয়ের চাপ।

“মেঞ্জিকো সিটি সেন্টারের সেই ঘটনাটা স্বপ্নে দেখছিলাম আমি,” ম্যালন বলল “একই ঘটনা বারবার দেখি। দেখি যে তৃতীয়বার আমি আর গুলি চালাতে পারছি না, মানে এই তিনি নম্বর বদমাশটাকে।”

“কিন্তু তুমি তো পেরেছিলে।”

“কী জানি, কোনো কারণে হয়তো আমি সেটা স্বপ্নে দেখতে পাই না।”

“তুমি ঠিক আছ তো?” থ্রিভান্ডসেন জিজ্ঞেষ করলো স্যাম কলিসকে

“আমি সোজা গেলাম মিস্টার ম্যালনের-”

“ওটা বলতে হবে না,” বলল হেনরিক। “কটন নামেই ডাক।”

“আচ্ছা তো পৌছালাম। তারপর কটন ওদেরকে সামলাল।”

“আর আমার দোকানের আবারও বারোটা বাজলো।”

“ছাড়ো, ওটার তো বীমা করা আছে,” থ্রিভান্ডসেন পরিষ্কার করলো বিষয়টা।

তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে ম্যালন। “আচ্ছা, তো ওরা স্যামের পেছনে লাগল কেন?”

“আমি ভেবেছিলাম যে ওরা ওটা করবে না। পরিকল্পনাটা এমন ছিল যে ওরা আমার কাছে আসবে। এইজন্যই তো আমি স্যামকে শহরে পাঠিয়েছিলাম। বোঝা যাচ্ছে যে ওরা আসলে আমার থেকেও ভালো খেলেছে।”

“তোমার ঘটনা কী, বল তো? কী কাজে হাত দিয়েছ তুমি?”

“গত দুই বছর আমি শুধু খুঁজেছি আর খুঁজেছি। আমি জানতাম যে মেঞ্জিকোতে সেদিন যা হয়েছিল, এর বাইরেও আরও ঘটনা আছে। ওটা কোনো সন্তানী হামলা ছিল না, ওটা ছিল পরিকল্পনামাফিক হত্যাকাণ্ড।”

আরও জানার জন্য অপেক্ষা করছে ম্যালন।

স্যামের দিকে দেখাল থ্রিভান্ডসেন। “এই ছেলেটা বেশ বুদ্ধিমান। এ যে কতটা স্মার্ট, সেটা এর উপরের লোকজন বুঝতে পারেনি।”

ম্যালন লক্ষ্য করলো, তার বন্ধুর চোখের কোণে অশ্রু জমেছে, এমনটা সে আগে কখনো দেখেনি।

“খুব মনে পড়ে ওকে, খুব,” নিচু স্বরে বলল থ্রিভান্ডসেন, এখনো তাকিয়ে আছে স্যামের দিকে। একটা হাত সে রাখল তার বন্ধুর কাঁধে।

“কেন মরতে হলো তাকে?” কান্না জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলো থ্রিভান্ডসেন।

“তুমই বল,” বলল ম্যালন। “সাই কেন মারা গেল?”

▲

আজ কেমন আছ বাবা তুমি?

যদিও তার ছেলেটা এখন আর ছোটটি নেই, এখন সে পঁয়জিশে বছরের এক যুবক, ডেনমার্কের বিশেষ কৃটনৈতিক শাখার একজন সদস্য, তবে থ্রিভান্ডসেন এখনো প্রতি সঙ্গাহেই মুখিয়ে থাকে তার একমাত্র ছেলের ফোনের জ্ঞান। আর এখনো তার ছেলের মুখে বাবা ডাক শোনার জন্য প্রতিক্ষা করে সে।

“এতো বড় বাড়িতে একা লাগে খুব, তবে জেস্পারের অনেকটাই মাত্রিয়ে রাখে। ও এখন বাগানে, ডালপালা ছেঁটে দিচ্ছে। ওর সাথে এটা নিয়ে প্রায়ই তর্ক হয়, আমি বলেছি যে সুযোগ পেলেই ছাঁটতে হবে এম্বেটিংথা আছে? কিন্তু সে শোনার পাত্র না। একটা একগুঁয়ে লোক, বুঝলে।”

“কিন্তু বাবা, জেস্পারের কাজ কিন্তু ঠিক হয় সব সময়। আর এটা তো অনেক আগে থেকেই আমরা জানি, তাই না?”

শব্দ করে হাসল সে। “বটে, তবে এ কথা কিন্তু আমি ওকে কখনোই বলব না। যাকগে, এখন বল, ভিনদেশে কেমন লাগছে?”

মেঞ্জিকো সিটিতে অবস্থিত ডেনমার্কের কনস্যুলেটের হয়ে কাজ করার জন্য আবেদন করেছিল সাই, আর সেটা গ্রহণও করেছে ওরা। ছোটবেলা থেকেই তার

অ্যাজটেক সভ্যতার প্রতি প্রবল আগ্রহ। যখনই সময় পেত সে, তখনই বহু পুরনো এই সভ্যতার উপর পড়াশুনা করতে বসে যেত, অনেক উপভোগ করত সে এটা।

“মেঞ্জিকো একটা অদ্ভুত জায়গা। যেমন অস্থির, তেমন গোলমেলে আর নোংরা। আবার অন্য দিকে অসাধারণ, রোমাঞ্চকর এবং রোমাঞ্চিকও। এখানে এলাম বলে আমি খুশি।”

আর এই মেয়েটার ব্যাপারে কিছু বলবে না?”

হ্যামি, এলেনা আসলেই চমৎকার।”

এলেনা রেমিরেজ রিকো কাজ করে মেঞ্জিকো সিটির ফেডারেল প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের বিশেষ গোয়েন্দা শাখায়। এগুলো নিয়ে সাই দু-একটা কথা বলেছে তার বাবাকে, তবে আরও বেশী বলেছে এলেনাকে নিয়ে। ঘটনা যা তাতে বোৰা যাচ্ছে যে সাই বেশ ডুবে আছে এলেনার মাঝে।

“তুমি তো মেয়েটাকে বেড়াতে নিয়ে আসতে পার এখানে।”

“হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম তো, সামনের ক্রিসমাসে আসতে পারে।”

“তাহলে তো দারুণ হয়। ডেনিশরা যেভাবে ক্রিসমাস পালন করে, সেটা ওর খুব ভালো লাগবে, কিন্তু কথা হলো, এখানকার আবহাওয়ায় ওর একটু প্রভৃত্যা হতে পারে।”

“বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দর্শন ঘূরিয়ে দেখিয়েছে আমজকে, ওদের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে ওর বিশাল জ্ঞান।”

“মনে হচ্ছে যেন ওর প্রেমে পড়ে গেছ।”

“ইয়ে, মানে... হ্যাঁ, বাবা। ওকে দেখলে যাবে কথা মনে পড়ে যায়। ওর আন্তরিকতা, ওর হাসি, সব-ই।”

“বুঝেছি সোনা, তাহলে আসলেই ও চমৎকার মেয়ে।”

“এলেনা রেমিরেজ রিকো,” থ্রিভাল্ডসেন বলল, “যুক্ত ছিল সংস্কৃতি-বিষয়ক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ শাখার সাথে। মূলত দেশের মূল্যবান শিল্প চোরদের নিয়েই কাজ ছিল ওর। মেঞ্জিকোতে এটা কোটি টাকার ব্যবসা। এই কারবারে যুক্ত দু'জন ঘায় লোককে সে প্রায় দোষী প্রমাণ করেই ফেলেছিল। একজন স্প্যানিশ, আরেকজন ব্রিটিশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাবার আগেই ওকে মেরে ফেলল।”

“আমি একটা জিনিস ঠিক বুঝতে পারছি না—এলেনার মৃত্যুতে কাজটা তো আর থেমে থাকার কথা না, তাই না?” জিজেস করলো ম্যালন। “অন্য কোনো প্রসিকিউটরকে নিয়েগ দিলেই হতো।”

“দেওয়া হয়েছিল একজনকে, তবে সে এদের পেছনে ছুটতে চায়নি, বা পারেনি। তাই আরকি, সব অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় লোক দুটো নাগালের বাইরে চলে যায়।” থ্রিভাল্ডসেন খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ম্যালনকে দেখছে। সে বুঝতে পারছে যে তার এই বন্ধুটি বুঝে নিয়েছে সে কী বলতে চায়।

“আচ্ছা, এবার বল, যাদের বিরুদ্ধে লড়ছিল যেয়েটা, তাদের নাম কী?” জিজ্ঞেস করলো ম্যালন।

“স্প্যানিশ যে তার নাম অ্যামান্দো ক্যাব্রাল। আর ব্রিটিশটার লর্ড গ্রাহাম অ্যাশবি।”

বারো কর্সিকা

সোফায় বসে রাম উপভোগ করছে অ্যাশবি। তার সামনে বসে আছে কর্সিকান লোকটা, আর্কিমিডিসের পিঠে চড়ে এগিয়ে যাচ্ছে তারা পূর্ব দিকের কেপ করসের পাথুরে উপকূলের দিকে।

“ঈ চার জার্মান পথওম লোকটির কিছু একটা রেখে গিয়েছিল,” মুখ ঝুলন অ্যাশবি। “এটা নিয়েও গুজবের শেষ নেই। তবে আমি অবশ্যে জানতে পেরেছি যে এটা সত্যি।”

“হ্যাঁ, তথ্যটা আমিই কয়েক মাস আগে দিয়েছিলাম। তাই একটু ধন্যবাদ পেতেই পারি।”

মাথা নাড়ুল সে “তা ঠিক। তুমি এই হারানো অংশটি খেঁজার দায়িত্ব ভালোই পালন করেছ আর সে জন্যই আমি নিজ থেকেই এগিয়ে এসে তোমায় প্রস্তাবটা করেছি, সাথে যা পাব তার একটা অংশ তোমায় দেওয়া হবে; আর সেটা কত পরিমাণ, সেটা নিয়েও খোলামেলা কথা বলেছি। তুমি রাজীও হয়েছিলে।”

“হয়েছিলাম, কিন্তু আমরা এখনো কিছুই পাইনি। তাহলে আর এতো কথার কী দরকার? আমাকে আটকে রেখেছেন কেন?”

“আটকে রেখেছি? তা মনে হয় না। আমরা তো শুধু ছোট্ট একটা ভ্রমণে বেরিয়েছি; দুই বন্ধু, একটু আরাম করছি।”

“বন্ধু কখনো আরেক বন্ধুকে এইভাবে অপদন্ত করে না, মেরে ফেলতে চায় না।”

“তারা তো একজন আরেকজনকে মিথ্যেও বলে না, কি বল?”

অ্যাশবি বছরখানেক আগে জানতে পারে যে পথওম লোকটির সাথে এই কর্সিকানের কোনোরকম যোগাযোগ আছে। তখনই এর সাথে দেখা করে ও। উনিশশ তেচান্ত্রিশ সালের সেপ্টেম্বরে চার জার্মানের সেই ঘটনার সাথে এই পাঁচ নম্বর লোকটিও ছিল। কিংবদন্তী বলে, সেই চার জার্মানকে হিটলার মেরে ফেলার আগেই, ওদের মধ্য থেকে একজন সোনার বাঙ্গালো গোপন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে সেটার অবস্থানটা খুব চড়া দামে বিক্রি করতে চাইছিল হিটলারের বাহিনীর কাছে। কিন্তু কপাল মন্দ, হিটলারের নাজি বাহিনী এটার উপর কোনো আগ্রহ দেখায়নি, আর দেখালেও সেটা অন্তত বিশ্বাসের সাথে না। তার সামনে বসে থাকা এই কর্সিকানটা প্রাণপণ চেষ্টা করছে যে সেই সোনার হরিপটা এখান থেকে কোন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটা খুঁজে

বের করতে। আর এই পরিশ্রমের আগনে ঘি পড়েছে যখন সেই হতভাগ্য জার্মানটার একটা বই এই কর্সিকানের হাতে এসে পড়েছে। বইটা ছিল নেপোলিয়নের সাদামাটা বইয়ের মধ্যে একটা যেটা ঘটনাক্রমে সেই জার্মানটার হাতে এসে পড়েছিল যখন সে ইটালিতে বন্দী ছিল, আর সেখান থেকে কয়েক হাত ঘুরে বইটা এখন এই মিথ্যক কর্সিকানের হাতে।

“সেই লোকটা,” অ্যাশবি বলল, “মুরস নটের পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিল।” টেবিলের দিকে দেখাল সে। “তাই সে ঐ চিঠিগুলো লিখেছিল। আর চিঠিগুলো যার কাছে পাঠানো হয়েছিল-মানে তোমার পাঁচ নম্বর লোকটি-ঠিকই সেগুলো যুদ্ধের পর বাজেয়াণ হয়ে যাওয়া জার্মান আর্কাইভ থেকে খুঁজে-খুঁজে বের করে নিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, যে বইয়ের ভেতর নির্দেশনা থাকতে পারে, সেই বইয়ের নামটা সে কখনোই জানতে পারেনি। অবাক হলাম এই দেখে যে তুমি অসাধ্যটা সাধন করে ফেলেছ। শেষবার যখন আমাদের দেখা হলো, তখনই চিঠিগুলো আমি তোমাকে দিয়েছি। তোমার উপর যে আমার বিশ্বাস আছে, তা এতেই প্রমাণ হয়ে যায়। কিন্তু তুমি আসল বইয়ের নামটার ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলনি।”

“কে বলল যে আমি জানি?”

“গুস্তাভ।”

কথাটা শুনে লোকটা যেন চমকে উঠল।

“তুমি কি ওর গায়ে হাত তুলেছ?” জিজ্ঞেস করলো কর্সিকান্টা।

“সে তথ্য দিয়েছে, আমি সে জন্য তাকে পারিষাক্ষীক দিয়েছি। গুস্তাভ বেশ সদালাপী, আর ওর আশাবাদী ভাবটাও বেশ তীব্র, এসে সাথে কথা বললে যে কেউই আশাবাদী হয়ে উঠবে, আমার ভালো লেগেছে। আজও ওর অবস্থাও ফিরে গেছে এখন, বেশ টাকার মালিক সে।”

বন্ধুর এমন বেঙ্গানিটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে তার, অ্যাশবি স্পষ্ট বুঝতে পারল

মিস্টার গিল্ডহল স্যালুনে ঢুকে মাথাটা নেড়ে একটা সংকেত দিল। অ্যাশবি জানে এটার অর্থ কী-প্রায় পৌঁছে গেছে তারা। ইঞ্জিনের গর্জন কমে আসছে, সাথে নৌকার গতিও। ইশারা করতেই তার সহকারীটা চলে গেল।

“আর যদি আমি এই মুরস নটের অর্থ বের করতে পারি, তো?” জিজ্ঞেস করলো কর্সিকান্টা, বিন্দুগুলো প্রায় মিলিয়ে ফেলেছে সে।

“তাহলে আর কী, তুমিও লালে লাল হয়ে যাবে, টাকা আর টাকা

“কত টাকা?”

“এক মিলিয়ন ইউরো, কড়কড়ে নোটের দশ লাখ।”

হাসল কর্সিকান্টা। “গুপ্তধনটা আর না হলেও ঐ টাকার থেকে একশ গুন বেশী দামের।”

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অ্যাশবি। “যদি কিনা তা পাওয়া যায়। এমনকি তুমিও
স্বীকার করবে যে পুরোটাই একটা গুজব হতে পারে।”

কয়েক পা এগিয়ে কালো রঙের ব্যাগটা হাতে নিল অ্যাশবি। তারপর আবার ফিরে
এসে ওটা উপুড় করে ধরল সোফার ওপর।

বান্ডেল-বান্ডেল ইউরো বেরিয়ে এলো।

বসে থাকা মানুষটার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল এটা দেখে।

“পুরো দশ লাখ। সব তোমার। আর কোনো দিন তোমার পেছনে লাগব না।”

কর্সিকান দ্রুত একটু ঝুকে গিয়ে বইটা বন্ধ করে দিল। “আপনার মতো এভাবে
আর কেউ বশ করতে পারেনি আমায়, লর্ড অ্যাশবি।”

“আসলে, প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ একটা দাম থাকে। সে পর্যন্ত পৌঁছানো নিয়েই
কথা।”

“এই রোমান সংখ্যাগুলো বেশ পরিষ্কার। একেবারে উপরের সারিটা হলো পৃষ্ঠা
নাম্বার। মাঝের সারি লাইন নাম্বার। আর শেষের সারিটা দিয়ে বোঝাচ্ছে শব্দের
অবস্থান। আড়াআড়ি করে একসারি-একসারি শব্দ নিয়ে দেখতে হবে।

XCV CXXXXVI CXIXIII CXCV ময়ো॥

IV XXXI XXVI XVIII IX
VII VI X II XI

অ্যাশবি দেখল, কর্সিকানটা সংখ্যা দেখে-দেখে পুরনো বইটার ভেতর দিয়ে হাত
চালাচ্ছে, প্রথমে সঠিক পৃষ্ঠাটা পাওয়া গেল ৯৫, লাইন পাওয়া গেল ৪, আর সব শেষে,
শব্দের সংখ্যা পাওয়া গেল ৭ “Santa। কিছু বোঝা যাবে না। কিন্তু এর পরে যখন
আরও দুটো শব্দ বসানো হচ্ছে, তখন পাচ্ছি Santa Maria Tower।”

এই পদ্ধতি আরও চারবার প্রয়োগ করা হলো।

Santa Maria Tower, convent, cemetery, marker, Ménéval.

অ্যাশবি দেখল তাকিয়ে, তারপর বলল, “একেবারে সঠিক বইটাই বেছেনেওয়া
হয়েছে। নেপোলিয়ন যখন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত, সেই সময়ের স্টোন নিয়ে
লেখা বইটা। কর্সিকায় থাকাকালীন সময়েরও কিছু বর্ণনা আছে এতে আশা করি যে
সবগুলো সঠিক শব্দই ওটাতে পাওয়া যাবে। আসলেই জার্মানটার শুধু তারিফ করতে
হয়।”

হেলান দিল কর্সিকান লোকটা। “তার এই বার্তাটা মুক্তি বহুর ধরে লুকায়িত ছিল।
আর এখন সেটা আমাদের হাতে

মুহূর্তটা আরও একটু মধুর করতে একটা হাসি দিল সে।

ইউরোগুলো হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে কর্সিকানটা। “আমি বেশ কৌতুহলী,
লর্ড অ্যাশবি। আমি ঠিক বুঝে উঠে পারছি না যে আপনার এতো ধন-দৌলত
থাকতেও, কেন এই অনিশ্চিত গুণ্ডানের পেছনে ছুটছেন?”

“এমনটা কেন মনে হলো তোমার?”

“আপনি শুধু বুঁজে পাওয়ার আনন্দটুকু পাওয়ার জন্যই করেন, তাই না?”

নিজের সাবধানী পরিকল্পনাটার কথা এক মুহূর্ত ভেবে নিল সে। খুব হিসাব করে পা ফেলতে হবে, কুঁকি নেওয়া চলবে না। “ঐরকমই, হারানো জিনিসের প্রতি আমার একটা টান আছে।”

বিরাট প্রমোদতরীটা অবশেষে থামল একটা জায়গায়।

“আমি এগুলো করি,” বলল কর্সিকান, একটা বাস্তিল উঁচু করে ধরে, “স্রেফ টাকার জন্য। আমার এতো বড় জাহাজেরও দরকার নেই।”

দক্ষিণের সুদূর সেই ফ্রাঙ্গ থেকে এখানে রওনা হওয়ার আগে থেকেই অ্যাশবির মাথায় যে দুশ্চিন্তাটা ছিল, সেটা এখন দূর হয়ে গিয়েছে। তার লক্ষ্যটা এখন সে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে। সে এখন শুধু ভাবছে যে পুরক্ষারটা সব ঝামেলা, সব খরচ থেকে বড় হলৈ হয়। হারানো জিনিস খোঁজার এই একটা বিপদ। কখনো-কখনো সমাপ্তিটা ন্যায্য পাওনাটুকু থেকে বর্ষিত করে।

তার বড় একটা উদাহরণ এখানেই।

কেউই জানে না যে ঐ ছয়টা বাস্তি আসলেই তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কিনা। আর যদি করেও, ওগুলোর ভেতর আছেই বা কী? হতেও পারে কৃপোর কিছু জিনিসপত্র, আর সামান্য কিছু সোনার গয়নাগাঢ়ি। নাজি বাহিনী তেওঁ আর নিশ্চিত না যে মুক্তিপণ হিসেবে যা দেওয়া হয়েছিল তার মূল্য আসলেই কতটুকু।

তবে অ্যাশবি চায় না, ওগুলোর ভেতর ছাইপাশ প্রাকৃক। কর্সিকানটা একটা বোকা। সে এটার মূল্য কতটুকুই বুঝবে? কথা হলো, ওগুলো অ্যাশবির চাই-ই চাই।

“আমরা এখন কোথায়?” অবশেষে জিজ্ঞেস করে লেগুনে কর্সিকান।

“ডাঙা থেকে খানিক দূরে, উত্তর ম্যাসিনাঙ্গুর *Site Naturel de la Capandula* তে।”

বাস্তিয়া থেকেও কেপ করসে আরও বেশী পরিমাণ ওয়াচটাওয়ার রয়েছে, আরও আছে খালি পড়ে থাকা মঠ, আর মধ্যযুগীয় কিছু চার্চ। একেবারে উভয়ের জাতীয় বনভূমি অঞ্চল, অন্ন কিছু রাস্তা আর শুটিকয়েক মানুষের বাস সেখানে। শঙ্খচিল আর করমর্যান্টরাই শুধু দাবি করতে পারে যে এটা তাদের এলাকা। এলাকাটার ভৌগলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অ্যাশবি খোঁজ-খবর নিয়েছে। ওখানে একটা তিন তলা উঁচু পরিত্যক্ত বিল্ডিং আছে, নাম, *Tour de Santa Maria*। উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরেই একেবারে জলের মাঝে ভয় দশায় দাঁড়িয়ে আছে ভবনটা। ঘোলশ শতকে জেনোয়ানরা ওটা বানিয়েছিল যেন ওখান থেকে সমুদ্রের উপর নজর রাখা যায়। *Chapelle Santa Maria* নামে একটা মঠও আছে এখানে, আর সেটায় পৌছানোর জন্য একটা আলাদা রাস্তা আছে। এগারশ শতকে গড়া এই পরিত্যক্ত মঠটা এখন পর্যটকদের কাছে দর্শনীয় স্থান।

Santa Maria Tower, convent, cemetery, marker, Ménéval.

ঘড়িতে সময়টা দেখে নিল সে ।

এখনো কিছুক্ষণ বাকি ।

আরও কিছুটা প্রতিক্ষা ।

কর্সিকানের দিকে ফিরল সে । “আরাম করে পান কর । ছোট একটা মৌকা অপেক্ষা করছে, তোমার গ্লাসটা খালি হলেই আমরা ওটায় চড়ে পাড়ে গিয়ে নামবো । এখন রোমেলের সোনা খুঁজে বের করার পালা ।”

তের ডেনমার্ক

শুরু দুশ্চিন্তা নিয়ে থ্রিভান্ডসেনের দিকে চেয়ে আছে স্যাম । ঠিক এই মুহূর্তে তার সিক্রেট সার্ভিসে থাকাকালীন সময়ের এক প্রশিক্ষকের কথা মনে পড়ছে-কাউকে খুঁচিয়ে দিলে সে তখন চিন্তা করে, আর কাউকে রাণিয়ে দিলে সে সব পণ্ড করে দেয় ।

আর এখন থ্রিভান্ডসেন রেগেই আছে । ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার ধারে-কাছেও নেই সে ।

“আজ রাতে তুমি দুঁজনকে মেরেছ,” পরিষ্কারভাবে বলল ম্যালন

“আমরা আগেই জানতাম যে এই রাতটা আসবে ।” উত্তর দিল থ্রিভান্ডসেন ।

“আমরা বলতে?”

“জেস্পার আর আমি ।”

স্যাম দৃষ্টি দিল জেস্পারের উপর, -দেখল সে কিন্তু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে-মুখে সম্মতি ।

“আমরা আসলে অপেক্ষায় ছিলাম,” বলল থ্রিভান্ডসেন । “গত সপ্তাহে তোমার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম আমি, কিন্তু তুমি কোথায় যেন গিয়েছিলে । স্বত্ত্ব পেলাম যে তুমি সময়মত এসেছ । স্যামকে আগলে রাখার দায়িত্ব আমি তোমার উপর দিতে চেয়েছিলাম ।”

“হ্ম, এখন বল যে ক্যান্ডাল এবং অ্যাশবি সম্পর্কে জানলে কিভাবে?” জিজেস করলো ম্যালন ।

“গোয়েন্দা লাগানো হয়েছিল তাদের পেছনে, দুই বছর কাজ করেছে তারা ।”

“কই, আগে তো কোনো দিন বলনি এসব ।”

“বিষয়টা নিয়ে তোমার বা আমার মাথা ঘামানোর মতো কিছু ছিল না ।”

“তুমি আমার বন্ধু, সেই হিসেবেও তো আমায় একটু বলতে পারতে ।”

“হ্ম, তা হয়তো ঠিক বলেছ, কিন্তু বিষয়টা যেহেতু আমিই শুরু করেছি, আমি আমার মতো করেই এগুচ্ছিলাম, তাই আরকি...তোমায় এতে জড়িয়ে তোমার দুশ্চিন্তা বাড়াতে চাইনি । কয়েক মাস আগে আমি জানতে পারলাম যে অ্যাশবি ঘৃষ দিয়ে এলেনা রিকোর মুখ বন্ধ করাতে জোর চেষ্টা করছিলো । কিন্তু যখন দেখল, এতে কাজ হলো না,

তখন ক্যাব্রাল লোক ভাড়া করলো এলেনাকে মারার জন্য। কিন্তু পুরো ঘটনাকে অন্য খাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার ছেলে সাই সহ আরও কয়েকজনকে মারল ওরা, যেন এটা সন্তাসীদের কোনো আক্রমণ-বিচ্ছিন্নতাবাদী বা উৎপন্নীরা যেমন করে থাকে।”

“তাহলে তো সেই রকমের ব্যাপার!”

“তো এই ঘটনায় রিকোর জায়গায় যে এই কেসটা লড়তে এসেছিল, সে পরিষ্কার একটা সতর্কবার্তা পেয়ে গেল। আর তাতে কাজও হলো। প্রাণের ভয় কেউ না কেউ তো করবেই, তাই না? সে আর রিকোর পথে হাঁটল না, খুব সহজেই বিক্রি হয়ে গেল অ্যাশবিদের কাছে।”

শুনে যাচ্ছে স্যাম, অবাক হয়ে ভাবছে, তার জীবনটা হঠাতে করে কতটা বদলে গেল। মাত্র দুই সপ্তাহ আগেও যে একজন দৃষ্টির আড়ালে থাকা সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য ছিল, দিন-রাত গাদাগাদা ইলেক্ট্রনিক তথ্যভাণ্ডারের ভেতর দিয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে কে বা কারা অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ লেনদেন করছে। আর বাইরে...সে একজন সেকেন্ডারি ফিল্ড এজেন্ট। মূলত ফিল্ডেই কাজ করার ইচ্ছা তার, কিন্তু তাকে সেই প্রস্তাৱ কখনো দেওয়া হয়নি। তার বিশ্বাস যে সে ফিল্ডের যেকোনো রকমের চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম ছিল। তার প্রমাণও পেয়েছে সে ম্যালনের বইয়ের ক্ষেত্রকানে। এই পরিস্থিতিতে যে কাজ যেভাবে করা দরকার, সে সেভাবেই করেছে, কিন্তু এই ঘরে এখন দুই দুটো মানুষকে মৃত পড়ে থাকতে দেখে তার অবাকই লাগল থ্রিভান্ডসেন আর জেস্পার এদেরকে মেরেছে। কিভাবে করলো এটা? সে কি পারত?

সে দেখল, জেস্পার দুটো লাশের ব্যাগ এনে ঘোঁষের উপর সেগুলো মেলে রাখল। স্যাম এর আগে কোনো দিন নিজ চোখে খুন্দুম্বাবি দেখেনি, আজ দেখছে। ঘরের ভেতর রক্তের ভারী গন্ধ। অপলক দৃষ্টিতে জাকিয়ে আছে সে জেস্পারের দিকে। মৃতদেহ দুটো খুব ধীরে-সুস্থে ব্যাগের ভেতর ঢোকাল সে, কোনো উত্তেজনা বা তাড়াছড়ো নেই হেনরিকের এই লোকটির মাঝে।

স্যাম কি এটাও করতে পারত?

“এখন বল যে গ্রাহাম অ্যাশবির সাথে কিভাবে কী মোকাবেলা করবে? কতখানি জানো ওর বিষয়ে?” জিজ্ঞেস করলো ম্যালন। “স্যাম অবশ্য একবার তার নাম আমার সামনে বলেছে, তবে মনে হয়, সেটাও তোমার ইচ্ছাতেই বলেছে।”

স্যাম নিশ্চিত যে ম্যালন একই সাথে বিরক্ত ও চিন্তিত।

“আমি বলছি,” বলল স্যাম। “ব্রিটেনের একজন খুব ধনী মানুষ সে। বয়সে যেমন বুড়ো, ওর ধন-সম্পদও তেমন পুরনো, মানে আদি থেকেই ধনী তার বংশ। কিন্তু তার সম্পদের আসল পরিমাণ বা মূল্য কত, সেটা কেউ জানে না। বেনামে প্রচুর সম্পত্তি আছে তার। কয়েক বছর আগে সে একটা কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে। *Retter der Verlorenen Antiquitäten*-মানে হারানো সম্পদ শিকারি। এটা হলো একদল মানুষ যারা চুরি হওয়া মূল্যবান কোনো বস্তু আবারও চুরি করে, তারপর নিজেদের মধ্যে তা আবার কেনাবেচা করে চোরদের উপর বাটপারি।”

“মনে পড়েছে,” ম্যালন বলল। “সেই অ্যান্ডার রংমের ঘটনাতেও ওরা ছিল।”

মাথা নাড়ল স্যাম। “টন-কে-টন পুরনো, মূল্যবান সম্পদ হাতিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হত না ওরা। ওগুলো যাদের কাছ থেকে কেড়ে নিত, তাদের বাড়ি-ঘরে পর্যন্ত হামলা করত, লুটপাট চালাত। অ্যাশবিও ওদের সাথে জড়িত ছিল, কিন্তু সেটা প্রমাণ করা যায়নি কখনো। অ্যামান্দো ক্যাব্রাল ওদের একজন সদস্য। সবাই ওকে দখলবাবা বলে ডাকে। মূলত সে-ই মালামাল সংগ্রহের কাজগুলো করে থাকে।” একটু থামল সে। “বাচুরি, নির্ভর করছে আপনি কিভাবে এটা দেখছেন তার ওপর।”

মনে হলো যেন ম্যালন বিষয়টা খুব ভালো বুঝতে পেরেছে। “তার মানে, অ্যাশবি মেঞ্জিকো সিটিতে গিয়েছিল এরকম চুরির কাজে, আর বামেলায় পড়ে, ঠিক?”

মাথা নেড়ে সায় দিল থ্রিভাল্ডসেন। “কেসটা ঠিকঠাক মতোই এগুচ্ছিল, এলেনা রেমিরেজও সঠিক পথেই কাজ এগিয়ে নিচ্ছিল। ক্যাব্রাল ও আশবির অপরাধ প্রমাণ প্রায় করেই ফেলেছিল সে, তাই অবস্থা ভালো না বুঝে অ্যাশবি সিদ্ধান্ত নিল যে মেয়েটাকে সরিয়ে ফেলবে।”

“কাহিনী এখানেই শেষ না,” বলল স্যাম।

ম্যালন ঘুরে তাকাল স্যামের দিকে। “অ্যাশবি বসে নেই, সে আরও একটা গুণ্ঠ সংগঠনের সাথে ভিড়ে গিয়েছে, আর এবার আরও বড় একটা চক্রান্ত করছে।”

“এটা কি তুমি এজেন্ট হিসেবে বলছ, না কী মানিওয়াশ ওমের সাইটের মালিক হিসেবে?” জিজ্ঞেস করলো ম্যালন।

মাথাটা দেলাল সে, এতো অবিশ্বাস করলে চলে কিন্তুবে! “কি যে বলেন, আমি জানি বলেই বলছি। একেবারেই সত্যি এটা। ওরা একের পুরো দুনিয়ার অর্থনীতির উপর হামলা করার পরিকল্পনা করছে।”

“বাহ, মনে হচ্ছে যেন তারা একেবারে তুড়ি মেরেই এটা করে ফেলবে, কি বল?”

“আমি বুঝতে পারছি যে আপনি আমায় পাগল ভাবছেন, কিন্তু এটা তো মানেন যে অর্থনীতি একটা শক্তিশালী অস্ত্র? আর এটাও প্রমাণ করা যাবে যে এই অস্ত্র দিয়ে চরম ধ্বংসযজ্ঞ চালান সম্ভব।”

“বেশ, তো এবার বল যে এই গোপন সংগঠন সম্পর্কে কিভাবে জানলে তুমি?”

“আমরা কয়েকজন মিলে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। প্যারিসে আমার পরিচিত একজন আছে, সে-ই খবরটা দিয়েছিল। তারা মাত্র শুরু করেছে তাদের কাজ-কর্ম। নানান দেশের মুদ্রাবাজারে টুঁ মেরেছে তারা। সম্পূর্ণ কাজটা ছোট-ছোট অংশে ভাগ করে নিয়ে সম্পন্ন করছে, তাই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সেগুলো ধরা পড়ে না। ভালো করে মনোযোগ দিলে বোঝা যায়।”

“এই মনোযোগ দেওয়ার কাজটা মনে হচ্ছে তুমি আর তোমার বন্ধু ভালোই করছ। আর সম্ভবত, এটা তোমার উপরের লোকদের জানিয়েছিলে তখন, কিন্তু তারা বিশ্বাস করেনি। কারণ আমার মনে হয়, তুমি কোনো প্রমাণ দেখাতে পারনি।”

মাথা নাড়ুল কলিঙ। “ঠিক, কিন্তু আমি জানি ওরা আছে, সত্যিই আছে। আর অ্যাশবিও আছে ওদের সাথে।”

“কটন,” থ্রভাল্ডসেন বলে উঠল, “বছরখানেক আগে স্যামের সাথে পরিচয় হয় আমার। ওর ওয়েবসাইটটা দেখেছি আমি, আর ওর এমন রীতিবিরুদ্ধ মতবাদও জানলাম সেখান থেকে, বিশেষ করে অ্যাশবি সম্পর্কিত তথ্যাবলি। ওর অনেক বক্তব্যই কিন্তু ফেলার মতো না।” স্যামের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল প্রবীণ মানুষটি। “ও বেশ করিঞ্কর্মা, আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। হয়তো তুমি এতক্ষণে সেগুলো ধরেও ফেলেছ, ম্যালন।”

একটা শুকনো হাসি দিল কটন ম্যালন। “মানছি। আমিও তো এক সময় যুবক ছিলাম, নাকি? কিন্তু কথা হলো যে অ্যাশবি তো মনে হচ্ছে জেনে গেছে যে তুমি ওর পেছনে লেগেছ। আর সে স্যামকেও চিনে গেছে।”

মাথাটা দোলাল থ্রভাল্ডসেন। “আমি জানি না যে সে জানে কিনা। তবে আজ রাতে যারা এসেছিল, তাদেরকে ক্যাবাল পাঠিয়েছিল। আমি ইচ্ছে করেই এই বজ্জাতটাকে খেপিয়ে দিয়েছিলাম, যেন আমার পেছনে লাগে। তবে নিশ্চিত ছিলাম না যে স্যামও ওদের টার্গেট হবে কিনা। আমি আশা করেছিলাম যে ক্যাবালের ক্রোধ শুধু আমার উপরেই পড়বে। কিন্তু সাবধানের মার নেই, তাই স্যামকে রুক্ষেছিলাম যে কোনোরকম ঝামেলা হলেই যেন সে তোমার সাথে যোগাযোগ করে।”

জেন্স্পার একটা ব্যাগ টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল।

“ওরা ছোট জাহাজ বা নৌকায় করে এখানে এসেছিল,” বলল থ্রভাল্ডসেন। “কালকে ওরিসুন্দের ঘাটে খোঁজ নিলেই পাওয়া যাবে গোটা জায়গাটা বেশ দূর আছে এখান থেকে।”

“বুঝলাম, এখন বল যে তুমি ঠিক কী করুন্তে থাচ্ছ?” জিঞ্জেস করলো ম্যালন।

মুখ দিয়ে দ্রুত শ্বাস নিল থ্রভাল্ডসেন। বন্ধুর সুস্থিতা নিয়ে সন্দেহ হলো স্যামের।

“যে সমস্ত আর্ট বা শিল্প অনেক দামী, ঐতিহাসিক মূল্য আছে এমন সম্পদ সংগ্রহ করতে পছন্দ করে অ্যাশবি, হোক সেটা অখ্যাত, বা বেওয়ারিশ, অথবা প্রয়োজনে চুরি করে হলেও নিতে হবে তার,” অকপটে বলে ফেলল থ্রভাল্ডসেন। “আইন বা আইনি যুদ্ধ, অথবা গণমাধ্যম কোনোটা নিয়েই মাথাব্যথা ছিল না তার। হারানো জিনিসের যে সংগ্রহ অ্যাশবির আছে, সেটার উপর অনেক খোঁজ খবর নিয়েছি। যেটা জেনেছি সেটা হলো—অ্যাশবির দলটা দীর্ঘ দিন ধরেই এই কাজ করে আসছে। ওরা কিভাবে কাজ করে সেটা জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। চুরি যাওয়া জিনিস ওরা আবার সেই চোরদের কাছ থেকে চুরি করে। তাহলে আসল চোরের নাম হিসেবে অ্যাশবির কাজটা করে গিল্ডহল নামের এক লোক, অনেক দিন ধরেই অ্যাশবির সাথে আছে সে। ক্যাবালকে দলে ঢোকান হয়েছে পরে, অ্যাশবির লোকজন একবার একটা বিশেষ অভিযানে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, তখন ক্যাবালকে পাঠানো হয়েছিল যেন অন্তত সেই মালামালগুলো হাতছাড়া না হয়। ধরা পড়েছে যারা পড়ুক। আর যখন সত্যি-সত্যি

সেগুলো অ্যাশবির লোকজন খুঁজে পেল, সেটাৰ তালিকাটা দেখলেই মাথা ঘুৱে যাবে তোমার। অ্যাশবি পাকা খেলোয়াড়, ও নিশ্চিত না হয়ে কাজে নামে না। কিন্তু এখন আবার সে ব্যস্ত আৱও বড় একটা প্ৰজেষ্ঠি নিয়ে। সফল হলে সেটা হবে সব থেকে বড় খ্যাপ, একেবাৰে মাথা খাৱাপ কৰে দেওয়াৰ মতো।” স্যামেৰ দিকে তাকাল প্ৰভাস্তসেন। “তোমার দেওয়া তথ্যে চোখ খুলে গেছে, অ্যাশবিকে নিয়ে যা-যা বলেছ, সবই এখন পৰ্যন্ত একেবাৰে অক্ষৱে-অক্ষৱে মিলে গেছে।”

“কিন্তু এখন পৰ্যন্ত তোমার চোখে অৰ্থনীতি নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্ৰ চোখে পড়েনি, তাই না? তুমি তো চোখ-কান খোলাই রাখ,” ম্যালন বলল।

কাঁধ উঁচু কৰলো ডেনিশ লোকটা। “সারা জায়গায় অ্যাশবিৰ বন্ধু-বান্ধব ছড়িয়ে, আৱ এৱকমটাই আশা কৰা উচিত। তাৰ উপৰ সে আবার ইংল্যান্ডেৰ সবচে বড় ব্যাঙ্কগুলোৰ একটাৰ মালিক। সত্যি বলতে, আমাৰ সব মনোযোগ আমি দিয়ে রেখেছি অ্যাশবিৰ সাথে ক্যাৰালেৰ কাজকৰ্মেৰ—”

“তাহলে এৱকম ইঁদুৰ-বেড়াল না খেলে সৱাসিৰ অ্যাশবিৰ পেছনে লাগছ না কেন? ওকে শেষ কৰলেই তো সব চুকে যায়। ঠিক কি না?” জিজ্ঞেস কৰল ম্যালন।

জোড়া প্ৰশ্নেৰ উত্তৰটা স্যামেৰ ঠোটেৰ আগায়। “ওটা কৰছেন না কৰুণা আপনি আমায় বিশ্বাস কৰেন। আৱ এটাও জানেন যে আসলেই একটা ষড়যন্ত্ৰ ছাইছে।”

প্ৰভাস্তসেনেৰ মুখ থেকে উত্তৰ কেড়ে নিয়ে স্যাম কথা বললেন্তে এই প্ৰথম প্ৰবাণ মানুষটাৰ চোখে-মুখে আনন্দেৰ দৃতি দেখতে পেল সে।

“আমি কখনো বলিনি আমি তোমায় বিশ্বাস কৰি না।

“তাহলে আসল ঘটনা কী, হেন্ৰিক? আবারও প্ৰশ্ন ম্যালনেৰ। “তুমি তো এৱকম ঘাপটি মেৰে থাকা লোক না, কী লুকাছ আমাৰ ঘোৰে, বল তো?”

“স্যাম, তুমি কি জেস্পার এলে ওকে একটু সাহায্য কৰতে পাৰবে? মাত্ৰ একটা ব্যাগ আছে, একটু হাত লাগিও ওৱ সাথে। নৌকায় তোলা লাগবে তো, ওটা বেশ দূৰে; ও মুখ ফুটে কিছু বলে না, কিন্তু বোৰোই তো, বয়স হয়েছে ওৱও, আগেৰ মতো তো আৱ সেই তেজ নেই।”

এভাৱে সৱিয়ে দেওয়াটা মোটেই ভালো লাগল না স্যামেৰ, কিন্তু সে বুঝতে পাৰছে যে প্ৰভাস্তসেন আসলেই একটু আলাদাভাৱে কথা বলতে চাইছে ম্যালনেৰ সাথে। তাৰ অবস্থান তাৰ ভুলে গেলে চলবে না, যত যা-ই হোক, সে একজন বহিৱাগত, এটা নিয়ে বাদানুবাদ কৰাৰ কোনো সুযোগই নেই। তাৰ জীবনটাই এমন, ছেটবেলা থেকে নিয়ে সিক্ৰেট সাৰ্ভিস পৰ্যন্ত সবখানেই সে একৱকম আচুৎ, নিচু অবস্থানেৰ মানুষ। সে শুধুমাত্ৰ প্ৰভাস্তসেনেৰ ইচ্ছামত কাজ কৰে গেছে, ম্যালনেৰ সাথে যোগাযোগ কৱেছে সময় মতো। তবে এটাও সত্যি যে ম্যালনেৰ বইয়েৰ দোকানে যে হামলা হলো, সেটা ঠেকাতে ম্যালনকে প্ৰত্যক্ষ সাহায্য কৱেছে সে। তাৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ সে রেখেছে। তাৰপৰও এখন তাকে বাইৱে থাকতে হচ্ছে। স্যাম ভাবল, বাধা দিয়ে কিছু বলবে, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল শেষ মুহূৰ্তে গত বছৰে সে নানা বিষয়ে

মূল্যবান অনেক তথ্য দিয়েছে তার উর্ধ্বর্তন কর্মকর্তাদেরকে, যার সবটুকুই যে তাদের জন্য সুখকর ছিল তা না, আর সে কারণেই তার সিক্রেট সার্ভিসের চাকরিটা খোয়াতে হলো। তারপরও জানার তীব্র নেশা তার কমেনি, তাই থ্রিভাল্ডসেন যে পরিকল্পনাই করে থাকুক, সেটা জানার জন্যেও মরিয়া সে।

দাঁতে দাঁত চেপে নিয়ে চলা ছাড়া কিছু করার নেই তার, পরিস্থিতি এখন এমন, যখন যেটা বলা হবে, তাকে সেটাই করতে হবে।

তাই জেস্পার ফিরলেই নিচু হয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল স্যাম। “দেখি, ব্যাগটা একটু ধরে দেই আপনার সাথে”।

পুরু প্লাস্টিকের ব্যাগ জড়ানো পায়ের অংশটুকু ধরে জীবনের প্রথমবারের মতো খুন হওয়া কোনো মানুষের শরীরটা উঁচু করতেই তার দিকে তাকাল ম্যালন। “কী একটা দলের কথা বলছিলে তুমি, টাকার কারবারি, না কী যেন। ওদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো, তাই না?”

“ফ্রান্সে আমার যে বন্ধুটি আছে, সে আমার থেকেও ভালো জানে।”

“তুমি অস্তত দলের নামটা তো জানো?”

মাথা নাড়ল সে। “প্যারিস ক্লাব।”

চৌল কর্সিকা

জনমানবহীন দ্বীপ ক্যাপ করসের বুকে পা রাখল অ্যাশবি। চারদিকে ঘন ম্যাজ ঘাস আর পাথর মিলে অমসৃণ এক চাদর সৃষ্টি হয়েছে। এখান থেকে পশ্চিমে তাকালেই, ওপারের এলবা শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। ভগ্ন, ক্রমেই ছোট হলে আসা *Tour de Santa Maria* টাওয়ারটি মাত্র কুড়ি মিটার দূরেই জলের মাঝে নেমতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন ওটা বলতে চাইছে, ওর থেকে দূরে থাকতে। আজ রাতের তাপমাত্রা আঠারো ডিগ্রী সেলসিয়াস পুরে আরামদায়ক। ভূ-মধ্য সাগরীয় অঞ্চলে এখন এরকমটাই আবহাওয়া, অন্তর্ভুক্ত সময়ে পর্যটকরা সবচে বেশী ভিড় করে এখানে।

“ক্রি ভাসা মঠে যাচ্ছ নাকি আমরা?” জিজেস করলো কর্সিকান্টা।

অ্যাশবি ইশারা করতেই ছোট নৌকাটা চলে গেল। তার কম্বে ছোট্ট একটা রেডিও আছে আর্কিমিডিসের সাথে যোগাযোগ রাখতে। জাহাজটা একটু দূরেই শান্ত জলের মাঝে নোঙ্গের ফেলে আছে।

“অবশ্যই যাচ্ছ। ম্যাপ দেখে নিয়েছি আমি, বেশী দূরে না ওটা।”

ছোট দলটা খুব সাবধানে গ্রানাইট পাথরের ভেতর দিয়ে এগুতে শুরু করলো। উচু-নিচু পাথরে ঢাকা অঞ্চলটা ঢেকে আছে ঘন ঘাস আর নানান রকম পাথুরে লতা-পাতায়, তার মাঝেও পায়ে হাঁটা পথটা স্পষ্ট দেখা গেল কয়েক পা এগুতেই, নানা

রকম স্বাগ এসে লাগল নাকে। নাম না জানা ছোট-ছোট ফুলের ঝোপ, মিষ্টি স্বাদের রোজমেরি, ল্যাভেডার, সিস্টাস, জুনিপার, ম্যাস্টিক এবং মারটল ঘিরে আছে চারদিকে। বসন্ত এবং গ্রীষ্মের মতো এতটা তীব্র না থাকলেও এখনও যথেষ্ট সুরভী আছে চারদিকে। যদিও ঐ দুই ঋতুতে পুরো কর্সিকা চেকে যায় মোহনীয় গোলাপি আর হলুদ ফুল, তবু চমৎকার লাগে সব সময়। নেপোলিয়নের কথা মনে পড়ে গেল তার, প্রথম যখন তাকে এলবার কাছে নির্বাসনে পাঠানো হলো, সে তখন সে সময়ের অনুভূতি লিখে রেখেছিল। যখন পশ্চিমা বাতাসে চড়ে এতো শত স্বাগ তার দ্বীপে পৌঁছাত, সে তীব্রভাবে অনুভব করত তার জন্মস্থানকে। তবে এখন নিজেকে অ্যাশবির মনে হচ্ছে শত-শত বছর ধরে এই দ্বীপে আসা যাওয়া করা সেই মুরিশ জলদসুয়দের মতো, যারা লোকালয়ের চোখ ফাঁকি দিতে চলাচলের পথ ব্যবহার না করে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে যাওয়া-আসা করত। ওদেরকে ঠেকাতে জেনোয়ানরা একটা টাওয়ার দাঁড় করিয়ে দিল জলের মাঝেই, রাত-দিন পাহারা থাকত সেখানে। *Tour de Santa Maria*-র মতো আরও টাওয়ার আছে কাছে-দূরে। প্রতিটাই গোলাকার, প্রায় কুড়ি মিটার উঁচু, আর দেওয়ালটা পুরু-প্রায় মিটার খানেক। একটা চৌবাচ্চা থাকত টাওয়ারের নিচের অংশে, মাঝের অংশে ছিল থাকার জায়গা, আর একটা উপরে ছিল পাহারা দেওয়া ও প্রয়োজনে আক্রমণ করার জায়গা।

এতো আগেও ওদের এমন স্থাপত্যশৈলী আসলেই প্রশংসন করা র মতো।

ইতিহাস যেন আজ অ্যাশবিকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

আর তারও ভালো লাগছে ইতিহাসের লুকিয়ে রাখব একটা অধ্যায়ের শেষ করতে পারছে বলে।

উনিশশ তেতাল্লিশের এক রাতে পাঁচজন প্রমুখ অসাধারণ এক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছিল, যেটার তাঃপর্য অ্যাশবি বুঝতে পেরেছে মাত্র তিন সপ্তাহ আগে। দুঃখের বিষয় হলো এটাই যে এক সামান্য ভুঁইফোঁড়ের কারণে তার এই পরিকল্পনা ভেস্টে যেতে বসেছিল। এই পুঁচকে, ঠাণ্ডা মাথার কর্সিকান্টা অনেক মাথাব্যথা উপহার দিয়েছে তাকে। আর না, সবকিছুর শেষ টানা দরকার। আর তা আজ রাতেই। সামনে যে আরও কত দুশ্চিন্তার কারণ অপেক্ষা করছে সেটা সে জানে N

সমুদ্রতীরের পাথুরে অঞ্চলটা ছেড়ে তারা ওক গাছের মিছিলে ঢুকে গেল, বাদাম আর জয়তুন গাছও আছে চারপাশে। আর অদৃশ্যভাবে বিচরণ করছে সুনসাম নীরবতা। সান্তা মারিয়ার মঠটা দেখা যাচ্ছে সামনেই। এগুরশ শতক থেকে দাঁড়িয়ে আছে ওটা ওখানে একটা দীর্ঘ, গানপাউডারের মতো ধূসর বর্ণের আয়তাকার কাঁচের মতো পাথর, তত্তা দিয়ে বানানো ছাদ ও একটা ঘণ্টাঘর দেখা যাচ্ছে।

থামল কর্সিকান্টা “কোথায় যাচ্ছি আমরা? এখানে তো জীবনে আসিনি।”

“এই জাতীয় সম্পদটাকে এখনও দেখনি? এই দ্বীপে থাকা যে কারো জন্যই এটা না দেখে উপায় নেই।”

“আমার বাড়ি এই দক্ষিণে। আমাদের নিজের এলাকায় যা আছে তা দেখেই কূল পাইনা।”

বাঁ দিকে ঘুরে গেল গেল অ্যাশবি। “আমি শুনেছি এই মঠের পেছনে কোথাও একটা কবরস্থান আছে।”

এবার অ্যাশবি পথ দেখাতে শুরু করলো। প্রায় আধখানা চাঁদ আকাশে, পথ দেখার জন্য যথেষ্ট আলো দিয়ে যাচ্ছে। আশপাশে কোথাও আর কোনো আলো নেই। কাছের গ্রামও এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে।

বহু পুরনো ভবনটার চারপাশে একবার ঘুরে আসতেই লোহার একটা খিলানে ঢাকা পথ ঝুঁজে পেল তারা, যেটা গিয়ে মিশেছে একটা কবরখানায়। তার গবেষণায় সে পেয়েছিল কেপ করসে মধ্যযুগের যে লর্ডরা ছিল তারা তাদের মনিব জেনোয়ানদের কাছ থেকে একটা অঞ্চলের মালিকানা পেয়েছিল। উভয়ের এই পাহাড়ে ঘেরা, সাগরের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা জনমানবহীন এই দ্বীপের মালিক সেই লর্ডরা ফরাসি ও ইতালিয়ান উভয়ের কাছ থেকেই বেশ লাভ করেছিল। স্থানীয় দুটো পরিবার ডা জেন্টাইল এবং ডা মেইরেস, বহুকাল ধরে যৌথভাবে নির্দিষ্ট অঞ্চলের দেখাশুনা করে আসছে। ডা মেইরেসের কয়েকজনের সমাধি আছে এখানে, এই মঠের পেছনে। শত^{শত} বছরের আগের ঘটনা।

তিনটা আলোর রশ্মি এসে পড়ল আধার ভেদ করে। সবগুলোই ইলেকট্রিক টর্চে, এসে পড়েছে তাদের পথের ওপর।

“কে ওখানে?” হাঁক দিয়ে উঠল কর্সিকানটা।

একটা আলোতে একজনকে দেখা গেল, ওটা গিল্ডহলের সেই আবেগহীন মুখ।

কর্সিকানটা অ্যাশবির দিকে তাকাল। “কি হচ্ছে এগুলো?”

সামনে এগিয়ে গেল অ্যাশবি। “দেখতেই পাবে।”

আলোর দিকে হেটে গেল দুজন, ভঙ্গুর পাথরের চিহ্ন দেওয়া রাস্তার ভেতর দিয়ে পা চালাচ্ছে তারা। পঞ্চাশ বা তারও বেশী উপচে পড়া ঝোপঝাড় চারপাশে, দারুণ সুগন্ধ আসছে সেগুলো থেকে। আলোর উৎসের আরও কাছে আসতেই তারা দেখল মাটিতে একটা আয়তাকার গর্ত খোঁড়া, প্রায় দেড় মিটারের মতো গভীর। দু’জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে গিল্ডহলের পাশে, হাতে বেলচা। নিজের টর্চটা বের করলো অ্যাশবি, তারপর আলোটা ফেলল সমাধি ফলকের উপর। একটা নাম দেখা গেল সেখানে—*MéNéVAL*.

“ডা মেইরেস বংশের ছিল সে, শতেরশ শতকের মানুষ। চার জার্মান এই কবরটাই ব্যবহার করেছিল বাস্তুগুলো লুকিয়ে রাখতে। ছয়টা বাস্তু এখানে পুঁতে রেখেছিল মুরের নট বিশ্রেণ করে বইটাতে যেমনটা পেয়েছি, *Santa Maria Tower, convent, cemetery, marker, Ménéval*.Ó

আলোটা ঠিক মতো অ্যাঙ্গেল করে ফেলল সে সদ্য খোঁড়া কবরটাতে।

খালি।

“কোনো বাক্স নেই নেই *Ménéval* এর দেহ। একেবারে ফঁকা। এর মানে কি বলবে?”

কোন উত্তর করলনা কর্সিকানটা।

অ্যাশবি অবশ্য কোনো উত্তর আশাও করেনি। আলোটা নিচ থেকে এবার তরুণ দুজনের মুখের উপর ফেলল, তারপর বলল, “এই লোকগুলো আমার সাথে কাজ করেছে দীর্ঘদিন। ওদের বাপ-চাচারাও কাজ করেছে আমার সাথে। এরা এক কথায় বিশ্বস্ত। সামনার...,” সে ডেকে উঠল।

অন্ধকার থেকে আরও কিছু মানুষ এগিয়ে এলো, আরও একটা আলো পড়তেই বোৰা গেল সেখানে দু'জন মানুষ।

“গুস্তাভ,” বলে উঠল কর্সিকানটা, অচেনার ভিংড়ে চেনা মুখ দেখে, তবে এখন মানুষটা অ্যাশবির মতই বেঙ্গমান। “কি করছ এখানে?”

“ঐ সামনার আমাকে এখানে এনেছে।”

“তুমি বেঙ্গমানি করলে, গুস্তাভ।”

কাঁধ ঝাঁকাল সামনের লোকটি। “তুমিও একই কাজটাই করতে।”

হাসল কর্সিকানটা। “করলেও আমি দু'জনের স্বার্থই দেখতাম। সব আমি একাই কামাতাম না।”

অ্যাশবি খেয়াল করলো তারা কর্সিকান ভাষায় কথা শুনে করেছে, তাই সেও তাদের ভাষায় যোগ দিল, “এই পরিস্থিতির জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমাদের কাজটা শেষ করার জন্য গোপনীয়তার দরকার ছিল। আর আমি জানতেও চেয়েছিলাম যে এখানে আসলেই কিছু পাওয়া যাবে কিনা।”

কর্সিকানটা গর্তটার দিকে দেখাল। “দেখতেহ পাচ্ছেন, লর্ড অ্যাশবি, কোনো বাক্স নেই এখানে। কোনো কানাকড়িও নেই। আপনার আশঙ্কাই ঠিক হয়েছে।”

“বিষয়টা বোৰা কঠিন কিছু না, তোমরা দু'জনে মিলে ওগুলো আগেই সরিয়ে ফেলেছ, আর সেটা গত কয়েক দিনের মাঝেই।”

“সম্পূর্ণ ভুল কথা,” বলল কর্সিকানটা। “একেবারে মিথ্যা।”

যথেষ্ট হয়েছে, এবার এই নাটকের শেষ টানতে হবে। “তিন বছর ধরে আমি রোমেলের সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছি। এর পেছনে আমার কাঁড়িকাঁড়ি টাকা গেছে, আর সাথে সময়ও। ছয় মাস আগে আমি সেই পাঁচ নম্বর জার্মান পরিবারের হন্দিস পাই। লোকটা অনেক দিন বেঁচে ছিল, বছর দশকে আগে মারা গেছে বাভারিয়াতে। তার বিধবা স্ত্রীকে কিছু পয়সাকড়ি দিয়ে তার বাড়ির ভেতর ঢোকার সুযোগ পাই। ভেতরে আমি যা-যা দেখেছিলাম, সেগুলোর মাঝে কিছু রোমান সংখ্যা লেখা জিনিসও ছিল।”

“লর্ড অ্যাশবি,” বলল কর্সিকানটা। “আমি আপনার সাথে কোনো বেঙ্গমানি করিনি।”

“সামনার, একটু এদিকে এসে বলতো তোমরা কী পেয়েছিলে?”

ছায়ার মতো অবয়বটা ঘুরে গেল গুস্তাভের দিক থেকে, তার হাতেও টর্চ। “এই চোরের বাড়ির পেছনের জমিতে ছয়টা বাক্স পেয়েছি।” একটু বিরতি নিল কঠটা। “সবগুলোতেই সোনার বারে ভরা, আর প্রত্যেকটা বারেই হিটলারের স্বন্দিকা চিহ্ন।”

এমন একটা খবর দারণ খুশি করে দিল অ্যাশবিকে। এখন পর্যন্ত সে জানত না যে তার লোকজন কী আবিষ্কার করেছে। যে সময়টাতে সে কর্সিকানের পেছনে সময় দিয়েছে, সে সময়ে সামনার মুরেই ও তার ছেলেরা মিলে গুস্তাভের বাড়িতে হানা দিয়েছে, এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে, বাস্তিয়ার বাইরে জায়গাটা। মুরেই এর দলের লোকজনও অপেক্ষায় ছিল এটা দেখতে যে তাদের মনিবের করা সন্দেহ সত্য হয় কিনা, সোনাগুলো আসলেই সবার আগে গুস্তাভরা হাতিয়ে নিয়েছে কিনা। যখন অ্যাশবি আর্কিমিডিসে চড়ে কর্সিকানের সাথে এই উভরে রওয়ানা হলো, ততক্ষণে মুরেই গাড়িতে চড়ে উপকূলীয় রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গেছে। তারপরে গিল্ডহল এখানে আগে পৌঁছে করবটা খুঁড়ে রেখেছে।

“আমি বেশ ভালো মনেই তোমার সাথে একটা চুক্তি করেছিলাম,” সামনের দুই মিথ্যাবাদীকে বলল অ্যাশবি। “কথা ছিল যা পাব তার থেকে একটা অংশ তোমায়, বা তোমাদের দেব, আর আমি কিন্তু সেই কথা রাখতামও। কিন্তু তুমি আমার সাথে প্রতারণা করলে, তাই এখন তুমি আমার কাছ থেকে আর একটা কানাকঙ্কালও পাবে না। আমি যে এক মিলিয়ন ইউরো দিয়েছিলাম, তা আবার তোমাদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নিছি।”

কর্সিকানদের জাতিগত দাঙ্গার কথা পড়েছে অ্যাশবি^(৩) প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকা এই বিবাদে খুনের বদলে খুন-এই অনুশীলনকাঠাই করে এসেছে তারা, যেটা একসময় গৃহযুদ্ধে রূপ নিয়েছিল সামান্য মর্যাদার কঠিনাত্মক নিয়ে তারা এতটাই খুনে হয়ে উঠত যে প্রতিশোধের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলতো দশকের পর দশক ধরে। কয়েকশ বছর ধরে ডা. জেন্টাইলস এবং ডা. মেইরস এই দুই বংশের লোকেরা একে অপরের সাথে মারামারি কাটাকাটি করেছে। আর সেই সব যুদ্ধে যারা মারা গেছে তাদের কেউ-কেউ এই কবরস্থানের মাটিতে মিশে আছে। খাতা-কলমে যদিও এই গৃহযুদ্ধের আর কোনো অস্তিত্ব নেই, তারপরও কর্সিকান রাজনীতিতে সেই পুরনো বিবাদের নিভু-নিভু উত্তাপ এখনও স্পষ্ট। গুপ্তহত্যা আর সংঘাত হরহামেশাই ঘটে। এমনকি রাজনৈতিক এই মারপ্যাচের একটা নামও জুটে গেছে। *Règlement de comte* -দেনা মেটানোর খেলা।

এখন এই খেলাটাই খেলতে হবে।

“আমি খুব সহজেই আমার উকিল লাগিয়ে দিতে পারতাম তোমাদের পেছনে।”

“আইনের লোক ডাকবেন? আমাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা আপনার?”
জিজেস করলো কর্সিকানটা।

“আরে নাহ, ওসব কিছু না।”

হেসে ফেলল কর্সিকানটা। “আসলে, আমি ভাবছিলাম যে আমরা কি একটু আলোচনায় বসতে পারি না? যেহেতু আপনি ও আমরা মিলেই এটা খুঁজে বের করেছি, সেহেতু কি আপনার দেওয়া এই টাকাগুলো আমরা রাখতে পারি না?”

“তার আগে তো তোমাদেরকে আমার ক্ষমা করা দরকার।”

“আসলে, আমার এটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে,” বলল কর্সিকানটা। “কোনোভাবেই এটা দূর করতে পারি না, মিথ্যা আমার মুখ থেকে বের হয়ে যায়। তাই বলছি যে এই সব ঝামেলার জন্য অর্ধেকটা আপনি ফিরিয়ে নিম, বাকিটা থাকুক আমাদের।”

সে দেখল গিল্ডহল ধীরে-ধীরে কর্সিকান দু'জনের পেছন থেকে আরও খানিকটা পিছিয়ে গেল। সামনার এবং আরও দু'জন তরুণ ইতোমধ্যে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়েছে, বুঝতে পারছে সামনে কী ঘটতে চলেছে।

“অর্ধেক একটু বেশিই হয়ে যায় আমার জন্য,” সে বলল। “তার চেয়ে বরং—”

টাস টাস করে শব্দ হলো দুটো, রাতের নীরবতায় একটা ছেদ পড়ল যেন।

কর্সিকান দুটো সম্মুখে হেলে গেল খানিকটা, গিল্ডহলের বন্দুক থেকে ছোঁড়া গুলি দুটো দু'জনের মাথা ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেমন স্থির হয়ে তারপরই সামনের দিকে পড়ে গেল উপুড় হয়ে, খোঁড়া কবরটা এবার ভরে ভেঙ্গিল ওদের পেয়ে।

আপদ বিদায় হলো।

“এগুলো ঢেকে দাও, দেখ যেন কিছু বোঝা না যায়।” অ্যাশবি জানে মুরেইরা একাজ ভালোভাবেই করবে।

গিল্ডহল এগিয়ে এলো অ্যাশবির কাছে, তাকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, “সোনাগুলো নিয়ে আসতে কত সময় লাগতে পারে?”

“ওগুলো আনা হয়ে গেছে আগেই। ট্রাকে আছে।”

“দারুণ। ওগুলো আর্কিমিডিসে তোল। এখন ফিরতে হবে আমাদের। কালকে আবার জরুরী কাজ আছে আমার আরেক জায়গায়।”

পনের
ডেনমার্ক

ক্রিস্টিনাগেডের সবচে বড় হলরুমটা হেঁটে পার হলো কটন ম্যালন ও হেনরিক থ্রাভাল্ডসেন। ওখান থেকে একটা সিঁড়ি ধরে উপরের তলায় উঠে গেল থ্রাভাল্ডসেন, সেখানে আরেকটা করিডোর ধরে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। দু'পাশের দেওয়ালে ডেনিশ ছবি আর নানারকম প্রাচীন বস্তু শোভা পাচ্ছে, সব গিয়ে শেষ হয়েছে একটা তালাবদ্ধ ঘরের সামনে গিয়ে ম্যালন জানে তারা কোথায় যাচ্ছে।

থ্রাভাল্ডসেনের একমাত্র সন্তান সাইয়ের ঘরে।

ভেতরে একেবারে আলাদা রকমের একটা চেম্বার, ছান্ডটা বেশ উঁচুতে, দেওয়ালের প্লাস্টারে হালকা একটা রঙ করা, ঘরের মাঝে চার খুঁটির একটা ইংলিশ বেড়।

“ও সব সময় এই জায়গাটাকে বলত ভাবনা ঘর, যত রকম চিঞ্চা-ভাবনা আছে তা এখানেই করত ও।” এক-এক করে তিনটা বাতি জ্বালানোর মাঝে বলল থ্রিভাল্ডসেন। “এই ঘরটা বেশ কয়েকবার নতুন করে সাজান হয়েছে। সেই ছেট বয়স থেকে সারাটা জীবন এখানেই ছিল। যখন একটু-একটু বড় হলো, তখন একবার সব সাজালাম, যখন ও আরও একটু বড়, এই ধর কৈশোর পার হলো, তখন আরেকবার এটা সাজালাম, এমনভাবে যেন এই ঘরই ওর স্বর্গ হয়, আর শেষমেশ ওর হারিয়ে যাওয়ার পর আরেকবার। লিজেট সব সময় নতুনভাবে সব সাজাতে ভালবাসত।”

ম্যালন জানে যে থ্রিভাল্ডসেনের স্ত্রীকে নিয়ে কোনো কথা বলাটা একেবারেই নিষেধ। থ্রিভাল্ডসেনের সাথে ম্যালনের এই দু'বছরের পরিচয়, এর মাঝে তার স্ত্রীকে নিয়ে মাত্র একবার কথা হয়েছে, তাও খুব সামান্য। নিচতলায় তার ছবি টানানো আছে, আরও কিছু ছোট-বড় ছবি ছড়িয়ে আছে সারা বাড়ি জুড়ে। এগুলো দেখে মনে হয় যেন চোখের দেখায় তার স্ত্রীর এই মূল্যবান স্মৃতি হাজারবার মনে পড়লেও তাতে ক্ষতি নেই, কেউ এ বিষয়ে কোনো মুখ না খুললেই হলো।

এর আগে সাইয়ের ঘরে সে আসতে পারেনি কখনো, তবে জীরপাশে চোখ পড়তেই সে আরও অনেক কিছুই দেখতে পেল যা তীব্রভাবে সবকিছু মনে করিয়ে দেয়, বইয়ের তাকগুলোতে এখনো নিকন্যাক চকোলেট ছড়িয়ে আছে।

“আমি রোজ অনেকবার আসি এখানে,” বলল থ্রিভাল্ডসেন।

প্রশ্নটা করতেই হবে ম্যালনকে। “এটা কি ভালো কথা?”

“হয়তো না। কিন্তু আমাকে তো বাঁচতে হচ্ছে, আঁকড়ে ধরার মতো এই ঘরটা ছাড়া আর কিছুই নেই আমার।”

ম্যালনের অনেক কিছুই জানার বাকি, তাই সে চুপ থাকল, আর কান দুটো সজাগ করে দিল, তার পূর্ণ মনোযোগ এখন তার বন্ধুর দিকে, সব ঘটনা তার জানতেই হবে। থ্রিভাল্ডসেন একটা কাপড় রাখা তাকের সামনে থামল। ওটার কাঠের শরীর জুড়ে পরিবারের নানা সময়ের অনেকগুলো ছবি আটকে আছে। একটা কল্পনাতীত গভীর যন্ত্রণা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যেন।

“ওকে মেরে ফেলা হয়েছে, কটন। জীবনের সব থেকে উজ্জ্বল সময়টাতে তার জীবনের তুলনায় তুচ্ছ একটা ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে তাকে এভাবে সরিয়ে দেওয়া হলো।”

“কী প্রমাণ আছে তোমার হাতে?”

“ক্যান্ডাল মোট চারজনকে ভাড়া করেছিল। তাদের মধ্যে তিনজন গিয়েছিল প্লাজায়—”

“হ্যাঁ, ওদেরকে তো আমিই মারলাম।” বাস্তব বিভীষিকা এতই তীব্র যে সব মনে পড়ে গেল তার।

মুখোয়াখি দাঁড়ালো প্রভাসেন। “হ্ম, ঠিক। এরপর আমি চতুর্থ লোকটিকে খুঁজে পেলাম, যে আমায় সব খুলে বলেছে সেদিনের ঘটনা। তোমার ভূমিকাটাও বর্ণনা করেছে। কিভাবে তুমি দু'জনকে গুলি করলে। ত্তীয়জন, মানে যে তোমায় গুলি করলো, তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলো সে, কিন্তু পরে তুমি যখন আবারও গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে, তখন সে প্লাজা ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু প্রাণের ভয়ে ক্যারালের সামনে আসেনি সে, তাই গা-ঢাকা দিয়ে ছিল কিছু দিন।”

“তাহলে এই ক্যারালের বিরুদ্ধে মামলা করছ না কেন?”

“তার আর দরকার নেই। সে খতম।”

তাহলে এই কথা। “তার মানে এই দুই ব্যাগের একটায় সে?”

মাথা নাড়ল প্রভাসেন। “সে নিজেই আমায় শেষ করতে এসেছিল।”

কিছু একটা এখনো বলা হচ্ছে না সেটা ম্যালন বুঝতে পারছে। “বাকি ঘটনা খুলে বল।”

“স্যামের সামনে এগুলো নিয়ে কথা বলতে চাইনি। ছেলেটা খুবই কৌতুহলী, বলতে পার অতিমাত্রায় আগ্রহী। নিজের কাজ-কর্ম নিয়ে সে খুব আত্মবিশ্বাসী। সে আসলে তার যুক্তির গ্রহণযোগ্যতাটা চায়, আরও ভালো করে বলতে গেলে সে প্রমাণ করতে চায় যে সে যা-যা বলছে তা সত্যি। খারাপ লাগে এটা ভেবে যে ছেলেটা আর একটু হলে মারাই যেত।”

জামা-কাপড়ের তাকের দিকে আবারও দৃষ্টি দিল প্রভাসেন। ভেতরের আবেগ যেন ধরে রাখতে পারছে না সে, ম্যালন চুপচাপ দেখে যাচ্ছে সব।

“তো বল, কী পেলে অবশ্যে?” খুব নরম স্বরে জ্ঞানেস করলো ম্যালন।

“যা কোনো দিন কল্পনাও করিনি।”

Banned Book

A

জল্যান্টায় উঠে বসলো স্যাম, ওটার পেছন দিকে আরও একটা ছোট নৌকা শক্ত করে বেঁধে দিচ্ছে জেস্পার। স্ক্যানিনেভিয়ার কণকগে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মুখে লাগছে, মনে হচ্ছে যেন ফুটছে সুঁচের মতো। পেছনের নৌকাটায় লাশ দুটো ব্যাগ থেকে বের করে রেখেছে। এখন সামনের খোলা জলপথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে দু'জনের। জেস্পার আগেই বলে নিয়েছে যে সামনে একটু এগুলেই স্নোতটা বেশ তীব্র হবে, তখন পেছনের নৌকাটা সেই স্নোতে ভাসিয়ে দিলেই কাজ শেষ, ওটা তখন সুইডেনের দিকে চলে যাবে, আর ওখানেই কাল সকালে মানুষের চোখে পড়বে লাশ দুটো।

কী যে একটা রাত গেল!

অনেক কিছুই ঘটলো এই সময়টুকুর মাঝে

মাত্র তিন দিন আগেও স্যাম বুঝতে পারছিল যে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে, আর হলোও তাই।

“আপনি তো হেনরিকের জন্য অনেক কিছুই করেন, তাই না?” ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে প্রশ্নটা পৌছে গেল জেস্পারের কাছে।

“কর্তা আমার জন্যেও অনেক করেছেন।”

“মানুষ মারাটা তো একটু বেশিই হয়ে গেল প্রয়োজনের তুলনায়, তাই না?”

“মরার মতো কাজ করলে তো মরবেই।”

উত্তরের বাতাসে ঢেউ হয়ে উঠেছে উত্তাল, সেই সাথে বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। ভাগ্য ভালো যে জেস্পার তাকে একটা পুরু উল্লের কোট, এক জোড়া হাতমোজা আর মাথা ঢাকার জন্য একটা স্কার্ফ দিয়েছে।

“আপনার কি মনে হয়, তিনি কি ক্যারাল আর অ্যাশবিকেও মারবেন?” স্যাম জিজেস করলো।

“মিস্টার ক্যারাল তো মারা গেছে।”

কলিস বিষয়টা ঠিক বুঝল না। “কখন ঘটলো এটা?”

পেছনের নৌকাটাকে দেখাল জেস্পার। “সে আমার কর্তার সাথে বাহাদুরি দেখাতে চায়, সাহস কর!”

পেছনের আঁধারে ঢাকা ফ্রেমটায় দৃষ্টি দিল স্যাম, দুটো দেহ পড়ে আছে। কত কিছু ঘটে গেছে, কিন্তু তাকে জানানো হয়নি, তার থেকেও বড় বিষয় হচ্ছে—থ্রিভাল্ডসেন এখন ম্যালনের সাথে কী আলাপ করছে, সে ব্যাপারেও ও অজ্ঞ। মিজেকে মূল ঘটনার বাইরে দেখতে তার ভালো লাগছে না। অ্যাশবিকে কিভাবে মারার পরিকল্পনা করছে হেনরিক, সেটা নিয়ে স্যাম প্রশ্ন করলেও, জেস্পার উত্তর দেয়নি, আর এটাও পরিষ্কার যে উত্তর সে দেবেও না। এই লোকটা হেনরিকের স্বরচ্ছে বিশ্বস্ত, তাই বাইরের কারো সামনে মুখ খোলা মানেই থ্রিভাল্ডসেনের আঙ্গু নষ্ট হয়ে যাওয়া।

কিন্তু তার চুপ থাকাটাও অনেক কিছুই বলে দিচ্ছে।



“একটা গুণ্ঠনের সন্ধানে বেরিয়েছে অ্যাশবি। এমন এক ভাণ্ডার এটা, যার পেছনে মানুষ বহু বছর ধরে পাগলের মতো ছুটেছে।”

“তো কী হয়েছে?”

“বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে...তা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না। তবে বিষয়টাকে খাটো করে দেখা বোকামি হবে।”

অপেক্ষা করলো ম্যালন।

“ছোকরাটা ঠিকই বলেছে, ষড়যন্ত্র আসলেই একটা আছে। আমি সেটা ওকে, মানে, স্যামকে এখনো বলিনি, তবে আমার অনুসন্ধান থেকে পাওয়া তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে পাঁচজন মানুষ বেশ কয়েকবার মিটিং করেছে, কোথায় জানো? প্যারিসে।”

“অ্যাশবির প্যারিস কুাবে?”

কাঁধ দুটো ঝাঁকাল থ্রিভান্ডসেন।

“মানুষজন তো মিটিং করতেই পারে, সে অধিকার তাদের আছে।”

ম্যালন খেয়াল করলো, থ্রিভান্ডসেনের কপালে ঘামের হালকা একটা প্রলেপ জমেছে, যদিও ঘরের ভেতর কোনো গরমই নেই।

“না, এই লোকগুলোর মিটিং আর পাঁচটার মতো না। আমি নিশ্চিত, এরা নতুন কোনো পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখছে। গত বছর রাশিয়ার ন্যাশনাল ব্যাংকে এর প্রভাব দেখা গিয়েছিল। আর্জেন্টিনাতে তারা কি করেছে জানো? ওখানকার স্টকের দাম কৃত্রিমভাবে কমিয়ে দিয়ে সেই স্টকগুলোই কিনে নিয়েছে সব, তারপর সেগুলো জমা করে রেখেছে, কিছু দিন পর তা আবার চড়া দামে বিক্রি করে দিয়েছে। আরও আছে, ইন্দোনেশিয়া আর কলাঞ্চিয়াতেও একই কাজ করেছে ওরা। কৌশলগুলো প্রয়োগ করছে একটু-একটু করে। যেন চূড়ান্তভাবে কাজে নামার আগে সবার মতামত নিতে চাইছে।

“তারা কতটুকুই বা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারবে? প্রত্যেক দেশই নিজের অর্থনীতির নিরাপত্তা দিতে সব রকম প্রস্তুতিই নিয়ে থাকে।”

“তুমি যেমন ভাবছ, বিষয়টা এতো সহজ না। এটা এমন একটা বিষয়, যার উপর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বিশেষ করে এই ধরণের আক্রমণ মুখ্য খুব পরিকল্পিতভাবে, বেছে-বেছে নির্দিষ্ট কিছু দেশের উপর করা হয়, তখন সেটা ভয়াবহ হতে পারে। যেমন দেখ, এই পর্যন্ত যে দেশগুলোর উপর ওরা ওদের পরীক্ষা চালিয়েছে, তার কোনো কোনোটাতে গণতন্ত্র আছে না থাকলেও মতো, আর কোনোটাতে তো একেবারেই নেই। বরং অনেকটা স্বৈরশাসন এর মতো চলছে এই দেশগুলোতে, আর খেয়াল করলে আরও বুঝতে পারবে যে এই দেশগুলোর জনগণের নাগরিক অধিকার খুবই কম।”

“তোমার কি মনে হয়, এতে কিছু যাবে আসবে?”

“অবশ্যই। এই ধনকুবেরো যথেষ্ট প্রশিক্ষিত, পুরদস্তুর পাকা খেলোয়াড়। আমি ওদের সবার সম্পর্কেই খোঁজ নিয়েছি। বেশ ভালো নেতৃত্বের অধীনেই আছে তারা।”
ম্যালনের কষ্টে বিদ্রূপের টান ধরতে পারল সে।

“এলেনা রিকো-আগেই বলেছি-লেগেছিল অ্যাশবি আর ক্যারালের পেছনে। এই অ্যাশবি সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জেনেছি। রিকোর মৃত্যুটাকে সে আরও বিচক্ষণতার সাথে সামাল দিতে পারত, কিন্তু তার সবচে ঘনিষ্ঠ লোক ক্যারালকে যখন এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো, তখন সে কাজটা সারলো নিজের মতো করে, ফলে কিছু সমস্যা হলো। আমি জানি যে অ্যাশবির কাছেও প্লাজার ঐ খনো-খনির ঘটনাকে ভালো লাগেনি, কিন্তু সে এটা নিয়ে অভিযোগ করবে কার কাছে? তাই, যে ভুলগুলো ক্যারাল করেছিল, তার সূত্র ধরে এগিয়েই আমাদের কাজটা হয়েছে অনেকখানি।”

যেন পেটের ভেতর একটা কথা আর চেপে রাখতে পারছে না ম্যালন, যত সময় যাচ্ছে, তার অস্বস্তিও বাড়ছে। “তুমি এই লোকটাকেও মেরে ফেলতে চাও, তাই তো? ঠিক ক্যারালের মতো?” অপলক তাকিয়ে আছে ছবিগুলোর দিকে থ্রিভান্ডসেন।

“আজ রাতে ক্যান্ডেল আমার উপর যে হামলা করতে এসেছে, এটা অ্যাশবি জানে না। ক্যান্ডেল এমনভাবে আমার কাছে এসেছিল যেন অ্যাশবি যদি জানে তাহলে এটা জানবে যে ক্যান্ডেলকে আমি বা আমার লোক চিনে ফেলেছিল, যে কারণে আমাকে শেষ করে দিতে সে আসছে আমার কাছে,” যন্ত্রের মতো বলে গেল প্রভান্ডসেন, যেন আগে থেকেই সব ঠিক করে রাখা যে কী বলতে হবে। কিন্তু কিছু একটা এখনো অস্পষ্ট, ম্যালন ঠিকই বুঝতে পারছে সেটা। “আসলেই কী সব বলবে খুলে? ঠিক কী হতে চলেছে, হেনরিক?”

“গল্পটা বেশ জটিল, কটন। তবে এই গল্পের শুরুটা হয়েছিল, ঠিক যেদিন নেপোলিয়ন মারা যায়, সেদিন।”

যৌন

অ্যাশবি বেশ রোমাঞ্চিত। রোমেলের সোনা ভরা বাল্কণগুলো এখন নিরাপদেই আর্কিমিডিসে রাখা। একনজরে যতটা দেখেছে, তাতে হিসেব করে দেখেছে, লুকানো এই গুপ্তধনের মূল্য বর্তমান বাজারদরে হবে ষাট থেকে সত্ত্বর মিলিয়ন ইউরো। বা একশ মিলিয়নও হয়ে যেতে পারে। পড়ে থাকা কর্সিকানটার কথাই সত্য প্রয়োগিত হলো। সোনার এই বারগুলো সে আয়ারল্যান্ডে নিজের কোনো একটা ক্ষাক্ষে রেখে দেবে ভেবেছে, ব্রিটিশ ইস্পেক্টরদের নাগালের বাইরে। এই চকচকে ধাতু গলিয়ে টাকা বানানোর কোনোই দরকার নেই, অন্তত এখন তো নয়। সারা বিশ্বে সোনার দাম বাড়ছে হ হ করে, বুঝে নেওয়া যায় সামনে এ দাম আরও বাড়বে, আর সব বাদ দিলেও, সোনায় বিনিয়োগ করাটা কোনো দিক দিয়েই লোকসান না। তার কাছে এখন যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তা বন্ধক রেখে অন্যাসে প্রয়োজনের সময়ে বড় অঙ্কের টাকার ব্যবস্থা করা যাবে।

সব মিলিয়ে একটা দুর্দান্ত সংক্ষ্যা :

আর্কিমিডিসের প্রধান কামরায় তুকল অ্যাশবি। দুই সারি সোফার মাঝের টেবিলে কর্সিকানের খাওয়া রামের গ্লাসটি এখনো পড়ে আছে। ওটা হাতে তুলে বাইরে ডেকের দিকে এগিয়ে গেল সে, তারপর একটানে সাগরের জলে ছুঁড়ে মারল ওটা। ঐ জোচোর কর্সিকানের গ্লাসে অ্যাশবি নিজেও পান করবে, এটা সে ভাবতেই শরীর ঝঁঁলে যাচ্ছে। লোকটা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল সোনা আর এক মিলিয়ন ইউরোর দুটোই হাতাতে। এমনকি হাতেনাতে ধরা খাওয়ার পরও এই মিথ্যুক চালবাজি করেই গেছে।

“স্যার।”

ঘুরে দাঁড়ালো সে। স্যালুনের ভেতরেই এসে দাঁড়িয়েছে গিল্ডহল।

“সেই ম্যাডাম ফোন দিয়েছেন।”

এটার আশাতেই ছিল অ্যাশবি, তাই দেরী না করেই পাশের লাউঞ্জের দিকে পা বাড়াল সে এই ঘরটাও দারুণভাবে সাজানো। দামী কাঠের চকচকে ফার্নিচার,

তুলতুলে কাপড়ের কভার, চাদর, দেওয়ালটাও ঢাকা অসাধারণ স্প্লিট-স্ট্রি মারকুয়েটি দিয়ে। অ্যাশবি একটা ক্লাব চেয়ারে বসে ফোনটা তুলল।

“ব্যুউজ্যু, গ্রাহাম,” ফরাসি ভাষায় সম্ভাষণ জানালো এলিজা লাঘক।

“এখনো কি আকাশে তুমি?” ফরাসি ভাষায় জিজ্ঞেস করলো সে।

“হ্যাঁ, এখনো। কিন্তু ভ্রমণটা দারুণ হয়েছে। মিস্টার ম্যন্ট্রিয়ানি আমাদের সাথে কাজ করতে রাজি হয়েছে। সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার টাকা-পয়সা এই প্রজেক্টের জন্য ডিপোজিট করে দেবে, তাই এটা সামলানোর জন্য প্রস্তুত থেক।”

“তোমার অনুমানই সত্যি হলো।”

“একে দিয়ে আমাদের দারুণ কাজ হবে। আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়েছে এতো সময়, সব ইতিবাচক।”

কিছু হোক, বা না হোক, এলিজা লাঘকের দারুণ ক্ষমতা আছে মানুষ পটানোর কাজে। কিছুদিন আগে মেয়েটা অ্যাশবির এস্টেটে এসে তার সাথে দেখা করে, তিনি দিন ছিল তার বাড়িতে, তখন যে কত রকম কথা-বার্তা বলেছে, আর কত কী আকাশ-কুসুম কল্পনা করেছে, তার ঠিক নেই। মেয়েটা দারুণ প্ররোচিত করতে পারে। অ্যাশবি খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছে, তার বংশটা আদি থেকেই বড়লোক। তার ~~পুরুষ~~ পুরুষেরা প্রথমে বিদ্রোহীদের কাতারে নাম লেখিয়েছিল, তারপর সেখান থেকে ~~কে~~ মেই অবস্থার উন্নতি হয়ে অভিজাত শ্রেণীদের দলে চুকে যায়, তারপর ফরাসি ~~বিশ্ববৰ্বের~~ সময়ে উত্তাল সংগ্রামে নিজেদেরকে না জড়িয়ে কৌশলে গা ঢাকা দেয়, ~~ভুবনেশ্বর~~ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার ফিরে আসে। অর্থ বা অর্থনীতি মেয়েটার ~~পুরুষ~~ ধ্যানজ্ঞান। ইউরোপের তিনটে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার ডিগ্রী নেওয়া। তার ~~পুরুষবারিক~~ ব্যবসাগুলো নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সে, নিজেকে খুব দ্রুত সব কিন্তু সাথে মানিয়ে নিয়ে অভিজ্ঞতার দারুণ প্রয়োগ ঘটিয়েছে। বেতার যোগাযোগ ক্ষমতা, পেটোক্যামিকাল, এবং রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় সে-ই এখন রাজত্ব করছে। ফোর্বস ম্যাগাজিন তার সম্পদের আনুমানিক মূল্য ধরেছে প্রায় কুড়ি বিলিয়ন ইউরো। অ্যাশবির কাছে তার টাকার পরিমাণটা বিশাল মনে হয়েছে সব সময়, কিন্তু লাঘক কখনোই ঠিক করে বলেনি আসল পরিমাণটা কত। কখনো প্যারিসে, আবার কখনো দক্ষিণের লহঘ ভ্যালীতে থাকে সে। বিয়ের পিঁড়িতেও বসেনি কখনো, আর এটাই কেমন যেন অদ্ভুত লাগে অ্যাশবির কাছে। মেয়েটার ভাষ্য অনুযায়ী ক্লাসিক্যাল আর্ট আর কন্টেম্পরারি মিউজিকের প্রতি তার ভালবাসা রয়েছে।

তাহলে তার ক্রটিটা কোথায়?

চোখের পলকে সে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

ব্যাপারটা সে এভাবে দেখে যে, কিছু পেতে হলে এই হিংস্রতার কোনো বিকল্প নেই।

অ্যাশবি হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, যেটার সামনে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই, তবে আজ রাতে সে যেটা করেছে, সেটা এমনিতেই করতে হতো। এটা যদিও হিংস্রতা, তবে সাধারণত সেটার প্রয়োগে একটু পরিবর্তন আনে সে।

“তোমার ছুটি কেমন কাটছে?” লাঘক জিজ্ঞেস করলো তাকে।

“দারুণ, ভূমধ্যসাগরে চমৎকার একটা ভ্রমণ দিলাম। এ জাহাজটাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। এমন উপভোগ্য ভ্রমণ খুব কমই করেছি আমি।”

“আমার আবার এতো ধীর গতি পছন্দ হয় না, গ্রাহাম।”

এদের প্রত্যেকেই নিজ-নিজ বাহনকে ভালবাসে। লাঘকের আসক্তি বিমানের উপর। অ্যাশবি শুনেছে যে কিছু দিন হলো, সে একটা গালফস্ট্রিম বিমান কিনেছে।

“সোমবারের মিটিঙে আসতে পারবে?” জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা।

“এখন আমরা যাচ্ছি মাসেইতে। ওখান থেকে বিমান ধরব।”

“হ্ম, তাহলে তো তোমার সাথে দেখা হচ্ছে।”

ফোনটা রেখে দিল অ্যাশবি।

সে এবং লাঘক মিলে একটা দলগত কাজে নেমেছে। চার বছর আগে মেয়েটার এই সংগঠনে যোগ দিয়েছিল সে, কৃড়ি মিলিয়ন ইউরো ভর্তি ফি দিয়ে। দুর্ভাগ্যবশত সে সময় থেকে তার অর্থনৈতিক অবস্থাটা বেশ সংকটের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। যার জন্য তার বাধ্য হয়ে পারিবারিক জমানো টাকায় হাত দিতে হয়েছে। তার দাদা বেঁচে থাকলে নির্বাধের এমন ঝুঁকি নেওয়ার জন্য অ্যাশবির কপালে দুর্ভোগ ছিল। অন্য স্তুবা বেঁচে থাকলে বলত, আরে তাতে কী? লাগলে আরও নাও। বাপ-দাদার এই বৈপরীত্যের কারণে অনেক দিক থেকেই অ্যাশবির বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা দুল্যমান অবস্থায় আছে। যদিও দু'জন অনেক আগেই গত হয়েছে, তবু অনেক এই দু'জনকেই তার কাজ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে চায়।

হারানো প্রাচীন সম্পদ খুঁজে বের করার লস্ট অ্যান্টিকুইটিস দলের সদস্যরা যখন ধরা পড়ল, তখন সেটা ধারাচাপা দিতে গিয়ে অ্যাশবি প্রায় ফতুর হতে বসেছিল, ইন্টারপোলের মতো ইউরোপোলকে সামাল দেওয়া চান্তিখানি কথা না। কিন্তু সে পেরেছিল। আর রাজনৈতিক উপর মহলের হাত থাকায়, ও উপর্যুক্ত প্রমাণাদি না পাওয়ায় ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছে সে। নানান রকম প্রাচীন মূল্যবান জিনিসে ভরা তার গোপন ভাণ্ডারের কথা কেউ জানতে পারেনি, ওটা আগের মতোই আছে। কিন্তু শেষ রক্ষার জন্যও ওতে হাত দিতে পারেনি সে।

তবে এবার পারবে ওটা। তার হাতে এখন কয়েক বাল্ক সোনা।

ঝামেলা মিটে গেছে।

অন্তত সামনের আসছে দিনগুলো নিয়ে যত দিন ভাবা যায় তত দিন পর্যন্ত কোনো চিন্তা নেই তার।

সে দেখল, কর্সিকানের আনা নেপোলিয়নকে নিয়ে লেখা *Napoleon, From the Tuilleries to St. Helena* বইটা চেয়ারের উপর রাখা। জাহাজের এক কর্মী ওটা রেখে গেছে, সাথে একটা স্যুটকেস, আবারও সেই এক মিলিয়ন ইউরো, সাময়িক যাত্রা শেষে আবারও ফিরে এসেছে ঘরে।

বইটা হাতে নিল সে।

কর্সিকায় জন্ম নেওয়া এক অধ্যাত, সাদামাটা পরিবারের এক শিশু কিভাবে এমন উচ্চতায় পৌছালো? যেখান থেকে একে-একে গড়ে উঠেছিল ফরাসি সাম্রাজ্যের একশ ত্রিশটি *départements*, ছয় লক্ষ সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী, যারা শাসন করেছে সাত কোটি মানুষকে। আর এমন এক দুর্ধর্ম মিলিটারি বাহিনী যেটা চমে বেড়িয়েছে জার্মানি, ইটালি, স্পেন, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়াতে। আর ঐসব অভিযান থেকে নেপোলিয়ন যে অপরিসীম সম্পদের লুট চালিয়েছে, তা মানব ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। যে দেশই জয় করেছে, সেই দেশের একেবারে আগাগোড়া পর্যন্ত হাত চালিয়েছে সে। মূল্যবান ধাতু, আঁকা ছবি, রত্ন, রাজদণ্ড, দেওয়াল ঢাকার পর্দা, মুদ্রা-যেকোনো রকমের যেকোনো কিছু কজা করেছে সে ফ্রান্সকে আরও মহিমাবিত করার জন্য।

যদিও ওয়াটারলু যুদ্ধের পর এগুলোর বেশীরভাগই ফেরত দেওয়া হয়েছিল।
কিন্তু সবুকু না।

যা অবশিষ্ট ছিল, তা নিজেই কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বইটা খুলে কিছু দিন আগে পড়া একটা অংশ মেলে ধরল সে। গুস্তাভ স্বেচ্ছায় তার কপিটা দিয়ে দিয়েছিল তাকে যখন কথা মতো এক মিলিয়ন ইউরো তার হাতে গুঁজে দেওয়া হলো। বইটা লিখেছিল লুইস এতিয়েন সেইন্ট মেন্সেন্স নামের নেপোলিয়নের একজন খানসামা, যে আঠারোশ ছয় থেকে আঠারোশ একুশ পর্যন্ত নেপোলিয়নের সেবা করেছে। নির্বাসনে পাঠানোর সময়ে সে স্বেচ্ছায় নেপোলিয়নের সাথে প্রথমে এলবায়, তারপর সেন্ট হেলেনায় যায়। যেহেতু নেপোলিয়নের লিখনশৈলী ছিল খুবই বাজে, তাই সে-ই সব রকম লেখা-কোকাস স্কার্জ করত। প্রতিটা লেখাই পরিচ্ছন্নভাবে তুলেছে সে নতুন করে। স্ম্যাটের লাইব্রেরি দেখাশুনা করার দায়িত্বও ছিল তার। সেন্ট হেলেনায় লেখা প্রায় সব কিছুই তারে নিজের হাতে লিখতে হয়েছিল। সেইন্ট দেনিসের আত্মজীবনীটা বেশ প্রলুক্ষ করেছিল অ্যাশবিকে। বিশেষ করে একটা অধ্যায় মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল তার। আবারও সেই পৃষ্ঠাটা খুঁজে পেল সে।

সেন্ট হেলেনাকে একটুও ভালো লাগে না স্ম্যাটের। ব্রিটিশদের দখল করা জগতের ম্যাপের বুকে একরতি একটা ফোঁটার মতো জায়গা। একে তো আফ্রিকার পশ্চিমে, দ্বিতীয়ত বড়-বৃষ্টি লেগেই থাকে সারা সময়। তার উপর আবার সারাটা দ্বীপ খাড়া পাহাড়ে ঘেরা। জেলখানার মতো এই দ্বীপ তার কাছে সেই আঠারোশ পনের সালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম লেগেছে। “একেবারে বিচ্ছিরি, নিরানন্দ একটা জায়গা। মিশরে থাকলে চের ভালো করতাম আমি।”

কিন্তু এত যন্ত্রণাময় বিচার নেপোলিয়ন মাথা পেতে নিলেও, ফেলে আসা দিনগুলোতে তার দুর্দান্ত ক্ষমতার স্মৃতিগুলো তাকে খুব আনন্দদায়ক, ও তৃপ্তির মাঝে ডুবিয়ে রাখে সব সময়। “আমার সারা জীবনের অর্জন চেলে দিয়ে,” তিনি বলেন, “ফরাসিদেরকে আমি বিশেষ সবচে সেরা মানুষে রূপান্তর করেছি। আমার সারা জীবনের চাওয়া একটাই-ফরাসিরা যেন হাতিয়ারের মজুদ সহ বিজ্ঞান ও শিল্পকলায়

পার্সিয়ান, গ্রীক ও রোমানদের থেকে এগিয়ে থাকে। ফ্রান্স এমনিতেই পৃথিবীর সবচে সুন্দর, সবচে উর্বর দেশ। এক কথায় বলতে গেলে, প্রাচীন রোম যেমন সারা বিশ্বকে শাসন করেছিল, তেমন করেই আমরা শাসন করতে পারতাম। আর আমি সে পর্যন্ত যেতেও পৌঁছেও যেতাম, যদি না একের পর এক বাধার সৃষ্টি করত ঐসব ষড়যন্ত্রকারীরা, এই হতচাড়া, দুর্নীতিবাজ গোঁয়ার-গোবিন্দরা। টাকার গক্ষে পাগল হয়ে গেল সবগুলো, আর শেষ পর্যন্ত আমার এই উন্নয়নের যাত্রা থামিয়েই দিল। এরা একটুও বুঝল না যে গোটা ইউরোপের প্রায় পুরোটাই দখলে আনা ও সেই মানুষগুলোকে অভিন্ন আইনের ছায়াতলে এনে বশ করা চাইখানি কথা না। যদি কোনো জাতি কোনো শিক্ষিত, তথা আলোকিত সরকারের ছায়াতলে থাকে, তবে এক দিন সেই জাতি নতুন আরেক জাতিকে সেই ছায়াতলে টেনে আনতে পারে, এরকম করে এক সময় সব জাতি একটা পরিবারে রূপান্তরিত হবে। আমার জীবনেও যদি এরকমটাই হতো, তাহলে আমি এমন এক সরকার গঠন করতাম যেটার মাঝে কোনো স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বেচ্ছাচারী কোনোটাই থাকত না। তাই খামখেয়ালিপনা নিয়ে কারো কোনো ভয় থাকত না, প্রত্যকেই সমান আইনের শাসন পেত। ক্ষমতার জোরে সুবিধা তোগের রাস্তা বন্ধ করে দিতাম, জোর দিতাম শুধুই মেধা আর জ্ঞানের উপর। কিন্তু এমনটায় ভেটো দেওয়ার লোকও আছে। সবাই যে এমন চাইবে না, এইই স্বাভাবিক। টাকাওয়ালা ব্যারনদের সীমাহীন লোভ সেই গুটিকয়েক ভেটো দেওয়া মানুষের মূর্খতার সুযোগে আরও বেড়ে গেল, ব্যারনেরা কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা দিল, আর সেগুলো নির্বাধের দল হাত পেতে নিল। কিন্তু আমার লক্ষ্যই ছিল মানুষকে পুরোপুরি ঝণমুক্ত করা। মানুষগুলো এটা বুঝল না যে আজ যারা ভালবেসে ঝণ দিচ্ছে, তাদের আসল লক্ষ্যটা কত গভীরে লুকিয়ে আছে। আরে, ঝণের টাকায় কোনো দিনও জীবন চালান যায়? এই সহজ বিষয়টা বোঝা গেল না! আর আমি এটার বিরুদ্ধেই কথা বলেছিলাম। টাকার কী ক্ষমতা যে এটা কোনো সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দেয়? কিন্তু সত্যিটা হলো এই যে এই টাকার কাছেই তারা বন্দী হয়ে পড়ে শুধুমাত্র তখন, যখন টাকা নাড়াচাড়া করার ক্ষমতাটা সরকারের হাত থেকে চলে যায় ব্যাংকারদের হাতে। যে হাত ঝণ দেয়, সেটা সর্বদা ঝণ নেওয়া হাতের ওপরেই থাকে। তাই বলি, টাকার কোনোই মা-বাপ নেই। কিন্তু যাদের হাতে এটা যায়, তাদের ভেতর না থাকে দেশপ্রেম, না থাকে কোনো আদব-কায়দা। ওরা চায়ই শুধু নিজেদের আখের গোছাতে।”

আশবি কখনো ভাবতে পারেনি যে টাকা ঝণ দেওয়ার বিষয়টাকে নেপোলিয়ন এতটা বিহেষী চোখে দেখে। তার পূর্বাপর সব রাজা-স্ন্যাটই ঝণের ফাঁদে পা দিয়েছে, যে কারণে তাদের পতনও হয়েছে দ্রুত। কিন্তু নেপোলিয়ন এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই, তার নিজেরই পতন হয়ে গেল আরও দ্রুত।

বেশ দুঃখজনক।

বইটার আরও একটা অধ্যায় তার মনোযোগ কেড়ে নিল।

বহু পুরনো হওয়ায় ও বহু হাত ঘোরায় বইটার অবস্থা বেশ নাজুক। পৃষ্ঠাগুলো হলদে হয়ে গেছে, ছিঁড়ে যায়-যায় অবস্থা। সাবধানে কয়েকটা পাতা উল্টে রাখল অ্যাশবি। নতুন একটা অধ্যায়, ভূমিকাতেই একটা সমালোচনামূলক রেফারেন্স দেওয়া। উনিশশ বাইশ সালে লেখা এটা, ইউনিভার্সিটি অফ প্যারিসের এক প্রফেসর লিখেছে।

সেইন্ট দেনিস মারা যান ১৮৫৬ সালে। মৃত্যুর সময়ে সিটি অফ সেনসে তিনি কিছু জিনিস রেখে যান। জিনিসগুলো তিনি তার সম্রাট নেপোলিয়নের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সংরক্ষণ করে আসছিলেন। ওগুলোর মাঝে ছিল *Fleury de Chaboulon* এর দুটো খণ্ড, সাথে নেপোলিয়নের নিজের হাতে লেখা কিছু নেট, দুটো মানচিত্র, যেগুলোর মাঝে নেপোলিয়ন পেপিল দিয়ে কিছু আঁকিবুঁকি করেছিলেন, ইটালির অভিযানের সব বৃত্তান্ত লেখা কাগজ-পত্র, *Merovingian Kingdom 450-751 A.D.* এর একটু কপি, নিজের সংগ্রহ করা কিছু পুরনো স্মারক, কাঁধের এপালুয়েট সহ একটা কোট, টুপির উপর লাগানোর একটা ফিতা, সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়নের কফিনের একটা টুকরো, এবং সম্রাটের সমাধির উপর জন্মানো উইলো গাছের একটা স্মৃতির সময়ে তার শেষ কথাগুলো ছিল পরিক্ষার, “আমার কন্যাগণ, তোমরা সব সময় মনে রাখবে যে আমি যেমন আমার সম্রাটের দয়া, অনুগ্রহে বেঁচে ছিলাম, তেমন্তেও ঠিক তারই অনুকম্পায় বেঁচে থাকবে। কারণ যা কিছু সম্পদ আমার হয়েছে আজ, তার বড় একটা অংশই আমার সম্রাটের দেওয়া, তার মহানুভবতার প্রতি আমি আজীবন কৃতজ্ঞ।”

•••

অ্যাশবি আগেই শুনেছিল যে সেইন্ট দেনিস মারা যাবার সময় সিটি অফ সেনসে কিছু রেখে গিয়েছিল। *Fleury de Chaboulon*’র দুটো খণ্ড। কয়েকটা ম্যাপ। ইটালি অভিযানের উপর লেখা ভাঁজকরা কাগজের কিছু নথিপত্র। কিন্তু *The Merovingian Kingdom 450-751 A.D.?*

এটা নতুন জিনিস।

হয়তো সে যে উক্তরটা খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটা এর মাঝেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

সতের ডেনমার্ক

থ্রান্ডসেন তার একমাত্র সন্তানের ঘরে এসেছে একটু শক্তি, একটু সাহস পাওয়ার জন্য। সমস্যা সমাধানের মুহূর্তটা সমাগত। খুব সতর্কতার সাথে, হিসেব করে পরিকল্পনা করেছে সে, সম্ভাব্য সব রকম গতিপথ ও সেগুলোর কার্যকারিতা খুব সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করেছে। তার মন থেকেই সায় আসছে যে এখন সে পুরোপুরি

প্রস্তুত। তালিকায় শুধু এখন কটন ম্যালনের সাহায্য নেওয়ার কথাটা যোগ করা বাকি। তার বাস্তবী ক্যাসিওপিয়াকে সে ফোন দিয়ে জানাতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে এই চিন্তা বাদ দিয়েছে। মেয়েটা তাকে নির্ধাত এগুলো করতে মানা করবে হয়তো বলবে যে এটা এভাবে না করে ঐ ভাবে কর। কিন্তু ম্যালন ওরকম না, সে বুঝবে। বিশেষ করে গত কয়েক সপ্তাহে যা ঘটেছে, সেগুলো সে-ই ভালো জানে সবচে।

“মে মাসের পাঁচ তারিখ, আঠারোশ একুশ সাল, গ্রন্দিন সকাল ছয়টার ঠিক পরেই নেপোলিয়ন মারা গেল, যন্ত্রণাহীন মৃত্যু,” ম্যালনকে বলতে শুরু করেছে হেনরিক। “সেখানে উপস্থিত একজন লিখেছিল, বাতিটা নিভে যাওয়ার সাথেই নেপোলিয়নও চলে গেল। সেন্ট হেলেনায় কবর দেওয়া হলো তাকে, কিন্তু আঠারোশ চল্লিশ সালে তার সমাধি স্থানান্তরিত করা হলো প্যারিসের *Hôtel des Invalides*-এ, যেখানে এখনো সে শায়িত। কেউ বলে তাকে ধীরে-ধীরে বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলা হয়েছে। আবার কারো মতে এটা স্বাভাবিক মৃত্যু। কেউই ঠিক জানে না। অবশ্য এতে কিছু আসে যায় না।”

বইয়ের তাকগুলোর একটা থেকে ঘুড়ির একটা লেজ ঝুলছে, হেনরিকের চোখে পড়ল। গ্রীষ্মের এক দুপুরে সে এবং সাই মিলে ঘুড়ি উড়িয়েছিল, অনেক দিন আগের কথা। এক ঝলক আনন্দের স্নোত বয়ে গেল তার ভেতর দিয়ে-খুব দুর্লভ শুক স্মৃতি, একই সাথে সুখের ও বুক কাঁপিয়ে দেওয়ার অনুভূতি।

জোর করে মনোযোগ ফিরিয়ে আনল আগের আলোচনায়। তারপর দম নিয়ে বলল, “নেপোলিয়ন যে কী পরিমাণ জিনিস চুরি করেছে, কোনো হিসেব করা অসম্ভব। মিশরে যাবার পথে সে মাল্টা জয় করে, তারপর ক্ষেত্রে দেশ থেকে মুদ্রা, মূল্যবান ছবি, ঝল্পোর থালা-বাসন, রত্ন, এবং মাল্টার নাইটদের ক্ষাত্র থেকে পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মূল্যমানের সোনা হাতিয়ে নেয় সে। ইতিহাস বলে মুটপাটের এইসব কিছুই সাগরে হারিয়ে যায় যখন আবুকির বে যুদ্ধ হলো, তখন। ভাবলে অবাক লাগে না বল, যে কিভাবে আমরা একেকটা যুদ্ধকে মহান তকমাটা জুড়ে দেই? ব্রিটিশরা যখন সতেরশ আটানবই সালে ফরাসি নৌবহর গুঁড়িয়ে দিল, সতেরশ নাবিক মারা গিয়েছিল। তারপরও আমরা এই ঘটনাগুলোকে বড়-বড় উপাধি দিয়েই চলেছি, যেন একেকটা উপন্যাস।”

একটু থামল সে।

“মাল্টা থেকে নেওয়া ধন-সম্পদ তোলা হয়েছিল যে জাহাজে, সেটা ডুবে যাওয়া জাহাজগুলোর মাঝে একটা ছিল, তবে কেউই জানে না যে আসলেই সেটা ডুবেছিল কিনা। লুটপাটের আরও কাহিনী শোনা যায়। ঘৰবাড়ি, রাজপ্রাসাদ, জাতীয় কোষাগার কোনো কিছুই নাকি বাদ যায়নি নেপোলিয়নের সৈন্যদের থেকে। এমনকি ভ্যাটিকানও। নেপোলিয়নই একমাত্র ব্যক্তি ছিল যে কিনা চার্চের সম্পদ পূর্ণভাবে হাতিয়ে নিয়েছিল। লুঠের কিছু অংশ ফ্রাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিল, বাকি অংশ পারেনি। আর এসবের কোনো আনুষ্ঠানিক তালিকাও ছিল না। আজকের দিনেও ভ্যাটিকানের কাছে এমন অনেক কিছুরই কোনো হিসেব নেই।

একদিকে কথা বলছে হেনরিক, অন্য দিকে এই পরিত্র ঘরের মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা আত্ম-রূপী স্মৃতিগুলোর সাথে যুদ্ধ করে চলেছে সে। ওদের উপস্থিতি যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে কত মূল্যবান সম্পদ হারিয়েছে তার জীবন থেকে। তার খুব ইচ্ছা ছিল, সাই তার সবকিছুর হাল ধরুক যোগ্য উত্তরসূরির মতো, কিন্তু তার ছেলে নেমে পড়ল সরকারি চাকরিতে। হেনরিক নিজেও যুবক বয়সে এমন পেশায় নিজেকে জড়াতে চেয়েছিল। সেটা অনেক বছর আগের কথা, সে একবার বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছিল, তখন তার মাথায় এমন চিন্তা আসে প্রথম। হেনরিক অবাক হয়ে ভাবে, দুনিয়াটা কত বদলে গেছে এখন। তার সময়ে মানুষ আজকের দিনের মতো এমন দিনে-দুপুরে খাবার খেতে-খেতেই খুন হত না।

“মৃত্যুর সময় নেপোলিয়ন বেশ বড়-সড় একটা উইল রেখে যায়। দীর্ঘ সেই উইলে বিপুল পরিমাণ অর্ধের কথা উল্লেখ থাকে, লেখা থাকে কে কতটা পাবে। একটা হিসাবে দেখা যায়, সেটার পরিমাণ প্রায় তিন মিলিয়ন ফ্রাঙ্কস। উইলে উল্লেখিত বেশীরভাগ মানুষই নিজের ভাগের অংশটুকু পায়নি, কারণ টাকা আসবে কোথা থেকে, বল? নেপোলিয়ন তো উইলে লিখেই খালাশ, কিন্তু তার নিজের অবস্থাটাই ভাব একবার। সেন্ট হেলেনায় বন্দী, সিংহাসন হারিয়ে নিঃস্ব-এমন একজনের কি-ই বা থাক্কচু পারে? নির্বাসনের সময় সাথে কিছু ছিল না বললেই চলে। কিন্তু তার এমন ঝাজকীয় উইলটা পড়লে তাকে তোমার উচ্চ পর্যায়ের সম্পদশালীই মনে হবে। তবে এমনও জেনে রাখ যে, কেউই চায়নি নেপোলিয়ন জীবিত অবস্থায় সেন্ট হেলেনা থেকে যিবাক।”

“আমি এখনো ঠিক বুঝি না যে ব্রিটিশরা তাকে কেন্দ্রে মেরে ফেলল না,” ম্যালন বলল। “সে তো মৃত্যুমান বিপদ ছিল তাদের জন্য। তাকে যখন প্রথমবারের মতো নির্বাসনে পাঠানো হয় এলবায়, সেখান থেকে প্রালয়ে গিয়ে ইউরোপে ফিরে কী তাওবই না চালাল সে।”

“কথা সত্যি! আর দেখ, সে যখন ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো, অনেক মানুষ অবাক হলো। সে আমেরিকায় যেতে চাইল, তাকে যেতে দিতেও রাজি হলো তারা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিল ইংরেজরা। তুমি ঠিকই বলেছ, নেপোলিয়ন একটা সাক্ষাৎ বিপদের নাম। তার তাওব দেখে মানুষের হয়ে গিয়েছিল, কেউই আর যুদ্ধ-বিন্দু চায়নি। কিন্তু তাকে মেরে ফেললে আরও কিছু সমস্যার উদয় হতো। এক নম্বরে, তাকে মেরে ফেললে তাকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া লাগত। যেটা ব্রিটিশরা চায়নি। তারপরও কিন্তু নেপোলিয়ন যথেষ্ট সম্মানিত লোক ছিল; এমনকি তার পরাজয়ের মুখেও তাকে অর্মর্যাদা করেনি অনেক ফরাসি ও ব্রিটিশরা। অবশ্য, এটার একটা ব্যাখ্যাও আছে।”

ডেসারের উপরে লাগানো আয়নাটায় তার মুখের প্রতিবিম্বটা চোখে পড়ল ম্যালনের, শক্তি আর উত্তেজনা খেলা করছে তার প্রবীণ বন্ধুটির চোখ দুটোতে।

“বলা হয়ে থাকে যে সে একটা বিশেষ কিছু জানত যেটা সে গোপন রেখেছিল, আর সেটাই ব্রিটিশরা জানতে চেয়েছিল তার কাছ থেকে। অকল্পনীয় পরিমাণ লুট করা সম্পদ,

টাকা-পয়সা, সবকিছুই ইংরেজরা নিজেদের কজ্যায় নিতে চেয়েছিল। নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধের খরচটা অনেক বেশী ছিল, তাই সেটা পোষানোর জন্যই নেপোলিয়নকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল

“দর কষাকষি করতে?”

কাঁধ ঝাঁকাল হেনরিক। “বরং বলতে পার, নেপোলিয়নের ভুল করে ফেলার অপেক্ষায় ছিল ওরা, কোনোভাবে যদি একবার সে বলে দেয়, সেই লুকিয়ে রাখা সম্পদের অবস্থান!”

“হ্ম, সেন্ট হেলেনায় থাকাকালীন সময়ের কথা আমি পড়েছি,” ম্যালন বলল। “নেপোলিয়ন এবং ব্রিটিশ কমান্ডার হাডসন লউয়ের ভেতরে উইল নিয়ে বেশ ঝামেলা চলেছিল। লউ নেপোলিয়নকে জেনারেল বলে সম্মোধন করত। কিন্তু সবাই বলত জঁহাপনা, বা ইয়োর ম্যাজেস্টি বলে। এমনকি নেপোলিয়নের মৃত্যুর পরও, লউ চায়নি যে ফরাসিরা তার সমাধির উপর নেপোলিয়ন শব্দটা লিখুক। সে আসলে নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে রাজনৈতিকভাবে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত তাকে কোনো নামফলক বিহীন একটা কবরে শোয়ান হয়।”

“মানুষ হিসেবে নেপোলিয়ন একজন উল্টাপাল্টা স্বভাবের ছিল, এন্টি সত্যি,” থ্রিভান্ডসেন বলল। “কিন্তু তার উইলটা খুব পরিচ্ছন্নভাবেই লেখা হয়েছিল, তার মৃত্যুর তিনি সঙ্গাহ আগে। উইলে নেপোলিয়ন তার ভূত্য সেইন্ট দেনিসকে বলে গিয়েছিল যে কোথায় এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক রাখা আছে। শুধু তাই না, উইলে নেপোলিয়ন স্পষ্ট আদেশ দিয়ে গিয়েছিল দেনিস যেন সেই মুদ্রাগুলো নিয়ে আসে, তারপরে *The Merovingian Kingdoms 450-751 A.D.* বইটাও সংগ্রহ করে রাখে। নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতেও অনেক বই ছিল সেখান থেকে তাঁর প্রিয় চারশটা বইও আনার কথা উল্লেখ করে সে। আর এসব কিছুই সেইন্ট দেনিস যেন নিজের কাছে যত্ন করে রাখে, সেটাও ভালো করে বলেছে নেপোলিয়ন। তারপর নেপোলিয়নের ছেলের বয়স ঘোল হলে সবকিছু দেনিস তার ছেলের কাছে হস্তান্তর করলেই তার দায়িত্ব শেষ। যদিও তার ছেলে একুশ বছর বেঁচেছিল, কিন্তু সে কার্যত বন্দীই ছিল একরকম, মারাও যায় বন্দী অবস্থায়, অস্ত্রিয়াতে। বইগুলো একনজর দেখার ভাগ্যও হয়নি তার।”

কঠে ক্রোধ ফুটে উঠল থ্রিভান্ডসেনের, নিজের সব ভুলের কথা মনে পড়ে গেল নেপোলিয়ন সম্পর্কে লেখা প্রায় প্রতিটা নথিপত্রই সাক্ষ্য দেয় যে সে তার একমাত্র ছেলেকে কী পরিমাণে ভালবাসত। তার প্রথম স্তৰী জোসেফিনকে ডিভোর্স দিয়ে অস্ত্রিয়ার ম্যারি লুইসকে বিয়ে করে সে, শুধুমাত্র একজন যোগ্য পুরুষ উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য, যেটা জোসেফিন তাকে দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। নেপোলিয়নকে যখন সেন্ট হেলেনা দ্বাপে নির্বাসিত করা হয়, তখন তার ছেলের বয়স মাত্র চার।

“লোকে বলে, ওই বইগুলোর মাঝেই কিছু সূত্র লুকানো আছে যেগুলো ধরে নেপোলিয়নের নিজের জন্য জমা করা ধন-সম্পদের নাগাল পাওয়া যেতে পারে। যে

ভাণ্ডার স্মাটের নিজের গড়া, আর সেগুলো কোথায় লুকানো সেটা শুধু সে-ই জানে।
অপরিমেয় সম্পদ সেখানে, বুঝলে?”

আবারও একটু বিরতি নিল হেনরিক।

“নেপোলিয়ন একটা পরিকল্পনা করেছিল, কটন। আর সে আশাও করেছিল যে
সবকিছু তার পরিকল্পনা মাফিক হবে। তোমার কথাই ঠিক, সে আসলে ব্রিটিশ কমান্ডার
লউ-এর সাথে তার এই সম্পদ নিয়ে একরকম লুকোছাপার খেলা খেলতে চেয়েছিল,
কিন্তু সেন্ট হেলেনায় থাকাকালীন কোনোকিছুই ঠিকমত মিটমাট করা যায়নি। সেইন্ট
দেনিস ছিল তার সবচে বিশ্বস্ত ভূত্য, আর আমি হলফ করে বলতে পারি, এই মানুষটার
কাছেই নেপোলিয়ন তার সবচে মূল্যবান সম্পদটি দিয়ে গিয়েছিল।”

“বুঝলাম, কিন্তু এর সাথে গ্রাহাম অ্যাশবির কী সম্পর্ক?”

“সে ওই সম্পদেরই পেছনে লেগেছে এখন।”

“কিভাবে জানলে?”

“আমি যে জানি, এটা বলাই যথেষ্ট। সত্যি বলতে, অ্যাশবির আসলেই এরকম
একটা দান মারা খুব প্রয়োজন। অথবা আরও যদি পরিষ্কারভাবে বলি, প্যারিস ক্লাবের
দরকার এই সম্পদের। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা একটা মেয়ে, নাম এলিজা^{লাইক}, আর
তার কাছেই কিছু বিশেষ তথ্য আছে যেগুলো তাদেরকে সেই সম্পদের খোঁজ দিতে
পারে।”

সামনের ড্রেসার থেকে চোখ সরিয়ে নিল সে তাঙ্কে পাশের বিছানার দিকে
যেখানে সাই সারাটা জীবন ঘুমিয়েছে।

“এত কিছুর কী দরকার আছে?” জিজেস কলেজ ম্যালন। “ওদেরকে ওদের
মতোই চলতে দাও না।”

“তোমার বাবার খোঁজ করাও কি দরকার ছিল?”

“কিন্তু কাউকে মারার উদ্দেশ্যে তো আমি কাজটা করিনি।”

“ঠিক, কিন্তু তুমি খোঁজ তো করেছিলে।”

“সে অনেক পুরনো কথা, হেনরিক। কিছু বিষয়ের ইতি টানতে হয়।” শেষের
কথাগুলো গভীর বিষণ্নতায় ঘোড়া।

“সাইকে যেদিন কফিনে শোয়ালাম, সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে এই দিনে
ঘটে যাওয়া ঘটনার পেছনে আসল সত্যটা আমি খুঁজে বের করবই।”

“আমি মেঝিকো যাচ্ছি,” সাই সেদিন বলেছিল তাকে। “ওখানে আমাদের দৃতাবাসে
প্রধান সহকারী হিসেবে যোগ দেব।”

নিজের একমাত্র পুত্রের চোখে যে উত্তেজনা খেলা করছে তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে
হেনরিক, কিন্তু তারপরও প্রশ্নটা করতেই হচ্ছে তাকে। “হ্যাঁ, আর যখন সব করা শেষ
হবে, তখন? এই পরিবারের লাগাম কে ধরবে? আমি চাই, তুমি এই বিষয়টা মাথায় রাখ।”

“মনে হচ্ছে যেন তুমি আমায় আমার ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত নিতে দিচ্ছ।”

মনে-মনে আরও একবার মুঝ হলো তার ছেলের প্রতি। তেজী সৈনিকের মতো চওড়া দুটো কাঁধ, শরীরের বাঁকগুলো যেন একজন অ্যাথলেটের মতো। গাঢ় নীলচে চোখ দুটো তার নিজের চোখের মতোই, অনেক আগেই এটা পরিষ্কার হয়েছে। চোখ দুটোর দিকে তাকালে প্রথমেই মনে হবে যেন ছেলেমানুষ খেলা করছে সেখানে, কিন্তু সময় যত গড়াবে, ততই সেখানে ভারবুদ্ধির উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যাবে। অনেক দিক দিয়েই ছেলেটা তার স্ত্রী লিঙ্গেটের মতো হয়েছে। ওর সাথে কথা বলার সময় অসংখ্যবার তার মনে হয়েছে যেন সে লিঙ্গেটের সাথেই কথা বলছে।

“তোমার খুশি মতোই সিদ্ধান্ত নেবে তুমি, আমি বাধা দেব না,” পরিষ্কারভাবে বলল হেনরিক। “আমি বিশ্বামৈ যেতে যাই, অনেক হলো।”

মাথাটা দোলাল সাই। “তোমাকে বিশ্বামৈ যেতে দিলে তো।”

হেনরিক তার ছেলেকে সেটাই শিখিয়েছে যেটা তার বাবা তাকে শিখিয়েছিল ছোটবেলায়। একজন মানুষকে বুঝে নেওয়া যায় সে জীবনে কী হতে চায় সেটা বিশ্বেষণ করে। আর তার ছেলেও তাকে ভালো করেই জানে, বোবে।

“মাত্র একটা বছর সরকারি চাকরী করবো,” বলল সে। “আমি কি অনুমতি পেতে পারি?”

অনুশোচনা ঘিরে ধরল তাকে।

আরও একটা বছর।

ম্যালনের দিকে তাকাল সে।

“কটন, অ্যামান্দো ক্যাব্রাল আমার একমাত্র সন্তানকে হোবেছে। সে নিজেও মরেছে এখন। কিন্তু গ্রাহাম আশ্বিন তার মতোই দোষী।

“তাহলে তাকেও সরিয়ে দাও, তারপর ছাড়ে এন্সেন্স।”

“এত সহজে না। প্রথমেই আমি তার কাছ থেকে মূল্যবান সবকিছুই ছিনিয়ে নিতে চাই। তাকে অপমান, অপদস্থ করে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাই। আমার যে যন্ত্রণা আমি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি সারাটা দিন, একই যন্ত্রণা ওকেও দিতে চাই।” একটু থামল সে। “কিন্তু এ কাজে তোমার সাহায্য দরকার আমার।”

“ধরে নাও তুমি পেয়ে গেছ।”

সামনে একটু এগিয়ে সে তার বন্ধুর কাঁধের উপর হাতটি রাখল।

“স্যাম এবং প্যারিস ক্লাবের কী হবে?” জিজেস করলো ম্যালন।

“ওটাও দেখে নেব। বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই। আমাদেরকে দেখতে হবে, ওদের ভেতরের কাহিনীটা কী। স্যাম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছে প্যারিসে থাকা তার বন্ধুর কাছ থেকে। আমি চাই তুমি ও স্যাম মিলে সেই বন্ধুর সাথে দেখা কর। যতটা পার আরও খোঁজ-খবর নাও।”

“হ্ম, আর আমরা যখন এই কাজে ব্যস্ত থাকব, তখন তুমি কী করবে? ওদের সবাইকে খতম করে দেবে?”

“নাহ, আমি ওদের সাথে যোগ দেব।

দ্বিতীয় খণ্ড

আঠার
প্যারিস, ফ্রান্স
তোক ১৪২৩

প্যারিস খুব ভালো লাগে ম্যালনের। তার কাছে এটা নতুন আর পূরনোর এক চমৎকার মেলবন্ধন, প্রতিটা বাঁকেই এক পরিবর্তনশীল প্রানবস্তু খেলা করে। ম্যাগেলান বিলেতে কাজ করার সময় এই শহরে অনেকবার এসেছে সে। আর এখন কোন পথে যেতে হবে সেটাও সে জানে, মধ্যযুগীয় ছোট-ছোট খুপরি ঘরকে ঘিরে আছে রাস্তাটা। তবে আজকে তার ভালো ঠেকছে না, তার একমাত্র কারণ এবারের কাজের ধরণটা একেবারেই অন্যরকম।

“তা, এই লোকটা সম্পর্কে কিভাবে জানলে তুমি?” স্যামকে জিজ্ঞেস করলো ম্যালন।

তার দু'জন কোপেনহেগেন থেকে মাঝ সকালের একটা বিমানে চড়ে সরাসরি চার্লস দে গলে বিমানবন্দরে এসে নেমেছে, তারপর ট্যাক্সি কষে জনবহুল ল্যাটিন কোয়ার্টারে এসেছে। এই নামটা অনেক আগে দেওয়া হয়েছে, এই জায়গাটার, যখন শুধুমাত্র একটা ভাষাই অনুমোদন পেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে ব্যবহার হওয়ার জন্য অন্য সবকিছুর মতো, ল্যাটিন ভাষার ব্যবহারও সিদ্ধ করেছিল নেপোলিয়ন, কিন্তু নামটা রয়েই গেছে। এটা প্যারিসের পঞ্চম প্রিভাগ। সেই শুরুর সময় থেকেই, জায়গাটা এখনো শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের তীর্থস্থান-শাস্তি ও নিরাপত্তার এক স্থান। কাছের বিখ্যাত সগবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারনায় মুখরিত থাকে চারপাশের পাথর বাঁধানো পথগুলো। আর থাকে পর্যটকেরা, যারা সাজানো-গোছানো, ঝলমলে দোকানপাট, ক্যাফে, গ্যালারী, বইয়ের দোকান এবং নাইটক্লাবের আকর্ষণে ভিড় করে এখানে।

“অনলাইনে আমাদের পরিচয় হয়েছিল,” স্যাম বলল।

ম্যালন শুনে গেল স্যামের কথাগুলো। জিমি ফড়েল নামক এক দেশত্যাগী আমেরিকান প্যারিসে এসেছিল ইকোনমিক্স নিয়ে পড়তে, পরে ওখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। তিনি বছর আগে GreedWatch.net নামে সে একটা ওয়েবসাইট খোলে, যেটা নিউ এজ, তথা আশির দশকের শেষের দিকে চালু হওয়া জীবনধারার মানুষের মাঝে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, সেই সব আগ্রহীদের কাতারে আরও যোগ দেয়

বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ের স্বার্থাবেষী চক্রান্তবাজের দল। আর প্যারিস ক্লাব হলো এই গুরুনেরই সাম্প্রতিক সৃষ্টি।

“ফড়েল ওখানে বসেই তার তথ্যগুলো নানান জায়গা থেকে সংগ্রহ করছে,” প্রভাসেন বলছিল তাকে, “এমন হতেও তো পারে যে, সেখানে গেলে আমাদের কাজে লাগাবার মতো তথ্য পাওয়া যাবে।”

এটার বিপরীতে পাল্টা যুক্তি দেখাতে পারেনি ম্যালন। অগত্যা, প্যারিসে আসতে রাজি হয়ে গিয়েছে সে।

“গ্রোবাল ইকোনমিক্সে মাস্টার্স করেছে ফড়েল, সগবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে,” স্যাম বলল তাকে।

“তা সেই ডিছী দিয়ে সে কী করেছে?”

তারা জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট একটা গির্জার সামনে দাঁড়ালো। *ST.-JULIENLE-PAUVRE* নামের এই স্থাপনাটা বোঝাই যাচ্ছে প্যারিসের সবচে পুরনো। ডানেই ডাউন রু গ্যালাস্ট, ম্যালন চিনতে পারল সারি-সারি পুরনো বাড়িগুলো দেখে-জায়গাটার নাম লেফট ব্যাংক। এখানকার বর্ণিল বাড়িগুলো সহজেই চোখে পড়ে। বামে প্রশস্ত রাস্তাটা নিয়ে চলেছে হাজারো ব্যস্ত মানুষদেরকে, রাস্তাটা প্রায় হলেই শান্ত সেইনে নদী, আর তার ওপারেই দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত নটর দেন ক্যাথেড্রাল। ক্রিসমাসের পর্যটকেরা ভিড় করেছে ওখানে।

“আমি ঠিক সেটা জানি না,” স্যাম বলল। “মনে আছে সে তার ওয়েবসাইট নিয়েই ব্যস্ত থাকে, যা করে সব ওখানেই। সারা দুনিয়ার জ্ঞানীতি নিয়ে যত ষড়যন্ত্র হয়, সে সব নিয়ে খবরা-খবর ছাপা হয় তাতে, বিরাট ব্লগার।”

“এই কারণেই তো কপালে চাকরী জোটে আছে।”

চার্চ পেরিয়ে সেইনে নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা, পায়ের নিচের পথটা বেশ পরিচ্ছন্ন, শীতের আলো সেখানে একটা আলো-ছায়ার ধারা তৈরি করেছে। ঠাণ্ডা একটা বাতাস এসে শুকনো পথের উপর দিয়ে ঝরা পাতা সরিয়ে দিল। স্যাম আগে থেকেই ফড়েল কে মেইল করে দিয়েছে যেন সে একটু সময় বের করে তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য, ফিরতি মেইলে তার সম্মতি ও সাক্ষাতের স্থানের বর্ণনা দেয় তার বন্ধু। যার ফলে ম্যালন ও স্যাম চলে এসেছে *37 Rue de Bucherie*। যেটা-ম্যালন আবিষ্কার করলো-স্ট্রেফ একটা বইয়ের দোকান-*Shakespeare & Company*.

এটাও ম্যালনের চেনা জায়গা। প্যারিসের প্রতিটা গাইড বইতেই পুরনো বইয়ের এই দোকানকে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হিসেবে দেখান হয়। উনিশশ উনিশ সালে প্রথম এটা চালু করে *Sylvia Beach* নামের এক বই বিক্রেতা ও প্রকাশক। সেটা ছিল প্যারিসের বল্ট বিভাগীয় শহরে। বিনামূল্যে বই পড়তে দেওয়ার মহানুভবতার কারণে বছরখানেকের মাঝেই নামকরা অনেক লেখকের আড়তাখানায় পরিণত হয় জায়গাটা। তাদের মাঝে ছিল হেমিংওয়ে, পাউল, ফিতজেরাল্ড, স্টেইন এবং জয়েস। চাল্লিশ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মান শাসনের অধীনে এটা বন্ধ হয়ে গেলে আর খোলা

হয়নি। পরে, পঞ্চাশ বছরেরও আগে *George Whiteman* নামের এক আমেরিকান প্যারিসের পঞ্চম বিভাগীয় শহরে এটা শুরু করে, এবং *Sylvia Beach* এর সম্মানে এটার নাম দেয়ঃ *Shakespaeare Co' Company*। এমন রূপান্তরের পরেও এটা এখনো সাধারণ মানুষের পাশাপাশি অনেক ভবঘূরে মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় একটা জায়গা।

“তোমার বস্তু কি বই পাগল?” জিজ্ঞেস করলো ম্যালন।

“আমার সামনে মাত্র একবার এই জায়গার নাম উল্লেখ করেছিল। তবে সে প্রথম প্যারিসে এসে এখানেই থাকত এই দোকানের মালিক এ রকম সুবিধা দিয়ে থাকে। ভেতরের বইয়ের তাকগুলোর মাঝে-মাঝে খাট পাতা আছে। চাইলে ওখানে শয়ে-বসে থাকতে পারবে, বিনিময়ে বইয়ের দোকানে টুকটাক কাজগুলো করে দেবে, আর দিনে একটা বই পড়বে। আমার কাছে এটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।”

একটু বাঁকা হাসি দিল ম্যালন।

এরকম পেইং গেস্টের কথা আগেও শুনেছে সে, অতিথির মতো থাকা, তবে পয়সা দিয়ে। যারা নিজেদেরকে প্রথম শ্রেণীর ভবঘূরে ভাবে, তারা মাসের পর মাস এ রকম জায়গায় থেকে যায়। প্যারিসে থাকাকালীন সময়ে সে অনেকবার এখানে এসেছে, তবে তার কাছে বেশী ভালো লাগত *Abbe' Bookstore* নামের পুরনো বইয়ের দোকানটা। এখান থেকে কয়েক ব্লক সামনেই স্টো। আর এখান থেকেই সে বেশ কিছু দুর্লভ বইয়ের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেছে।

কাঠের বানানো সামনের অংশের দিকে তাকিয়ে শুনেছে ম্যালন। এটাই যেন দোকানের আসল পরিচয় বহন করছে, যেন সব তাঙ্গৰ্ষ্যেরঙিন এই জীবন্ত মুখ্যবয়বে ফুটে উঠেছে তবে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে থাক্কা এই ভবনটাকে কিছুটা নড়বড়েই মনে হলো তার কাছে। গরাদহীন জানালাগুলোর নিচে, কাঠের বেঞ্চগুলো খালি পড়ে আছে। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা দূরে থাকা ক্রিসমাস বলে দিচ্ছে, কেন ফুটপাথে এত মানুষের স্রোত, আর কেনই বা একদল মানুষ দোকানটার মূল দরজা দিয়ে চুকচে আর বেরচ্ছে।

“আমাদেরকে সোজা উপরের তলায় চলে যেতে বলেছে,” বলল স্যাম, “ভালবাসার আয়নার কাছে। কে জানে কী স্টো!”

তারা চুকল।

বয়সের ছাপটা বেশ স্পষ্ট ভেতরটায়। ওক গাছের বিমগুলো বাঁকা হয়ে লেপটে আছে ছাদের সাথে, পায়ের নিচের টাইলসগুলোর কোনোটায় ফাটিল ধরেছে, কোনোটা ভেঙেছে। বইগুলো দেওয়াল জুড়ে ঝুলে থাকা তাকগুলোতে এলোমেলোভাবে গাদাগাদি করে আছে। আরও বইয়ের স্তুপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মেঝেতে। আলো আসছে পিতলের ঝাড়বাতির সাথে লাগানো বাল্বগুলো থেকে কোট, হাতমোজা আর মাফলারে মোড়ান মানুষগুলো বইয়ের তাকগুলো থেকে নানান রকম বই নেড়েচেড়ে দেখছে।

সে এবং স্যাম লাল রঙ করা একটা সিঁড়ি বেয়ে উপরের তলায় উঠে এল। একেবারে উপরে, বাচ্চাদের বইয়ের স্তুপের মাঝে একটা আয়না দেখা গেল। বেশ বড় ওটা। ম্যালন

দেখল, ওটা দেওয়ালের সাথে স্থায়ীভাবে লাগানো, আর ওটার গায়ে হাতে লেখা নানা রকম নোট লেগে আছে, সাথে আছে কিছু ছবি। বেশীরভাগই ধন্যবাদ জানিয়ে লেখা—তাদের পক্ষ থেকে যারা এখানে বছরের পর বছর থেকেছে। প্রতিটা নোটেই তাদের ভালবাসা ও আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। পড়লে স্পষ্ট বোধা যায় মানুষগুলো এই দোকানে অবস্থান করাটাকে এমন-সুযোগ-জীবনে-একবারই-আসে রকমেরই ভাবত। এত কার্ডের মাঝে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের একটা কার্ড তার নজরে এল, আয়নার একেবারে মাঝ বরাবর লাগানো সেটা।

স্যাম, গতবছরে আমরা যা বলাবলি করেছিলাম তা ভুলে যেও না।

মনে আছে তো, আমি বলেছিলাম যে ওই মানুষটার কথাই ঠিক।

এখন তার বইটার ভেতরে দেখ, ওটা বিজনেস সেকশনে রাখা আছে।

“কিসব ফাজলামো এগুলো?” বিড়বিড় করে বলল ম্যালন। “এই লোক কি অসুস্থ? মদ-গাঁজা খায় নাকি?”

“আমি জানি। ও আসলেই একটা ভিত্তি। আগে থেকেই এরকম ও। ওর সাথে আমার প্রথম কথা-বার্তা হবার আগেই আমাকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে আমি সত্যিই সিক্রেট সার্ভিসে চাকরী করি। আর তাও আবার প্রতিবারই কোনোকিছুর আদান-প্রদানের সময়ে নতুন-নতুন পাসওয়ার্ড দেওয়া লাগত।”

ম্যালন এবার অবাক হয়ে চিন্তা করছে—সমস্যা অনুপাতে এত নিরাপত্তির আদৌ কোনো দরকার আছে কিনা। তবু একবার ঝুঁকিটা আঁচ করতে চাইল সে, সহজে মেঝেটা পার হয়ে একটা দরজা খুলে নিচে যাওয়ার পথ ধরল, বেশ নিচু দরজাটা। ওটোর গায়ে কৌতূহলোদ্দীপক একটা কথা লেখা। একটা উপদেশঃ অপরিচিত আগস্টকের সন্তুষ্টি দুর্ব্যবহার কর না, হতেও তো পারে আড়ালে সে একজন ফেরেন্টা। একটা জানালার স্থানে এসে দাঁড়ালো সে—কোনো গরাদ বা লোহার শিক নেই ওটায়।

কিছুক্ষণ আগে যখন তারা চার্চ পার হয়ে এই দোকানের দিকে আসছিল, তখনই প্রথম লোকটাকে দেখে ম্যালন। লম্বা, ছিপছিপে গড়ন, পরনে ঢিলেচালা খাকি প্যান্ট, নীল রঙের কোমর অবধি ঝুলের একটা কোট, পায়ে কালো জুতো। লোকটা তাদের থেকে প্রায় একশ ফুট পেছনে ছিল। যখন তারা ধীরে হেঁটে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো, পেছনের লোকটিও থেমে গিয়েছিল, দাঁড়িয়েছিল একটা কফির দোকানের সামনে।

এখন আবার সেই তালপাতার সিপাহীকে দেখা গেল, দোকানে চুকচে।

আরও একটু নিশ্চিত হতে হবে ম্যালনকে, তাই সে জানালার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল স্যামের দিকে, “তুমি দেখতে কেমন, তা ফড়েল কি জানে?”

মাথা নাড়ল স্যাম। “আমি একটা ছবি পাঠিয়েছিলাম।”

“তা, সে কোনো ছবি দিয়েছিল?”

“আমি চাইনি কখনো।”

ভালবাসার আয়নায় লাগানো নোটের কথাটা আরেকবার মনে করলো সে। “তাহলে এবার বল, ফড়েল যে মানুষটার কথা ঠিক আছে বলল, সেই মানুষটা কে?”

উনিশ

লক্ষন

দুপুর ১৪২৫

ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবির পর্যটকদের ভিড়ের ভেতর দিয়ে পায়চারি করছে অ্যাশবি।
মাত্র কিছুক্ষণ আগেই কয়েকটা বাস এসে নামিয়ে দিল তাদেরকে।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের কবরস্থান এখানে। আর যতবারই সে এখানে আসে, প্রতিবারই
মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে শিহরণ বয়ে যায় তার।

এই একটা স্থানই ইংরেজ ইতিহাসের গত এক হাজার বছরেরও বেশী সময়ের
গন্ঠ বলতে পারে। একটা আশ্রম আছে, যেটার পরিচালনার নিয়ম-কানুন লিখেছে
সেইন্ট বেনেডিক্ট নিজে, তবে এখন এটা সরকারি কার্যালয়। অ্যাংলিকান চার্চেরও
প্রাণকেন্দ্র এটা। দু'জন বাদে বাকি সব ইংরেজ রাজাদের এখানেই রাজমুকুট পরানো
হয়, সেই *William the Conqueror* এর সময় থেকেই চলে আসছে এই প্রথা। শুধু
এই স্থানের উপর ফরাসিদের প্রভাবটাই তাকে একটু অস্বস্তি দেয়, আর এটার কারণ
হয়ত একটাইঃ এটার নকশা। ফ্রাপের বিখ্যাত ক্যাথেড্রাল রেইমস, অৰ্মেনিস এবং
সেইন্ট চ্যাপেলের নকশার উপস্থিতি দেখা যায় এখানে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে একজন
ব্রিটিশের কাছে ওয়েস্টমিনিস্টার জায়গাটা কতখানি তাঁপর্যেও, অন্ধিয়ে তিল পরিমাণ
সন্দেহ নেই তার।

এক মহান ফরাসি ভাবনা চমৎকার ইংরেজিতে প্রকাশ পায়।

গেটের সামনে থেমে ঢোকার ফি পরিশোধ করলে অ্যাশবি। তারপর একটা
ভিডের পিছু-পিছু Poet's Corner এর দিকে এসে গেল। মানুষ সেখানে দলা পাকিয়ে
আছে, চারপাশের দেওয়ালে শেক্সপিয়ার, ওয়াল্টসওয়ার্থ, ডিকেন্স, কিপলিং, হার্ডি,
ব্রাউনিং প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের ছবি দেখছে। আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই এখানে
শায়িত, যাদের মাঝে আছে টেনিসন, ডিকেন্স, কিপলিং, হার্ডি, ব্রাউনিং; কিন্তু এসবে
তার আগ্রহ নেই এখন, তাই চোখ দুটো দিয়ে বিশেষ কিছু খুঁজতে শুরু করলো। একটু
দূরেই, ইংরেজি সাহিত্যের জনক জিওফ্রে চসার এর সমাধি, আর তার সামনেই একটা
লোক দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাশবির দৃষ্টি তার ওপরেই স্থির হলো। পরনে মোটা কাপড়ের
সুট, কাশ্মিরি টাই। হাতে গাঢ় বাদামি রঙের হাতমোজা, আর বড়-সড় পা জোড়া
দারুণ দেখতে গুচি লোফারে মোড়া।

সমাধির কারুকার্য খচিত পাথরগুলোর প্রশংসা করতে-করতেই এগিয়ে গেল
অ্যাশবি, তারপর প্রশ্ন করলো, “চিত্রশিল্পী গড়ক্রে নেলার কে ছিলেন, তা জানেন?”

লোকটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী চোখ দিয়ে তাকাল অ্যাশবির দিকে, চকচকে চোখ দুটো
হলুদাত বাদামী যেগুলো একই সাথে স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখছে, একই সাথে অস্বস্তিও
দিচ্ছে। “আমার মনে হয়, আমি জানি। আঠারশ শতকের রাজ-চিত্রশিল্পী। আর এটাও
জানি যে তাকে টুইকেনহ্যামে কবর দেওয়া হয়েছে।”

টুইকেনহ্যামের কথা বলা মানে হলো উন্নত ঠিক আছে, কঢ়ে আইরিশ টান ও আঘাতের উপস্থিতি। তাই সে বলল, “আমি শুনেছি এই জায়গাটার প্রতি নেলারের তীব্র ঘৃণা ছিল, যদিও তার স্মরণে আলাদা একটা স্থাপনাও আছে এখানে ওই দক্ষিণের নির্জন দরজাটার কাছে।”

মাথাটা নাড়ল লোকটা। “জানি, তার কথা ঠিক এরকমই ছিল যে ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ওয়েস্টমিনিস্টারে কবর দিও না। সব নির্বাধের কবর ওখানে।”

নেলারের এই উক্তিটাই প্রমাণ করে দিল যে এ-ই সে যার সাথে তার ফোনে কথা হয়েছিল। তার কষ্ট থেকে সব রকম টান, নাকি ভাব উবে গেল, এখন সেটা আরও কিছুটা গম্ভীর।

“সকালের সবচে সেরা অংশের শুভেচ্ছা, লর্ড অ্যাশবি।” লোকটা বলল, একটু হেসে দিয়ে।

“আমি কী বলে ডাকব আপনাকে?”

“গড়ফ্রে হলে কেমন হয়? এই বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর সমানে এটাই চলুক। এখানে সমাধিস্থ করা আত্মাদের নিয়ে তার উক্তিটা কোনো দিক থেকেই ভুল না। আসলেই এখানে অসংখ্য নির্বাধের কবর আছে।”

কঢ়ের কর্কশ ভাব, উঁচু নাক, বড় মুখ, আর খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি সুরক্ষিত খেয়াল করছে অ্যাশবি, তবে ঘন ভুর নিচে সরীসৃপের মতো চোখ দুটোতার মনোযোগকে ধরে রেখেছে।

“আমি নিশ্চিত করছি আপনাকে, লর্ড অ্যাশবি, এটাই আমার আসল রূপ না। তাই এটাকে মনে রাখতে গিয়ে সময় নষ্ট না করলেই পারেন।”

অ্যাশবি ভাবছে যে মানুষটার এরকম ছদ্মবেশ নিতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। সে কিভাবে তার সবচে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-তার চোখ দুটো-না দেকে এভাবে থাকছে। চোখের জ্বলজ্বলে ভাব দেখেই তো সবকিছু বুঝে নেওয়া যায়। কিন্তু এগুলো মাথা থেকে সরিয়ে সে উন্নত দিল, “যার সাথে আমি ব্যবসায় নেমেছি, তার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।”

“আমি কিছুই জানতে চাই না আমার ক্লায়েন্ট সম্পর্কে। কিন্তু লর্ড অ্যাশবি, আপনি এর ব্যতিক্রম। তাই আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই আমি জেনেছি।”

এই ধরণের জিলাপির প্যাঁচ মার্কী কথা-বার্তায় আঘাত নেই অ্যাশবির।

“আপনি হলেন ব্রিটিশ ব্যাংকিং ইস্টিউশনের একমাত্র শেয়ারহোল্ডার। বিশাল ধন-সম্পদের এক মালিক যে কিনা জীবনটা উপভোগ করতে চায়। এমনকি রাণী এলিজাবেথ পর্যন্ত যাকে একজন উপদেষ্টা হিসেবে ভাবে।”

“হ্যাঁ, আর আপনিও তো একই রকম বিখ্যাত, বেশ চমৎকার একটা ব্যক্তিত্ব আপনার।”

হাসল লোকটি, আর তখন তার সামনের দাঁতের মাঝের ফাঁকা অংশটি বেরিয়ে পড়ল। “আমার অন্য কিছুতে কোনো আগ্রহ নেই, মাই লর্ড, আপনাকে খুশি করতে পারলেই আমার স্বস্তি।”

এমন বিদ্রূপ ভরা তোষামোদি তার ভালো লাগল না, তারপরও এটা নিয়ে কিছু বলল না সে। “যেমন কথা হয়েছিল আপনার সাথে, সেভাবেই কি সব কাজ করতে প্রস্তুত?”

লোকটা এক সারি স্মৃতিস্তম্ভের দিকে এগিয়ে গেল—স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, দেখে মনে হবে যেন সেও আর পাঁচ-দশজন পর্যটকের মতো এগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখছে। “সেটা নির্ভর করছে কথামত আপনি সেই জিনিসটা আমার হাতে দিতে পারবেন কিনা তার উপর।”

পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক ছড়া চাবি বের করে আনল অ্যাশবি। “এগুলো হ্যাঙ্গার খোলার চাবি। প্লেনটা ওখানেই আছে, পেট্রোল ভরাই আছে ট্যাঙ্কিতে। এটার রেজিস্ট্রেশন বেলজিয়ামের, আর মালিকের নাম-ঠিকানা সব ভূয়া।”

হাত বাড়িয়ে চাবিগুলো নিল গডফ্রে। “আর?”

আগুন-চোখের দিকে তাকিয়ে আবারও অস্বস্তির একটা স্নোভুক্সে গেল অ্যাশবির। সে এবার একটা কাগজ বের করে তার হাতে দিল। “আপনার কথা মতো, এখানে সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের নাম্বার এবং পাসকোড দেওয়া আছে। টাকার অর্ধেকটা আছে ওখানে, বাকি অর্ধেক কাজের পর।”

“হ্যাঁ, আর যে সময় আপনি চেয়েছিলেন, সেটা আজ প্রেকে নিয়ে দুই দিন। মানে, ক্রিসমাসের দিন। এটা ঠিক আছে তো?”

মাথা নাড়ল অ্যাশবি।

গডফ্রে পকেটের মাঝে সব রাখল। “তাহলে তো এবার কিছু জিনিস সত্যিই বদলে যাবে।”

“হ্যাঁ, এটাই তো মূল পরিকল্পনা।”

একটা মৃদু হাসি দিল লোকটি। তারপর তারা ক্যাথেড্রালের ভেতর দিয়ে এক সাথে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল হেঁটে। তারপর একটা স্তম্ভের কাছে থামল যেটার গায়ে কিছু লেখার সাথে একটা মৃত্যুর তারিখ খোদাই করা—১৯৬৯ সালের। দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল গডফ্রে, তারপর বলল, “স্যার রবার্ট স্ট্যাপাইল্টন। চেনেন একে?”

মাথা নাড়ল অ্যাশবি। “ড্রামাটিক পয়েট, দ্বিতীয় চার্লস তাকে নাইট উপাধি দিয়েছিল।”

“আমার যতদূর মনে পড়ে, সে ছিল একজন ফ্রেঞ্চ বেনেডিক্টাইন ভিক্ষু যে পরে প্রটেস্ট্যান্ট হয়ে যায় এবং রাজার একজন সেবক হয়ে কাজ শুরু করে। চার্লস এর *Gentleman Usher of the Privy Chamber* পদবি পাওয়া ব্যক্তির তালিকায় জায়গা করে নেয় সে।”

“ইংরেজদের ইতিহাস ভালোই জানেন দেখছি।”

“সে একজন সুবিধাবাদী লোক ছিল। মনের ভেতর বড়-বড় আকাংখা নিয়ে ঘূরত। তার মনের একান্ত চাওয়াগুলো নিয়ে আর কাউকেই তিল পরিমাণ নাক গলাতে দিত না। অনেকটা আপনার মতো, লর্ড অ্যাশবি।”

“আপনার মতোও বটে।”

আবারও হাসি দেখা গেল তার মুখে। “মোটেই না। আমি তো বলেই দিয়েছি, আমাকে শুধুমাত্র ভাড়া করা হয়েছে আপনাকে সাহায্য করার জন্য।”

“বটে, খুব খরচে সাহায্য।”

“ভালো কিছু পেতে হলে খরচ তো করতেই হয়। এখন কথা হলো, কাজটা করতে হবে দুই দিনের মধ্যে। আর আপনিও আপনার কথা ভুলে যাবেন না, কাজ শেষ হলেই ওটা পাঠিয়ে দেবেন।”

গডফ্রে নামের লোকটা দক্ষিণের চলমান মানুষের সারির মাঝে ঝুঁরিয়ে গেল মুহূর্তেই, অ্যাশবি তাকিয়ে আছে এখনো সেদিকে। জীবনে অনেক মানুষের সাথেই তার দেন-দরবার হয়েছে, কিন্তু এইমাত্র চলে যাওয়া এই নীতিহীন ক্ষমতাবান লোকটা এই প্রথম তাকে অস্বস্তির মাঝে ফেলে দিয়েছে। লোকটা বিটেনে কৃত বছর আছে, তা সে জানে না। প্রথম কলটা এসেছিল এক সপ্তাহ আগে। তারপর কৃতি খুঁটিনাটিগুলো আরও কিছু অনাকাঙ্খিত কলের মাধ্যমে ঠিক করা হয়। তার সাথে দর কষাকষি করতে বামেলা হয়নি অ্যাশবির। তারপর অপেক্ষা করেছে গডফ্রের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সংকেতের। যখন সে বুঝতে পেরেছে যে লোকটা ঠিকমতোই কাজ করছে, তখনই আজকের এই সাক্ষাতের বিষয়টা আসে।

আর এখন, সে এটাও জানে।

মাত্র দুটো দিন।

বিশ

লয়ার উপত্যকা

দুপুর ২৯৪৫

প্যারিসের দক্ষিণাঞ্চলের একটা জায়গায় এসে গাড়িটা থামাল থ্রিভান্ডসেনের ড্রাইভার। চারপাশে উঁচু পাহাড় ঘিরে থাকায় জায়গাটাকে একটা বড়-সড় গুহার মতো লাগছে। আঙুর লতায় ছেয়ে আছে সবগুলো পাহাড়। দুর্গের মতো শ্যাতোটি দাঁড়িয়ে আছে সামনে, দেখে মনে হয় যেন চের নদীর মাঝে একটা জাহাজ নোঙ্গর ফেলে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, মৃদু শ্রোতে দুলছে একটু এদিক-ওদিক। এখান থেকে পনের কিলোমিটার দূরে ঘোলা জলের এই প্রবাহ ফ্রান্সের সবচে বড় নদী লইর-এ গিয়ে মিশেছে। শ্যাতোর সামনে দিয়ে নদীটা সরু হয়ে বয়ে গিয়েছে। চমৎকার একটা সেতু এপারের সাথে ওপারের সংযোগ করে দিয়েছে। শ্যাতোর সম্মুখভাগের ইট, পাথর, সুউচ্চ চূড়া, সুচাল অগভাগ, পেঁচান স্লেটের ছাদ, সবই এক কথায় অনবদ্য শরীরে বয়সের ছাপ পড়েনি

এখনো ওটার। শক্রদের হাত থেকে বাঁচার জন্যেও এটা বানান হয়নি, আবার অনেক পুরনো বলে অযত্তে এটাকে ফেলেও রাখা হয়নি। এই প্রাসাদ মধ্যযুগীয় একটা রাজকীয় দুতি ছড়াচ্ছে যেন।

শ্যাতোর মূল বৈঠকখানায় বসে আছে থ্রিভাল্ডসেন। মাথার উপর সারি কাঠের শক্তপোক্ত ফ্রেমগুলো লেগে আছে ছাদের সাথে। শত-শত বছরের পুরনো স্থাপনা, কিন্তু এখনো অবাক হতে হয় তখনকার নির্মাণকৌশলের কথা ভেবে। দুটো রট আয়রনের দীপাধার তীব্র আলো ছড়াচ্ছে। দেওয়ালগুলো ঢেকে আছে দারুণ সব পেইন্টিঙে। *Le Sueur, Van Dyck* এর আঁকা ছবি, আর কিছু উঁচুমানের তৈলচিত্র, যেগুলোর চরিত্রগুলো-তার মনে হলো-পূর্বপুরুষদের হবে। শ্যাতোর মালিক একটা চমৎকার চামড়ার কেদারায় বসে আছে। দ্বিতীয় হেনরির সময়ের ওটা। তার কর্ণটা সুন্দর, ব্যবহারে নম্রতা, আর আছে মনে রাখার মতো বৈশিষ্ট্য। এই মহিলার কাছ থেকে সে এলিজা সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছে, তাতেই সে বুঝতে পেরেছে যে তার সামনে বসে থাকা নারী যেমন স্বচ্ছ দৃষ্টির, তেমনই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তবে একগুঁয়েমি ও বাতিকগ্রস্ত ভাবও আছে কিছুটা।

শেষের অনুমানগুলোই সঠিক হবে, এমনটাই আশা থ্রিভাল্ডসেনের।

“আমি কম-বেশি অবাক হয়েছি আপনার এই আসাতে,” বলল এলিজা।

তার মুখের হাসিতে আন্তরিকতা থাকলেও, কেমন একটা বেঞ্চেমালভাব তাতে।

“আপনাদের পরিবারকে আমি অনেক বছর আগে থেকেই চিনি,” বলল থ্রিভাল্ডসেন।

“আর আমিও তো আপনার চীনেমাটির বাসন-ক্রেস্টেনের ভক্ত। আমাদের ডাইনিং রুমে বিশাল কালেকশন আছে আপনার পণ্যের দুটো বৃত্ত, নিচে একটা একটা সরল রেখা। আপনার এই লোগো সর্বোচ্চ মানের কথাই বলে।”

মাথাটা একটু নত করে প্রশংসাটুকু গ্রহণ করলো থ্রিভাল্ডসেন। “এই খ্যাতি গড়তে আমার বংশের কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছে।”

চোখ দুটো ঘন কালো এই মহিলার। তবে অদ্ভুত বিষয় হলো, সেখানে কৌতুহল ও সতর্কতা একসাথে মিশে আছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে অস্বস্তির মাঝে আছে, আর এটা গোপনও করতে চাইছে প্রাণপণে। থ্রিভাল্ডসেনের নিয়োগ করা গোয়েন্দারা তাকে ইতিমধ্যে এটা জানিয়েছে যে এলিজা তার জেট বিমান অবতরণ করিয়েছে। সেখান থেকে তারা এলিজার পিছু নিয়েছে, থেমেছে তার গন্তব্য জানার পর। তাই ম্যালন ও স্যাম যখন প্যারিসে তাদের জাল বিছাতে ব্যস্ত, থ্রিভাল্ডসেন এসেছে এই দক্ষিণে, নিজেই কিছু মাছ শিকার করতে।

“আমাকে বলতেই হচ্ছে, মিস্টার থরভাল্ডসেন,” ইংরেজিতেই বলল সে, “আমার বেশ কৌতুহল হলো বলেই আপনার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছি। কিন্তু গত রাতেই আমি নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরেছি, সত্যি বলতে...বেশ ক্লান্ত। অন্তত এখন আর কারো সাথে দেখা করার মতো শক্তি নেই।

মেয়েটার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল সে। মুখের গঠনটা দারুণ এই মহিলার। ঠোটের কোণে এক চিলতে হাসি দেখা গেল তার। এটা আনন্দের হাসি না, প্রভান্ডসেনকে সফলভাবে যা-তা বুঝিয়ে দিতে সফল হওয়াই এই হাসির কারণ।

“এটা কি আপনার পরিবারের গ্রামের বাড়ি?” জিজ্ঞেস করলো প্রভান্ডসেন, চেষ্টা করছে তাকে কোণঠাসা করতে। সাথে-সাথেই একটা বিরক্তির অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার মুখে।

মাথা নেড়ে সায় দিল সে। “মোলশ শতকে বানানো, Chenonceau-এর আদলে। এখান থেকে দূরে হবে না ওটা। আরও একটা মনোরম স্থাপনা। খুবই বিশ্ময়কর।”

ওক কাঠের একটা তাক চোখে পড়ল তার, কালচে রঙের তাকটা আসলেই প্রশংসা করার মতো। ফরাসিদের অন্য যত বাড়ি-ঘর দেখেছে সে, সেগুলোর মাঝে একেবারে স্পষ্টভাবেই কবরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দেখলেই গোরস্থানের কথা মনে আসে। কিন্তু এই বাড়িতে সেই কবরের ভাব নেই।

“আপনি জেনে থাকবেন, মাদাম লাঘক, যে আমার ধন-সম্পত্তি যা আছে, তা আপনার থেকে অনেক-অনেক বেশী। এই ধরেন, দশ বিলিয়ন ইউরো তেওঁ ছাড়েই।”

গালের উঁচু অঙ্গির দিকে তাকিয়ে আছে প্রভান্ডসেন, সেই সাথে আবেগহীন চোখ ও দৃঢ় মুখের দিকেও খেয়াল করছে সে, পড়তে চাইছে তার ভেতরের কথাগুলো। তার মনে হলো এই মহিলা ইচ্ছা করেই তার কোমল অভিব্যক্তি কালো চুলের মাঝে একটা বৈপরীত্য টেনে দিয়েছে। কারণ তার যে বয়স, তাত্ত্বিক মুখে সেই বয়সের ছাপ থাকলেও, চুলে সে ছাপ দেখা যাচ্ছে না। তাই তার একটু সন্দেহই হচ্ছে যে চুলের রঞ্জটা আসল কিনা। তবে প্রশ়াতীতভাবেই, প্রসূন্দরী এই নারী। একই সাথে আত্মবিশ্বাসী ও বৃদ্ধিমতি নিজের ইচ্ছামতো সব করতে অভ্যন্ত, তবে নির্বুদ্ধিতায় অনভ্যন্ত সে।

“তো আপনার এই অটেল সম্পদের কথা আমায় শুনাচ্ছেন যে? এতে আমার কী আসে যায়?”

একটু বিরতি নিল প্রভান্ডসেন, যেন পরিস্থিতিটা একটু স্বাভাবিক হয়ে যায়। তারপর বলল, “আপনি আমায় অপমান করেছেন।”

বিহুলতা ফুটে উঠল মেয়েটির চোখে। “আমি? কিভাবে সম্ভব? আমাদের তো দেখাই হলো এইমাত্র।”

“ইউরোপের সবচে বড় ও সফল ব্যবসাগুলো আমার হাতে। গ্যাস, তেল, টেলিকমিউনিকেশন, বিভিন্ন মালের কারখানা, সবই আছে আমার। আর এগুলো তো গোটা বিশ্ব জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছে। আশি হাজারেরও বেশী মানুষ আমার অধীনে কাজ করে। আমি এক বছরে যে লাভ করি, সেটা আপনার সব ব্যবসার টাকা এক জায়গায় করলেও যা হবে, তার থেকে বেশীই হবে। তারপরও আপনি আমায় অপমান করেন।”

“মিস্টার প্রভান্ডসেন, একটু খুলে বলবেন কী?”

একেবারেই হতচকিত হয়ে গেছে এই নারী। আর কাউকে বেখেয়ালে পেয়ে আক্রমণের আসল মজা তো এখানেই। পারফেন্ট ব্লাইন্ড অ্যাটাক, ভাবল সে। এখানে আক্রমণকারীর হাতেই সুবিধা থাকে বেশী। ঠিক দু'বছর আগে এমনই এক আক্রমণ হয়েছিল মেঞ্জিকো সিটিতে-পার্থক্য শুধু স্থান-পাত্রে।

“আপনি যে পরিকল্পনা করেছেন, সেটার অংশ হতে চাই আমি।” থ্রিভাল্ডসেন বলল।

“বুঝলাম না, কী সেটা?”

“আমি যদিও আপনার জেট বিমানে ছিলাম না কালকে, তারপরও অনুমান করতে পারি যে রবার্ট ম্যন্স্রয়ানি নামের আমার এক বন্ধুকে খুব আন্তরিকভাবেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু দেখেন, সেই দাওয়াত আমি এখনো পেলাম না।”

এটা শুনে তার মুখটা একেবারে জমে গেল, মনে হলো যেন একটা সমাধিফলক। “দাওয়াত? কিসের দাওয়াত?”

“প্যারিস ক্লাবের।”

মেয়েটার মুখ থেকে বশীকরণ ধরণের কথাবার্তা বের হোক সেটা চাইল না হেনরিক। “আপনার বাপ-দাদার বংশ ছিল আসলেই সেই রকমের, দুষ্ট। আমি জানি, আপনারা অ্যান্ড্রে পোজো ডি বোরগোর সরাসরি বংশধর। ওনার জন্ম হয়েছিল কর্সিকার অ্যাজাশিওতে। তারিখটা ৮ই মার্চ, ১৭৬৪। অদৃশুক নেপোলিয়ন বোনাপাটের ঘোরতর শক্র ছিল। তবে বুদ্ধির জোরে সে আন্তরিকভাবে রাজনীতিতে এমন চাল চালে যে তার আজীবনের শক্রটিও তার এই কুটচম্বল্ট-কাছে হেরে যায়। একটা দীর্ঘ, তিক্ত কর্সিকান ভেন্দেটা-বিবাদ। কোনো বন্দুক বা গোলা-বারুদ ব্যবহার করেনি সে, তবে যেটা করেছে, সেটা নিখুঁত কৃটনৈতিক চাল, ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। একটা জাতির নিয়তির বুকে একেবারে মরণ কামড় বসিয়েছিল তার কৌশল।”

হেনরিক কথাগুলো হজম করতে তাকে একটু সময় দিল।

“ভয়ের কিছু নেই,” বলল সে। “আমি আপনার শক্র না। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি বরং আপনার কাজের প্রশংসাই করছি, আর সেই কাজে আমিও নামতে চাই।”

“আপনার কথা যদি আংশিক সত্যি ধরেও নেই, তারপরও আমি আপনার এমন অনুরোধ রাখতে যাব কেন, বলুন?”

মহিলার কষ্টে উষ্ণ স্থবিরতা, বোঝাতে চাইছে, সে একটুও বিচলিত না। তাই হেনরিকও একই দৃষ্টি দিয়ে তার চাতুরি ভরা চোখের দিকে তাকাল। “প্রশ্নের উত্তরটা খুবই সোজা।”

কান দুটো সজাগ তার।

“ঘরের কথা কিন্তু পরে জেনে গেছে। আর আপনার নিরাপত্তায়ও ফাঁক-ফোকর আছে।”

একুশ প্যারিস

স্যামকে অনুসরণ করছে ম্যালন। দু'জনেই 'বিজনেস' শব্দটা লেখা বইয়ের তাকটা খুঁজছে। বেগ পেতে হলো না তাদের, চোখে পড়ল দু'জনেরই।

"ফড়েল আর আমার মাঝে প্রচুর মেইল চালাচালি হয়," স্যাম বলল। "ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের একেবারে ঘোর বিরোধী সে। ও বলে, এখানে নাকি এমন ষড়যন্ত্র হচ্ছে, যার কারণে আমেরিকার পতন ঘটবে। তার বক্তব্যের কিছু সত্যতা অবশ্য আমি পেয়েছি, কিন্তু এই মানুষটার বেশীরভাগ দৃষ্টিভঙ্গি এখনো আমার বোঝার বাইরে থেকে গেছে।"

একটু হাসল ম্যালন। "দেখে ভালো লাগছে যে তুমি বিশ্বাসেরও একটা সীমা বজায় রাখ।"

"যা ভাবছ, আসলে বিষয়টা সেরকম না, আমি অতটা অন্ধবিশ্বাসী না। আমি এটাকে একটু অন্যরকমভাবে দেখি। আমি মনে করি যে হ্যাঁ, কিছু লোক থাকতে পারে ওরকম, কিন্তু তারা পৃথিবীটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে বা ধ্বংস করে দেবে, আমি ~~তামনে~~ করি না। তারা লোভী হতে পারে, আর এ কারণেই গোটা অর্থনীতিতে ~~তারা~~ কম-বেশি প্রভাব খাটাতে পারে, আর সেটা স্রেফ লোভের কারণেই। তবের উদ্দেশ্যই হলো রাতারাতি বড়লোক হওয়া, আর সেই বড়লোকি ভাব ধরে ~~তারা~~ জাতীয় অর্থনীতিকে তারা অনেক দিক থেকেই প্রভাবিত করতে পারে, তবে~~তামনে~~ সেগুলোর একটাও ভালো কোনো কিছু বয়ে আনবে না।"

অমত প্রকাশের সুযোগ নেই তার কথায়, ~~কিন্তু~~ এসবের প্রমাণ তো থাকতে হবে। ক্রিস্টিনাগেড ছাড়ার আগেই স্যাম এবং জিমি ফড়েলের ওয়েবসাইটে টুঁ মেরেছে ম্যালন। পড়েছে অনেক কিছুই। দুইজনের বক্তব্য প্রায় একইরকম, তফাও শুধু এই যে বৈশ্বিক ধসের ব্যাপারে ফড়েলের ভবিষ্যৎবাণীটা অনেক বেশি জোরালো।

স্যামের কাঁধের উপর হাত রাখল ম্যালন। "আমরা আসলে ঠিক কী খুঁজছি?"

"ওপরের তলায় আমরা যে একটা নেট পড়লাম, সেটায় একটা বইয়ের কথা উল্লেখ আছে, সেটা খুঁজছি। ওটা লিখেছে খুব নামকরা একজন অর্থনীতি পরিকল্পনাকারী। সেই লোকটাও এই একই রকম পরিস্থিতির মাঝে আছে, আর এটা নিয়ে আমি ও ফড়েল বেশ আলোচনা করেছি। কয়েক মাস আগে আমার হাতে একটা লেখা এসেছিল এই বিষয়ে, তখন পড়েছিলাম।"

হাতটা সরিয়ে নিল ম্যালন, তারপর দু'জনেই বইয়ের ভিড়ের মাঝে খুঁজতে লাগল সেই বইটি।

ম্যালনের অভিজ্ঞ চোখ দুটো নানান রকম বই দেখে যাচ্ছে। বইগুলো সাজানোর ক্ষেত্রে নিয়মের কোনো বালাই নেই। এই রকম জগাখিচুড়ি অবস্থায় কেউ যদি বস্তা ভরেও বই আনে, ম্যালন তা কোনো দিনই কিনবে না তার কাছ থেকে। এই বইগুলো

এখানে বিক্রির জন্য রাখা, কিন্তু ম্যালন ভেবে দেখল যে এগুলোর এই জায়গায়, অর্থাৎ এই লেফট ব্যাংকে যে মূল্য, সেটা ধাম করে কয়েকগুণ বেড়ে যেত যদি এখান থেকে মাত্র কয়েকশ মিটার দূরে সেইনে ও নটর ডেমের ওপারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হতো।

“এই যে ওটা।”

বেশ বড়-সড় একটা বই তুলে নিল স্যাম, সোনালী রঙের পেপারব্যাক বইটার নামঃ *The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve*.

“এই জায়গা ছাড়া আর কোথাও এটা রাখতে পারত না ফড়েল,” বলল স্যাম। “এই বইয়ের আরও যে কপি থাকবে, সেটা দুরাশা। এটার কথা কেউ জানে না বললেই চলে।”

লোকজন চারপাশে ঘুরে-ঘুরে বই দেখছে। আরও বেশ কিছু মানুষ বাইরের ঠাণ্ডা ছেড়ে দোকানে ঢুকেছে। তাদের ভেতরে ম্যালন সেই ছিপছিপে মানুষটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে, কিন্তু পাচ্ছে না। সে হয়ত বুঝতে পারছে যে কী ঘটছে, কিন্তু আজকের দিনে ধৈর্যের কোনো বিকল্পই নেই।

স্যামকে ভারমুক্ত করে বইটা হাতে নিল ম্যালন, তারপর পৃষ্ঠাগুলোর ক্ষেত্রে দিয়ে যেতে থাকল দ্রুত, আর হঠাতে করেই একটা ছোট নোট চোখে পড়ল পৃষ্ঠার মাঝে।

আয়নার কাছে যাও।

মাথাটা দোলাল সে

তারা একরকম দৌড়েই উপরের তলায় গেল যেখানে পাওয়া ছেটা নোট ধরে তারা নিচে নেমে এসেছিল পৌছেই দেখল, একই সময়ে আরও একটা গোলাপি নোট সাঁটা রয়েছে সেখানে। তবে লেখাটা ভিন্নঃ

CAFÉ D'ARGENT, 34 RUE DANTE THIRTY MINUTES

ম্যালন দ্রুত উপর তলার জানালার কাছে গেল। নিচের গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে ঠায়, প্রাণহীনের মতো। ডালে কোনো পাতা না থাকায় দেখতে ঝাড়ুর মতো লাগছে, ঘৃণ্যমান ছায়াগুলো দীর্ঘ হতে শুরু করেছে দুপুরের পর সূর্যটা পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ায়।

তিনি বছর আগে সে এবং গ্যারি ওয়াশিংটনের *International Spy Museum* এ গিয়েছিল। গ্যারি জানতে চেয়েছিল যে তার বাবা আসলে কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করত, আর তারা জাদুঘরে পৌছালেই জায়গাটা একটা চমৎকার স্থানে পরিণত হয়েছিল তাদের কাছে। ওখানের প্রদর্শনীটা উপভোগ শেষে গ্যারিকে সে একটা বই কিনে দিয়েছিল, নাম *Handbook of Practical Spying*. গোয়েন্দা কলাকৌশলের উপর

ଲେଖା ସହଜେ ହଜମ ହବାର ମତୋ ଏକଟା ବହୁ । ଓଟାର ଏକଟା ଅଧ୍ୟାୟେର ଶିରୋନାମ ଛିଲଃ *Keeping Caution from the Wind*, ସେଥାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଓୟା ହେଁଛେ ଯେ କିଭାବେ ନିରାପଦେ ଯାକେ ଧରତେ ଚାଗ୍ୟା ହେଁଛେ ତାକେ କାହେ ଆସତେ ଦିତେ ହ୍ୟ ।

ତାଇ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରହେ, ଜାନେ କୀ ଆସତେ ପାରେ ।

କାହେ ଏଗିଯେ ଏଲ ସ୍ୟାମ ।

ନିଚତଳା ଥେକେ ଦରଜା ଖୋଲାର ଶବ୍ଦ କାନେ ଏଲ, ତାରପର ଆବାର ବନ୍ଦ । ଠିକ ପରେଇ ମ୍ୟାଲନ ଦେଖିଲ ସେଇ ରୋଗା-ପାତଳା ମାନୁଷଟା ଦୋକାନ ଥେକେ ବେର ହେଁଛେ, ହାତେ ଏକଟା ବହୁ, ରଙ୍ଗ ଓ ଆକାର ଦେଖେ ବୋକା ଗେଲ ସେଟା ନିଚତଳା ଥେକେ ନେଓୟା *Jekyll Island* ଏର ସେଇ ବହେଟା !

“ଲୁମ, ଏଟା ଖୁବହି ପୁରନୋ ଏକଟା କୌଶଳ ।” ବଲଲ ସେ । “କେ ସାକ୍ଷାତ କରତେ ଚାଇଛେ ସେଟା ନିରାପଦେ ଜେନେ ନେଓୟା । ବନ୍ଦୁଟା ତୋମାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେ ସ୍ପାଇ ଏୟାକଶନ ଟାଇପ ମୁଭି ଦେଖେ, ବୁଝତେ ପାରଛି ।”

“ସେ ଏଥାନେଓ ଏସେଛିଲ ?”

ମାଥା ନାଡ଼ିଲ ମ୍ୟାଲନ “ତାକେ ମନେ ହଲୋ ଆମାଦେର ବିଷୟେ ତାରଓ ଆଗ୍ରହ ଆଛେ, ଯଥନ ବାଇରେ ଥେକେ ଭେତରେ ଏଲାମ, ସେ ସଂଭବତ ବହିୟେର ତାକେର ପେଛନେ ଶୁଣ୍ଡିଯେ ଛିଲ, ପରେ ଯଥନ ବହେଟା ପେଯେ ଆବାର ଉପରେ ଗେଲାମ ତାର ମିନିଟ ଥାନେକ ଆଗ୍ରହି ସେ ନୋଟ ରେଖେ ନେମେ ଏସେହେ । ଆର ତୁମି ଯେହେତୁ ତାକେ ଛବି ପାଠିଯେଇ, ଅଛୁ ସେ ଭାଲୋଇ ଜାନେ କାକେ ଖୁଜିତେ ହବେ ଆର ଆମାର ବିଷୟେଓ ତାର ବିଶ୍ୱାସଟା ଏମେହେ ବଲେଇ ସେ ଦ୍ଵିତୀୟ ନୋଟେ କୋଥାଯ ଦେଖା କରତେ ହବେ ବଲେଛେ ।”

“ତୋମାର ମନେ ହ୍ୟ ଏ ଲୋକଟାଇ ଫଢ଼ିଲ ?” ଆପଣ ନିଯେ ଦେଖିଯେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲୋ ସ୍ୟାମ ।

“ତା ଛାଡ଼ା ଆର କେ ହବେ, ବଲ ?”

ଆରଓ ସଜାଗ, ସତର୍କ ହ୍ୟେ ଗେଲ ଏଲିଜା । ହେନରିକ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ତାର ବ୍ୟବସା ସମ୍ପର୍କେ ଜେନେ ଗେଛେ ତା-ଇ ନା, ମନେ ହେଁଛେ ଏମନ ଆରଓ କିଛୁ ସେ ଜାନେ ଯା ଏଲିଜା ନିଜେ ଜାନେ ନା । “ନିରାପଦାର ଫାଁକ-ଫୋକର ବଲତେ ?”

“ଆପନାର ପ୍ୟାରିସ କ୍ଲାବେର ଏକଜନ, ଯାକେ ଆପନି ଚିନିତେ ଭୁଲ କରେହେନ ।”

“ଆମି ତୋ ଏଥନେ ବଲିଇନି ଯେ ଏମନ କୋନୋ କ୍ଲାବ ଆଛେ ।”

“ବେଶ, ତାହଲେ ଏଟା ନିଯେ ଆପନାର ସାଥେ ଆମାର ଆର କୋନୋ କଥା ନେଇ ।”

ଉଠେ ଦାଁଡାଲ ଥ୍ରାଲ୍‌ବ୍ୟାନ୍‌ସେନ ।

“ଆପନାର ବାଡ଼ି ବେଡ଼ାତେ ଆସତେ ପେରେ ଭାଲୋ ଲାଗଛେ । ଯଦି କଥନୋ ଡେନମାର୍କେ ଆସେନ, ଆମାର ଅତିଥି ହଲେ ଆମି ଖୁବହି ଆନନ୍ଦିତ ହବ । ଆମି କ୍ରିସ୍ଟିନାଗେଡେଇ ଥାକି, ଜାନେନ ନିଶ୍ଚୟ । ଆମି ତାହଲେ ଆସଛି ଏଥନ, ଆପନି ବରଂ ବିଶ୍ରାମ ନିନ, ଜାରି କରେ ବେଶ କ୍ଲାନ୍ଟ ଆପନି ।”

খুব সতর্ক একটা হাসি দিল মহিলাটি। “আপনি কী সব সময়ই এমন বাগান্মর
বজায় রাখেন?”

কাঁধ দুটো ইষৎ উঁচু করলো হেনরিক। “দেখুন, আর দুদিন বাদেই ক্রিসমাস,
আমি কষ্ট করে সময় বের করে আপনার বাড়ি পর্যন্ত এলাম আপনার সাথে কথা
বলতে। যদি মনে করেন, আলোচনার কিছু নেই, তো ভালো, আমি আসি। আপনার
সিকিউরিটিতে যে ঘাপলা আছে, সেটা আজ হোক, কাল হোক, বেরিয়ে আসবে। আশা
করি, ক্ষতির পরিমাণটা খুব বেশী হবে না।”

খুবই সতর্কতার সাথে, বহু হিসেব-নিকেস করে এলিজা তার ক্লাবের জন্য সদস্য
বাছাই করে। সংখ্যায় সে সহ মাত্র সাতজন। প্রতিটুকু সদস্যই স্ব-ইচ্ছায় কুড়ি মিলিয়ন
ইউরো খরচ করে দলে ঢুকেছে। প্রত্যেকেই গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য একটা
বিশেষ শপথও পড়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায় তারা যে গোপন অভিযান
চালিয়েছিল, সেখান থেকে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছিল, প্রচুর লাভ করেছিল তারা, যে
কারণে সদস্যরা আরও বেশী পরিমাণে আনুগত্য প্রকাশ করতে শুরু করে, আরও বেশী
উদ্যমী হয়ে ওঠে আরও লাভের আশায়। আর এমনটাই তো হবার কথা।

ষড়যন্ত্র করে যদি সফলতাই না আসে তাহলে সেই ষড়যন্ত্রের সার্থকতা কোথায়?
কিন্তু বিশাল ক্ষমতার মালিক এই ডেনিশ একজন বাইরের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, মনে
হচ্ছে সবকিছুই জানে।

“আমাকে বলুন তো, মিস্টার থ্রিভান্ডসেন, আপনি কি সঙ্গেই যোগ দিতে চান?”

চোখ দুটো একটু মিটিষ্টি করে উঠল তার। সঠিক ভাবেই আঘাত করেছে এই
মহিলা।

আকারে হেনরিক একজন বেঁটে মানুষ, ত্রয়োদশ বয়সেও হাঁটুতে সমস্যা থাকায়
তাকে আরও বেঁটে লাগে। গায়ে একটা ঢিলেচালা সোয়েটার, আর প্রয়োজনের তুলনায়
বড় একটা কর্ডের ফুলপ্যান্ট। আর পায়ে কালো একজোড়া স্লিকার। ঢিলেচালা
পোশাকে তার শারীরিক বিকলাঙ্গতা কিছুটা হলেও ঢাকা পড়ে বলেই হয়ত এমন
পোশাক তার পছন্দ। মাথার সোনালী চুলগুলো বড়, এলোমেলো, ঝুলছে বাবরি চুলের
মতো। ঘন ভুরুগুলো চকচক করছে, যেন সেগুলো ধাতব তার দিয়ে বানান কোনো
ব্রাশের মাথা। মুখের উপর চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, কোথাও বা একটু গভীর খাদে রূপ
নিয়েছে সে ভাঁজ। তাকে দেখে সহজেই মনে হবে যে লোকটার ঘর-দুয়োর নেই। আর
এমনটাই চেয়েছে সে। বেঁটে লোকটা সফল, নিঃসন্দেহে।

“আমি কি তাহলে তামাশা করার জন্য এলাম?” জিজেস করলো হেনরিক।
“আমি এসেছি নির্দিষ্ট একটা কারণে। যেটা, আমার বিশ্বাস, উভয়ের মঙ্গলের জন্যই।”

“তাহলে, আর কী, কথা শুরু যাক।”

মহিলাটি এই বিষয়ে আলোচনা করতে রাজি হলে, তার অধৈর্যের পালা শেষ
হলো।

বসে পড়ল হেনরিক। “আমি আপনার প্যারিস ক্লাব সম্পর্কে খুব গভীর তদন্তের মাধ্যমে জেনেছি।”

“ভালো, তো কী কারণে আপনার আগ্রহটা হলো?”

“আমি জানতে পারলাম যে বৈদেশিক মুদ্রা এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে বেশ বড় ধরণের একটা কিছু ঘটতে চলেছে, বা ঘটছে। যা আসলে স্বাভাবিকভাবে ঘটে না। আর সত্য বলতে, এই বিষয়ে বেশ কিছু ওয়েবসাইট আছে যেগুলো একেবারে রাখাটাক ছাড়াই এগুলো প্রকাশ করছে। ওরা আপনাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে যা জানে সেই তুলনায় আমি নিয়ে, কিছুই না।”

“আমি জানি ওরা কী লেখে, পড়েছি কিছু। এইসব ছাইপাশ কি আপনি বিশ্বাস করেন?”

“না, ঠিক করি যে তা না।” একটা ছোট বিরতি হেনরিকের। “কিন্তু ওগুলোর ভেতর একটা ওয়েবসাইট মনে দাগ কেটেছে। ওটার নাম *GreedWatch*. এটায় যা বলা হয়েছে তা বেশ ভাবিয়েছে আমাকে, বলতে পারেন এটার কথাই সবচে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে আমার। আপনাদের পরিকল্পনাটা বোধ করি ধরেই ফেলেছে ওরা। আপনি দেখবেন, ওটার হোমপেজে, একেবারে উপরে একটা কথা লেখা, শার্লক হোমসের। *There is nothing more deceptive than an obvious fact.* আসলেই, স্পষ্ট সত্যের মতো বিভ্রান্তিকর আর কিছু নেই।”

এলিজা এই সাইট ও এটার মালিক সম্পর্কে জানে, থ্রিভাল্ডসেনের ক্ষেত্রেই সত্য। ওরা আসলেই অনেক কাছে চলে এসেছে তাদের। ঠিক এই কারণেই সে তিন সপ্তাহ আগে এই ঝামেলা দূর করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে ব্যগ্রেছে! কিন্তু সে এখন অবাক হচ্ছে এটা ভেবে যে তার এই পদক্ষেপের কথাও কেন্দ্রীয় লোকটা জানে? না জানলে এত ওয়েবসাইট থাকতে বেছে-বেছে এটার নামই বা কোনো কেন সে?

থ্রিভাল্ডসেন তার প্যানের পকেটে হাত চুকাল একটা ভাঁজ করা কাগজ বেরিয়ে এল হাতের সাথে, তারপর সেই হাতটা এসিয়ে গেল এলিজার দিকে। “গতকাল এটা *GreedWatch* থেকে প্রিন্ট করেছি।”

কাগজের ভাঁজ খুলল সে।

এক খ্রিস্ট-বিশ্বেষীর আগমন?

উন্নত দেশগুলোর দিকে একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, তারা ধীরে-ধীরে সবকিছু কজা করে ফেলছে। তাদের এই উত্থানের পেছনে নতুন একটা শক্তি কাজ করছে যেটার মাঝে আছে অর্থনৈতিক শক্তি, সামরিক শক্তি, গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক শক্তি। আমি চেষ্টা করবো এটা দেখাতে যে এই শক্তিটা শুধুমাত্র বিশ্বের হাতেগোনা কিছু টাকার কুমিরের দখলে চলে গিয়েছে। আর আমার বিশ্বাস, এই চক্রের মূল হোতা একজন খ্রিস্ট-বিরোধী। তার নাম এলিজা লাইক। তিনি গোটা দুনিয়াকে শাসন করতে চান, আর

সেটা পর্দার আড়ালে থেকেই। তার এই অর্থনৈতিক উথান রাতারাতি কিছু না, শত-শত বছর ধরেই তাদের পূর্বপুরুষরা গোপনে অর্থনীতির কলকাঠি নেড়েছে, আর তারই ধারাবাহিকতায় যে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে সেটার একচ্ছত্র অধিপতি এখন মিস লাঘক।

কোনো দেশকে টাকা খণ্ড দেওয়ার মতো নিরাপদ ও লাভজনক ব্যবসা দ্বিতীয়টি আর নেই। বড়-বড় সব অর্থ লগ্নিকারিয়া এক জোট হয়েছে এখন, তাই আর তাদের অভ্যন্তরিন প্রতিযোগিতা নেই। নিজেদের আরও বড় স্বার্থের কথা ভেবে তারা আরও বড় ধরণের বিনিয়োগে নেমেছে যেটা আসলেই গোটা পৃথিবীর জন্যই হ্রাস। লাঘক এবং তার সাথের লোকদের এমনই শক্তিশালী একটা সাংগঠনিক অবকাঠামো আছে যেটা বিশ্ববাজারে মূল্যবান যেকোনো কিছুর শেয়ারই কিনতে পারে, আর তারা তা করছেও। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়ঃ তাদের হাতে হয়ত কোকাকোলা বা পেপসির মতো বড়-বড় কোম্পানি চলে গিয়েছে, এবং আরও এমন শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানও তাদের দখলে যেতে বসেছে। তারা এরকম বড় কোম্পানিগুলোর ভেতর চলতে থাকা বাজার ধরে রাখার হাড়ডাহাড়ি প্রতিযোগিতা দেখতে থাকে। এখানে যে-ই জিতুক, লাভ তাদেরই থাকে। আর যদি কেউ পিছিয়েও পড়ে, সেই কোম্পানি তখন অব্যাহত আটঘাঁট বেঁধে যুক্ত নামে, তখনও তাদের লাভ হয়, আর সেটা আরও বড় আকারে। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এখনো টিকে আছে। ফ্রান্সের চালায় তারা ছাড়া আর কেউই জানে না যে এই পলিসিতে কী আছে। পশ্চিম দেশগুলোর সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা পুরো পশ্চিমা বিশ্বকেই হাতের কঞ্চিৎ এনে ফেলেছে। বিশ্বের রাজনৈতিক পলিসির দিকে আপনি একটু মনোযোগ দিবেন দেখবেন যে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তন হয়, বদলে যায় নেতৃত্ব, কিন্তু তাদের পলিসির কোনো নড়চড় হয় না, সেটা সব সময়ই ধনীদের পক্ষে যায়, তাদের স্বার্থই দেখে। অসংখ্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এটা বেশ স্পষ্ট যেকোনো এক অদৃশ্য সংগঠন গোটা দুনিয়াকে পুতুলের মতো নাচাচ্ছে। আর আমার কাছে যত তথ্য-উপাদান আছে, সেটার উপর ভিত্তি করে বলতে পারি, সেই সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এলিজা লাঘক। আর এখানে আমার বঙ্গবের উদ্দেশ্যই হলো এমন একটা ষড়যন্ত্রকে উন্মোচিত করা যেটা পুরো পৃথিবীটাকেই গ্রাস করে নিচ্ছে।

একটু হাসল এলিজা। “ফ্রিষ্ট-বিরোধী?”

“যদি আপনি মেনে নেন তাহলে বলি, আসলে এটা হবে আন-অর্থোডক্স। যে লিখেছে সে নিজে হয়ত অর্থোডক্স, তাই আপনাকে সে ফ্রিষ্ট-বিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করেছে। যদিও শেষে এসে হয়ত খানিকটা অতিরিক্ত করে ফেলেছে, কিন্তু এই কথাগুলো কিন্তু মিথ্যে না।”

“একটা বিষয়ে আপনাকে নিশ্চিত করি, মিস্টার থ্রিভান্ডসেন, শেষে যে কথাটা লিখেছে...আমি গোটা পৃথিবীটাই শাসন করতে চাই...এটা তো গাঁজাখুরি বললেও কম হয়ে যায়।”

“আমি মানছি। মানছি যে আপনি এটা করছেন শুধুমাত্র নিজের ও আপনার সংগঠনের অন্যান্যদের স্বার্থের কথা ভেবে। যদি কখনো রাজনৈতিকভাবেও আপনারা পিছিয়ে পড়েন, তারপরও কিছু যায় আসে এতে? আসল কথা হলো মুনাফা, আর সেটা তো আপনাদের আসছেই, ঠেকানো যাবে না।” একটু থেমে দম নিল থ্রিভান্ডসেন। “এই জন্যেই আমার এখানে আসা। আমিও সেই মুনাফায় ভাগ বসাতে চাই।”

“আপনার যা আছে এরপরে তো আর টাকার দরকার হয় না।”

“টাকার দরকার তো আপনারও নেই, মিস। কিন্তু এটা তো আসল কথা না, তাই না?”

“এতে আমার লাভ কী? আপনার লাভের বিপরীতে কী দেবেন আমায়?” পাল্টা প্রশ্ন এলিজার।

“আপনার এক সদস্য আর্থিক টানাপোড়েনের মাঝে আছে। তার সম্মাজ্য প্রায় ভঙ্গতে বসেছে। ঝণ তাকে চেপে ধরেছে মারাত্মকভাবে। সে যে ধরণের জ্বরন-যাপন করে, তাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু তার সেই পরিমাণ টাকা মেই এখন। ভুল ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ, অতি দ্রুত ব্যবসার সম্প্রসারণ, আর উপরোয়া স্বভাবের কারণে সে এখন প্রায় ধৰ্মসের কিনারায় পৌঁছেছে।”

“এই মানুষটার প্রতি আপনার আগ্রহের কারণ?”

“আগ্রহ তার প্রতি না, অন্য জায়গায়। সব জন্মের পর আমার মনে হয়েছে এই দিকটায়, মানে এই সদস্যের দিকে আপনার মনোযোগ দেওয়া উচিত। আর আমি এটাও জানি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে এমন কিছু দেওয়া উচিত যা আপনার নেই, বা জানতেন না। এটাই আমার আসল উদ্দেশ্য।”

“বুঝলাম, কিন্তু এই লোকের সমস্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন?”

“কারণ এই লোকটাই আপনার নিরাপত্তার বড় দুর্বলতা, একমাত্র সিকিউরিটি লিক।”

মেরণ্দণ্ডের ভেতর দিয়ে শীতল স্নোত বয়ে গেল মহিলাটির। তার এত গোপনীয়তা, এত পরিকল্পনা, সবকিছুই ভেস্টে যাবে যদি তার বেছে নেওয়া মানুষগুলোর যে কেউ বেঙ্গিলানি করে বসে।

তাই তাকে জানতেই হবে। “কে সে?”

“লর্ড গ্রাহাম অ্যাশবি।”

বাইশ ইংল্যান্ড

স্যালেন হলে ফিরতে একটু দেরী হওয়ায় অ্যাশবির দুপুরের খাবার প্রায় ঠাণ্ডা হতে চলেছে। তার বাবার পূর্বপুরুষের আদি ভিটেমাটি জমিদারি এই বাড়িটা। দুর্গের মতো গঠন এটার, দাঁড়িয়ে আছে চরিশ হেটের' আয়তনের বিশাল বনভূমির মাঝে। সেই ঘোলশ ষাট সাল থেকে অ্যাশবিদের দখলে এই সম্পদ।

প্রধান খাবার ঘরে চুকে নিয়মমাফিক উত্তর দিকের শেষের আসনে গিয়ে বসল অ্যাশবি। ঠিক পেছনেই তার প্রপিতামহের একটা ছবি দেওয়ালে সঁটা, যেন পেছন থেকে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এই অঞ্চলের ষষ্ঠ ডিউক ছিল এই মানুষটা, এমনকি রানী প্রথম ভিট্টেরিয়ার অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিল সে। বাইরে শীতের হিমশীতল বাতাসের ঘৃণ্ণি তুষারকণা পৌঁছে দিচ্ছে সর্বত্র, আর এটা মাত্র দু'দিন পরের তুষারে ঢাকা ক্রিসমাসের কথাই যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে, অ্যাশবি বসে-বসে ভাবল।

“আমি শুনেছি যে তুমি ফিরেছ,” একটা নারী-কণ্ঠ বলে উঠল।

টেবিল থেকে মুখটা তুলে ক্যারলাইনের দিকে তাকাল অ্যাশবি। সিল্কেজ বেশ বড় একটা খারমিউজ গাউন পড়ে আছে সে, খালি পা দুটো জামার নিচ দিয়ে একটু দেখা দিচ্ছে, আবার আড়ালে হারাচ্ছে। জাপানীদের মতো কিমোনো স্টাইলের একটা আলখাল্লা তার সরু কাঁধজোড়াকে ঢেকে আছে। সামনে ধোকা খোলা সোনালী রঙের গাউনের সাথে তার দীর্ঘ, কঁকড়া চুলগুলো মানিয়েছে বেশ।

“তোমাকে তো দারুণ লাগছে, একেবারে আদু গুহণীর মতো করে সাজগোজ করেছ দেখা যায়।”

হাসল ক্যারলাইন। “এটা কি আমার কাজ না? আমার মনিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য এটা তো আমার করণীয়।”

দু'জনের এই বাক্যবিনিময় ভালো লাগল অ্যাশবির। তার স্ত্রী একরকম অতিশালীনতায় আক্রান্ত। শারীরিক মেলামেশা তো দূরে থাক, একটু-আধটু ঘনিষ্ঠতাকেও তার কাছে মনে হয় কোনো পাপ। সে থাকে লভনে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টটা নানান রকমের পিরামিডে ভরে ফেলেছে সে, আর সেগুলোর নিচে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দেয় যেন কোনো জাদুশক্তি এসে তার আত্মাকে পবিত্র, শুন্দ করে দিয়ে যায়। রাগে, দুঃখে জর্জরিত অ্যাশবি মনে-মনে চায় যেন পিরামিডগুলো সহ তার স্ত্রী ওই এপার্টমেন্টেই পুড়ে মরে। কিন্তু না, তেমন ভাগ্য তার আসেনি। তবে এতে ভালোই হয়েছে তার কোনো সন্তান হয়নি তাদের, বছরের পর বছর তারা আলাদা থাকছে, যে কারণে অ্যাশবির সুযোগটা কাজে লাগিয়ে একাধিক নারীকে সে নিজের সেবা-যত্নের জন্য নিয়োগ দিয়েছে। আর ক্যারলাইন হলো সর্বশেষ এবং সে সবচে দীর্ঘ সময়ের জন্য আছে তার পাশে।

অ্যাশবি তিনটা বিশেষত্ত্ব খুঁজে পেয়েছে ক্যারলাইনের মাঝে যেগুলো আর কারো মাঝে পায়নি।

প্রথমত, সে অসম্ভব রূপবর্তী। এমন নিখুঁত শারীরিক কাঠামো একক মেরুদণ্ডের আর কোনো মেয়ের মাঝে সে পায়নি। একের ভেতর সব উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত, তার মেধা। ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবার্গ এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডন থেকে তার ডিগ্রীগুলো নেওয়া। যার একটা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উপর, আরেকটা ফলিত প্রাচীন ইতিহাসের উপর। মাস্টার্সের গবেষণায় সে আত্মনিয়োগ করেছিল নেপোলিয়নের শাসনামল ও আধুনিক রাজনীতিতে এর প্রভাব-এই বিষয়ে। বিশেষ করে তার আগ্রহ ছিল ইউরোপের একীভূতকরণের উপর এটার প্রভাব নিয়ে। আর সর্বশেষ কারণ হলো, সে আসলেই এই নারীকে পছন্দ করে মন থেকে। এই মেয়ের শারীরিক ভাষ্টা এতই তীব্র আর উত্তেজক যে অ্যাশবি নিজেকে ধরে রাখতে পাও না, আর এভাবে কাউকে আকর্ষণ করা যেতে পারে সেটা তার ধারণাও ছিল না।

“খুব মিস করেছি তোমায় গত রাতে,” টেবিলের উপর বসেই বলল মেয়েটা।

“আমি তখন জাহাজে।”

“ব্যবসা, নাকি বিনোদন?”

নিজের অবস্থান জানে ক্যারলাইন। যে অবস্থানটা অ্যাশবি নিজেই নিয়েছে তাকে। কোনো হিংসা করা নেই, নেই কোনো চাওয়া। ভাবলে অবাক লুম্প, লোকটা তাকে কখনো ঠকায়নি। আর অ্যাশবিও ভাবে যে এই মেয়েটাও তার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত আছে কী না। কিন্তু অ্যাশবি জানে, দু'জনের গোপনীয়তার পথ দু'ভিত্তে চলে গিয়েছে। প্রত্যেকেই তারা স্বাধীন যার-যার জগতে-সুখ পাওয়ার মতো যেকেন্দ্রে কিছু করতে।

“ব্যবসা,” বলল অ্যাশবি, “কাজ তো ওই একটী।” যোগ করল পরে।

একজন চাপরাশি এসে ঢুকল ঘরে, হাতের প্লেটটা রাখল তার সামনে। কচি সেলাইর মূল, চারপাশ মাংসে মোড়া, আর উপর নিচে তার পছন্দের টক স্বাদের পনিরের সস।

ন্যাপকিনটা গুঁজে নিয়েই একটা কাঁটাচামচ তুলে ধরল ক্যারলাইনের দিকে।

“না, না। ধন্যবাদ,” বলল ক্যারলাইন। “আমার খিদে নেই। আর এটা তো আনাই হলো তোমার জন্য।”

কথায় একটু বিদ্রূপের ভাঁজ, অ্যাশবি বুকল সহজেই, কিন্তু খেয়াল না দিয়ে খেয়ে চলল। “তুমি তো আর ছেট মানুষ না, খেতে চাইলে তুমিও কিছু আনিয়ে নিতে পারতে।”

অ্যাশবির এই পুরো এলাকা জুড়ে ক্যারলাইনের বিচরণের অনুমতি দেওয়া আছে, সব চাকর-বাকর এই মেয়েটার কথায় ওঠে বসে। বহু বছর হলো, তার স্ত্রী এই বাড়িতে আসে না। এটা বেশ স্বত্ত্বাদায়ক এই মেয়েটার জন্য। অ্যাশবির স্ত্রী যেমন সব কর্মচারীর প্রতি খিটিমিটি করত, ক্যারলাইন তার উল্টো, সবার সাথেই আন্তরিক আচরণ করে। সবকিছু দারুণ দেখে-শুনে রাখে এই মেয়েটা, যেটা অ্যাশবির খুব ভালো লাগে।

“এই তো ঘণ্টা দুয়েক আগেই খেলাম,” বলল সে।

সেলারিটা খাওয়া শেষ করলো অ্যাশবি, এমন উপাদেয় খাবার পরিবেশনের জন্য তার চাপড়াশির উপর মনে-মনে সন্তুষ্ট হলো সে। এবার তার সামনে তিত পাখির রোস্ট, সাথে মিষ্টি সালাদ। একটু মাথা নেড়ে সে তার ত্ত্বিত বহিঃপ্রকাশ করল, তারপর তার রুটির জন্য আরও একটু মাখন দিতে ইশারা করলো তাকে।

“সেই সোনার খোঁজ কি পেলে?” অবশ্যে মুখ খুলল ক্যারলাইন।

ইচ্ছা করেই মুখ বুজে আছে অ্যাশবি, কিছুই বলেনি কর্সিকার সফল অভিযান সম্পর্কে। সে চাইছিল যেন ক্যারলাইন নিজ থেকেই তা জানতে চায়। সবকিছুতে একটা ভারসাম্য রাখতে হয়। একটা সুসম্পর্কের জন্য এটা খুবই জরুরী।

আর এটা যে মেয়েটাও জানে এবং হাসিমুখে তা মেনে চলে, তা অ্যাশবি বোঝে।

আরও একটা কাঁটাচামচ তুলে নিল সে। “একেবারে তোমার কথামত জায়গায়।”

এই ক্যারলাইন-ই গুস্তাভ, কর্সিকান বই এবং রোমান সংখ্যাগুলোর মাঝের যোগসূত্রটা আবিষ্কার করতে পেরেছিল। এমনকি মুরের নট এর যে ধাঁধা, সেটার সমাধান করার জন্যও মেয়েটা কয়েক সপ্তাহ আগে বার্সেলোনায় কিছু গবেষণা চালায়। এমন কাউকে তার পাশে পেয়ে অ্যাশবি অনেক বেজায় খুশি। আর এটা জানে যে তার কাছ থেকে এখন মেয়েটা কী চাইবে।

“সোনার কয়েকটা বার আমি তোমার পাশে সাজিয়ে রাখব, তোমার জন্য।”

একটু নড় করে মেয়েটা জানান দিল যে সে এতে খুশি আমিও তোমাকে শ্রদ্ধিয় এক সন্ধ্যা উপহার দেবার চেষ্টা করব।”

“একটু বিশ্রাম বা বিনোদনের ব্যবস্থা করা যাক, কীভুল?”

টেবিলের প্রান্তের দিকে আরও একটু ঝুকে আসতেই তার গাউনের খারমিউজ চকমক করে উঠল। “তোমার টাকার সমস্যা তোমিটে গেছে এখন।”

“হ্ম, যতদূর ভাবতে পারি, ভবিষ্যতে আর টাকার দরকার নাও হতে পারে। আমার মনে হয়, ওখানে একশ মিলিয়ন ইউরোর দামের সোনা আছে।”

“আর আমারগুলোর দাম?”

“এক মিলিয়ন তো হবেই। বেশি হতে পারে। আসলে নির্ভর করছে আজ রাতটা কত মধুর কাটবে তার উপরে।”

হেসে ফেলল মেয়েটি। “জনাবের এই পোশাকে চলবে তো?”

সব মিলিয়ে অ্যাশবি এখন বেশ স্বস্তিতে আছে। বছর দুয়েকের নানান বিপদে-আপদের পর সবকিছু আবার ঠিকঠাক মতো চলতে শুরু করেছে। খারাপ পরিস্থিতি শুরু হয়েছিল যখন অ্যামান্দো ক্যান্ট্রাল বিরাট এক ঝামেলা পাকিয়ে ফেলে মেঞ্জিকোতে। ওই সময়ে সে এবং অ্যাশবি প্রায় ধরা পড়তে বসেছিল। ভাগ্য ভালো যে এই সমস্যার সমাধান ক্যান্ট্রাল নিজেই করে ফেলেছিল।

সব ঝামেলা শেষে, এখন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেয়েছে সে।

আর এখন সব ঝামেলা পেরিয়ে, একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেয়েছে।

খাওয়া শেষ হলো তার।

“একটা সারপ্রাইজ আছে তোমার জন্য,” ক্যারলাইন বলল।

এই মেয়েটা আসলেই এক বিরল সংমিশ্রণে ভরা। অর্ধেক কামুক, অর্ধেক জ্বানী। আর ঘটনাক্রমে, এই দুই জগতেই সে মারাত্মক সফল।

“বল, বল। শোনার জন্যই বসে আছি,” বলল অ্যাশবি।

“আমার মনে হয়, আমি নতুন আরও একটা সূত্র আবিষ্কার করেছি।”

মেয়েটার চোখে খুশির বিলিক স্পষ্ট দেখতে পেল অ্যাশবি। “মনে হয় বলতে?”

“সত্য বলতে, আমি নিশ্চিত এটা নিয়ে।”

তেইশ

প্যারিস

বইয়ের দোকান ছেড়ে এখন ছুটছে ম্যালন, পেছনে তাকে অনুসরণ করছে স্যাম। চারপাশের শত মানুষের ব্যস্ততা ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। ফড়েল এখন সেইনে নদী থেকে ঘুরে গেছে, এগিয়ে যাচ্ছে ল্যাটিন কোয়ার্টারের লোকজনে লিঙ্গিজ করা রাস্তাঘাটের দিকে। প্রতিটা গলিই আমোদ-ফুর্তিবাজ মানুষে ভরা। আর দু'দিন বাদেই ক্রিসমাস।

“এরকম ভিড়ের মাঝে কেউ পেছন-পেছন আসছে কিনা তা ধরার কোনো কায়দা নেই,” বলল ম্যালন। “কিন্তু ফড়েল আমাদের মুখ চেনে নেইন, তাই একটু দূরে-দূরে থাকতে হবে।”

“তাকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই মনে হচ্ছে। একবারের জন্য হলেও পেছনে ফিরে দেখেনি সে”

“নিজেকে সবার থেকে পিণ্ডিত ভাবছে, বুঝতে পারছি।”

“সে কি *Café d'Argent* এ যাচ্ছে?”

“তা ছাড়া আর যাবে কথায়?”

একটা স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলল তারা, একটু এগুতেই নানান রকম কথা আর বানিজ্যের সাগরে ডুবে গেল দু'জন। পনির, সবজি, ফল, চকলেট এবং অন্যান্য উপাদেয় খাবার সাজানো রয়েছে কাঠের বিভিন্ন আকারের বাক্সের মাঝে, যেন ভিড়ের মাঝে উপচে পড়ছে ওগুলো। স্যাম খেয়াল করলো, চকচকে বরফের উপর মাছ সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সাথে হাড় সহ ও রোল করা মাংসও আছে, তবে সেগুলো রাখা ফ্রিজের ভেতর। আরও একটু সামনে একটা আইসক্রিমের দোকান, ইটালিয়ান জেলাতো আইসক্রিম বিক্রি করছে তারা বেশ কিছু লোভনীয় ফ্রেঞ্চারে।

ফড়েল এখন তাদের থেকে একশ ফিট দূরে।

“এই লোকটার সম্পর্কে আসলেই কী জানতে চাও তুমি?” জিজ্ঞেস করলো ম্যালন।

“আদ্যপান্তি সব না । আমার ব্যাপারে তার আগ্রহ জাগে বছর খানেক আগে ।”

“আর স্বাভাবিকভাবেই এটাও একটা কারণ, যার জন্য সিক্রেট সার্ভিস চায় না যে তোমার কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকুক । এতে যেমন পাগলামি, তেমনই ঝুঁকি ।”

“তাহলে এখানে আসার কী দরকার ছিল আমাদের?” স্যাম বলল ।

“তা জানে কার কলায় । তুমই বল কেন এলাম? হেনরিক কাদের সাথে যোগাযোগ করতে বলল, ব্যস, এতুকুই জানি শুধু ।”

“আপনি কি সব সময়ই এমন সন্দেহপ্রবন্ধ?”

“এই রোগটা থাকা ভালো, বেশ কাজের । এতে আক্রান্ত হলে তোমার জীবনটা আরও বড় হবে ।”

আরও কিছু ক্যাফে, আর্ট গ্যালারী, বুটিকের দোকান, এবং কয়েকটা স্মারক বস্তু বিক্রির দোকান পেরিয়ে গেল তারা । ভেতরে-ভেতরে দারুণ উত্তেজনা কাজ করছে স্যামের । একজন এজেন্টের কাজ যেমন হওয়া উচিত, অবশেষে তেমন একটা কাজ জুটিছে তার ভাগ্যে ।

“দু'জন দু'দিকে যেতে হবে,” বলল ম্যালন । “এতে করে আমাদেরকে চেনার সম্ভাবনা কমে যাবে । তার মানে যদি সে আমাদেরকে দেখার জন্য প্রেক্ষিত ফেরে তখনকার কথা বলছি ।”

যেই বলা সেই কাজ । রাস্তার অন্য দিক ধরে হাঁটা শুরু করুলো স্যাম । একটা কলেজে মুখ্য হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করত সে, আর কিছু দিন গেলেই সে একজন সার্টিফায়েড পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে যেতে । কিন্তু তার শেষের শেষের বছরে এক সরকারি নিয়োগদাতা তাদের কলেজ পরিদর্শনে আসে আর স্যামকে দেখে পছন্দ হয়ে যায়, আর তখনই তাকে সরাসরি সিক্রেট সার্ভিসে প্রতিয়ে বসানো হয় । গ্রাজুয়েশন শেষে টেজারি শাখার চাকরির জন্য আবেদন করলে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে । একটা পলিগ্রাফ টেস্টও দিতে হয়েছে তাকে, সাথে মেডিক্যাল চেকআপ, চোখের টেস্ট এবং মাদকের উপস্থিতির পরীক্ষা ।

কিন্তু শেষমেশ বাদ পড়তে হয়েছিল তাকে ।

বছর পাঁচেক পর, আবারও সে আবেদন করে, তত দিনে তার ঝুলিতে আরও কিছু দেশী ফার্মে কাজ করার অভিজ্ঞতা যোগ হয়েছে । সেই ফার্মগুলোর একটা আবার তথ্য-বিবরণী গোপন করে বড় রকমের কেলেক্ষারিতে জড়িয়ে পড়ে । সিক্রেট সার্ভিসে থাকাকালীন সময়ে আগ্নেয়ান্ত্রের ব্যবহার শেখান হয়েছে তাকে । কিভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, আপত্কালিন চিকিৎসা কৌশল, গুরুত্পূর্ণ প্রমাণাদির সংরক্ষণ, অপরাধ শনাক্ত, এমনকি জলের মাঝে বাঁচার কৌশল-এসবও শিখতে হয়েছে তাকে । এরপর তাকে নিযুক্ত করা হয় ফিলাডেলফিয়ার ফিল্ড অফিসে, যেখানে সে ক্রেডিট কার্ড অপব্যবহার, জালিয়াতি, চুরি শনাক্তকরণ, এবং ব্যাংক জালিয়াতি নিয়ে কাজ করত ।

ভেতর-বাহিরের সব ভালো-মন্দ খবরই সে জানত ।

স্পেশাল এজেন্ট যারা, তাদের প্রথম ছয় থেকে আট বছর কাটে ফিল্ড অফিসে। এরপর, তাদের কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে বদলি করা হয়, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই আগের থেকে বেশী নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ করতে হয়। এখানে থাকতে হয় তিন থেকে পাঁচ বছর। শেষ হলে, বেশীরভাগই আবার ফিল্ডে ফিরে যায়, অথবা প্রধান কার্যালয়ে বদলি হয়, বা প্রশিক্ষণ অফিসে নিয়োগ, কিংবা ওয়াশিংটন ভিত্তিক কোনো কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়। স্যাম খুব সহজেই দেশের বাইরের কোনো শাখায় কাজ করতে পারত, কারণ সে ফরাসি এবং স্প্যানিশ ভাষায় দারুণ দক্ষ।

ইন্টারনেটে বোকার একটাই কারণ ছিল, সেটা একঘেয়েমি। তার ওয়েবসাইটটা তাকে এমন এক জগতে কাজ করার সুযোগ করে দেয় যেটা একজন এজেন্ট হিসেবে সব সময় তার চাওয়া ছিল। ইলেক্ট্রনিক জালিয়াতি ঠেকানোই বিশ্ব অর্থনীতির নিরাপত্তার সবটুকু না। তার ওয়েবসাইটে একটা ফোরাম ছিল যেখানে সে নিজের কৈথা প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু তার এই নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করার ক্ষমতার জন্য এমন একটা বিষয় সে জেনে যায় যা আসলেই একজন এজেন্টের পক্ষে জানা সম্ভব না, সম্ভব না সেটা হজম করা, কখনোই। এটা যে সে বোঝেনি তা ন্যাটু-দুবার তাকে কঠিন আকারে বকা দেওয়া হয়েছে। দুই বার সে তার উপরের কর্মকর্তাদের কথার অমান্য করেছে। তৃতীয়বার তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডেকে নিয়ে পশ্চ করা হয়েছে, দু সপ্তাহ আগে। যে কারণে তাকে একরকম পালিয়েই চল্লে আসতে হলো কোপেনহেগেনে, উঠতে হলো প্রভাল্ডসেনের কাছে। আর সবশেষে প্যারিসের ছবির মতো সুন্দর একটা জায়গা ধরে, ডিসেম্বরের শীত গায়ে মেঝে ছুটছে সে এক সন্দেহভাজনের পিছু।

সামনের অসংখ্য খাবারের দোকানের একটায় চুকল ফড়েল। অড্রুতভাবে লেখা নামটা বলে দিচ্ছে এটাইঃ

CAFÉ D'ARGENT

গতিটা একটু কমিয়ে দিয়ে ম্যালনকে খুঁজতে লাগল স্যাম, পেয়েও গেল তাকে পঞ্চাশ ফিট দূরেই। দোকানের মূল দরজা দিয়ে চুকতেই কিছুক্ষণের জন্য হাওয়া হয়ে গেল ফড়েল, তারপরেই আবার তাকে দেখা গেল দোকানের স্বচ্ছ কাঁচের ভেতর দিয়ে। প্লেট-কাঁচে বানান জানালার গা ঘেঁষা একটা টেবিলে বসেছে সে।

এগিয়ে এল ম্যালন। “এই হলো তার বুদ্ধি, উদ্ভট কাণ ঘটিয়ে এখন বাবু সেজে শিয়ে বসেছে ওখানে, যেন ফ্রেমে বাঁধান ছবি, আর আমরা সবাই ছুটছি ওটা দেখতে, বাহ।”

গত রাতে জেস্পারের দেওয়া কোট, হাতমোজা, আর মাফলারটা এখনো পরে আছে স্যাম। চোখের সামনে এখনো সেই লাশ দুটো ভাসছে। কোনোরকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই কর সহজেই ওদুটোকে সাগরে ভসিয়ে দিল জেস্পার, যেন খুন-

খারাবী নিত্যদিনের কাজ তার। হয়ত এমনটা তার হতে হয়েছে হেনরিকের জন্যই। সত্যি বলতে, স্যাম এই দেনিস সম্পর্কে কিছুই জানে না তেমন, শধু জানে তার কাজকর্ম, ওয়েবসাইট নিয়ে খুবই আগ্রহী এই বৃন্দ।

এটুকু জানাও যে কারো পক্ষেই অনেক বড় কিছু, স্যাম বিশ্বাস করে।

“চলে আস,” বলল ম্যালন।

দরজা ঠেলে উজ্জ্বল আলোকসজ্জার রেস্টুরেন্টটায় ঢুকল তারা। ভেতরটা চমৎকারভাবে সাজানো-গোছানো। উজ্জ্বল নিলচে ধূসর রঙ, ভিনাইল এবং নিওন দিয়ে পঞ্চশের দশকের আদলে পরিশোভিত করা হয়েছে পুরোটা। চারপাশের পরিবেশটা একটু ধোঁয়াটে ও কোলাহলপূর্ণ। স্যামের চোখ ফড়েলের উপর পড়তেই দেখল সেও তাকিয়ে আছে তাদের দিকে, একদ্রষ্টিতে। বোঝাতে চাইছে যে আমি তোমাদেরকে চিনতে পেরেছি, আর আমিই সেই লোক যাকে তোমরা খুঁজছ।

সরাসরি তার দিকে হেঁটে গিয়ে ভিনাইলের একটা চেয়ার টেনে নিয়েই বসে পড়ল ম্যালন। “মজা তো অনেক হলো, নাকি?”

“আপনি কিভাবে জানেন আমি কে?” জিজেস করলো ফড়েল।

কোলের উপর রাখা বইটার দিকে দেখাল ম্যালন। “ওটাকে ওভাবে মেলে না রেখে ঢেকে রাখাই উচিত ছিল তোমার। যাই হোক, তোমার এই নাটক থেকে এবার আমাদের মুক্তি দিয়ে আসল কাজটা কি শুরু করা যায়?”

▲

ফায়ারপ্লেসের উপরের তাকে রাখা ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটা ছয়ের উপর এসে থেমে জানান দিল, সাড়ে তিনটা বাজে। পুরো বাড়ি জুড়ে আরও বেশ কিছু ঘড়ি একসাথে বেজে উঠল। কাজ বেশ দারুণ আগাছে হেনরিকের। ~~স্টো~~ এলিজাকে এমন কোণঠাসা করে ফেলেছে যে তাকে সাহায্য করা ছাড়া আর কেন্দ্র উপায় নেই এই নারীর।

“লর্ড অ্যাশবির কোমর ভেঙ্গে গেছে,” বলল হেনরিক।

“আপনার কথার স্বপক্ষে প্রমাণ আছে কৈ?”

“প্রমাণ ছাড়া কথা বলা আমার স্বত্ত্বাবের বাইরে।”

“বেশ, তাহলে এবার বলুন, আমার সিকিউরিটির লিকটা কোথায়? কী সেই দুর্বল জায়গা?”

“আপনার কী মনে হয়, কিভাবে এগুলো জেনেছি আমি?”

একটা গভীর, অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকাল এলিজা তার সামনে বসে থাকা মানুষটার দিকে। “অ্যাশবি?”

মাথাটা দুদিকে দোলাল হেনরিক। “সরাসরি তার কাছ থেকে না। আমাদের কখনো দেখাও হয়নি, কথাও হয়নি। তবে সে কিছু লোকের কাছে গিয়েছিল টাকার জন্য। যারা তাকে টাকা দিতে রাজি হলো, তারা একটা নিশ্চয়তা চাইল তাদের টাকা

শোধের ব্যাপারে। তখন তাদেরকে অভয় দিতে অ্যাশবি একটা চমৎকার গ্যারান্টি দেয়, যেটা দিতে গিয়ে তাকে খুলে বলতে হয়েছিল যে সে আসলে কাদের হয়ে, বা কাদের সাথে কাজ করছে। তার লাভ করা নিয়ে বেশ ভালোই বাকচাতুরী করেছে সে।”

“ওদের একজনেরও নাম বলার ইচ্ছা নেই আপনার, তাই না?”

কষ্টে একটা কঠোর ভাব ফুটিয়ে ওঠাল হেনরিক। “তা করতে যাব কোন দুঃখে আমি? আমার তখন আর চারআনা পয়সাও দাম থাকবে না।” সে জানে, নাম-ধাম কিছু না বললেও মহিলাটা তাকে ফেরাতে পারবে না।

“আপনি আসলেই একটা সাক্ষৎ বিপদ, মিঃ প্রভাস্কেন।”

একটা নিশ্চূপ হাসি দিল সে। “আসলেই তাই।”

“তারপরও আপনাকে আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে।”

“আমি আশা করেছিলাম, দু'জনে অন্তত এই বিষয়ের উপর একসাথে কাজ করতে পারব।” এলিজার দিকে দেখাল সে। “একটু আগেই বলেছি যে আমি আপনার কাজ-কর্ম নিয়ে বেশ ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, বিশেষ করে আপনার পূর্বপুরুষদের মধ্যে পোজো ডি বোরগোকে নিয়ে। আমি ভেবে অবাক হই যে এই একটা মানুষের বুদ্ধিতে যে বিবাদ শুরু হয়েছিল নিজেদের মধ্যে, সেটার সুযোগ কী দারণভাবে নিয়েছিল বিটিশ আর রাশানরা। বিশেষ করে তার একটা কথা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। ওটা সে বলেছিল নেপোলিয়নের ছেলের জন্যের কথা শনে, ১৮১১ সনে। সে বলেছিল, ‘নেপোলিয়ন হলো একটা দৈত্য, যে প্রাচীন জঙ্গলের সব বিশাল শক্তিশালী ওক গাছগুলোকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে, ওগুলোর মাথাগুলো মুহূর্যে রাখা হয়েছে জোর করে। কিন্তু একদিন এই জঙ্গলের সব আত্মা একসমত্বে হয়ে এই অনাচার, দাসত্বের দেওয়াল ভেঙ্গে দেবে, সেদিন এই ওকগুলো মাঝে উচু করে দাঁড়িয়ে এই দৈত্যকে বজ্রের বেগে বের করে দেবে, ছুঁড়ে দেবে পৃথিবীর দিকে।’ ঠিক যেন একটা ভবিষ্যৎবাণী যেটা ঠিক-ঠিক ফলেও গিয়েছে।”

হেনরিক জানে, সামনের এই মহিলাটি নিজের পূর্বপুরুষদের মাঝে শক্তি, অনুপ্রেরণা খোঁজে। এটা নিয়ে সে খোলামেলা কথাও বলে প্রায়শই, আর সেটা বেশ গর্বভরেই। এদিক থেকে হেনরিক আর এই নারী সাদৃশ্যপূর্ণ।

“সে নেপোলিয়নের মতো ছিল না,” বলল এলিজা। “ডি বরগো ছিল কর্সিকার সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক। নিজের দেশকে সে ভালবাসত জান-প্রান দিয়ে, আর দেশের স্বার্থের কথাই আগে ভাবত। নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সের হয়ে কর্সিকা দখল করে নিল, তখন ষড়যন্ত্র করে ডি বরগোর নাম রাজক্ষমপ্রাণদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাই জীবন বাঁচাতে সে পালিয়ে যায়। নেপোলিয়ন তাকে ধরতে সারা ইউরোপ চৰে বেড়িয়েছে, কিন্তু ডি বরগো সেই গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিল।”

“আর একই সাথে নেপোলিয়নকে কিভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়, সেই ছকও কষ্টিল। কী অসাধারণ কীর্তি।”

পোজো ডি বরগোর উপর পড়াশোনা করে হেনরিক জেনেছে, ওই সময়ে ফরাসি কোর্ট এবং ক্যাবিনেটে কী পরিমাণ প্রচারণা চালিয়েছে সে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে। শুধু নেপোলিয়ন কেন, তার অনেক ভাই-বোনের বিরুদ্ধেও অনেক কৃটচাল সে চেলেছে, হিংসায় নিজে যেমন জলেছে, তেমনি মানুষের কাছে নেপোলিয়নের বদনাম, দুর্বলতা ছড়িয়ে তাদের মনটাও বিষিয়ে তুলেছে। আর তাই, ফরাসি বিরোধী সব রকম কর্মকাণ্ডের মূল হোতায় পরিণত হয় সে খুব সহজেই। অঞ্চিয়ার রাজনীতিতে তাকে আস্থাভাজন হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকে, এবং সে ভিয়েনাতে ব্রিটিশ এস্বাসির হয়ে কাজ শুরু করে। এর পরে আসে তার মোক্ষম সুযোগ। যখন সে রাশান কৃটনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে প্রশিয়ান আর্মির কমিশনার হয়ে, তখন সে রুশ স্মার্ট জার এর ডান হাত। ফ্রাসের সাথে সব রকম সম্পর্ক দেখাশোনা তখন তার দায়িত্বে। সেই সুযোগে আলেকজান্দ্রকে সে প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়েছিল যেন, রাশিয়া নেপোলিয়নের সাথে আপসে না যায়। দীর্ঘ বারটি বছর সে খুব কৌশলে ফ্রাসে আভ্যন্তরীণ নানা রকম বিশ্বাস্তা, অরাজকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। সে এটা ভালোই জানত যে যুদ্ধ করার শক্তি নেপোলিয়নের আছে, তাই তাদেরকে দুর্বল করতেই ধীরে-ধীরে এমন বিরোধের দিকে ধাবিত করেছে সে। অবশেষে, তার এই কৌশল তাকে কঙ্কিত সাফল্য এনে দেয়, যদিও তার জীবনের সফলতা সেইভাবে স্থিকৃতি পায়নি। ইতিহাস তার কথা মনে রাখেনি। সে মারা যায় ১৮৪২ সালে শৃঙ্খলার আগে তার মস্তিষ্কের বিকার ঘটে, কিন্তু সম্পদের বিশাল এক পাহাড় রেখে আয় সে। তার সবকিছু সে তার ভাইয়ের ছেলেদের নামে দিয়ে যায়, যাদের একজনে ছিল এলিজার পূর্বপুরুষ, যার সন্তানেরা সেই সম্পদকে বাড়িয়েছে একশণ্ঠের প্রিয়ী, রচনা করেছে ইউরোপের বুকে এক বিরাট সাম্রাজ্যের।

“ডি বরগো তার জীবনের শেষ পর্যন্ত এই জাতিগত বিবাদ টেনে এনেছিল,” হেনরিক বলল। “কিন্তু আমি চিন্তা করি কী ম্যাডাম, নেপোলিয়নের প্রতি আপনার কর্সিকান পূর্বপুরুষের এই যে ঘৃণা ছিল, তার কী গোপন কোনো কারণ আছে, মনে ছিল?”

তার শীতল চোখে ঝুঁটিভাবে শ্রদ্ধা নিয়ে হেনরিকের দিকে তাকাল এলিজা। “আপনি যা-যা জানেন, তা কেন খুলে বলছেন না?”

“নেপোলিয়নের হারানো সম্পদ, মানে সোনা-দানা খুঁজছেন আপনি। এই কারণেই লর্ড অ্যাশবি আপনার দলের সদস্য। আর সে একজন...অন্দুভাবে যদি বলি...পুরদস্তুর সংগ্রাহক।”

এই শব্দটা শুনে একটু হাসল এলিজা। “হ্ম, বুঝতে পারছি, আপনার কাছে আরও আগে শরণাপন না হয়ে ভুল করেছি।”

কাঁধজোড়া একটু ঝাঁকাল হেনরিক। “সৌভাগ্যক্রমে, আমি আবার মনের ভেতর পুরনো রাগ পুষে রাখি না।”

চরিশ প্যারিস

জিমি ফড়েলকে নিয়ে ম্যালনের ধৈর্য কমে আসছে দ্রুত। “এই ধরণের লুকোছাপার কোনো দরকার নেই। কিসের ভয় তোমার এত? কে লেগেছে তোমার পেছনে?”

“আপনার কোনো ধারণাই নেই আমার উপর কত মানুষ ক্ষ্যাপা।”

হাত নেড়ে এই তরঙ্গের শংকা দূরে সরাতে চাইল ম্যালন। “ছাড়ো তো, ওগুলো কিছু সংবাদ মাত্র। কারো ওগুলো নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি তোমার ওয়েবসাইটে গিয়েছি, পড়েছি। বস্তাপচা, অকাজের জিনিসে ভরে রেখেছ সাইটটা। যাকগে, তোমার আসলে চিকিৎসা দরকার, এই রকমের পাগলাটে স্বভাব ওষুধ ছাড়া দূর হবে না।”

স্যামের দিকে তাকাল ফড়েল। “তুমি আমায় বলেছিলে যে তোমার হাতে এমন একজন আছে, যে কিনা জানতে চায়, শিখতে চায়। যার মনটা খোলামেলা। কিন্তু এটা তুমি কাকে এনেছ? এই-ই কি সেই লোক? নাহ।”

“বেশ, আমাকে শেখাও তাহলে,” বলল ম্যালন।

পাতলা ঠোঁটজোড়া ফড়েলের একটু আলাদা হয়ে গেল, তখনই ক্ষুধা গেল তার সামনের দাঁত সোনা দিয়ে মোড়া। “কিন্তু, ঠিক এই মুহূর্তে আমার ক্ষুধা লেগেছে, খাব।”

ওয়েটারকে খুঁজে পেতে ঘুরে গেল ফড়েল। ম্যালন শুল্কে পেল ছেলেটি কড়াইয়ে ভাজা বাচ্চুরের কিডনি অর্ডার করেছে, সাথে সরিষা কাটা। শুনেই অভিজ্ঞতে পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল ম্যালনের। তবে ক্ষুলো খবর হলো, ওই খাবার আসার আগেই ম্যালনের কথা শেষ হয়ে যাবে। সে নিজে কিছু আর অর্ডার করলো না খাওয়ার জন্য।

“আমাকে একটা *côte de boeuf* দেবেন,” স্যাম বলল; গরুর পাঁজরের এই মাংস খুব প্রিয় তার।

“কেন?” প্রশ্ন করলো ম্যালন।

“আমারও ক্ষুধা লেগেছে, সেই কখন খেয়েছি।”

মাথাটা দুঁদিকে দোলান ছাড়া আর কিছুই করার নেই ম্যালনের।

ওয়েটার চলে যেতেই সে আবারও জিজ্ঞেস করলো ফড়েলকে, “তোমার এত ভয় কিসে?”

“এই শহরেই কিছু প্রভাবশালী লোক আছে, যারা আমার সম্পর্কে সবকিছুই জানে।”

মনে-মনে নিজেকে বোঝাল ম্যালন যে এই হাঁদারামকে বুঝিয়ে লাভ নেই। তাই সে যা বলতে চায়, বলতে দেওয়া উচিত। হয়ত কখনো, কোনোভাবে একটা-দুটো গুরুত্বপূর্ণ কিছু বেরিয়ে আসতে পারে তার কথায়।

“তারা এমনভাবে কাজ করে যেন আমরা বাধ্য হই তাদের অনুসরণ করতে,”
বলল ফড়েল। “এমনকি সেটা আমরা মালুমও করতে পারি না। তারাই আমাদের
ভেতর অভাবটা তৈরি করে, আর সেটা পূরণ করতে আমাদের যা করতে হয়, তাতেই
তাদের স্বার্থ হাসিল হয়ে যায়, কিন্তু আমরা সেটা টেরও পাই না। তাদের জন্যই কাজ
করে চলেছি আমরা, আর সেটা আমাদের অজান্তেই। ওদের পণ্য আমরা কিনছি,
আর...

“তারা কারা?” প্রশ্ন ম্যালনের।

“এই ধরুন ইউ এস ফেডারেল রিজার্ভ এর মতো মানুষজন। এরা পৃথিবীর বুকে
শক্তিশালী দলগুলোর একটা।”

ম্যালন জানে যে তার কোনো প্রশ্ন করা উচিত হবে না, তবুও না করে পারল না।
“তোমার এমনটা বলার কারণ?”

“আমি ভেবেছিলাম এই মানুষটার কথা তুমি বেশ ভালো বলেছিলে,” ফড়েল
বলল স্যামকে। “কিন্তু ইনি তো কিছুই জানেন না।”

“দেখ ফড়েল,” আবারও মুখ খুলল ম্যালন। “এলিয়েনদের ময়নাতদন্ত নিয়ে যে
গল্প চালু হয়েছিল তা ঘেঁটেঘুঁটে দেখা শেষ আমার। *Area 51* নিয়েও কাজ করেছি গত
কয়েক বছরে। কিন্তু এই অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদি আমার কাছে নতুন।”

উত্তেজনায় কাঁপতে থাকা একটা আঙুল উঁচু করে ধরল ফড়েল। “বুবলাম, আপনি
বেশ মজার মানুষ। আর তাই এই সবকিছুই আপনার কাছে আসে তামাশার বিষয় মনে
হচ্ছে।”

“আমার যা-ই মনে হোক, তুমি সব খোলাসা করে কেন বলছ না?”

“ফেডারেল রিজার্ভ একরকম শূন্য থেকেই দৌড়ে ইনকাম করে। তারপর এটা সেই
টাকাই আবার আমেরিকাকে ঝণ দেয়। যেই ঝণ শোধ করতে হয় যারা ট্যাক্স দেয়
তাদের টাকায়, একেবারে সুদ সমেত শোধ দিতে হয়। কিন্তু তারপরও ঝণ থেকে যায়
আমেরিকার, যে ঝণের পরিমাণ এত বেশী যে সেটা কয়েক ট্রিলিয়ন হবে। এই ঝণের
বিপরীতে যে বিরাট অংকের সুদ আসে, সেটার সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে প্রাইভেট কিছু
বিনিয়োগকারী। এরা পর্দার আড়াল থেকে এগুলো করে। আর এক বছরে যে পরিমাণ
সুদ আসে, সেটা পৃথিবীর সবচে ধনী মানুষটার সম্পদ থেকেও কমপক্ষে আটগুণ বড়।
তাই বোঝাই যায়, যে এই ঝণ থেকে পুরোপুরি বের হতে পারবে না কখনোই। অনেক
মানুষ এই ঝণ দেওয়া-নেওয়ার খেলায় সীমাহীন লাভবান হচ্ছে, সম্পদের পাহাড়
গড়ছে। আর এটা পরিষ্কার দু-নম্বরি। আপনার-আমার যদি টাকা ছাপানোর ক্ষমতা
থাকত, আর আমরা সেটা করে ঝণ দিয়ে বেড়াতাম, তাহলে আমাদের জেলে যাওয়া
লাগত।”

ম্যালনের মনে পড়ে গেল ফড়েলের ওয়েবসাইটে কী পড়েছিল সেটা। ধারণা করা
হয়, জন কেনেডি এই ফেডারেল রিজার্ভকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন, এবং
Executive Order 11110-এ স্বাক্ষরও করেছিলেন, যেটায় স্পষ্ট আদেশ দেওয়া

আছে যে ইউ এস সরকার ফেডারেল রিজার্ভের কাছ থেকে টাকা সরবরাহের দায়িত্বটা নিয়ে নেবে। এর তিনি সপ্তাহ পরেই, কেনেডি খুন হন। তার স্থানে লিভন জনসন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আসার পরপরই কেনেডির স্বাক্ষরিত আদেশটি বাতিল করেন। ম্যালন আগে কখনো এরকম কোনো অর্ডার বা রিপোর্টের কথা শোনেনি, তাই সে নিজে সেই *Executive Order 11110* খুঁজে বের করেছে। সে দেখেছে, অর্ডারটা আসলেই কার্যকর ছিল, আর যদি ওটা কাজে লাগানো যেত, তাহলে ওটার প্রভাব সত্যিকার অর্থে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমকে দুর্বল করার পরিবর্তে আরও শক্তিশালী করে দিত। সেই অর্ডারে স্বাক্ষর করা আর তার কিছুদিন পরেই খুন হওয়া, দুটো বিষয়ই কাকতালীয়। আর লিভন জনসন সেই অর্ডার বাতিলও করেনি। তার বদলে ওটাকে সংস্কার করা হয় কয়েক দশক পরে, আরও কিছু পুরনো নিয়ম-কানুনের সাথে।

ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার সব।

মূল বিষয়ে আবার ফিরতে চাইল ম্যালন। “প্যারিস ক্লাব সম্পর্কে কী জানো তুমি?”

“যতটুকু জানলে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত, ততটুকুই।”

▲

এলিজা এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে থ্রিভাল্সেনের দিকে। “আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে, টাকা আসলেই কি করতে পারে?”

কাঁধ ঝাঁকাল তার অতিথি। “আমার পরিবার বহু টাকা জমিয়েছে, বছরের পর বছর ধরে, আসলে ওভাবে কখনো ভেবে দেখিনি। তবে এটা বলতে পারি, টাকা আপনাকে শক্তি, প্রভাব আর একটা আরামদায়ক জীবন দিতে পারে।”

একটু আয়েশি ভাব ফুটে উঠল তার মন্ত্রিতর। “টাকা আরও কিছু করতে পারে। যুগোন্দুভিয়া এর একটা চমৎকার উদাহরণ।”

সে খেয়াল করলো, তার অতিথি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠছে।

“ধারণা করা হয়, ১৯৮০ সালে যুগোন্দুভিয়ায় সমাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শাসনামলের উত্থান ঘটে যেটা মানবতা বিরোধী বহু কাজের জন্য দেয়। ১৯৯০ সালের স্বাধীন গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পর, সার্বিয়ার জনগণ বেছে নেয় সমাজতান্ত্রিক দলকে, অন্য দিকে, যুগোন্দুভিয়ার বাকি জনগণ পশ্চিমা বিশ্বের সরকার ব্যবস্থা বেছে নেয়। ফলে আমেরিকা যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয় সার্বিয়ার সাথে। এই ঘটনার আগে যুগোন্দুভিয়া ছিল পূর্ব ইউরোপের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলোর একটা। কিন্তু বিশ্বের কিছু হোমরা-চোমরার কূটচালের কাছে ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে দেশটি। আমেরিকা-সার্বিয়া যুদ্ধ, এবং যুগোন্দুভিয়ার ভেঙ্গে যাওয়া-এই ঘটনাগুলোই মূলত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে ভালো হতে পারে সেই ধারণা, বিশ্বাস একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়।”

“সার্বিয়াকে ধোয়া তুলসী পাতা মনে করা যাবে না, ওরা মারাত্মক মারকুটে, আর বিপদজনক,” বলল থ্রিভাণ্ডসেন।

“কে বলেছে এটা? মিডিয়া? সার্বিয়া কি আপনার ঐ উত্তর কোরিয়া, চায়না বা ইরানের থেকেও উগ্র? বলুন। তারপরও দেখেন, কোনো দেশই তাদের সাথে যুদ্ধ করতে যায় না। বড় বন জ্বালিয়ে দিতে একটা দেয়াশলাই-ই যথেষ্ট। আমায় এটা বলেছিল এক কৃটনীতিক। সার্বিয়াতে যে আগ্রাসন চলেছিল, সেটাকে মূলধারার গণমাধ্যমগুলো পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল, সাথে সে সময়ের সারা বিশ্বের বেশ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও প্রভাব ছিল এর উপর। এই আগ্রাসন চলে দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। আর শেষে এসে সবকিছু এতটাই অনুকূলে চলে যায় যে সাবেক যুগোস্লাভিয়ার গোটা অর্থনীতিকে করায়ত করতে খুব কম মূল্যই দিতে হয়েছে সেইসব পর্দার আড়ালের কৃটনীতিকদের।”

“ତାର ମାନେ ଆସଲ ଘଟନା ଏଟାଇ ଘଟେଛିଲୁ?”

“আমি এটাও জানি যে বেশ কিছু বিনিয়োগকারী এই বিপর্যয়ের সুযোগটা নিয়েছিল ভালোভাবেই।”

“তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন যে ওখানে যা কিছু হলো, তা সবটাই পূর্বপরিকল্পিত?”

“তা বলা যায় একরকম। খুব জোর গলায় না পারলেও, ভেতরে-ভেতরে ঠিকই জানি। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে বড় কোনো বিপর্যয় থেকে ফায়দা লোটা খুবই সম্ভব। বিবাদ হোক, সেটা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মধ্যখানেই কিছু মানুষ লাভ খুঁজে নেয়, সে যেভাবেই হোক। তবে কথা হলো, সেই গ্র্যাঞ্চামকে থামতে হবে কখনো না কখনো। তাহলেই শুধুমাত্র বিনিয়োগটা লাভের প্রত্যেক দেখাবে।”

এই জ্ঞানগর্ত আলোচনাটা বেশ উপভোগ করছে এলিজা। এমন সুযোগ কালেভেদে আসে। সে কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু কাউকেই নির্দিষ্ট করে অভিযুক্ত বা দোষী করছে না; শুধুমাত্র একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে, যে কথাগুলো অনেক অর্থনীতিবিদ ও ইতিহাসবিদ অনেক আগেই বলে শিয়েছে।

“১৮শ শতক ও ১৯শ শতকে,” বলল এলিজা, “রথচাইল্ডরা ছিল এই কাজে একেবারে সিদ্ধহস্ত। ওরা উভয় পক্ষের হয়েই খেলত, আর প্রচুর ফায়দা লুটিত, বিশেষ করে যখন মাঠের বাচ্চাদের মতো ইউরোপীয়রা নিজদের মধ্যে লড়াই করতে ব্যস্ত ছিল, তখন। রথচাইল্ডরা যেমন ছিল ধনী, ওদের কাজকর্ম ছিল বিশ্বব্যাপী, একেবারেই স্বাধীন ছিল ওরা। আর এই তিনটা শক্তি তো বিপদজনক। রাজ্য সরকার তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। যেসব আন্দোলন হত তখন শান্তির পক্ষে, সেসব আন্দোলন কর্মীরা তাদেরকে ঘৃণা করত, কারণ তাদের কাজকর্ম, সম্পদের ক্ষতি কোনোকিছুই স্বচ্ছ ছিল না জনগণের কাছে। এমনকি সংবিধান প্রণেতারাও তাদেরকে বেশ ক্ষতিকর মনে করত, কারণ তাদের কাজকর্ম ছিল সব গোপনে।”

“ଠିକ୍ ଆପଣିଓ ସେଭାବେ କରନ୍ତେ ଚାଇଛେ?”

“দেখুন, যেকোনো কাজ পরিকল্পনামাফিক করতে গেলে আপনাকে গোপনীয়তা রাখতেই হবে। মিঃ প্রভান্তসেন, আপনি বুঝবেন বিষয়টা। একটু ভাবুন, একটা কাজে আপনি অর্থের যোগান দিলেন, বা দিলেন না, দুটোতেই কিন্তু দৃশ্যপট একেবারেই বদলে যেতে পারে। শুধু অর্থ না, দৃশ্যপট কিন্তু আপনার দলের সদস্য নির্বাচনের উপরে নির্ভর করেও বদলে যেতে পারে। এমনকি আপনি নিয়মিত তাদের সাথে কেমন কী আলোচনা করবেন, সিদ্ধান্ত নেবেন, এটার উপরেও নির্ভর করে ঘটনা কোন দিকে মোড় নেবে। আপনি যদি পর্দার আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়েন, তো জনগণের রোষানল থেকে আপনি বেঁচে যাবেন, আর তাদের কাছে এমন ইতিবাচক থাকতে পারলে, সেটা স্বাভাবিকভাবেই একটা সময়ে আপনাকে রাজনৈতিক ব্যক্তিতে পরিণত করে দেবে, যার উপর জনগন আস্থা রাখতে পারে।”

“হ্ম, আর তাদেরকে নিয়ন্ত্রণও করা যাবে তখন।”

“মনে হচ্ছে যেন আপনার নেই এমন লোকবল।” মূল আলোচনায় ফিরতে হবে এলিজাকে। “আচ্ছা, যাই হোক, এখন লর্ড অ্যাশবির বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে কোনো প্রমাণ দেবেন আপনি?”

“সময় এলেই দিয়ে দেব।”

“বেশ, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহলে লর্ড অ্যাশবিরকে নিয়ে আপনি যা বলেছেন সেগুলো আমি আমার অজ্ঞাত বিনিয়োগকারীদের সাথেই তুলে রাখছি। আপনার বলার সময় হলে বলবেন, আর আমিও তখন অজ্ঞাতদের আপনার সামর্থ্যে ধরবো।”

“আচ্ছা, এটা হলে কেমন হয়? আমাকে আপনার দলে নিয়ে নিন, আমরা এক সাথে কাজ করি, তখনই প্রমাণিত হয়ে যাবে, আমি সম্মতি বলেছি, নাকি মিথ্যা। যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি, তাহলে আপনি আমার স্ট্রেচ-ফি-র কুড়ি মিলিয়ন পাউন্ড রেখে দেবেন।”

“কিন্তু এতে তো আমাদের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে।”

“এটা তো ইতিমধ্যেই ফাঁস হয়ে গেছে।”

প্রভান্তসেনের এই হঠাৎ আগমনটা আসলেই ঘাবড়ে দেওয়ার মতো, কিন্তু তারপরও এটাই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। এই লোকের দ্বারাই আসতে পারে তার চূড়ান্ত সফলতা। এলিজা ভাগ্যে বিশ্বাস করে—এটা ম্যানেজমেন্টেও বলেছে সে।

তার চূড়ান্ত ভাগ্যের অংশ হতেও পারে এই হেনরিক প্রভান্তসেন।

“আমি কি আপনাকে কিছু দেখাতে পারি?” প্রশ্ন করলো এলিজা।

▲

জলের বোতল, ওয়াইন আর রুটির বাক্সেট নিয়ে ম্যালনের সামনে হাজির হলো ওয়েটার। এর আগেও সে কখনো ফরাসি রেস্তোরাঁ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

প্রতিটাতেই হয় খাবারের দাম চড়া, বা অতি-প্রশংসিত, কখনো বা দুটোই পাওয়া যায় এক জায়গাতে।

“এই প্যানে ভাজা কিউনি সত্যিই ভালো লাগে তোমার?” ফড়েলকে জিজ্ঞেস করলো ম্যালন।

“কেন, কী সমস্যা এতে?”

এই ধরণের খাবার যে দেহের জন্য খারাপ, তা ব্যাখ্যা করার জন্য ম্যালন এখানে আসেনি। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ম্যালন বলল, “প্যারিস ক্লাব নিয়ে কিছু বল।”

“আপনি কি জানেন, এই চিন্টাটা কোথা থেকে এল?”

ম্যালন খেয়াল করলো, ফড়েল এমন একটা কথা বলে খুব ভাব নিচ্ছে। “তোমার ওয়েবসাইটে যা লিখেছ, তা তুমি নিজেই স্পষ্ট করনি।”

“ইউরোপ জয় করার পর নেপোলিয়ন চাইলেন, সে ওখানেই থিতু হয়ে বাকি জীবনটা আয়েশ করে কাটাবে। তাই সে একটা দল গঠন করল, যার নাম দিল প্যারিস ক্লাব। উদ্দেশ্য ছিল, সে যেন এই ক্লাবের মাধ্যমে তার রাজ্যগুলো সহজেই শাসন করতে পারে। কিন্তু দৃঢ়গ্রামবশত, সে আসলে তার এই চিন্তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। কিভাবেই বা পারবে, একের পর এক যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে সে—”

“আমার মনে হয়, একটু আগেও তুমি বললে, নেপোলিয়ন আর যুদ্ধ করতে চায়নি।”

“হ্যাঁ, ঠিকই তো, কিন্তু অন্যান্যরা চাইত। নেপোলিয়নকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখতে পারলে তাকে সবচে বেশি অপ্রস্তুত অবস্থায় রাখা যাবে। তারা সব সময় চাইত যেন নেপোলিয়নের দরজায় সর্বদা শক্রদের আনাগোনা থাকে। রাশিয়ার সাথে সে শান্তি আলোচনায় বসতে চেয়েছিল, কিন্তু জার তাকে এই ক্ষণে মানা করলেন। তাই ১৮১২ সালে রাশিয়া আক্রমণ করে সে, আর এটা এমন্ত্রে একটা সিদ্ধান্ত, যেটা নেপোলিয়নের আর্মির প্রায় পুরোটাই শেষ করে দেয়। এরপর, একের পর এক অবনতি। তিনি বছরের মাথায়, বাই-বাই। ক্ষমতাচ্যুত।”

“এতে কী বোঝা যায়? কিছুই না।”

এক দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ফড়েল, যেন কিছু একটা চোখে পড়েছে তার।

“কোনো সমস্যা? কিছু দেখলে নাকি?” জিজ্ঞেস করলো ম্যালন

“না, এমনি একটু দেখলাম চারপাশটা।”

“বুঝলাম না, সবার চোখের সামনে এমন জানালার পাশে বসলে কেন তুমি?”

“এখনো এটা ধরতে পারেননি, তাইতো?”

“ধরার চেষ্টা করছি।”

“যেহেতু আপনি ওয়েবসাইটটা দেখেছেন, আপনি জানেন যে এলিজা লাঘক নতুন একটা প্যারিস ক্লাব গঠন করেছে। উদ্দেশ্য একই। সময় এবং মানুষগুলো শুধু আলাদা Ruel O'Araignée ভবনে তারা বৈঠক করে। আমি এটা হলফ করেই

বলতে পারি। কারণ আমি তাদেরকে সেখানে দেখেছি। এমনকি তাদের সদস্যদের মাঝে একজনের হয়ে আমার পরিচিত এক লোক কাজ করে। সেও আমার সাথে আমার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করে এই বিষয়ে অনেক কিছুই বলেছে। এই লোকগুলো এখন চক্রান্তের নীল নকশা করছে। তারা ঠিক সেই কাজটাই করতে যাচ্ছে যেটা রথচাইল্ডের দুইশ বছর আগে করেছিল। যেটা নেপোলিয়নও করতে চেয়েছিল। এটা হলো চূড়ান্ত রকমের ষড়যন্ত্র। *The New World Order*, নতুন যুগের সূচনা। যেখানে অর্থনীতিই হবে একমাত্র অস্ত্র।”

স্যাম চুপচাপ বসে শুনছে তাদের দু'জনের কথাবার্তা। ম্যালন বুঝতে পারছে যে জিমি ফড়েলজা বলছে তার বাস্তব ভিত্তি কতটা অমূলক। কিন্তু তারপরও নিজেকে কিছু বিষয়ে সংবরণ করাতে পারছে না সে। “কোথাকার কোন ঘাথানষ্ট মানুষের কাজকর্মে এমনভাবে ডুবে আছ যে দেখ, আমার নামটা পর্যন্ত জানতে চাওনি এখনো।”

“কটন ম্যালন। স্যাম আমাকে মেইলে জানিয়েছে।”

“তুমি আমার সম্পর্কে কিছুই জানো না। হতেও তো পারে আমি এখানে তোমাকে মেরে খুন করতে এসেছি। তুমই এতক্ষণ যেরকম বললে, কারা যেন তোমায় চোখে-চোখে রাখছে, তোমার চারপাশেই ঘুরঘুর করছে। তুমি ইন্টারনেটে কিসের ছাড়ছ, সেগুলো তারা দেখছে। লাইব্রেরি থেকে কোন বই তুমি নিছ, স্টোরে তারা খেয়াল করছে। তোমার রক্তের গ্রুপ, মেডিকেল ইন্সিটিউট, তোমার বন্ধুবান্ধব-প্রজাতি তারা জানে।”

চারপাশের মানুষের ভেতর দিয়ে চোখ বুলাতে শুরু করলো ফড়েল। প্রতিটা টেবিলেই মানুষজন গিজগিজ করছে, যেন একেকটা খাঁচা আমাকে যেতে হবে।”

“এই ভাজা কিউনির কী হবে?”

“আপনি খেয়ে নেন।”

আর কোনো কথা না বলেই ফড়েল উঠে দাঁড়িয়ে ছুট দিল দরজার দিকে।

“এটা আসলে তারই খাওয়া উচিত,” বলল স্যাম।

ম্যালন খেয়াল করলো, এই পাগলাটে মানুষটা কিভাবে টেবিল ছেড়ে ছুটে গিয়ে চারপাশের রাস্তাটা ভালো করে দেখে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সে নিজেও ছোটার জন্য প্রস্তুত। বিশেষ করে যেহেতু খাবারটা এখনো আসেনি।

ঠিক তখনই কিছু একটা তার মনোযোগ আকর্ষণ করলো।

পথচারীদের একমাত্র পথটার ওপারে, একটা আর্টের দোকানের সামনে।

দুটো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, পরনে উলের পুরু কোট।

তাদের মনোযোগ চট করে জেগে উঠল ঠিক যখনই ফড়েলকে দেখতে পেল তারা।

“ওরা পর্যটক না,” বলল স্যাম।

“ঠিক ধরেছ।”

পঁচিশ

স্যালেন হল

অ্যাশবি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যারলাইনকে, একটা গোলকধাঁধাময় পথ দিয়ে। জায়গাটা একেবারে নিচতলায়, এই ম্যানসনের উন্নত দিকটায়। কিছুদুর এগিয়ে তারা একটা বৈঠকখানায় ঢুকল, যেটা বর্তমানে ক্যারলাইনের স্টাডি। ভেতরে কয়েকটা টেবিল জুড়ে নানান বইখাতা, কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বইগুলোর বেশীরভাগই দুশ বছরেরও পুরনো হবে। একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে খুব চড়া দামে কেনা হয়েছিল ওগুলো, সেই সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে। অবশ্য সেখান থেকে কিছু বই চুরি করেছিল মিঃ গিল্ডহল। সবগুলোই একই বিষয়ের উপর লেখা।

নেপোলিয়ন।

“গতকালই আমি রেফারেন্সটা পেলাম,” নির্দিষ্ট একটা বাস্তিল খুঁজতে-খুঁজতে বলল ক্যারলাইন। “অরলিওস থেকে যে বইগুলো কিনেছিলাম না? ওগুলোর ভেতর একটায়।”

ক্যারলাইন আধুনিক ও পুরাতন উভয় ফরাসি ভাষায়ই সমান দক্ষ ট্রান্সলিট থেকে অ্যাশবি পিছিয়ে আছে।

“এটা ১৯ শতকের শেষ দিকে লেখা একটা বই, এক ব্রিটিশ সৈন্যের লেখা যে সেন্ট হেলেনায় নিয়োজিত ছিল। এই মানুষগুলো যে নেপোলিয়নকে কী পরিমাণে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত তা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। মানে প্রকৃজন বীরকে ঘতটা ভক্তি করা যায় এটা তার থেকেও বেশি। মনে হয় যেন নেপোলিয়নের পক্ষে কোনো পাপ বা ভুল করা সম্ভব না। আর এই বইটা, যেটা লেখাটি একজন ব্রিটিশের, ভাবা যায়?”

বইটা অ্যাশবির হাতে দিল সে। ফিকে হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলোর মাঝ দিয়ে বেশ কিছু টুকরো কাগজ বেরিয়ে আছে, কাজ করছে বুকমার্কের। “যত গল্প প্রচলিত, তার বেশীরভাগই সিরিয়াসলি নেওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে এখানে যেটা আছে সেটা আসলেই চমৎকার কিছু।”

অ্যাশবি যে নতুন কিছু খুঁজে পেয়েছে, সেটা ক্যারলাইনকে জানাতে চাইল। “যে বইটা ধরে কর্সিকার সোনা পেলাম, ওখানে কিন্তু আরও একটা *Sens* এর কথা উল্লেখ আছে।”

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়েটার মুখ। “সত্যি?”

“তুমি তো ভাব আমি কিছুই আবিষ্কার করতে পারি না, দেখলে তো, আমিও পিছিয়ে নেই।”

হাসল মেয়েটা। “আমি কী ভাবি, তুমি জানো কিভাবে?”

“এটা বোঝা কঠিন কিছু না।”

অ্যাশবি তাকে খুলে বলল যে সেই বইয়ের ভূমিকাতে কী লেখা আছে, সেইন্ট দেনিস কী রেখে গেছে *Sens* শহরের মাঝে। বিশেষ করে একটা বইয়ের কথা উল্লেখ করে গেছে সে, *The Merovingian Kingdoms 450-751 A.D.*

অ্যাশবি খেয়াল করলো যে এই বইয়ের শিরোনামটাই কেমন যেন অর্থপূর্ণ ঠেকল ক্যারলাইনের কাছে। সে নামটা শুনেই পাশের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল, তারপর বইপত্রের ভেতর দিয়ে হাতড়াতে লাগল। তার চোখে-মুখে অনুসন্ধানী ভাব, কিন্তু তার পোশাক সত্ত্বিই খুব উত্তেজিত করে তুলছে অ্যাশবিকে।

“এই যে সেটা,” ক্যারলাইন বলল। “আমিও জানতাম বইটা গুরুত্বপূর্ণ। নেপোলিয়নের উইলে এটার কথা আছে, আইটেম নামার VI-এ। আমার লাইব্রেরী থেকে চারশ ভলিউম, যেগুলো আমি সবচে বেশি পড়েছি, *The Merovingian Kingdoms 450-751 A.D.* সহ, আমি সেইন্ট দেনিসকে আদেশ দিয়ে যাচ্ছি, সে যেন সেগুলো সংগ্রহ করে নিজের দায়িত্বে রাখে, তত দিন পর্যন্ত, যত দিন আমার পুত্রের বয়স ঘোল না হয়।”

তারা দু'জনে মিলে এমন একটা ধাঁধার সমাধান করতে বসেছে, যেটা আসলে এত সাদামাটা ভাবে সমাধান হবার কথা ছিল না।

“সেইন্ট দেনিস বিশ্বস্ত ছিল,” বলল ক্যারলাইন। “আমরা জানি, যে সে আদেশ মতই চারশ বই নিজের কাছে যত্ন করেই রেখেছিল। আর এটা সত্যি, বইগুলোকে নেপোলিয়নের ছেলের কাছে পৌঁছানোর কোনো উপায়ও ছিল নাই। সে চলে গেল ফ্রান্সে, নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর, আর ওদিকে তার ছেলে আর্টুর ছিল অস্তিয়াতে, ১৮৩২ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।”

“সেইন্ট দেনিস মারা যান ১৮৫৬-তে,” সেগুলো অ্যাশবি, মনে পড়ল সে পড়েছিল। “পঁয়ত্রিশ বছর সে এগুলো আগলে রেখেছিল। তারপর সে সেগুলো *Sens* শহরে রেখে যান, হয়ত সেই শহরের লোকগুলোর জন্য, নতুন প্রজন্মের জন্য।”

একটা অর্থপূর্ণ হাসি দিল মেয়েটা। “এই জিনিস খুব টানছে তোমাকে, তাই না?”

“আরে টানছ তো তুমি।”

অ্যাশবির হাতের বইয়ের দিকে ইশারা করলো ক্যারলাইন। “মিস্টেসের দায়িত্ব সন্তুষ্টিতে আমি পালন করার আগে, আমি জাঁহাপনার সুদৃষ্টি আশা করছি এই বইয়ের প্রথম অংশের প্রতি। আমার বিশ্বাস, এটা তোমার উপভোগের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবে।”

বইটা খুলল অ্যাশবি। শুকিয়ে যাওয়া চামড়ার ছোট-ছোট অংশ ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

সেন্ট হেলেনার দু'জন প্রিস্টের মাঝে প্রবীণতম যিনি, *Abbé Bonavita*, কয়েকমাস যাবত এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন, যে তিনি তার কক্ষ থেকে আর বের হতে পারছিলেন

না। একদিন নেপোলিয়ন এটা জানতে পেরে খুশি মনেই বললেন যে তার আর কালবিলম্ব না করে ইউরোপে ফিরে যাওয়া উচিত। এই সেন্ট হেলেনায় থাকলে তার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে পড়তে পারে। তাই ইটালিতে ফিরলে তার আচুক্ষাল আরও কিছু বৃদ্ধি হতে পারে। স্ম্যাট নেপোলিয়ন একটা চিঠিও লিখে দিলেন রাজপরিবার বরাবর যেন রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে অসুস্থ প্রিস্টকে তার পেনশন বাবদ তিন হাজার ফ্রাঙ্ক দেওয়া হয়। দ্বীপ ত্যাগ করার আগে যখন প্রিস্ট নেপোলিয়নকে তার মহানুভবতার জন্য ধন্যবাদ দিতে যান, তখন তিনি দুঃখও প্রকাশ করে যে এটা তার জন্য খুবই পরিতাপের বিষয় যে তিনি নেপোলিয়নের পাশে আমৃত্যু থাকতে পারলেন না, যেটা তিনি মনে-প্রাণে চাইতেন। শেষ সাক্ষাতের সময়ে স্ম্যাট নেপোলিয়ন Abbé Buonavita-কে বেশ কিছু চিঠিপত্র ও দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন যেগুলো নেপোলিয়ন প্রেরণ করতে বলেছিলেন তার পরিবার ও তৎকালীন পোপের কাছে।

“প্রিস্ট বুওনাভিতা যখন দ্বীপ ছাড়ে, নেপোলিয়নও তখন অসুস্থ,” বলল ক্যারলাইন।

“আর এর কয়েকমাস পরেই সে মারা যায়। যে চিঠিগুলো নেপোলিয়ন তার পরিবারের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল সেগুলো আমি দেখেছি। কর্সিকার জাদুঘরে রাখা আছে ওগুলো। সেন্ট হেলেনায় চিঠিপত্র যা কিছু আসত বা পুরুষ থেকে যা কিছু পাঠানো হত, সবই খুলে পড়ত ব্রিটিশরা। ওই চিঠিগুলো ভাইসের কাছে খুব সাদামাটা ঠেকেছিল, তাই সেগুলো আটকায়নি তারা, প্রিস্টকে নিতে দেয়।”

“তাহলে এই ঘটনার তাৎপর্য কোথায়?”

“দেখতে চাও?”

“ওগুলো কি তোমার কাছে?”

“ছবি আছে। এত পথ পাড়ি দিয়ে কর্সিকায় গেলাম কষ্ট করে, কিন্তু ছবিটুকু আনব না, তা কী হয়? গত বছর গবেষণার কাজে যখন গিয়েছিলাম যখন, তখন তুলেছিলাম।”

তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সুঁচালো নাক চোখে আটকে আছে অ্যাশবির চোখে। ভু জোড়া কী চমৎকার উপর দিকে ওঠানো, কী অপূর্ব সৌন্দর্যের মিশ্রণ! যেন এখনই ডুব দিতে মন চাইছে।

কিন্তু না, আগের কাজ আগে।

“আমার জন্য স্বর্ণের বার আনলেন আপনি,” বলল মেয়েটা। “এবার দেখেন আমি আপনাকে কী দেই।” এক পৃষ্ঠার এক চিঠির একটা ছবি তুলে ধরল সে তার সামনে। ফরাসি ভাষায় লেখা চিঠিটা। “কিছু কি চোখে পড়ছে?”

অপরিচ্ছন্ন লেখাটির দিকে তাকাল অ্যাশবি।

“মনে আছে নিশ্চয়,” ক্যারলাইন বলল। “নেপোলিয়নের হাতের লেখা ছিল ভয়ংকর রকমের বাজে। নেপোলিয়ন যা লিখত, সেটা আবারও লিখতে হত সেইন্ট

দেনিসকে। কিন্তু এই চিঠিটা দেখেন, পরিচন্তার নাম গন্ধ নেই। সেইন্ট দেনিসের যে হাতের লেখাগুলো আছে আমাদের জানাশোনা, সেগুলোর সাথে মিলিয়েছি আমি।”

চোখের দুষ্টুমিভরা দৃতি নজর এড়াল না অ্যাশবির।

“এই চিঠিটা নেপোলিয়নের নিজের হাতে লেখা।”

“এটার কোনো বিশেষত্ব আছে?”

“কোনো সন্দেহ আছে তোমার? এই শব্দগুলো নেপোলিয়ন নিজে লিখেছে যেগুলোর মাঝে সেন্ট দেনিসের কোনো স্পর্শ নেই। এই কারণেই এটা আরও গুরুত্ব পাচ্ছে। যদিও সেটা আমি প্রথমে ভালো বুবতে পারিনি।”

ছবিটা ভালো করে দেখছে অ্যাশবি। “কী লেখা এতে? ফরাসি ভাষায় আমার দৌড় তো তুমি জানোই।”

“একটা সাধারণ ব্যক্তিগত নোট। তার ছেলের প্রতি জয় করে গভীর ভালবাসা, আর তাকে কী পরিমাণ মিস করে, এগুলোই আরকি। শুধুমাত্র কিছুই নেই যেটা পড়লে ব্রিটিশদের নাকগুলো আরও সুঁচালো হয়ে যায় রহস্যের গন্ধ শোঁকার জন্য।”

প্রথমে একটু নিঃশব্দ হাসি দিয়েই আবারু শব্দ করে হেসে ফেলল অ্যাশবি। “একটু খুলে বলছ না কেন তুমি? এর পরে আমাদের আরও কাজ আছে নাকি?”

ছবিটা তার কাছ থেকে নিয়ে সেটা টেবিলের উপর রাখল মেয়েটা। একটা রুলার নিয়ে একটা লাইনের নিচে রাখল সে।

DESIER PROFOND DE SAVOIR QUE VOUS

“দেখতে পাচ্ছ?” জিজ্ঞেস করলো ক্যারলাইন। “লাইনের নিচে ক্ষেত্র রাখলে উপরের লাইনটা ভালো করে পড়া যায়।”

“এবার চোখে পড়ল অ্যাশবির। কয়েকটা অক্ষর বাকি অক্ষরগুলো থেকে একটু উপরের দিকে উঠিয়ে লেখা হয়েছে। সূক্ষ্ম, কিন্তু বোৰা যাচ্ছে।

“এটা একটা কোড, নেপোলিয়ন ব্যবহার করেছে এখানে,” ক্যারলাইন বলল। “সেন্ট হেলেনার ব্রিটিশরা কখনোই ধরতে পারেনি এটা। কিন্তু আমি যখন এটা জানলাম যে নেপোলিয়ন কিভাবে নিজ হাতে চিঠি লিখে তার প্রিস্টের মাধ্যমে চিঠি পাঠাত, তখন থেকেই চিঠিগুলো আরও ভালো করে পরীক্ষা করা শুরু করি। শুধুমাত্র এই চিঠিতেই উঁচু করে লেখা অক্ষর দেখা যায়।”

“হ্ম, তা এই অক্ষরগুলো দিয়ে কী শব্দ হচ্ছে?”

“Psaume trente et un.”

এবার অ্যাশবি ওটার অর্থ বুবল। “Psalm thirty-one.” যদিও এটার আসল তাৎপর্যটা এখনো ধরতে পারেনি সে।

“এটা একটা নির্দিষ্ট রেফারেন্স,” বলল মেয়েটা। “আমি সেটা পেয়েও গেছি।”
টেবিল থেকে খুলে রাখা একটা বাইবেল তুলে নিল সে।

“কর্ণ জোড়া সজাগ করো, আমাতে দাও, বজ্রগতিতে এসে আমাকে উদ্ধার করো;
আমাকে নিরাপদ আশ্রয় দাও, একটা অভেদ্য দুর্গ হও আমাকে রক্ষা করতো। আমার
জন্য গড়া এই শেকল থেকে আমাকে মুক্ত করো।” বাইবেল থেকে মুখটা তুলে মেয়েটা
তাকাল অ্যাশবির দিকে। “এটা তো নেপোলিয়নের নির্বাসনের সাথে একবারেই মিলে
যায়। এবার বাকি অংশটা শোন, কী লেখাঃ আমার জীবনটাকে যন্ত্রণায় গ্রাস করেছে,
জীবনের মুহূর্তগুলো কাটছে আমার আর্তনাদে; আমার কষ্টগুলো কেড়ে নিয়েছে আমার
শক্তির সাফল্যকে, আমার অস্থিগুলোও নিষ্ঠেজ হয়ে পড়ছে। আমার শক্তির কারণেই
আজ আমি আমার কাছের মানুষের কাছে তীব্র ঘৃণার পাত্র হয়ে গেছি; আমার বন্ধুরা
আমাকে ভয় পায়—আমাকে রাস্তায় দেখলেই ওরা আমার থেকে দূরে পালায়। ওরা
আমাকে এমনভাবে ভুলে গেছে, যেন আমি মরে গেছি।”

“এক পরাজিত মানুষের আর্তনাদ,” অ্যাশবি বলল।

“সে যখন চিঠিগুলো লিখেছিল, সে বুঝে গিয়েছিল যে সময় আর বেশি বাকি
নেই।”

অ্যাশবির দৃষ্টি এবার আটকাল টেবিলের উপর রাখা নেপোলিয়নের স্টাইলের একটা
কপির উপর। “তার মানে এই দাঁড়ালো যে নেপোলিয়ন বইগুলো সেইন্ট দেনিসের
কাছে রেখে যায় যেন সে তার ছেলের বয়স ঘোল হলেই চেঙ্গুলো তার কাছে দিয়ে
দিতে পারে। এরপর সে বিশেষ করে একটা বইয়ের কথ্য উল্লেখ করে, এবং একটা
চিঠি পাঠায় যেখানে সে নিজের নিয়তিকে নিয়ে অনেক স্মৃতি প্রকাশ করেছে।”

“Merovingians-দের নিয়ে লেখা ওই চিঠিটাই এই রহস্যের সমাধান হতে
পারে আমার মনে হচ্ছে।” ক্যারলাইন বলল।

সেও একমত এতে। “ওটা খুঁজে বের করতেই হবে।”

খুব কাছে এগিয়ে এল মেয়েটা, হাত জোড়া দিয়ে অ্যাশবির গলার চারপাশে
আলতো করে ধরে একটা চুমু খেল। “এখন আপনার মিস্টেসকে আদুর করার সময়
হয়েছে আপনার, জাঁহাপনা।”

কথা বলার জন্য মুখ খুলতে চাইল অ্যাশবি, কিন্তু তার আগেই একটা আঙুল তার
ঠোঁট দুটোকে থামিয়ে দিল।

“এরপর, আমি তোমাকে বলে দেব বইটা কোথায় আছে।”

ছাবিশ প্যারিস

স্যামের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে ওই লোক দুটো জিমি ফড়েলকে অনুসরণ করছে। এই পাগলাটে মানুষটার উপর আক্রমণ করা নিয়ে ম্যালন যা বলেছে তা ঠিক। স্যামকে এমন পরিস্থিতিতে দেখে সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন কী করত, সেটা ভেবে অবাক হলো সে। তবে জিমির মতো এমন আতঙ্ক নিয়ে চলা বা এতটা পাগলাটে ভাব করেনি সে। এটা সত্যি যে তার উর্ধ্বর্তন কর্মকর্তাদের আদেশ অমান্য করেছে সে, এবং জিমির মতো সেও একই মতাদর্শে বিশ্বাসী, তবু তার সাথে সব নিয়ম-কানুন কেন যেন যায়নি একসাথে।

ম্যালন আর সে এগিয়ে চলেছে রাস্তা ধরে। চারপাশে মানুষজন কান-মাথা ঢেকে ঝুঁটছে, কেউ আবার খাবারের দোকানের সামনে, কেউ বা ফুল বা অন্যকিছুর দোকানে ভিড় করেছে। রেস্টুরেন্টের লোকজন হাঁক ছাড়ছে তাদের সেরা খাবারের নামগুলো বলে, আকৃষ্ট করতে চাইছে পথচারীদেরকে। তাদের এমন সম্মোহনী ডাক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে মানুষের কোলাহল, নানান রকমের ঘ্রাণ ঠেলে সামনে ঝুঁটিয়ে যাচ্ছে সে।

“আপনার কী মনে হয়, ওই দু’জন কারা হতে পারে?” অবশ্যে জিজ্ঞেস করলো সে।

“ফিল্ড নেমে কাজ করার এই এক অসুবিধা, স্যাম! নিষিদ্ধভাবে কখনোই বলা যায় না, কার আসল রূপ কী! এটা বুঝে নেওয়ার খেল ভিটা ভিটা।”

“ওদের আরও কেউ কি এখানে থাকতে পারেন?”

“আমি দুঃখিত, এই হৈ-হল্লোড়ের ভেতর সেটা জানা সম্ভব না।”

বিভিন্ন মুভি আর টিভি সিরিয়ালের কথা মনে পড়ে গেল স্যামের। হিরোকে সব সময় দেখা গেছে যে চারপাশে যত ভিড়ই থাকুক না কেন, সে ঠিকই বিপদের আঁচ করে ফেলেছে। এমনকি বিপদ যদি দুরেও থাকে, তবুও। কিন্তু এই গোলমালই এখন তাদেরকে যেভাবে চেপে ধরেছে তাতে আর কিছু লাগে না। তার উপর যদি গোদের উপর বিষফৌঁড়ার মতো শক্র লাগে, বা থেকে থাকে পেছনে বা আশেপাশে কোথাও, তাহলে তাকে তো দেখলেও চেনা যাবে না। একমাত্র আক্রমণ হলেই যা একটু উপায় আছে বোবার।

হেঁটেই চলেছে ফড়েল।

সামনের ফুটপাথটা একটা বড়, খোলা রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। ট্যাঙ্কি, প্রাইভেটকার, আর বাসে গিজগিজ করা ব্যস্ত রাস্তাটা *Boulevard St.Germain* নামে পরিচিত। একটু থামল ফড়েল, কাছের ট্রাফিক সিগন্যাল পেয়ে সামনের গাড়িগুলো যখন থেমে গেল, এক দৌড়ে চার লেনের রাস্তাটা পার হয়ে আরও মানুষের ভিড়ে গিয়ে মিশল সে।

সেই দু'জন এখনো পিছু ছাড়েনি।

“কাম অন,” বলল স্যাম।

আরও দ্রুত ছুটছে তারা, সবুজ বাতিও জুলে উঠেছে ততক্ষণে। কিন্তু থামার নাম-গুরু নেই, আরও দ্রুত পা চালিয়ে মূল রাস্তায় নেমেই এক দৌড়ে সেটা পার হয়ে যেতেই পেছনের গাড়িগুলো সাই করে ছুটে অতিক্রম করে গেল তাদেরকে।

“আচ্ছা, থাক। বাদ দিন,” বলল স্যাম, একটু হাঁফাচ্ছে সে।

“আরে নাহ, ওদেরকে ফসকানো যাবে না।”

পাশের হাঁটা-পথটার ভেতরের প্রান্ত ধরে কোমর সমান উঁচু পাথরের দেওয়াল চলে গেছে, ওটার উপর রট-আয়রনের বেষ্টনী দেওয়া। মানুষ ছুটছে আর ছুটছে, কী এদিক, কী ওদিক। সবার চোখে-মুখেই কর্ম-চাঞ্চল্যে ভরা।

এই মুহূর্তে কোনো পরিবার না থাকায় ছুটির দিনের সময়গুলো স্যামের কাছে বেশ একাকি মনে হয়। গত পাঁচটা ক্রিসমাস সে ফ্লোরিডা বীচে একাই কাটিয়েছে। ছেটবেলা কাটিয়েছে সে কুক ইন্সটিউট নামের একটা এতিমখানায়। নামটা কী হাস্যকর, সে ভাবে। কে তার বাবা, কে তার মা, কিছুই জানে না সে। একজন অনাথ হয়েই সে এসেছিল ওখানে, আর জায়গাটা ছেড়েছে তার আঠারতম জন্মদিনের পার হবার এক সপ্তাহ পর।

“ব্যাপারটা কি আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে?” জিজ্ঞেস করেছিল স্যাম।

“হ্যাঁ।” উভরে বলেছিল নরস্ট্রাম।

“কিন্তু কবে থেকে? আগে তো কোনো দিন অম্বৰের কারো ইচ্ছার কথা শোনা হয়নি। আমি তো প্রথম থেকেই দেখছি এখানে ক্ষেত্রের আর নিয়ম।”

“ওগুলো আসলে বাচ্চাদের জন্য। তুমি তো আর বাচ্চা নেই, বড় হয়েছ। জীবন যেভাবে কাটাতে চাও, পারবে।”

“সত্যিই তাই? আমি...মানে যেতে পারব বাইরে? তাহলে চললাম, আবার দেখা হবে।”

“আমাদের কাছে তুমি একটুও ঝগী নও, স্যাম।”

শুনে প্রীত হয়েছিল স্যাম। তার দেওয়ার মতো কিছু ছিলও না।

“তোমার সামনে দুটো পথ আছে,” নরস্ট্রাম বলল। “হয় তুমি আমাদের সাথে এখানেই থেকে যাবে, এই আশ্রমের একটা বড় একটা অংশ হবে। অথবা তুমি থাকবে না, চলে যাবে।”

এটা আবার অপশন হলো নাকি? “আমি তাহলে যেতেই চাই বরং।”

“আমিও তাই ভেবেছিলাম।”

“ভাববেন না যে আমি আপনাদের প্রতি ক্রতজ্জ্ব নই। আমি এমনিতেই যেতে চাই। অনেক...অনেক...”

“নিয়ম-কানুন হজম করতে হয়েছে, তাই তো?”

“ঠিক বলেছেন। এত-এত বিধিনিষেধ, আমি শেষ।”

স্যাম জানে যে এখানকার দায়িত্বে যারা আছে, তাদের মাঝে অনেকেই এই আশ্রমেই বড় হয়েছে। তারাও অনাথ ছিল। কিন্তু এ নিয়ে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করা বারণ। তবে স্যাম যেহেতু থাকছে না, তাই সে প্রশ্ন করবে ভাবল, “আপনার কি আর কোনো উপায় ছিল না?”

“হ্রম, তবে আমি এটাই পছন্দ করেছিলাম।”

এই তথ্যটা তাকে অবাক করেছিল। সে জানতই না যে এই বৃদ্ধ মানুষটাও অনাথ ছিল।

“একটা উপকার করতে পার?” নরস্টোম জিজ্ঞেস করলো।

ক্যাম্পাসের সবুজ মাঠে দাঁড়িয়ে আছে তারা। চারপাশের ক্ষণগুলো দু'শ বছরের পুরনো, যার প্রতিটার প্রতি ইঞ্চি জায়গা তার চেনা, আর এটা হয়েছে, কারণ এখানকার সবকিছুর মেরামত, দেখাশোনা তাদেরই করতে হয়।

এই নিয়মটাও অপছন্দের তালিকায় আছে তার।

“বি কেয়ারফুল, স্যাম। কোনো কিছু করার আগে ভেবে-চিন্তে করবে। আমরা এখানে যেভাবে সবকিছু তোমাদের উপযোগী করে দেই, বাইরের জগতে কিন্তু ঠিক এরকম না।”

“এই স্থানকে তাহলে আপনি এভাবেই ডাকেন? আমাদের উপযোগী জায়গা?”

“তোমাকে বিশেষ যত্নে বড় করেছি আমরা।” একটা হাস্তাবরতি। “বড় করেছি আমি।”

গত আঠার বছরে এমন আবেগময় কথা একসময়ে শোনেনি সে এই মানুষটার কাছ থেকে।

“তুমি একটা স্বাধীন সত্ত্বার মানুষ, স্যাম। এটাকে আমি খারাপ বলছি তা না। শুধু একটু চোখ-কান খোলা রেখে চলতে বলেছি।”

যে মানুষটার কাছে সারাটা জীবন পার করেছে সে, তাকে আজ অনেক বেশি আন্তরিক দেখাচ্ছে স্যামের কাছে।

“বাইরের জগতের নিয়মনীতি তোমার কাছে সহজও মনে হতে পারে। ঈশ্বরই জানেন, এখানে থাকাটা তোমার জন্য বেশ কঠিনই ছিল আসলে।”

“এটা হয়ত আমার জিনগত বৈশিষ্ট্য।”

বিষয়টা হালকা করে নেওয়ার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু নরস্টোমসের ক্ষণগুলো তাকে বারবার শ্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে তার কোনো বাবা-মা নেই, নেই কোনো বংশ পরিচয়, বা উত্তরাধিকার। যা কিছু সে পেয়েছে, তার চারপাশের এই জায়গাটুকুই তার একমাত্র ঠিকানা হয়ে আছে। এর বাইরে আর কিছুই জানে না সে। তিল পরিমাণ কিছু দিলেও যে একজন তাকে দিয়েছে সে এখন দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। তাই স্বাভাবিক শৰ্কায় তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল স্যাম, প্রত্যুত্তরে মৃদুভাবে বাঁকুনি দিয়েছিল নরস্টোম।

“আমি ভেবেছিলাম তুমি থেকে যাবে এখানে।” বৃক্ষ লোকটির স্বর নীচু।

চোখ দুটোয় রাজ্যের দুঃখ ভর করেছে।

“ভালো থেক, স্যাম। সব সময় ভালো কাজ করার চেষ্টা করবে।”

আর সেই চেষ্টাই সে করেছে।

স্নাতক শেষ করেছে, তারপর নিজেকে ধাপে-ধাপে নিয়ে গেছে সিক্রেট সার্ভিস অবধি। সে ভাবে আর পরিতাপ করে যে আজ যদি নরস্টাম বেঁচে থাকত! আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগে তাদের সর্বশেষ কথা হয়। নিজে থেকে তার সাথে যোগাযোগ করত না, কারণ এই মানুষটাকে আর কষ্ট বা হতাশা দিতে চায়নি সে।

“আমি ভেবেছিলাম, তুমি থেকে যাবে এখানে।” এখনে ক্ষেত্রটা কানে ভাসে তার।

কিন্তু ওই পর্যন্তই, থাকতে সে পারেনি।

একটা মোড় নিয়ে ঘুরে গেল তারা। সামনের ফুটপাথটাও আরেকটা চওড়া রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। গতিপথ পরিবর্তনের কারণে একটা লোহার বেষ্টনীটি ডান দিকে চলে এসেছে তাদের। ধীরে চলা পাণ্ডুলো অনুসরণ করে কিছু দূর এগিয়েই আবারও একটা বাঁক নিল তারা। একটা উচু দেওয়াল জয়েগা করে নিয়েছে লোহার বেষ্টনীর স্থানে। এটার অমসৃণ পাথরের গায়ে একটা ব্যানার ঝুলছে যেটার গায়ে লেখাঃ

MUSÉE NATIONAL DU MOYEN, AGE, THERMES DE CLUNY

মধ্যযুগীও ইতিহাসের একটা Cluny যাদুঘর এটা।

দেওয়ালের ওপারের বিল্ডিংটা পুরনো গথিক রীতিতে বানানো, ছাদটা ঢালু হয়ে আছে, গায়ে dormer. মূল ফটক দিয়ে চুকতেই ফড়েল অদৃশ্য হয়ে গেল, আর তার পেছন-পেছন চুকল সেই মানুষ দুটো।

থামল না ম্যালন।

“কি করছি আমরা এখন?” জিজ্ঞেস করল স্যাম।

“ঠিক এই মুহূর্তে যা করা দরকার।”

▲

ম্যালন জানে তারা আসলে কোথায় যাচ্ছে। *The Cluny Museum*-টা দাঁড়িয়ে আছে রোমান রাজপ্রাসাদের সীমানার মাঝে, যেটার খ্রংসাবশেষ এর ঠিক ভেতরে এখনো ঢিকে আছে। বর্তমান ভবনটা গড়া ১৫শ শতকে, একজন *Benedictine abbot* এর দ্বারা। ১৯ শতকে জায়গাটা রাজ্য-সরকারের অধীনে চলে যাওয়ার পরই

চোখ-ধাঁধানো ও ঐতিহাসিক শিল্পবস্তুর বিশাল এই সংগ্রহ মানুষের দেখার জন্য খুলে দেওয়া হয়। যেকোনো ভ্রমনপিপাসু মানুষের কাছেই এই স্থান পরিদর্শন করা অবশ্য কর্তব্যের মতো। এর আগেও ম্যালন এখানে এসেছে কয়েকবার, তাই ভেতরটা বেশ ভালোই মনে আছে তার। মোট দুটো তলা আছে বিল্ডিংগে, একটা প্রদর্শনী কক্ষ, যেটা আরেকটায় গিয়ে মিশেছে, একটা প্রবেশ ও একটা বেরুনোর পথ। বেশ আবক্ষ জায়গাই বলতে গেলে। লুকানোর জন্য আদর্শ তো নয়ই।

মূল প্রাঙ্গণে পা রাখতেই সে দেখতে পেল ফড়েলের পিছু নেওয়া সেই দু'জনকে-দরজা দিয়ে ঢুকছে তারা। কমপক্ষে ত্রিশ জনের মতো দর্শনার্থী ক্যামেরা দিয়ে চারপাশের ছবি তুলতে ব্যস্ত।

একটু ইতস্তত করল সে, তারপর মূল দরজার দিকে পা বাড়াল স্যামকে নিয়ে।

প্রথমেই যেটা এল সেটা পাথরে মোড়ান একটা চেম্বার, যেটাকে এখন অভ্যর্থনা কক্ষ বানানো হয়েছে। সাথেই বাথরুম। দু'জন লোক টিকেট কিনছে বুথ থেকে, কেনা শেষ হতেই জাদুঘরের মূল অংশের দিকে পা বাড়াল তারা। সরু পথে তারা এগিয়ে যেতেই ম্যালন ও স্যাম তাদের টিকেট কাটল। তারপর একই পথে এগিয়ে একটা চিফট শপে পৌঁছাল তারা, মানুষ ভিড় করে আছে দোকানটায়। ফড়েলকে সেখা গেল না সেখানে তবে সেই দু'জনকে দেখা গেল। কিছুটা বাঁ দিকে এগিয়ে আরেকটা নিচু দরজা পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ম্যালন কী করবে সেটা বোঝার প্রশ্নেই দেখতে পেল জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ব্রোশর দেওয়া হচ্ছে, চট ক্যান একটা নিয়ে নিল যেন এক নজরে দেখে নিতে পারে এখানে কতগুলো রুম প্রেসার কোনটা কোন দিকে অবস্থিত।

কথা বলল স্যাম। “হেনরিক আমায় বলেছিলেন আপনার ফটোগ্রাফিক মেমোরি আছে, যা দেখেন একবার তা-ই ছবির মতো গেঁথে যায় মাথায়। এটা কি সত্যি?”

“আইডেটিক মেমরি,” শুধরে দিল ম্যালন। “খুটিনাটি সব ধরে রাখতে পারি মাথায়।”

“আপনি কি সব সময় এমন খুঁতখুঁতে?”

ব্রোশরটা নিজের ব্যাক পকেটে রাখল সে। “কালে-ভেদে।”

মূল প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকল তারা। পুরো জায়গাটা আলোকিত হয়ে আছে, একদিক থেকে জানালা দিয়ে আসছে সূর্যের আলো, আর সাথে আছে চীনেমাটি, কাঁচ ও মসৃণ অ্যালাবাস্টার পাথরে বসানো চমৎকার উজ্জ্বল বাতির আলোর বন্যা।

ফড়েল বা তার পেছনে লাগা লোক কাউকেই দেখা গেল না সেখানে।

আরও একটু এগিয়ে গেল তারা। তখনই দেখল লোক দুটো ঘরের উপর প্রান্তে বেরুনোর পথ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দুটো ঘরেই পর্যটকেরা ভিড় করে আছে, ছবি তুলে প্রচুর। ব্রোশর থেকে ম্যালন জেনেছে, সামনেই রোমান বাথ।

ম্যালন এগিয়ে গেল, পেছনে স্যাম। তারা দেখল ঘর থেকে বেরুনোর পর লোক দু'জন একটা সরু করিডোর ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। দু'ধারের দেওয়ালে রঙ করা। সরু

করিডোরটা গিয়ে মিশেছে একটা প্রশস্ত হলরুমের সাথে *frigidarium* দেখা গেল আরও একটু সামনেই, কিন্তু একটা সাইনবোর্ড জানান দিচ্ছে, সংস্কারের জন্য এটা এখন বন্ধ আছে। তানে, একটা বেশ জমকালো গথিক খিলানপথ ধরে এগিয়ে গেলেই একটা হল, যেখানে পুরনো ভাস্কর্যগুলো রাখা। একটা স্টেজের মতো জায়গা দেখা গেল পাশেই, আর তার চারপাশে কিছু ধাতব চেয়ার ভাঁজ করে রাখা। জায়গাটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে এটা এক সময়ে বাইরের দিককার খোলা জায়গা বা উঠানের মতো ছিল।

আর বাঁ দিকে জাদুঘরের আরও গভীরে যাওয়ার রাস্তা।

লোক দুটো সেদিকেই মোড় নিল।

ম্যালন, স্যাম এগিয়ে গিয়ে সাবধানে চারপাশটা দেখে নিল। তারপর এগিয়ে গেল পরের কক্ষটার দিকে। ছাদটা অনেক উচুতে, কমপক্ষে দু'তলা উঁচু হবে। অমসৃণ পাথরে মোড়া দেওয়ালগুলো এগিয়ে গিয়েছে আরও প্রায় চাল্লিশ ফিটের মতো। এটাও হয়ত এক সময় খোলা প্রাঙ্গন ছিল দুই ভাবনের মাঝে, কিন্তু এখন এটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে দুটোর সাথে যেন আরও অনেক জিনিস প্রদর্শনী করা যায় এখানে।

ফড়েলের হাদিস এখনো মেলেনি, তবে মানিকজোড়দের ঠিকই দেখাতে দেখাতে পরের প্রদর্শনী কক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে।

“ওই লোকেরা আমার পিছু নিয়েছে,” কেউ একজন চিৎকার দিল, লাইব্রেরীর মতো নীরবতাটাকে ভেঙ্গে দিয়ে।

সাথে-সাথে উপরের দিকে তাকাল ম্যালন।

একটা ব্যালকনির মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন স্বলেছে কথাটা, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সেই লোক দুটোকে, যাদেরকে অনুসন্ধান করছে ম্যালন ও স্যাম। ম্যালন দেখলঃ সে একজন নারী, বয়স সম্মত ত্রিশের কোটায়, বাদামী চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। পরনে নীল রঙের পোশাক। এই ধরণের কুঁচি দেওয়া চিলেচালা স্মক ম্যালন আগেও দেখেছে অন্যান্য জাদুঘরের কর্মচারীর গায়ে।

“ওরা আমার পেছনে লেগেছে,” চিৎকার দিল মেয়েটি। “আমাকে মেরে ফেলবে।”

সাতাশ

লয়ার ভ্যালী

এলিজা লাঘককে অনুসরণ করছে থ্রিভান্ডসেন। ড্রয়িংরুম ছেড়ে এখন এই বাড়ির উপর প্রাপ্তে চলেছে তারা। তাদের গন্তব্যস্থল যেখানে, সেটা বিল্ডিংর ভিত্তের নিচ দিয়ে চলে গিয়েছে। এখানে আসার আগেই এই জায়গার ইতিহাস সম্পর্কে জেনেছে হেনরিক। ১৬শ শতকে এর নকশা প্রণয়ন করা হয়, রাজা ১ম ফ্রান্সিসের সময়ে। প্রাথমিকভাবে একজন নারী এই ভবনের নকশা করে, যেটার প্রভাব চারদিকে বেশ স্পষ্ট। শক্তি

প্রদর্শিত হয় এমন কোনো নকশা বা বাল্লভ নেই কোথাও, তার পরিবর্তে একটা অতুলনীয়, কোমল সৌন্দর্য নিজের দিকে আহ্বান করছে সবাইকে।

“তিনি শতক ধরে আমার পরিবার এই সম্পত্তির মালিক,” বলল এলিজা। “আমার এক পূর্বপুরুষ এটার মূল শ্যাতোটি বানিয়েছিল ওই উত্তর প্রান্তে, যেখানে আমরা এতক্ষণ বসেছিলাম। ওখান থেকে একটা বিজের মাধ্যমে দক্ষিণ প্রান্তটা যুক্ত করা হয়েছে। আরেকজন ব্রিজের উপর একটা গ্যালারী বানিয়েছিল।”

সামনে এগিয়ে গেল এলিজা।

একটা দীর্ঘ আয়তাকার হলের দিকে তাকাল সে, ষাট মিটারের মতো লম্বা হবে সেটা। মেঝেটা সাদাকালো চেকারবোর্ডে ঢাকা, ঠিক দাবার কোর্টের মতো। ছাদটা ভর দিয়ে আছে খুব পুরু ওক কাঠের বিমের সারির উপর। জানালা দিয়ে আলো আসছে দুর্দিক থেকেই।

“ওই যে দূরের দক্ষিণ দিকের দরজাটা দেখছেন, ওই অংশটা জার্মানদের দখলের বাইরে ছিল, মানে স্বাধীন এলাকা। কিন্তু উত্তরের অংশটা ওদের, দখল করে বসেছিল। ভবতে পারেন কি পরিমাণ দুর্দশায় পড়েছিলাম আমরা?”

“আমি জার্মানদের ঘৃণা করি।” তার অবস্থান পরিষ্কার করলো হেনরিক।

একটা গভীর দৃষ্টি দিয়ে এলিজা গ্রহণ করলো তার কথাটা।

“ওরা আমার পরিবারকে শেষ করেছে, ধূংস করেছে আমার দেশকে, এমনকি আমার ধর্মকেও শেষ করে দিতে চেয়েছিল। ওদেরকে জীবনে কষ্টমা করব না আমি।”

হেনরিক নিজে একজন ইলুদি। এলিজার সম্পর্কে প্রোজ-খবর নিতে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছে যে, মেয়েটার মনে একটা তীব্র ইন্দৃষ্টি দ্রিষ্টে লুকানো ছিল। ঠিক কী তার কারণ, তা সে জানে না। একটা জন্মগত ক্ষিতিজ। এলিজার আরও একটা বন্ধমূল চিন্তা সম্পর্কে জেনেছে হেনরিক। সে আশা করেছিল এলিজা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে শ্যাতোর ভেতর দিয়ে, হয়েছেও তা-ই। তাদের পাশেই অনেকগুলো কক্ষ, তার একটার সামনে দুটো হ্যালোজেন বাতি জলছে, আর তার মাঝেই একটা ছবি।

ঠিক এই জায়গার কথাই বলা হয়েছিল হেনরিককে।

ছবির দিকে তাকাল সে। নাকটা বিশ্বী রকমেরই লম্বা। ট্যারা এক জোড়া চোখ, ধূর্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে এক কোণে। দৃঢ় চোয়াল। থুতনিটা উঁচু। চোঙার মতো একটা হ্যাট চেকে আছে প্রায় টাক-পড়া মাথাকে, দেখে মনে হয় যেন পোপ। কিন্তু এই মানুষটা তার থেকেও বেশি কিছু।

“রাজা এগারতম লুইস,” বলল হেনরিক, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

থামল এলিজা। “ভক্ত নাকি?”

“কী বলে যেন ডাকা হত তাঁকে? সাধারণ মানুষের ভালবাসার পাত্র, মহৎদের কাছে ঘৃণার, শক্রদের কাছে ভয়ের, আর গোটা ইউরোপের কাছে সম্মানের পাত্র ছিলেন তিনি। একজন রাজা রাজা ছিলেন তিনি।”

“কেউ ঠিক বলতে পারে না যে এই ছবিটা আসলেই তার কিনা। কিন্তু এটার একটা অদ্ভুত গুণ আছে, খেয়াল করেছেন?”

তার মনে পড়ে গেল, এই লুইসকে নিয়ে কী ধরণের তিক্ত ইতিহাসের কথা শোনান হয়েছিল তাকে। ১৪৬১ থেকে ১৪৮৩ পর্যন্ত শাসন করেছিল লুইস, আর এই সময়ের মাঝেই নিজেকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে সে ছিল একজন বিবেক বর্জিত, প্রকাশ্যে বাবার বিদ্রোহকারী, স্তীর উপর অত্যাচারকারী এক মানুষ। বিশ্বাস করত হাতে গোনা কিছু মানুষকে, দয়া দেখাত না কারো ওপরেই। তার ধ্যান-জ্ঞান বলতে ছিল শত বছরের যুদ্ধ-বিধ্বন্ত ফ্রান্সের পুনর্গঠন করা। নিরলস পরিশ্রম করে গেছে সে, পরিকল্পনা করেছে বারবার, অনেক খরচ করেছে শুধুমাত্র হারানো ফ্রান্সকে এক রাজার অধীনে আনার জন্য।

আর সেটা সে পেরেছেও।

যে কারণে তার অবস্থান একটা দেবদূতের পর্যায়ে পাকাপোক হয়ে গেছে ফরাসি ইতিহাসে।

“টাকার যে কত ক্ষমতা থাকতে পারে, সেটা প্রথম যারা বুঝেছিল, এই মানুষটা তাদের একজন,” বলল হেনরিক। “কারো বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিবর্তে তাকে টাকার বিনিময়ে হাত করে ফেলত সে।”

“আপনি অনেক জানেন, অনেক শিখছেন,” এলিজা বলল তার কঠে মুঠ্কতা। “অর্থনীতির গুরুত্বটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আর এটাকে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। আধুনিক *Nation-State* এর সূচনা তার হাতেই! যেখানে অর্থনীতি সামগ্রিক আর্মিদের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।”

এলিজা এবার আরেকটা কক্ষের দিকে এসিয়ে গেল। এটার দেওয়ালগুলো কোমল চামড়ায় মোড়া। রেনেসাঁ যুগের চমৎকার একটা ফায়ারপ্লেস, কিন্তু আগুন নেই কোনো। ফার্নিচার বলতে অন্ন কিছু চেয়ার আর কাঠের কয়েকটা টেবিল। ঘরের মাঝখানে স্টেইনলেস স্টিলের একটা কাঁচ রাখার পাত্র। শুধু এটাই এই ঘরের প্রাচীন আবহারের সঙ্গে যাচ্ছে না।

“১৭৯৮ সালে নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণ ছিল সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে একটা চরম ব্যর্থতার নাম,” এলিজা বলল হেনরিকে। “ফরাসি রিপাবলিক তাদের সবচে সেরা জেনারেলকে মিশর জয় করতে পাঠাল, সে জয়ও করলো। কিন্তু মিশর শাসন করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় ছিল। এই ক্ষেত্রে কিন্তু নেপোলিয়ন সফল ছিল না। আর এটা অস্বীকার করা যায় না যে মিশর দখলের এই ঘটনাটা পুরো পৃথিবীকেই বদলে দিয়েছিল। প্রথমবারের মতো এই জমকালো সভ্যতা সম্পর্কে মানুষ জানতে পেরেছিল। মিশরবিদ্যা নামক বিষয়ের সৃষ্টি হলো। নেপোলিয়নের স্যাভান্টসরা আক্ষরিক অর্থেই বালি খাঁড়ে ফারাও সাম্রাজ্য আবিষ্কার করলো। নেপোলিয়ন এমনই ছিল-সামান্য কিছু সফলতায় মোড়া চরম ব্যর্থ এক মানুষ।”

“কথা বলছেন একেবারে পোজো ডি বোরগোর উত্তরাধিকারের মতো করে।”

কাঁধ ঝাঁকাল এলিজা। “নেপোলিয়নের গৌরব ব্যর্থতার মাঝে থাকার পরও তাকে নিয়েই মাতামাতি, কিন্তু আমার পূর্বপুরুষ এক অর্থে গোটা ইউরোপকে রক্ষা করার পরও তার নাম কেউ মুখে নেয় না।”

হেনরিক জানে, এটা এলিজার জন্য একটা কষ্টের বিষয়, তাই এটা নিয়ে আর কথা বাড়াল না।

“যখন নেপোলিয়ন মিশরে ছিল, কিছু জিনিস, খুব মূল্যবান কিছু আবিষ্কার করেছিল সে।” সামনের ডিসপ্লের দিকে এগিয়ে গেল সে। “এখানে চারটা প্যাপিরাসের মোট আছে। ঘটনাক্রমে নেপোলিয়ন পেয়ে যায় এগুলো। এক খুনিকে যখন নেপোলিয়নের এক সৈন্য গুলি করে মেরে ফেলে, তখন তার কাছ থেকেই এটা কুড়িয়ে নেয় সে। যদি পোজো বোরগো দুনিয়াতে না আসত, নেপোলিয়ন এগুলোর ব্যবহার জেনে যেত আর গোটা ইউরোপে তার ক্ষমতার দাপট দেখাত। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে সেই সুযোগ সে পায়নি কখনো।”

এই বিষয়টা নিয়ে হেনরিকের তথ্য দাতা কোনো তথ্য দেয়নি তাকে। কোনো কিছু শেখার জন্য নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করে হেনরিক, কিন্তু এলিজার ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে শুধুমাত্র নিজের যা-যা জানা দরকার সেগুলোর উপরেই জোর দিয়েছিল সে। কাজটা মনে হয় ঠিক হয়নি আরও অনেক কিছুই জানার ছিল তার।

“তো, কী আছে এই প্যাপিরাসে?” দায়সারাভাবে জিজ্ঞেস করে জ্ঞানী হেনরিক।

“এগুলোর কারণেই প্যারিস ক্লাবের জন্ম। আমাদের অসম্ভব উদ্দেশ্যটার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এখানে, আমাদেরকে দিকনির্দেশনাও দেবে এগুলো।”

“কে লিখেছিল এগুলো?”

কাঁধজোড়া ঝাঁকাল এলিজা। “তা কেউ জানেনো। নেপোলিয়ন বিশ্বাস করত যে এগুলো আলেকজান্দ্রিয়ার, যখন ওটা ধ্রংস করে দেওয়া হয়, তখন কোনোভাবে এটা অন্য হাতে চলে গিয়েছিল।”

এই ধরণের হাতে বানানো প্রাচীন বস্তু নিয়ে তার নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে। “দেখতে পাচ্ছি, আপনি অগাধ আঙ্গু নিয়ে বসে আছেন এই অখ্যাত নথিপত্রের উপর। যেগুলো কে লিখেছে না লিখেছে তার ঠিক নেই।”

“তাই, যদি মনে করেন, তাহলে আমাকে বাইবেলের কথাই টানতে হয়। এটা মনে করেন বাইবেলের মতোই। আমরা ঠিক করে জানিই না যে এটার উৎপত্তি কোথায়, কিন্তু লক্ষ-কোটি মানুষ তাদের জীবনকে এই বাইবেলের কথার আলোকেই গড়ে নিয়েছে।”

“দারুন বলেছেন।”

এলিজার চোখে কোনোরকম ছলনাহীন আত্মবিশ্বাসের এক দৃতি খেলা করছে। “আমার খুব প্রিয় কিছু জিনিস আপনাকে দেখালাম আমি। এবার তাহলে অ্যাশবিকে নিয়ে আপনার প্রমাণ দেখান।”

আটাশ প্যারিস

নীল ব্রেজার আর টাই পড়া দু'জনকে এগিয়ে আসতে দেখল ম্যালন, উভয়ের গলায় জাদুঘরের আইডি ব্যাজ ঝুলছে। খুব দ্রুতই তারা প্রদর্শনী কক্ষের দিকে এগিয়ে আসছে। ফড়েলের পিছু নেওয়া দু'জনের মাঝে এলোমেলো চুলের মোটাসোটা মানুষটা এগিয়ে এল সামনে, তারপর মুহূর্তেই নীল পোশাকের একজনের মুখের উপর সজোরে ঘুসি বসিয়ে দিল। বাকি লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল দ্বিতীয় কর্মীর উপর, সজোরে লাথি দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল তাকে।

দু'জনের হাতেই বন্দুক দেখা যাচ্ছে এখন।

উপর থেকে যে মেয়েটা এই হটগোল বাঁধিয়ে দিয়েছে, তাকে আর দেখা যাচ্ছে না ওখানে।

তাদের অঙ্গের প্রদর্শনী ও চিত্কার ছড়িয়ে পড়ল সব দিকে। দর্শনার্থীদের দল দৌড়ে পালাতে শুরু করেছে ম্যালন আর স্যামের পেছন দিয়ে।

ওপর প্রান্ত দিয়ে নীল পোশাকের আরও দু'জনকে দেখা গেল।

তখনই গুলির শব্দ।

পাথুরে দেওয়াল, টাইলসের মেঝে এবং কাঁচের সিলিং-ক্লেলো কিছুই গুলির শব্দকে শুধে নিতে পারল না। বরং ম্যালনের মনে হলো যেন কোথের সামনেই কোনো বিস্ফোরণ হয়েছে।

এক নিরাপত্তা কর্মী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আর মনুষ ছুটে বেরিয়ে গেল তার পেছন দিয়ে। অপর কর্মীটি আড়ালে চলে গেছে সেকেন্ডের মাঝে।

আর চোখের পলকে অস্ত্রধারীরাও গায়েব

জাদুঘরের নকশাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল ম্যালনের। “যে রাস্তায় এসেছি ওখানেই যাচ্ছি আবার। এখান থেকে বেরুবার আর মাত্র একটা পথ আছে। ওদেরকে ওখানেই ধরবো আমি। তুমি এখানেই থাক।”

“হ্যাঁ, তা কী করবো এখানে আমি?”

“চেষ্টা করো যেন গুলি-টুলি না খাও।”

এক মুহূর্তে ম্যালন ভেবে নিল যে জাদুঘরের নিরাপত্তা কর্মী এখনই বেরুবার পথ বন্ধ করে দেবে, আর দেখতে-দেখতে পুলিশও চলে আসবে। এখন একটাই করণীয় তার, আর সেটা এই সবকিছু ঘটার আগেই ওই বজ্জাত দুটোকে যতটা পারা যায় ব্যস্ত রাখা।

মূল প্রবেশপথের দিকে ছুটল ম্যালন।

চারপাশে আরও একবার সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিল সে। কিছু ভাস্কর্য, কিছু মূর্তি, আর দুটো দরজা নজরে এল তার। দরজা দুটোর একটা লোহার ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করা, অপরটা খোলা, তবে সেটা জানালাবিহিন একটা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

একটু দূরেই, দেওয়ালের সাথে লাগানো একটা ট্যাপেন্টি চোখে পড়ল, সাথেই একটা সিঁড়ি যেটা সোজা উপরে উঠে গেছে।

▲

ভাবনা-চিন্তার খুব বেশি সময় নেই স্যামের। সব কিছুই চোখের পলকে ঘটে যাচ্ছে। আর সেও এরই মাঝে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে এখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকার কোনো মানে হয় না, ম্যালন কী দিয়ে গেছে সেই হিসেব পরে হবে। তাই সে প্রদর্শনী কক্ষের দিকে ছুট দিল, যেখানে গোলাগুলি হলো এইমাত্র। মেঝেতে নীল ভ্রজারের একজন পড়ে আছে উপুড় হয়ে, নিখর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার চারপাশ।

হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল স্যাম।

অপলক দৃষ্টি দিয়ে চারপাশে সর্তর্কভাবে দেখে নিল সে। এর আগে সে সামনা-সামনি কাউকে গুলি খেয়ে পড়ে থাকতে দেখেনি। কিন্তু মৃত মানুষ? হ্যাঁ, কাল রাতেই দেখেছে সে। কিন্তু সামনের পড়ে থাকা মানুষটা মরেনি এখনো।

দর্শনার্থীদের একজনও আর নেই, জান নিয়ে পালিয়েছে সবাই। একেবারে নিরব চারদিক এখন। নিরাপত্তাকারী, কর্মকর্তা বা পুলিশ, কোথায় সবাই? এতক্ষণে কর্তৃপক্ষের কানে খবর চলে গেছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু কোথায় তারা?

কিছু পায়ের শব্দ শোনা গেল। ছুটে আসছে এদিকে ঠিক ম্যালন যেদিক দিয়ে এল আবার গেল ঠিক সেদিক দিয়ে।

সে আটক হতে চায় না। সে চায় যা ঘটছে অর অংশ হতে মূল ঘটনায় যুক্ত হতে

“বাঁচান, এদিকে,” আগত মানুষের দিকে বলল সে।

এরপরেই এক দৌড়ে পরের কক্ষের দিকে ছুটল, তারপর সিঁড়ি ধরে সোজা উপর তলায়।

▲

সেই গিফট শপে ফিরে এল ম্যালন। মানুষ জটলা পাকিয়ে আছে ঢেকার দরজার সামনে।

উত্তেজিত কণ্ঠগুলো বিভিন্ন ভাঁষায় তাদের অনুভূতি প্রকাশ করছে অবিরত।

চারপাশে সর্তর্কভাবে দেখতে-দেখতে গিফট শপটা ছেড়ে এল ম্যালন, তুকল পাশের কক্ষে। ব্রোশরের তথ্য মতে এটা লাগেজ লকারের জায়গা, আর এখানেই একটা সিঁড়ি থাকার কথা, যেটা দিয়ে দর্শনার্থীরা উপরতলা থেকে নিচে নেমে আসে। তাই উপরে উঠে গেলে আড়াআড়ি পথে এগিয়ে লোক দুটোকে ঘায়েল করা যাবে। এখন মিউজিয়ামের ভেতর দিয়ে আসছে ওরা।

বিলম্ব না করে সিঁড়ি ধরে দুই ধাপ একবারে লাফিয়ে উপরে উঠতেই বর্ম, ছুরি, আর তরবারিতে ভরা হলো এসে পড়ল সামনে। একপাশের দেওয়ালে একটা ট্যাপেস্ট্রি, যেটায় একটা শিকার করার ছবি সাঁটা। ছবি সহ সবকিছুই পুরু কাঁচে সিল করা। তার একটা অস্ত্রের দরকার, সে আশা করলো জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বিষয়টা বুঝতে পারবে।

সে অপর প্রান্তে রাখা একটা চেয়ার তুলে নিল, তারপর সেটার ধাতব পায়া দিয়ে সজোরে আঘাত করলো সিল করা কাঁচের অপর।

বান করে কাঁচ ভেঙে গিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

চেয়ারটা একপাশে ফেলে দিয়েই এগিয়ে এসে একটা ছোট তরবারি তুলে নিল সে। প্রান্তগুলো বেশ ধারালো দেখা যায়, তার মানে এগুলোকে ধার দিয়েই রাখা হয়েছে যেন দেখতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় লাগে। ভেতরে একটা কার্ড জানান দিচ্ছে যে এটা ১৬শ শতকের অস্ত্র। ম্যালন একটা ঢালও তুলে নিল যেটা ১৫শ শতকের।

ঢাল ও তরবারি-দুটোই চমৎকার অবস্থায় আছে।

শক্ত করে দুটোকে দু'হাতে ধরল ম্যালন, তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো এক গ্লাডিয়েটর, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

নাই মামা থাকার চেয়ে কানা মামাই ভালো, নিজেকে বোঝাল সে

।

সিঁড়ির রেলিঙে পিতলের ছোট-ছোট খুঁটিগুলো পেছনে টেলে দিয়ে ঝড়ের গতিতে উপরে উঠে যাচ্ছে স্যাম কান দুটো সজাগ তাব জন্মছে নিচে থেকে মানুষের শব্দ ভেঙে আসছে। কোনো থামাথামি নেই, সোজা উঠে গেল জাদুঘরের একেবারে উপরের তলায়।

এখানে কোনো শব্দ নেই, এমন কী নিচ থেকেও শব্দ পৌছাচ্ছে না।

খুব আলতো করে পা ফেলছে সে এবার, এক হাতে রেলিং ধরে আছে। আসলে ঠিক বুঝে উঠে পারছে না যে ঠিক কী করবে। একে তো সে নিরস্ত্র, অন্যদিকে নিজের প্রাণের ভয়। কিন্তু ম্যালনকে তো সাহায্য করা দরকার, ঠিক যেমন গত রাতে ওর বইয়ের দোকানে যেমন করতে হয়েছিল।

আর তাছাড়া ফিল্ড এজেন্টরা একে অপরকে সাহায্য করবে এমনটাই নিয়ম।

আরও উপরে উঠে গেল স্যাম।

তার বাঁ দিকে একটা খিলানপথ একটা লম্বা কক্ষে গিয়ে মিশেছে। আর সামনেই আরেকটা প্রদর্শনী কক্ষ যেটার উপর লেখাঃ

LA DAME à LA LICORNE

দ্য লেডি অ্যান্ড দ্য ইউনিকর্ন-ইংরেজিতে তর্জমা করলো ।

একটু থেমে খিলানপথের মাঝ দিয়ে সামনের ঘরটা ভালো করে দেখে নিল সে ।

তিনটা গুলি ছোঁড়া হলো । একেবারে পরপর ।

বুলেটগুলো পাথরে গিয়ে আছড়ে পড়ল, একেবারে তার মুখের সামনে দিয়ে । পাথর গুঁড়ো হয়ে ধূলোর মতো উড়ছে । এক ঝটকায় নিজেকে পেছনে সরিয়ে আনল সে ।

ব্যাড আইডিয়া ।

আরও একটা গুলি ছোঁড়া হলো তার দিকে । এটাও পাশ কেটে বেরিয়ে গিয়ে লাগল ডান পাশের জানালার কাছে । মুহূর্তেই ঝনঝন করে ভেঙ্গে গেল কাঁচটা ।

“হেই,” খুব কাছ থেকে একটা কষ্ট বলে উঠল, একেবারে ফিসফিস করে ।

চট করে ডান দিকে তাকাতেই সে দেখল একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দ্য লেডি অ্যান্ড দ্য ইউনিকর্ন কক্ষের দরজার আড়ালে । একে সে আগেও দেখেছে, আর এই মেয়েটাই একটু আগে হলস্তুল বাঁধিয়ে দিয়েছে চিত্কার করে । তার ছোট চুলগুলো পেছনে বাঁধা, চোখ-মুখে সজাগ ভাব । খুব সতর্ক চাহনি । তার দু'হাতের একটায় একটা বন্দুক আটকে আছে ।

দ্বিতীয় কোনো শব্দ না করে সেটা ছুঁড়ে দিল মেয়েটা, ধরতে সমস্য হবার কথা না এজেন্ট স্যামের ।

বাঁ হাত দিয়ে প্রিপটা শক্ত করে ধরল সে, আঙুল চলে পেঁচ ট্রিগারে । সর্বশেষ সে নিজে ট্রিগার চেপেছে সিক্রেট সার্ভিসের শুটিং রেঞ্জে, প্রতিক্রিয়ের সময় । এই মাস-চারেক আগের কথা । কিন্তু তাতে কী, এখন ঠিক যা দরকার তা পেয়েই সে খুশি ।

মেয়েটার দিকে ভালো করে তাকাল সে, আঝে তাতেই মেয়েটা বুঝিয়ে দিল যে প্রয়োজনে সে যেন ট্রিগার চাপে ।

বুক ভরে একটা দম নিল স্যাম, তারপর দেওয়ালের প্রান্ত বরাবর বন্দুকটা তাক করেই ট্রিগারে চাপ দিল সে ।

সামনের ঘরের কোথাও জানালার কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ হলো ।

আবারও গুলি ছুঁড়ল সে ।

“ওদের দু'জনের একজনকে অন্তত মার, চেষ্টা করো,” আড়াল থেকে বলল মেয়েটা ।

“যদি তুমি ভালো পার তো নিজে করো ।”

“বেশ তো । ছুঁড়ে দাও ওটা, করছি ।”

উন্নিশ লয়ার ভ্যালী

নিজের ড্রইং রুমে বসে আছে এলিজা। গত কয়েক ঘণ্টায় যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো ঘটেছে তা নিয়ে চিন্তিত সে। থ্রিভাল্ডসেন প্যারিসে ফিরে গেছে। আগামীকাল তার সাথে আরও কথা হবে এগুলো নিয়ে।

এই মুহূর্তে তার সঠিক দিক-নির্দেশনা দরকার।

ঘরে একটা ফায়ারপ্লেস আর তাতে আগুন জ্বালাতে বলেছিল সে কিছুক্ষণ আগে। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে এখন, চারপাশে একটা উষ্ণ আলো ও তাপ ছড়াচ্ছে। সেই আলোতে ওটার গায়ে তার কোনো এক পূর্বপুরুষের লেখা একটা বাণী চকচক করছে তার সামনে।

SIL VIENT À POINT, ME SOUVIENDRA

-এই প্রাসাদ যখন আর থাকবে না, আমার কথা মনে পড়বে তখন।

একটা আরামকেদারায় বসে আছে এলিজা। চার প্যাপিরাসের ডিসপ্লে বাইটা দাঁড়িয়ে আছে তার ডানেই। কাঠগুলো পোড়ার সময়ের শব্দগুলোই আছে শুধু চারপাশে। আজ সন্ধ্যায় নাকি বেশ তুষারপাত হতে পারে, কে যেন বলেছিল অবজ তাকে। শীত তার ভালো লাগে খুব। বিশেষ করে যখন সে এখানে, নিজ বাস্তুত থাকে, তার চারপাশের প্রিয় জিনিসগুলোর সাথে।

মাত্র দু'দিন আগের ঘটনা।

অ্যাশবি ছিল ইংল্যান্ডে, প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারও মাসখানেক আগে তার উপর কিছু কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে এলিজা। সেই কাজে অ্যাশবির অভিজ্ঞতার উপরেই মূলত নির্ভর করেছিল সে। আর এখন সে ভাবছে যে তার সেই বিশ্বাসের অর্মর্দাদা যদি করা হয় তাহলে সর্বনাশ। এই লোকটার কাজের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

সত্যি বলতে, সর্বকিছুই।

থ্রিভাল্ডসেনের প্রশ়ঙ্গলোকে সে কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছে, প্যাপিরাসে কী লেখা তা তাকে দেখতে দেওয়া হয়নি। সেই অধিকার তার নেই। শুধু সে কেন, এই বিষয়ে নাক গলানোর এখতিয়ার তার ক্লাবের কারোই নেই। এই অর্জন, এই জ্ঞান তার ও তার পরিবারের কাছে খুবই পৰিত্র, যেটা পোজো ডি বোরগো নিজে অর্জন করেছে যখন তার এজেন্টেরা এগুলো চুরি করেছিল সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়নের সাথে যেতে থাকা মালপত্রের ভেতর থেকে। নির্বাসনের সময়ে যা কিছু সাথে গিয়েছিল নেপোলিয়নের, তার ভেতর এটাও ছিল। এগুলো খোয়া যাওয়ার বিষয়টা নেপোলিয়ন টের পেয়েছিল, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এর প্রতিবাদও করেছিল। কিন্তু তাকে বন্দী করা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আনা যায়নি।

এমনকি, এটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি।

কিছুদিন যেতেই, নেপোলিয়ন নিস্তেজ হয়ে আসে। ইউরোপের সকল রাজা-সম্রাটরা এক সময়ের এই প্রতাপশালী সম্রাটের আশু মৃত্যু কামনা করতে থাকে। কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যু না, কোনো মৃত্যুদণ্ড না। একজন শহীদের মর্যাদা তাকে কেউ দিতে চায়নি। তাই মেরে না ফেলে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো নির্বাসনে। সেই মুহূর্তে এই পরিকল্পনাটাই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়েছিল।

আর কাজেও দিয়েছিল তা।

সত্যিকার অর্থেই নেপোলিয়ন ফুরিয়ে গিয়েছিল তার মৃত্যুর আগেই।

ঢাপে পাঁচ বছরের মাথায় সে মারা যায়।

উঠে দাঁড়ালো এলিজা, এগিয়ে গেল কাঁচের বাক্সের দিকে। বহুবার দেখা প্রাচীন লেখাগুলোর দিকে আবারও গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকাল সে। এখানে নিরাপদেই আছে ওগুলো। এগুলোর অর্থ অনেক আগেই উদ্ধার করা হয়েছে, যার প্রতিটা শব্দই তার মস্তিষ্কে গেঁথে আছে। পোজো ডি বোরগো অতি দ্রুতই এগুলোর প্রকৃত মূল্য বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তার সময়টা ছিল নেপোলিয়ন-পরবর্তী সময়। যখন ফ্রান্সে বিপ্লব চলছে, এক দিকে অসৎ নেতৃত্ব, অন্য দিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অক্ষমতা।

তাই এগুলোর সম্বৃহার হয়নি বললেই চলে।

এগুলো যে কে লিখেছে, সেটা জানা যে অসম্ভব-এই কল্পাঞ্জি সত্য বলেছে সে খ্রিস্টানকে। কিন্তু কী লেখা সেগুলো জানাই আসল কথা নাই।

কাঁচের কাঠামোটার নিচ থেকে একটা ড্রয়ার খুল্জি সে। আদি কপটিক ভাষায় লেখা প্যাপিরাস থেকে ফরাসিতে অনুবাদ করে রাখা আছে এখানে।

আর মাত্র দু'দিন পরেই, প্যারিস ক্লাবের সঙ্গস্যদের সাথে এগুলো শেয়ার করবে করবে এলিজা। তার আগে সে পৃষ্ঠাগুলো আরেকটু নেড়েচেড়ে দেখতে চায়। পুনরায় নিজেকে পরিচিত করাতে চায় এই প্রাচীন জ্ঞানের সাথে, বিস্মিত হতে চায় এই সাবলীলতার আদলে লুকানো গভীর উপাখ্যানের মাঝে ঢুব দিয়ে।

যুদ্ধ একটা প্রগতিশীল শক্তির নাম, যে শক্তি তার স্বাভাবিক নিয়মেই এমন কিছু সৃষ্টি করে যা অন্যভাবে অর্জন করা বা সংঘটিত করা যায় না। মুক্ত চিন্তা এবং উজ্জ্বালনী ক্ষমতা এই দুটো বিষয় যুদ্ধের কোলে জন্ম নেওয়া অনেক ইতিবাচক বিষয়ের মাঝে উজ্জ্বল দুই তারকার মতো।

যুদ্ধ হলো সমাজের মাঝে এক সক্রিয় শক্তির নাম, যেটা সবকিছু স্থির রাখার ক্ষেত্রে এক নির্ভরযোগ্য হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করে। যেকোনো শাসকের ক্ষমতার ভিত্তি রচনা করে দেয় এই যুদ্ধই, যে ক্ষমতার পরিধি বাড়তেই থাকে যুদ্ধ যতই দ্রুতগত হুমকি সৃষ্টি করে তার সাথে পাল্লা দিয়ে। সবকিছুই মাথা নোয়াতে বাধ্য যতক্ষণ তারা এটুকু নিশ্চয়তা পাচ্ছে যে তাদেরকে সকল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা হবে।

যুদ্ধের হমকি না থাকলে, বা মানুষের জীবনের নিরাপত্তা না দিলে সব রকম কর্তৃত্বই যুদ্ধ থেবড়ে পড়বে। মানুষের মাঝে যে সামাজিক আনুগত্য সৃষ্টি করতে পারে যুদ্ধ, তা আর কোনো প্রতিষ্ঠান পারে না। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের কোনো অস্তিত্বই থাকত না যদি যুদ্ধ না থাকত, আর কোনো শাসক কতটা কর্তৃত্ব করতে পারবে, সেটাও নির্ভর করছে সে কতটা যুদ্ধ চালাতে পারবে তার উপর।

সমষ্টিগত আঞ্চাসনের একটা ইতিবাচক দিক হলো, এটা একই সাথে আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দূর করে এবং সমাজ-কেন্দ্রিক আনুগত্য সৃষ্টি করে। সমষ্টিগত আঞ্চাসন চালানোর জন্য যুদ্ধই সবচে সেরা পথ। দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকের মূল ভাবনা না, আর এই শান্তি চিরদিন থাকেও না, তারা চায়ও না যে যুদ্ধ শেষ হোক। সবচে সেরা পথ হলো, যুদ্ধের সম্ভাবনাটা জাগিয়ে রাখা, যেহেতু যুদ্ধের ভয়ই মানুষের মাঝে তাদের বাহ্যিক প্রয়োজনীয়তার চাহিদা সৃষ্টি করে, আর এই চাহিদা না থাকলে এক শাসনের অধীনে মানুষকে আনা যায় না, টেকে না সেই শাসন ব্যবস্থাও। স্থায়িত্ব দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে তখনই, যখন সেটা এমন কোনো দল বা গোষ্ঠী থেকে আসবে যেটা যুদ্ধের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

এত বছর আগেও যে এমন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি কারো থাকতে পারে, সেটা আসলেই অবাক করার মতো।

বাইরে থেকে যদি কেউ ভীতি প্রদর্শন না করে তাহলে কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো শাসনব্যবস্থা টিকতে পারবে না। তবে এই হমকি, বা ভীতি হজে উচ্চে বিশ্বাসযোগ্য, তাহলেই সমাজের সকল মানুষের ডেতের সত্ত্বিকারের ভয়ের প্রের বপন করা সম্ভব। আর মানুষের মনে এই ভয় না থাকলে যেকোনো শাসনব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়বে। যুদ্ধকে শান্তিতে রূপান্তরের সামাজিক প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ হবে, যদি কিনা কোনো শাসক যুদ্ধ না থাকার ফলে সমাজ ও রাজনীতির মাঝে সৃষ্টি হওয়া শূন্যস্থানগুলো পূরণ না করে।

যৌথ আঞ্চাসনের সূচনার জন্য বিকল্প কিছু খুঁজে পেতেই হবে, কিন্তু সেগুলো হতে হবে একই সাথে বাস্তবসম্মত এবং শক্তিশালী।

ভাষান্তর করা কাগজগুলো কাঁচ-বাক্সের উপরে রাখল এলিজা।

পোজো ডি বোরগোর সময়ে অর্থাৎ ১৯ শতকের মাঝামাঝিতে, যুদ্ধের কোনো বিকল্প ছিল না, তাই তখন ছিল যুদ্ধের জয়জয়কার। প্রথমে প্রাদেশিক সংঘাত, তারপর বিশ্বব্যাপী বড় দুটো ভয়াল যুদ্ধ। তবে এখন দিন বদলেছে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিকল্প এখন অনেক। সত্ত্ব বলতে, অসংখ্য। তবে সে কি সঠিক বিকল্পটা বেছে নিতে পেরেছে?

বলাটা কঠিন।

নিজের চেয়ারে ফিরে এল আবার।

এখনো একটা বিষয় তার জানার বাকি।

থ্রিভান্ডসেন চলে যাবার পর, খোলা থেকে সেই প্রত্যাদেশটা বের করে রেখেছে সে। আর এখন সেটা শান্তিমত পড়ার জন্য লম্বা কয়েকটা দম নিল প্রথমে। প্রশ্নের সারি থেকে একটা প্রশ্ন বেছে নিল তারপর। আমি এখন যে বন্ধুর উপর সব থেকে বেশি নির্ভর করছি, সে কি বিশ্বাস রাখবে, নাকি বেঙ্গানি করবে? প্রশ্নে বন্ধুর জায়গায় থ্রিভান্ডসেনের নাম ধরে নিয়ে জোরে, আগুনের দিকে তাকিয়ে মুখে বলল প্রশ্নটা।

চোখ দুটো বন্ধ করে মনোযোগ এক জায়গায় দিতে চাইল সে।

তারপর চট করে একটা কলম তুলে নিয়ে পাঁচ সারি উলম্ব রেখা এঁকে সেগুলো থেকে হিসাব করে কিছু ডট পেল ও খাতায় লিখে নিল দ্রুত।

•
•
•

আরও একটু হিসাব করে জানতে পারল, প্রশ্নের উত্তরটা আছে H লেখা পৃষ্ঠায়। উত্তরটা খুঁজেও পাওয়া গেল জলদি। বাণীর বইটা বলছে-বন্ধুটি হবে এমন্ত্রে তোমার বিপদে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে।

গ্রাহাম অ্যাশবির উপর বিশ্বাস রেখেছিল সে, নিজের জীবনের সবচেয়ে গোপন কথাগুলো বলে দিয়েছে তাকে। অথচ নিজে লোকটা সম্পর্কে বলত্তি গেলে কিছুই জানে না। শুধু জানে, লোকটার পূর্বপুরুষ খুব ধনী ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে সেও অনেক টাকার মালিক, পাশাপাশি একজন সফল গুণ্ঠন শিল্পী। এই মানুষটাকে এলিজা একটা বিশেষ প্রস্তাৱ দিয়েছিল, সাথে এমন কিছু তথ্যও সরবরাহ করেছিল যা পৃথিবীর আর কেউ জানে না, এমন কিছু সূত্র যেগুলোর মুক্তিপাত হয়েছিল পোজো ডি বোরগোর কাছ থেকে, তারপর পরের প্রজন্মের হাত ধরে এলিজাৰ কাছে এসে পৌছেছে।

আর এই সবকিছুই নেপোলিয়নের হারান সম্পদের খৌজ এনে দিতে পারে।

ডি বোরগো তার জীবনের শেষ দুই দশক ব্যয় করেছে এটার পেছনে, কিন্তু তার অনুসন্ধান কিছু এনে দেয়নি তাকে। তার এই ব্যর্থতা তাকে একরকম উন্মাদ করে ফেলেছিল শেষে। কিন্তু আশা না ছেড়ে বেশ কিছু নোট লিখে গিয়েছিল বোরগো যার সবগুলোই গ্রাহাম অ্যাশবিকে দেখিয়েছে এলিজা।

বোকামি হয়েছে তাহলে?

তার আবারও মনে পড়ে গেল, এইমাত্র কি দৈববাণী হয়েছে থ্রিভান্ডসেনকে নিয়ে। বিপদে তোমার ঢাল হয়ে দাঁড়াবে তোমার এই বন্ধু
বোকামি হয়নি হ্যাত।

ତ୍ରିଶ ପ୍ରାରିସ

ଗୁଲିର ଶବ୍ଦ କାନେ ଏଲ ମ୍ୟାଲନେର । ପାଁଚ ବା ଛୟଟା ଗୁଲି? ହୟତ । କିନ୍ତୁ ତାର ସାଥେଇ କାଁଚ ଭାଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦ ହଲୋ ଆରଓ ତୀଏଭାବେ ।

ପରପର ତିନଟା କଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଲୋ ମେ, ଯାର ସବଗୁଲୋଇ ଫରାସି ଐତିହାସିକ ଜିନିସପତ୍ରେ ଠାସା । ନାନାନ ରକମ ଚିତ୍ର, ଗିର୍ଜାର ବେଦୀର ପେଛନେ ରାଖାର ଜନ୍ୟ ଆଁକା ରଙ୍ଗିନ ଛବି, ନକ୍ଷା କରା ଧାତବ ବସ୍ତୁ ଆର କିଛୁ ଟ୍ୟାପେଣ୍ଟି । ଡାନେ ମୋଡ଼ ନିଯେ ଆରେକଟା କରିବୋରେ ଢୁକଲ ମେ । କୁଡ଼ି ଫିଟ ଦୀର୍ଘ ହତେ ପାରେ ପଥଟା । ମେଝେଟା ଶକ୍ତ କାଠେର ତୈରି । ଉପରେର ସିଲିଙ୍ଗଟା ମଜବୁତ । ଡାନ ପାଶେର ଦେଉୟାଲେର ଗାୟେ କାଁଚ ସେରା ଦୁଟୋ ବାଙ୍ଗେର ଭେତର ଲେଖାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାଜିଯେ ରାଖା । ଓଦେର ମାଝ ଦିଯେଇ ଆରେକଟା ପଥ ଚଲେ ଗେଛେ, ଯିଶେହେ ଅନ୍ୟ ଏକଟା କଷେ ଗିଯେ । ବା ଦିକେ ତାକାତେଇ ମ୍ୟାଲନ ଏକଟା ପାଥରେର ଖିଲାନପଥ ଦେଖିତେ ପେଲ । ମନେ ପଡ଼ିଲ, ତାର ମେଯେଟା ଏଖାନ ଥେକେଇ ଚିଂକାର କରିଛିଲୋ ।

ଏକଜନକେ ଦେଖା ଗେଲ କରିବରେର ଶେ ପ୍ରାପ୍ତେ ।

ମେଇ ମୋଟକୁ ବଦମାଶଟା ।

ତାର ମନୋଯୋଗ ମ୍ୟାଲନେର ପ୍ରତି ଛିଲ ନା, କିନ୍ତୁ ମେ ସିଥିର ଦେଖିଲ କେଉଁଏକଜନ ଚାଲ-
ତଲୋଯାର ହାତେ ଏଗିଯେ ଆସିଛେ, ତଥନ ଟିଗାରେ ଚାପ ଦିତେ ଦେରି କରିଛି ନା ମେ ।

ଏକ ଦିକେ ଝାପ ଦିଲ ମ୍ୟାଲନ, ହାତେର ଚାଲକେ ସାମନେର ଦିକେ ଶକ୍ତ କରେ ଧରେ ରେଖେ ।

ଗୁଲିଟା ସାଁଇ କରେ ଧାତବ ତାଳେ ଲାଗିତେଇ ହାତ ଥେବେ ଫେଲେ ଦିଲ ଓଟା ମ୍ୟାଲନ,
ମେଝେତେ ପଡ଼େ ଝନଝନ ଶବ୍ଦ କରିଲ ଓଟା । ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ମୁଣ୍ଡିଯେ ପାଶେର ସରେ ପୌଛେଇ ଉଠେ
ଦାଁଡାଲୋ ମେ ।

ପାରେର ଧପଧପାନି ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଛେ । ଏଥିନ ମେ ଯେ ସରେ, ସେଟା ଆରଓ ବେଶ
ପରିମାଣେ ରଙ୍ଗିନ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭରା ।

ଉପାୟ ନେଇ କୋନୋ ।

ଯେଖାନ ଥେକେ ଏସେହିଲ ସେଖାନେ ଆବାର ଫିରେ ଯାଓୟା ଅସ୍ତବ୍ର, ତାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଷେର
ଦିକେ ଛୁଟ ଦିଲ ମେ ।

▲

ହାତ ଦୁଟୋ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ବେଶ କିନ୍ପରଗତିର, ସ୍ୟାମ ଦେଖିଲ । ଛୁଟଡେ ଦେଉୟାର ସାଥେ-ସାଥେ
ବନ୍ଦୁକଟା ଧରେ ନିଯେଇ ସାମନେ ଏକଟୁ ଝୁଁକେ ଗେଲ ମେଯେଟା । ମେ ଯେଖାନେ-ଯେଖାନେ ଦାଁଡିଯେ
ଆଛେ, ସେଖାନ ଥେକେ ସାମନେର ରକମେର ପ୍ରବେଶପଥଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ କରା ଯାଚେ, ଆର ଶକ୍ତଟା
ଓଖାନେଇ ଅବଶ୍ଵାନ କରଛେ । ଖୁବ ସାବଧାନେ ପାଯେ ଭର ଦିଯେ ବନ୍ଦୁକ ତାକ କରେଇ ଦୁଇ ରାଉସ
ଗୁଲି ଛୁଁଡିଲ ମେ ।

ଆରଓ କାଁଚ ଭାଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦ, ଆରଓ ଏକଟା ଡିସପ୍ଲେ ତଚ୍ଛନ୍ଦ ହଲୋ ।

স্যাম একটু সাহস করে গলা বাড়িয়ে দেখতে চাইল, তখনই একজন নিজেকে বাঁচাতে অন্য দিকে লাফিয়ে আরেকটা বাক্সের আড়ালে যেতে চাইল, আর সেই সুযোগে মেয়েটাও তার দিকে গুলি চালাল।

একটা অনিশ্চিত সমাপ্তির কথা মনে করিয়ে দিল এই দৃশ্যটি।

সিকিউরিটির লোকজন কোথায় সব? ভাবল স্যাম।

আর পুলিশই বা কতদুর?

▲

খুব ভয়ংকর রকমের একটা ভুল হয়ে গেছে, ম্যালন বুঝতে পারেন্ট হঠাতে। আবারও ব্রোশরের কথা মনে পড়ল তার। এখন যেদিকে ছুটছে, এদিক ছিয়ে এগলে একটা ছোট চ্যাপেল পাওয়ার কথা, যেটায় ঢোকা বা বেরান্নোর পথ একটাই।

কিছু করার নেই, সে ইতিমধ্যে চ্যাপেলে চুক্তি পড়েছে। গথিক স্টাইলে গড়া ভেতরটা। মাঝের পিলারটা ছাদ পর্যন্ত উঠে গিয়ে শৈথান থেকে শক্ত ভল্টগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে চারপাশে, পাম গাছের মতো লাগছে দেখতে। চ্যাপেলের ভেতরের আয়তন হবে হয়ত পঁচিশ বর্গফিট। একেবারে খালি একটা ঘর, লুকানোর জায়গা নেই কোথাও।

সে এখনো তরবারিটা ধরে আছে হাতে, জানে যে বন্দুক হাতে কারো বিপক্ষে এটা নিস্যও না।

মাথা খাটাও, ম্যালন।

▲

মেয়েটা ঠিক কী করতে চাইছে, তা বোঝার চেষ্টা করছে স্যাম। তার ভাবভঙ্গিতে এটা পরিষ্কার যে এই যুদ্ধের শেষ না দেখে ছাড়বে না সে।

আরও দুটো বুলেট ছুটল, তবে সেগুলো মেয়েটার বন্দুক থেকে না, আবার তাদের দিকেও না। তাহলে?

খুব সতর্কতার সাথে ঝুঁকি নিয়ে মাথাটা একটু সামনে বাড়িয়ে দিতেই স্যাম দেখল, দু'জনের মাঝে একজন অক্ষত একটা কেসের পেছন থেকে বেরিয়ে গুলি ছুঁড়ছে, তবে অন্য দিকে লক্ষ্য করে।

সাথের মেয়েটাও দেখল এটা।

কেউ হয়ত অন্য দিক থেকে ঐ দু'জনের প্রতি আক্রমণ করেছে।

আরও তিনি রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হলো স্যামদের টার্গেটের দিকে। লোকটা এখন ক্রসফায়ারে পড়ে গেছে। তার পেছনে স্যাম ও মেয়েটা, সামনে অজ্ঞাত কেউ। তবে সামনের বিপদের থেকে পেছনেরটাই বেশি ভয়ঙ্কর হতে পারে তার জন্য, এমন দুশ্চিন্তা তার চোখে-মুখে। স্যাম দেখল, মেয়েটা উপরুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছে। আর যখনই সুযোগটা এল, গর্জে উঠল তার বন্দুকটা আরও একবার।

নিজেকে বাঁচাতে একটু আড়ালে সরে গেল লোকটা, কিন্তু দ্বিতীয় বুলেটটা নিয়ে
আঘাত করলো তার বুকে। ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠে পেছনে সরে গেল সে তার
আর্তনাদ স্পষ্ট শুনতে পেল তারা। আর তারপরেই দেখল শরীরটা মেঝেতে লুটিয়ে
পড়েছে।

▲

নাকের ডগায় যে বিপদ উপস্থিত, সেটা বরণ করে নেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলো
ম্যালন। বাঁচার আশা এখন একটাই। যদি আক্রমণকারী এই চ্যাপেলে এসে উঁকি দেয়!
কেননা, কেবলমাত্র তখনই ম্যালন তরবারিটা ব্যবহারের সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু সব
কি আর ইচ্ছামত ঘটবে? যখন থেকে থ্রান্ডসেন এর সাথে যুক্ত হয়েছে, তখন থেকেই
তার সব পরিকল্পনা যেন দৃঢ়স্থপনে রূপ নিচ্ছে। এখন এটা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী?

“হল্ট,” একটা পুরুষ কষ্ট চিন্কার দিয়ে উঠল।

এক মুহূর্তের জন্য সব চূপ।

“আমি থামতে বলেছি, নড়বেন না।”

একটা গুলি ছোঁড়ার শব্দ হলো।

রক্ত-মাংসের এক শরীর মেঝের উপর পড়ে গেল ধপাস করে। তাহলে কি পুলিশ,
নাকি জাদুঘরের নিরাপত্তাকারী স্বরূপে হাজির হয়েছে এতক্ষণে? অল্পিক্ষণে সে।

“মিস্টার ম্যালন, বেরিয়ে আসুন। হি ইজ ডাউন।”

এত বোকা হয়নি ম্যালন এখনো। ইঞ্জিখানেক গলাটো বাড়িয়ে দিয়ে দেখে নিতে
চাইল দরজার ওপারে আসলে কে বা কারা। মোটা নেকটা মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে
আছে, রক্ত বেরিয়ে আসছে তার শরীরের নিচ দিক্ষণে। তার কয়েক ফিট দূরেই কালো
স্যুট পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে সতর্ক ভঙ্গিতে, হাতের *Sig Sauer .357* সেমি-
অটোমেটিক বন্দুকটি তাক করা মেঝেতে পড়ে থাকা শরীরের দিকে। ম্যালন খেয়াল
করলো লোকটার মাথায় চুল ব্রাশ-কাট করা, তীক্ষ্ণ চাহনি, ছিপছিপে গড়ন। কষ্টের
পরিকার ইংরেজিতে একটু দক্ষিণের টান।

কিন্তু তার হাতের বন্দুকটাই সব বলে দিচ্ছে তার সম্পর্কে।

মডেল P229। স্ট্যান্ডার্ড ইসু।

তার মানে সিক্রেট সার্ভিস। বন্দুকের নলাটা সাঁই করে উপরে উঠে গেল,
একেবারে ম্যালনের বুক বরাবর।

“তরবারিটা ফেলে দিন।”

▲

স্যাম হাঁফ ছেড়ে বাঁচল শক্র ঘায়েল হওয়াতে।

“ম্যালন,” ডাক দিল সে। আশা করছে এই লোকটাকে ম্যালনই মেঝেছে।

ম্যালন শুনতে পেল স্যাম তার নাম ধরে ডাকছে অন্য কোনো ঘর থেকে। তরবারিটা এখনো ধরে রেখেছে ম্যালন, কিন্তু বন্দুকটা এখনো তাক করা তার দিকে।

“নড়াচড়া করবেন না,” নরম স্বরে বলল সে। “আর হাতের ঐ তরবারিটা ফেলে দিন তো।”

কোনো উত্তর এল না স্যামের ভাকের।

মেয়েটার দিকে তাকাল সে। দেখল হাতের বন্দুকটা সরাসরি তার দিকে তাক করা।

“আর দেরী না, এখনই যেতে হবে আমাদের,” বলল মেয়েটা।

একত্রিশ

জনমানবহীন জাদুঘরের ভেতর দিয়ে ম্যালনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পেছনে বন্দুক তাক করা। একটা কাকপক্ষীও নেই কোথাও। মনে হচ্ছে যেন তাকে আটকে রাখা হয়েছে ভেতরে রেখে। অনেক গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে, হ্যাত কারণেই পুলিশ বা জাদুঘরের নিরাপত্তাকর্মী সাহস করেনি ছোট দল নিয়ে সামনে আসার।

“সিক্রেট সার্ভিস এখানে কী করছে?” প্রশ্নটা করতেই হলো ম্যালনকে। “তোমার মতো আরও একজন ছিল এখানে, দেখেছ নাকি? বয়স কম, সুন্দর চেহারা, বেশ চটপটে স্বভাবের! স্যাম কলিঙ্গ নাম।”

নিরবতা যেন আরও গভীর স্তরে চলে গেল।

একটা প্রদর্শনী কক্ষ পার হলো তারা। দেওয়ালগুলো লাল রঙ করা, আরও বেশ কিছু বেদীর ছবি, আর তিনটে কেস। খুব ভয়ঙ্কর অবস্থা চারপাশে।

আরও একটা রক্তমাখা শরীর দেখা গেল মেঝেতে পড়ে আছে।

এটা সেই চ্যাপ্টা মুখের দ্বিতীয় জন, চিনল ম্যালন। বহুত পাঞ্চা নিয়েছ আজ।

ঘরটা থেকে বের হতেই একটা সিঁড়ি পাওয়া গেল যেটা সরাসরি নিচে নেমে গেছে ডান দিক দিয়ে, আর বাঁয়ে দুটো দরজা জানান দিচ্ছে দেওয়ালের ওপাশে আরও দুটো রুম আছে। লেমিনেট করা একটা প্ল্যাকার্ডে লেখা *LA DAME À LA LICORNE*, দরজার উপরের দেওয়ালে লাগান ওটা।

হাত দিয়ে দেখাল ম্যালন। “এই ঘরে যাব?”

মাথা নেড়ে সায় দিল লোকটি, তারপর হাতের বন্দুকটি সরাল ম্যালনের দিক থেকে। তারপর আবারও লালচে গ্যালারীর দিকে ফিরে গেল। তার সংশয়ী হাবভাব দেখে অবাক হল ম্যালন।

ভেতরের একটু আঁধারময় জায়গার দিকে পা বাঢ়াল ম্যালন। ছয়টা চমৎকার ট্যাপেস্ট্রি অসাধারণভাবে আলোকিত হয়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই জায়গাটা তাকে মুক্ষ করে, কারণ এগুলোই এই জাদুঘরের সবচে মূল্যবান সম্পদ, সেই ১৫শ শতকের খাঁটি শিল্পকর্ম। তিনটা বেঞ্চের উপর ঘরের একেবারে মাঝেই রাখা ওগুলো।

স্টেফানি নেলেই।

ম্যালনের সাবেক বস।

“তা মোটামুটি আরও একটা জাতীয় সম্পদ ধ্রংস করেছ তুমি,” বলল মহিলাটি, উঠে দাঁড়িয়ে, তার দিকে ফিরে।

“আরে না না, এবারেরটা আমি করিনি।”

“তাহলে চেয়ার দিয়ে কাঁচ ভেঙ্গে তরবারি আরঢাল কে বের করলো শুনি?”

“তার মানে আপনি আমায় দেখছিলেন।”

“ওসব বাদ। ফ্রাঙ্স সরকার তোমায় খুঁজছে,” আসল বিষয়টা বলল সে।

“তার মানে এর মূল্য এখন আমার দিতে হবে আপনাকে—” তখনই বুঝতে পারল সে। “না, মানে আপনাকে না। প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল কে দিতে হবে। ঠিক?”

“তিনি নিজ থেকেই এটায় জড়িয়েছেন, যখন আমি এখানকার ঘটনা তাকে জানিয়েছি তখনই।”

“তা বেশ, কিন্তু এখানকার একজন গার্ড গুলি খেয়েছিল, তার কী অবস্থা?”

“হাসপাতালের পথে, মনে হয় বেঁচে যাবে।”

“বাইরে যাকে দেখলাম, সেও কি সিক্রেট সার্ভিসের গুলি?”

মাথা নাড়ল তার বস। “প্রায় ওরকমই, ধার করুন।

স্টেফানিকে সে চেনে অনেকদিন ধরেই দু'বছর বছর তার হয়ে কাজ করেছে Magellan Billet-এর জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে। তারা একসাথে অনেক কিছুর মোকাবেলা করেছে, বিশেষ করে ম্যালনের অবসর নেওয়ার পর গত দুই বছরে তার সাথে অনেকবার দেখা-সাক্ষাত করতে হয়েছে।

“তোমার বাবার বিষয়টা শুনলাম। আই অ্যাম সরি,” স্টেফানি বলল।

গত কয়েক ঘণ্টায় যা হলো, তাতে বিগত দুই সপ্তাহে কী হয়েছে, তা মনে করার সময় পায়নি সে। “একেবারে শেষে আপনি না থাকলে কী যে হত আজ! থ্যাক্স ইউ।”

“ওটা করা ছাড়া আর উপায় ছিল না।”

“তা, এখানে কী করছেন আপনি?”

“স্যাম কলিসের জন্য। আমি জানি তোমাদের দু'জনের দেখা হয়েছে।”

একটা বেঞ্চে বসে পড়ল ম্যালন।

“কোনো ঝামেলায় পড়েছে স্যাম?” জিজ্ঞাসা ম্যালনের।

“ঝামেলা এখন দেখছ? প্রভাস্বেনের সাথে যেদিনই হাত মিলিয়েছে, সেদিন থেকেই ওর বিপদ শুরু।”

গতকাল স্টেফানির সাথে ড্যানি ড্যানিয়েলসের মিটিং হয়েছিল ওভাল অফিসে, যেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট বলেছে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটে চলেছে কোপেনহেগেনে। আর এই মিটিংের কথা স্টেফানি স্যামকে জানিয়েছিল।

“ড্যানিয়েলস জানে স্যামের কথা। সিক্রেট সার্ভিসই তাকে জানিয়েছে।”

“মনে হচ্ছে যেন এই ঘটনার সাথে প্রেসিডেন্ট ইচ্ছাকৃতই যুক্ত হতে চাইছেন।”

“হতেন না। কিন্তু যখন জানলেন এর সাথে শ্রভান্ডসেন জড়িত, তখন না হয়ে আর উপায় রইল না।”

ভালো যুক্তি।

“কটন, প্যারিস ক্লাব আসলেই আছে। আমাদের লোকজন এক বছরেও বেশি সময় ধরে এদের উপর নজরদারি করে আসছে। কিছুদিন আগ পর্যন্তও সব ঠিকঠাক ছিল, বুঝলে? কিন্তু আমার কথা হলো, শ্রভান্ডসেন এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? এটাই জানার বিষয়।”

“তার মানে, এখন কে বেশি জরুরী? স্যাম, নাকি হেনরিক?”

“দু’জনেই।”

“বুঝলাম, কিন্তু প্যারিস ক্লাব থেকে ধাম করে হেনরিকের পেছনে লাফটি^{কেন?}”

“বাহ। আমাকে বোকা পেয়েছ? তুমি এখানে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ঢালু করে বসে আছ, আমি সব বলে দেই, আর তুমি সেগুলো গিলে খাও। আমি কি এই কাজে এসেছি এখানে? এ ধান্দা বাদ। আমি যেটা জানতে চাই সেটা হতে এদের সাথে এ বুড়ো হেনরিকের কী কাজ?”

ম্যালন জানে যে হেনরিক এবং স্টেফানির মাঝে একটা সম্পর্ক আছে যেটা পারস্পরিক অবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই দু’জনকে নানান সময়ে নানানভাবে বাধ্য করা হয়েছে একে উপরের উপর নির্ভর করতে। আর সম্প্রতি সেটা আরও বেশি পরিমাণে হয়েছে। ম্যালন ভাবল যে এই যুদ্ধে মূল ভূমিকায় তার অবস্থান না থাকলেও তার বন্ধুকে সাহায্য তার করতেই হবে। তাই একবারের জন্য হলেও সত্যিটা তাকে বলতেই হচ্ছে।

“সে আসলে তার ছেলে সাইয়ের খুনির পেছনে লেগেছে।”

মাথাটা ঝাঁকাল স্টেফানি। “আমিও এরকম কিছুই আন্দাজ করেছিলাম। সে আসলে বিরাট এক পরিকল্পনাকে ভেঙ্গে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।”

মুখের মাংসপেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠল ম্যালনের। “গ্রাহাম অ্যাশবি কি আমাদের হয়ে কাজ করছে?”

হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল তার বস। “লোকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করছে।”

মাথাটা ভন করে উঠল ম্যালনের, গায়ের বল যেন পড়ে গেছে। “আরে, হেনরিক তো তাকেই মারতে চাইছে।”

“ওকে থামানোর দায়িত্ব তোমার।”

“তা কী করে সম্ভব?”

“কটন, বোঝার চেষ্টা করো। যতটুকু জানো তুমি, তার থেকেও বড় কিছু ঘটে যাচ্ছে আড়ালে। ঐ প্যারিস ক্লাব কিন্তু তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবে। সবার মাথা ঘুরে যাবে। কিন্তু কী যে করবে, তা আমরা জানি না। অন্তত এখন পর্যন্ত তো নয়ই। ওদের নাটের গুরুর নাম এলিজা লাঘক। ওর বুদ্ধিতেই সব চলে। অ্যাশবির কাজ হলো ওদের দলের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড দেখাশুনা করা, কিন্তু তলে-তলে আমাদের সাথেও যোগাযোগ রাখছে সে নিয়মিত, জানাচ্ছে সবকিছু। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের সাতজন নিয়ে ওদের ক্লাব। আর সত্যি বলতে, আমরা এখনো নিশ্চিত না যে সব সদস্যরা এলিজার পরিকল্পনার কথা জানে কিনা।”

“তাহলে ঐ লোকগুলোকে বলে দিচ্ছেন না কেন এসব?”

“কারণ ওদের সবাইকে একসাথে ধরবো বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওরা আগে থেকেই ঘূষ, চাঁদাবাজি আর বিরাট অঙ্কের অর্থ ও নিরাপত্তা জালিয়াতির সাথে যুক্ত আছে। মুদ্রা বিনিময়ের স্বাভাবিক ধারাকে ওরা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তাই এটাকে একটা কারণ ধরা হয় বিশ্বব্যাপী ডলারের দাম কমে যাওয়ার। তাই যখন ওদেরকে ছো মেরে একবারে তুলে আনব আমরা, তখনই একেবারে ওদের গোড়া পর্যন্ত খবর মনে করে যাবে যে আমরা কী করতে পারি।”

এর ফলটা কী হবে, তার জানা। “হ্ম, তারা ধরা খেল। আমি অ্যাশবি? সে তো পগার পার, কিছুই হবে না তার।”

“দেখ, এটুকু মূল্য তার প্রাপ্য, তাকে দিতেই হলে এই মানুষটা ছাড়া আমরা এতকিছু জানতে পারতাম? মোটেই না।”

সামনের ছবিগুলোর দিকে তাকাল ম্যালন। একটা অল্প বয়সী নারীকে একটা সিংহ আর একটা ইউনিকর্নে ঘিরে রেখেছে। পাত্র থেকে তারা মিষ্টি তুলে নিচ্ছে, আর একটা টিয়া পাখিও একটা মিষ্টি ধরে আছে পায়ের নখের মাঝে।

“আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন যে কী ঘটনাটি কী পরিমাণ তালগোল পাকিয়ে গেছে?” ম্যালন বলল।

“তা তো বুঝতেই পারছি। আমাদের লোকজন সম্প্রতি জেনেছে যে অ্যাশবির উপর নজরদারি শুরু করেছে থ্রিভাল্ডসেন। এমনকি তার বাড়ি-ঘর পর্যন্ত সে যন্ত্রপাতি বসিয়েছে গোপনে তার উপর নজরদারি করার জন্য। এটা হয়ত সম্ভব হয়েছে কারণ অ্যাশবির বাড়িতে এখন পাহারা দেওয়ার মতো কেউ নেই। অ্যাশবি মনে করে যে আমাদের সাথে আর এলিজার সাথে সে সমান তালে কাজ করে চলেছে, কোনো ঝামেলা নেই। তার কোনো ধারণাই নেই যে থ্রিভাল্ডসেন তার সবকিছু দেখেছে। এখন প্রেসিডেন্ট চাচ্ছেন যে এই কাজে থ্রিভাল্ডসেনের ছায়াও না থাকুক।”

“হেনরিক গত রাতে দু'জনকে মেরেছে। তাদের একজন সাইয়ের মৃত্যুর সাথে জড়িত ছিল।”

“আমি অবশ্য এক্ষেত্রে দোষ দেই না তাকে। এই কাজে আমি নাকও গলাতে চাই না, এতে দেখা গেল অ্যাশবির ওপরেই এটার প্রভাব পড়ল, কী দরকার?”

একটা বিষয় জানার দরকার ম্যালনের। “প্যারিস ক্লাবের পরিকল্পনাটা কী?”

“এটাই আসল কথা। অ্যাশবি এখনো আমাদের বলেনি সেটা। শুধু বলেছে, খুব দ্রুতই এটা জানা যাবে। হয়ত কয়েকদিনের মধ্যেই। আমার মনে হয়, তার কাজের ধরণ এরকম, ধাপে-ধাপে কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়, যাতে নিজের মূল্যটা ধরে রাখতে পারে।”

“হুম, তা গেল। জাদুঘরে যে দু'জন খুন হলো, এরা কারা?”

“ওরা এলিজা লাঘকের হয়ে কাজ করে। নীল পোশাকের মেয়েটা চিৎকার চেঁচামেচি করে ঐ দু'জনকে রাগিয়ে দিয়েছে। ফলে তারাও ওরকম উঝ আচরণ করল।”

“ওরা কি পাগল, না আর কিছু?”

“যেটাই হোক, খুব খারাপ হয়ে গেল ব্যাপারটা।”

“এখানে আমার কোনো দোষ দেখিনা।”

“সিক্রেট সার্ভিস এই জাদুঘরের উপর এক মাসেরও বেশি সময় ধরে নজরদারি করে আসছে।” একটু ইতস্তত করলো সে। “কোনো ঝামেলা হয়নি এতদিন।”

“কিন্তু ঐ মেয়েটাই সব গঙ্গোল বাঁধাল।”

“এখানে আসার সময়ে আমি খবর পেলাম যে এলিজা লাঘক সেই ওয়েবসাইট, মানে GreedWatch এর খোজখবর নিচ্ছে। আমার মনে হয়ে এটারই অংশ হিসেবে ঐ দু'জন তোমার ফড়েলের পেছনে লেগেছিল।”

“হতে পারে, কিন্তু স্যাম কোথায়?”

“তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিকিউরিটি ক্যামেরায় দেখলাম ঘটনাটা।”

“পুলিশে নিয়ে গেছে?”

মাথাটা দোলাল সে। “ঐ নীল পোশাকের মেয়েটা।”

“ওকে আপনি সাহায্য করতে পারতেন, উচিত ছিল বস।”

“এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।”

এই স্টেফানিকে ভালো করেই চেনে ম্যালন। দীর্ঘ সময় তারা একসাথে কাজ করেছে। ম্যাগেলান বিলেতে তার ব্যক্তিগতভাবে ভাড়া করা বার জন লয়্যার-এজেন্টের মাঝে ম্যালনও ছিল। এই নারীর হাবভাব ভালোই বোঝে সে তাই পরের প্রশ্নটা খুব সহজ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

“তার মানে আপনি ঐ মেয়েকে ভালোই করেই চেনেন, তাই না, বস?”

“আসলে ঠিক ওভাবে না। আমি ঠিক জানিও না যে মেয়েটার উদ্দেশ্য কী ছিল, কিন্তু আমি এতে অস্তত খুশি যে সে স্যামকে সরিয়ে নিয়েছে এখান থেকে।”

প্রথমবার যে সিঁড়িটা ধরে স্যাম উপরে উঠেছিল, সেটা দিয়েই আবার নিচে নামিয়ে আনা হলো তাকে। তারপর আরও একটা সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে একটা বন্ধ করে রাখা ফ্রিজিড্যারিয়ামের দিকে গেল সে আর মেয়েটি। রোমানরা এখানেই গোসল করত। আর তার থেকেও বড় বিষয়, জিমি ফড়েল এখানেই অপেক্ষা করছে। দু'জন আসতেই ফড়েলও তাদের সাথে যোগ দিয়ে এগিয়ে গেল সামনে, প্রথমে পাথরে ঢাকা একটা খিলানপথ, একটু এগিয়ে লোহার একটা দরজা। তালাটা খুলে দিল মেয়েটি।

বন্দুকের সামনে এভাবে থাকতে নিজেকে দুর্বল মনে হচ্ছে স্যামের। এভাবে এত কাছ থেকে, সরাসরি তার দিকেই, কেউ অস্ত্র তাক করে আছে এমনটা আগে কখনো হয়নি। তারপরও তার মনে হচ্ছে, এটা কোনো বিপদ না। বরং বলা চলে, সে সঠিক পথেই এগুচ্ছে এখন।

যা হচ্ছে হোক, যা করতে হবে, হবে। সে সব সময়েই একজন ফিল্ড এজেন্ট হতে চায়। তাই এমন সুযোগ পেয়ে নিজেকে বোঝালঃ প্রস্তুত থাক স্যাম, চোখ-কান খোলা রাখ, ঠিক ম্যালন যেরকম করত।

লোহার দরজাটায় আবারও তালাটা আটকে দিল ফড়েল।

পাথরের দেওয়ালগুলো পঞ্চাশ ফিটের লম্বা, আলো আসছে জর্নেক উঁচুতে করা কিছু জানালা দিয়ে। কিছু সংক্ষারের কাজ চলছে বোৰা মুয়ে^১ একটা মাচার মতো বানিয়ে রাখা হয়েছে পাথুরে দেওয়ালের গায়ে ওটার উপরে নিচে নির্মাণ সামগ্রী পড়ে আছে।

“তুমি এখন যেতেও পার, বা থাকতেও পার মেয়েটি বলল তাকে। “কিন্তু তুমি থেকে গেলে আমার খুব উপকার হয়”

“কে তুমি?”

“মিগ্যান মরিসন। প্রিডওয়াচ আমার ওয়েবসাইট

“মানে? এটা ওর না?” জিজ্ঞেস করলো স্যাম ফড়েলকে দেখিয়ে।

মাথাটা দোলাল সে। “সব আমার।”

“তাহলে সে এখানে কী করছে?”

তাকে দেখে মনে হলো যেন সে কী কতটুকু বলবে তা জানে। “আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে আমি পাগল না, আর কাজের ভিত্তি আছে। আর সে কারণেই আমার পেছনে মানুষ লেগেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার উপর চোখ লাগিয়ে আছে তারা। মাইকেল আমার সাথে কাজ করে আমার সাইটে। ফড়েল নামটা আমিই দিয়েছি ওকে, আর সেভাবেই ব্যবহার করেছি প্রলুক্ষ করার জন্য।”

“তার মানে, তুমিই আমাকে আর ম্যালনকে এই পর্যন্ত টেনে এনেছ?” সে জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা যাকে মাইকেল বলছে তাকে।

“খুব সহজ কাজ ছিল এটা, সত্যি বলতে

“হঁয়া, আসলেই তাই

“আমি এই মিউজিয়ামে কাজ করি,” বলল মেয়েটা। “যখন তুমি আমায় মেইল করলে যে তুমি আমার সাথে দেখা করতে চাও, আমার খুবই ভালো লেগেছিল। যে দু’জন আজকে খুন হলো মিউজিয়ামে, ওরা এই মাইকেলের পেছনে দু’সপ্তাহ ধরে লেগে আছে। এখন আমি যদি এটা তোমায় মুখে বলতাম, তুমি হয়ত বিশ্বাস করতে না। তাই তোমায় দেখালাম। আরও অনেকেই আছে, বলতে গেলে প্রতিদিনই এখানে আসে নজরদারি করতে, কিন্তু ওরা ভাবে, আমি সেগুলো বুঝি না।”

“আমার হাতে লোকজন আছে, সাহায্য করার মতো।”

হট করে তার চোখ দুটোতে যেন ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। “কোনো লোকের দরকার নেই আমার। তোমার লোকজনও কম যায় না, হতে পারে তাদের ভেতরও কেউ-কেউ আমার উপর চোখ রাখছে। হতে পারে তারা এফবিআই, বা সিক্রেট সার্ভিস। কে জানে? আমি যা কিছু করতে চাই তা তোমার সাথে।” একটা বিরতি। “তুমি আর আমি—” কষ্ট থেকে রাগ উঠাও “—কাজ করবো একসাথে।”

মেয়েটার এমন আন্তরিকতায় অসাড় হয়ে এল যেন সে। সাথে তার আকর্ষণীয় ও একই সাথে আহত চাহনি, সবকিছুই ভেতরটা নাড়া দিল তার। তারপৰে স্যামকে বলতেই হবে। “মানুষ গুলি খেল আজ, দেখেছ। একজন গার্ড খুব আরাতুকভাবে আহত হয়েছে।”

“আমারও এগুলো অপচন্দ, কিন্তু আমি তো করিনি এগুলো।”

“সত্যি বলতে, তুমই করেছ। এই সময় লোক দুটোর দিকে পাগলের মতো চিৎকার করেই ঝামেলা বাঁধিয়েছ।”

মেয়েটার গড়ন ছোটখাট, কিন্তু চমৎকার। ক্ষেত্রে দুটো এত নীল যেন নিলাভ শিখা, সেখানে একইসাথে নেতৃত্ব ও আত্মবিশ্বাস দুটোর স্ফুলিঙ্গই উপস্থিত। সত্যি বলতে, স্যাম নিজেই এখন চিন্তিত, তার হাতের তালু ঘামছে। তবে এই উদ্বেগ প্রকাশ হোক, সেটা চায় না সে। তাই চেষ্টা করছে স্বাভাবিক ভাবভঙ্গিতেই কথা বলতে।

“স্যাম,” মিগ্যান বলল। তার কষ্ট এখন আরও কোমল। “তোমার সাথে আমার কথা বলা প্রয়োজন। আলাদাভাবে। এই লোকগুলো মাইকেলের পেছনে লেগেছিল, আমার পেছনে না। আর যে আমেরিকানগুলো আমাদের দেখেছে, ওদেরকে কোনোমতে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি আমরা।”

“তাহলে ওরাই কি এই দু’জনকে মেরেছে?”

কাঁধ ঝাঁকাল সে। “তাহলে আর কারা?”

“আমি জানতে চাই এই দু’জনকে কে পাঠিয়েছে। কার হয়ে কাজ করছে ওরা?”

একটা নির্ভেজাল সাহসিকতা ভরা দৃষ্টি দিয়ে তাকাল মেয়েটা তার দিকে। স্যামের মনে হলো যেন তার মূল্যটা বুঝতে চাইছে মেয়েটা, এক মন হয়ত বলছে, নাহ, আরেক মনে হয়ত বলছে, মেয়েটা খুব সম্প্রস্ত তার প্রতি।

“আমার সাথে আস, তোমায় দেখাই।”

স্টেফানি বলে যাচ্ছে GreedWatch সম্পর্কে, চুপচাপ শুনছে ম্যালন।

“এটা শুরু করেছে আজকের হটগোল বাঁধানো সেই মেয়েটা। মিগ্যান মরিসন। একজন আমেরিকান, পড়াশুনা করেছে এই সগবনে, ইকনমিক্সের উপর। সে এক যুবককে এই কাজে লাগিয়েছে নিজেকে আড়াল করার জন্য, সেই ছেলের নাম দিয়েছে-ফ্রেডেল। আর এই ছদ্মনামেই ওয়েবসাইটটা চালায় সে।”

মাথাটা দোলাল ম্যালন। “ছেলেটা এমনই বেকুব যে লাঞ্ছে কিডনি রাখা খায়। জীবনে ভুলব না এই কাহিনী।”

হাসল স্টেফানি। “তুমি ফাঁদে পা দেয়ায়, আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে দিয়েছে। ড্যানিয়েল আমাকে বলেছে যে স্যাম এক বছরেরও বেশি আগে ছিডওয়াচের সাথে যুক্ত হয়েছে। তাকে এসব ছাড়তে বলা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে শোনেনি। প্যারিসে সিক্রেট সার্ভিসের ফিল্ড অফিসের মাধ্যমে ওয়েবসাইটটার উপর নজর রাখা হচ্ছিল, সেই সাথে কয়েকমাস ধরে মরিসনের উপরেও। মেয়েটা খুবই চতুর। যার পিছুপিছু এখানে এসেছে আজ, তাকেই তোমরা মনে করেছ যে ওয়েবসাইটের মালিক এই লোক। গত দু'সপ্তাহ ধরে তার উপর আলাদাভাবে নজর রাখা হচ্ছে, পিটার সূত্র ধরে সার্ভিসের কর্মকর্তারা এলিজা লাঘকের সম্পৃক্ততা খুঁজে পায়।”

“সব বুঝলাম, কিন্তু এর একটাও আমাকে এই উভর দিচ্ছে নয় আপনি এখানে কেন, বা এগুলো কিভাবে জানলেন।”

“আমরা মনে করি যে এই ওয়েবসাইটে এমন বিশেষ কিছু তথ্য আছে যেগুলো খুব গোপনীয়, আর স্বাভাবিকভাবেই এলিজাও মনে করে এটা।”

“আপনি কি এত পথ পাড়ি দিয়ে এলেন আমাকে এই ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানাতে? মনে হয় না। আসল ঘটনাটা কি?”

“পিটার লায়ন।”

এই লোকটার সম্পর্কে জানে ম্যালন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বাড়ি। মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় এর নাম আছে। অবৈধ অস্ত্রের কাজ, রাজনৈতিক খুনোখুনি, সন্ত্রাসবাদ-যেকোনো কাজেই তাকে পাওয়া যায় চাহিদা অনুযায়ী। হটগোলের দালাল বলা হয় তাকে। দু'বছর আগে ম্যালন যখন অবসর নিল, তখনও কমপক্ষে ডজনখানেক বোমাবাজি আর কয়েকশ খুনের ঘটনায় লায়নের নাম এসেছিল।

“সে কি এখনো টিকে আছে?” প্রশ্ন ম্যালনের।

“সে তো আগের থেকেও সক্রিয়। অ্যাশবি তার সাথে সাক্ষাত করেছে। এলিজা এমন কিছুর ফন্দি আঁটছে যেটাতে লায়নের সাহায্য দরকার তার মতো মানুষরা সহজে দেখা দেয় না। তাই আমরা মনে করছি যে এটাই সবচে সেরা সুযোগ তাকে বধ করার।”

“কিন্তু অ্যাশবি যে এগুলো জেনে যাচ্ছে, তাতে কোনো সমস্যা হবে না?”

“আমি জানি তুমি কী বলতে চাইছ। কিন্তু দেখ, এই অপারেশনটা আমি চালাচ্ছি না। আমি হলে ঐ মানুষটাকে এরকম কাজে জড়াতাম না।”

“এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে অ্যাশবি দু'পক্ষের সাথেই তাল দিয়ে চলছে। নিজে আছে মাঝখানে। তারা তো-আমি নিশ্চিত যে-তাকে এই গোপন তথ্যগুলো নিজের পেটের ভেতর রাখতে দেবে না।”

“সে রাখতে পারবেও না। যা রেখেছে, যথেষ্ট। এটা এখন বিলের অপারেশন। ঠিক যেমন বার বছর আগে আমরা করতাম। সব এখন আমার দায়িত্বে। এই শয়তানটার পিণ্ডী চটকাব এবার।”

“হেনরিক অ্যাশবিকে মারার আগে না পরে?”

“সম্ভবত আগেই। অ্যাশবির সাথে লায়নের দেখা হয়েছে কয়েক ঘণ্টা আগে, ওয়েস্টমিনিস্টারে। আমরা প্যারাবলিক মাইক সেট করে রেখেছিলাম ওদের কথা শোনার জন্য।”

“তারপর? কী হলো সেখানে?”

“কোনো কিছুই হয়নি। সব চুপচাপ। তারা তাকে ধরেনি। তার পিছুও নেওয়া হয়নি। ঠিকই আছে আমার মতে। কারণ একবার সে বুঝে গেলে, আবাসন্তু গা ঢাকা দেবে সে। এই মুহূর্তে সে অ্যাশবির সাথে কথা-বার্তায় বেশ স্বচ্ছন্দ বোঝ করছে।”

লায়নের ধৃষ্টাপূর্ণ আচরণের কথা ভেবে হাসল ম্যালন। “সমস্ত চোখ উল্টে দেবে যখন, সব মজা বের হবে ওর।”

“কয়েকটা চাবি দিয়েছে অ্যাশবি লায়নের কাছে। আবাসন্তু দিনের একটা সময়ের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে কথার মাঝে, আর বেশি কিছু কিছু। ওদের কথা-বার্তার রেকর্ড আছে আমার কাছে।” একটু থামল সে। “এখন কেথা হলো যে, আমাদের ফুলবাবু হেনরিক সাহেব কোথায়? তার সাথে আমার জরুরী আলাপ আছে।”

“সে গেছে এলিজার কাছে।”

ম্যালন জানে এই বিষয়টা তার মনোযোগকে আকর্ষণ করবে।

“হায় হায়! তার মানে কী? হেনরিক এলিজার ওখানেও কোনো ঝামেলা বাঁধাবে? এলিজা যদি কোনো কারণে ভয় পেয়ে যায়, তাহলে কোনোকিছুই স্বাভাবিকভাবে আগাবে না।”

তার চোখে রাগের উপস্থিতি দেখতে পেল ম্যালন। তার বস নিজের অপারেশন নিজের মতো করেই শেষ করতে চায়।

“সে গেছে নিজের প্রতিশোধ নিতে,” স্পষ্ট বলে দিল সে।

“তা হতে দিচ্ছি না, মনে রেখ। এখন সব আমার হাতে। এই মুহূর্তে অ্যাশবিই আমাদের একমাত্র সম্বল। লায়ন কী করছে না করছে সেটা অ্যাশবিই আমাদের জানাচ্ছে।”

“তার দরকার কি আছে? ইতিমধ্যে হেনরিকও প্যারিস ক্লাবে চুকে গেছে। সে তো আর চেহারা দেখাতে যায়নি সেখানে। সে কতটুকু কী পারে তার প্রমাণ ঠিকই রাখবে।”

কিছুক্ষণ চুপচাপ হয়ে পড়ল তারা, স্টেফানি পুরো বিষয়টা ভাবছে ভালো করে।

“মিগ্যান মরিসন,” বলল তার সাবেক বস। “স্যামকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে নিয়ে গেছে। মিউজিয়ামের ক্লোজড-সার্কিট টিভিতে দেখেছি আমি। আমি কিছু বলিনি, একটা কারণে।”

“এটা ভুলে গেলে হবে না ম্যাডাম, যে স্যাম কিন্তু ফিল্ডে কাজ করে না।”

“তো? সে একজন প্রশিক্ষিত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। আমি আশা করতেই পারি নিজের ভূমিকাটা ঠিকই পালন করবে সে।

“মানে? কী কাহিনী ওর?”

মাথাটা দোলাল সে। “তুমি তোমার থ্রিভাল্ডসেনের মতই কুটিল হয়ে গেছ। আরে স্যাম কি ছোট মানুষ? সে নিজের দেখাশোনা নিজেই করতে পারে।”

“আমার প্রশ্নের উত্তর এতে পেলাম না।”

“সে এক করুণ গল্প। যে গল্পের শুরু এক অনাথ শিশুর জীবনে, মেঝে হয়েছে এতিমখানায়।”

“এতিমখানা? কেউ দত্তক নেয়নি?”

কাঁধ ঝাঁকাল সে। “এতিমখানায় হলে কী সমস্যা তা বুঝলাম না।”

“কোথায় ছিল সে?”

“নিউজিল্যান্ডে। তারপর আসে আমেরিকায়, তখন তার বয়স আঠার। স্টুডেন্ট ভিসায় আসে, পরে নাগরিকত্বও পায়। পড়ালেখা কলাসিয়া ইউনিভার্সিটিতে, ওখান থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে। তার ক্লাসের তৃতীয় ছিল সে। তারপর একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করে কয়েক বছর। এরপরের কাহিনী তো জানোই, ওর দক্ষতাই ওকে সিক্রেট সার্ভিস পর্যন্ত টেনে আনে। সব মিলিয়ে, গুড বয়।”

“খালি যে একটু অবাধি, বসদের কথা শোনে না।”

“হেহ, বেশি তাৰ নিও না। তুমি-আমিও এই কাজ বহু করেছি।”

না হেসে উপায় নেই ম্যালনের। “আমার মনে হয় মিগ্যান মরিসন কোনো ক্ষতি করবে না ওর।”

“এখন কম বেশি যা-ই হোক, থ্রিভাল্ডসেনই একমাত্র সমস্যা। স্যাম কলিসকে আবারও যখন তার ওয়েবসাইট নিয়ে প্রশ্ন করা হলো, তখনই সে ওয়াশিংটন ছাড়ে। সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন তার উপর কোপেনহেগেন পর্যন্ত নজর রাখে। তারপর তারা নজরদারি করা ছেড়ে দেয়। কিন্তু যখন এই ঘটনা জানা যায় যে থ্রিভাল্ডসেন আবার অ্যাশবির উপর গোয়েন্দাগিরি করছে, তখন এটা প্রেসিডেন্টের কানে দেওয়া হয়। এর পরেই প্রেসিডেন্ট আমাকে এই কাজে টেনে আনে। সে ভেবেছিল যে হয়ত বড় কোনো কিছু ঘটছে কোথাও, আর তার ধারণা সত্যিও। আর আমাকে টানার

কারণও আছে। সে জানে যে থ্রিভান্ডসেনের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে, তাই এই কাজ আমার থেকে ভালো আর কেউ করতে পারবে না।”

তার এই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য শুনে একটু হাসল ম্যালন। “এলিজা কি জানে যে মিগ্যান শান্ত প্রকৃতির?”

চুপ মেরে গেল স্টেফানি, আর তার এই নিরবতাই দুশ্চিন্তাকে বাড়িয়ে দিল।

“আমি ঠিক জানি না।” অবশ্যেই বলল সে।

“এলিজা তো তামাশা করার জন্য ঐ লোকদেরকে পাঠায়নি। বিষয়টা ভালো করে দেখতে হবে। আজ এখানে যা হলো, সেটা বিবেচনা করলে, মরিসন আর স্যামের জন্য বিষয়টা বেশ চিন্তার।”

“স্যামকে দেখছি আমি। তুমি এখন নজর দাও অ্যাশবির ওপর।”

“বলা নেই, কওয়া নেই, কিসের মাঝে আমাকে ফেলে দিচ্ছেন, বলুন তো?”

“তুমই বল তাহলে কী করা যায়?”

উত্তরটা জানা তাদের দু'জনেরই, তাই আর না পেঁচিয়ে স্বাভাবিকভাবে জিজেস করলো ম্যালন, “বলুন, কী করতে হবে আমাকে?”

তেক্রিশ

বিকাল ৫:১৫

লয়ার ভ্যালী থেকে উত্তরে, হোটেল রিটজের সামনে নামিয়ে দেয়া হলো থ্রিভান্ডসেনকে। জায়গাটা প্যারিসের মাঝখানে। সারাটা পথ ধরে সে ভেবেছে পরবর্তী প্রিসিকল্লনা নিয়ে।

শেষ বিকেলের ঠাণ্ডা মাথায় নিয়ে হোটেলের বিখ্যাত লবিতে ঢুকল সে। দু'পাশের দেওয়ালে যে প্রাচীন জিনিসপত্র শোভা পাচ্ছে তা জাদুঘরে প্রকার্ষ যোগ্য। এটা ঘিরে একটা গল্লও আছে যেটা তার পছন্দের। হেমিংওয়ে দ্বিতীয় প্রিসিকল্লনের সময়ে এই রিটজ স্বাধীন করেছিল। ঘটনাটা এরকম যে হেমিংওয়ে মিস বাহিনীর মেশিনগানে শক্তিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই হোটেলে অপারেশন চালায়। প্রতিটা কানায়-কানায় খুঁজতে থাকে নার্থসি বাহিনীর সৈন্যকে। কিন্তু কোথাও একজুমের ছায়াও পায়নি তারা। পরে ক্ষান্ত দিয়ে তারা বারে বসে যায়, আর সবার জন্য ডাই মারচিনি অর্ডার করে। তার এমন বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ পানশালার অংশটিকে নাম দেয় বার হেমিংওয়ে। আর থ্রিভান্ডসেন এখন সেই বারেই ঢুকেছে। জায়গাটা এখনও যেন ভিন্ন একটা সময়ের আবহ ধরে রেখেছে। কাঠের দেওয়াল, চামড়ার আরামকেদারা চারপাশে। হেমিংওয়ের নিজের তোলা কিছু ছবি সুন্দর করে বাঁধানো, আর এই স্থানের ভবগান্ধীর্যের সাথে মিল রেখে বাজতে থাকা পিয়ানোর সুর যেন গোপনীয়তার মাত্রাকে জানান দিচ্ছে।

থ্রিভান্ডসেন যাকে খুঁজছে, তাকে দেখা গেল সামান্য দূরের একটা টেবিলে বসা। সে হেঁটে গিয়ে তার সামনে বসে পড়ল।

ডষ্ট্র জোসেফ মুর্যাড সগবনের একজন শিক্ষক। নেপলিওনিক ইউরোপের উপর তার অগাধ পাণ্ডিত্য। প্রভাসেন এই মানুষটাকে পুষ্টে গত বছর থেকে, যখন অ্যাশবির দুর্বলতা সম্পর্কে জেনেছে সে।

“সিঙেল-মল্ট হইকি চলবে?” ফরাসি ভাষায় জিজ্ঞেস করলো হেনরিক, মুর্যাডের চশমার দিকে তাকিয়ে।

“বাইশ ইউরো দামের পানীয়ের স্বাদ কেমন তা দেখার ইচ্ছা করছে বেশ।”

হাসল হেনরিক।

“আর, তাছাড়া, দামটা তো তুমিই দিচ্ছ।”

“হ্যাঁ, তা বটে।”

হেনরিকের তথ্যদাতা এর আগে তাকে ফোনে জানিয়েছে যে লুকিয়ে রাখা রেকর্ডারের সাহায্যে তারা কী কী শুনতে পেয়েছে। ক্যারলাইন ডড এর স্টাডিওর মেলুকানো ছিল যন্ত্রণালো। এখন সে যা তথ্য পেয়েছে সেগুলোর অর্থ ঠিক বুঝতে পারছেনা হেনরিক, তাই সেগুলো ফোনে মুর্যাডকে জানায় সে। সব শুনে এই বিজ্ঞ লোকটি আধ-ঘন্টা পর আবার ফোন করে হেনরিককে, বলে যে সামনা-সামনি দেখা করতে চায়।

“নেপোলিয়নের শেষ উইল আর কিছু ইচ্ছাপত্রে অবশ্যই বইটার কথা উল্লেখ আছে,” মুর্যাড বলল “আমি সব সময় ভাবতাম যে এটা আসলে মেরভেরয়োগ্য কোনো রেফারেন্স না। সেন্ট হেলেনায় যাবার সময় নেপোলিয়নের সাথে আয় ঘোলশ বই ছিল। তারপরও সব বাদ দিয়ে চারশর মতো বই সে সেইন্ট মেরিসের কাছে রেখে যায়, এবং বিশেষ করে *The Merovingian Kingdoms 450-751 A.D* বইটার কথা উল্লেখ করে। এটা যেন একটা ধাঁধার উত্তর।”

এই বিশেষজ্ঞের ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করছে সে।

“প্রত্তত্ত্বে একটা থিওরি আছে: *What's missing points to what's important.* বুঝিয়ে বলি। ধরুন, এক জায়গায় তিনটে মূর্তি, প্রতিটার গোড়া চারকোণা পাথরে বানানো। ধরুন, আরও একটা মূর্তি মানে চতুর্থটার পাদদেশটা বানানো গোলাকার পাথরে। এখন ধরা হবে, এই চতুর্থটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা একবার-দু'বার না, বহুবার এই সূত্রটা প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে যখন হাতে বানানো কোনো জিনিস, বা প্রাচীন আচারাদি অথবা ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় হয়, তখন এটার আরও সত্যতা মেলে। এখন তার উইলে এই বইটার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে, তার মানে এটাও ঠিক একইরকম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।”

মেরোভিনজিয়ানদের নিয়ে আলোচনা শুনে যাচ্ছে হেনরিক।

“এই মানুষগুলোর এক নেতা ছিল, নাম *Merovech*. সেখান থেকেই তাদের নাম হয়েছে মেরোভিনজিয়ান। প্রথমদিকে তাদের নেতারা স্যালিয়ান ফ্রান্স দলের মানুষদের সাথে যোগ দেয়, এরপর পূর্বে আক্রমণ করে তাদের সহোদর জার্মান জয় করে। পঞ্চম

শতাব্দীতে ক্লোভিস রোমানদের তাড়িয়ে দেয়, অ্যাকুইটানিয়া দখলে নেয়, এবং ভিজিগোথসদের স্পেনে পাঠিয়ে দেয়। লম্বা ইতিহাস। তারপর সে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে, এবং প্যারিসের ছোট শহর সেইনেকে নিজের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করে। প্যারিসের বাইরে ও ভেতরের অঞ্চলকে ডাকা হতে থাকে ফ্রাঙ্গিয়া নামে। সে সময়ে মেরোভিনজিয়ানরা ছিল অদ্ভুত জীবনাদর্শে বিশ্বাসী। আজগুবি সব কাজ-কর্ম করত। যেমন ধরো, লম্বা-লম্বা চুল দাঢ়ি রাখত, তারপর তাদের কেউ মারা গেলে কবর দেওয়ার সময়ে সোনার মৌমাছি বানিয়ে দিয়ে দিত সাথে। তো যাই হোক, ধীরে-ধীরে শাসক পরিবারের বংশবিস্তার হয়ে বিরাট এক রাজবংশে রূপ নিল, কিন্তু তারপরেই আবার সেই বংশ ছোট হতে থাকল, খুব দ্রুত গতিতেই। ৭ম শতকে এসে তাদের কাছে আর ক্ষমতা থাকল না, রাজ্য চালানোর ক্ষমতা চলে গেল কোটের অধীনে, নির্দিষ্ট করে বললে “*mayors of the palace*”- ক্যারোলিনজিয়ানদের অধীনে। পরবর্তীতে এরাই বাকি ক্ষমতাটুকু তাদের হাতে নিয়ে নেয় এবং মেরোভিনজিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়।”

শুনছে হেনরিক।

“গল্লে তারা প্রতাপশালী, কিন্তু ইতিহাসে ক্ষণজন্মা,” বলল মুর্যাড ^{গুরু}দের গল্ল এটুকুই। তারপরও নেপোলিয়ন তাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তার ^{আলখাল্লায়} যে সোনা দেখা যায়, তা মেরোভিনজিয়ানদের কাছ থেকেই নেওয়া ^{ক্ষেত্রে} লুটপাটেও ছিল সিদ্ধহস্ত। যখনই তারা কোনো স্থান জয় করত, মুহূর্তেই লুটে সব জড় করত ওদের রাজার কাছে, আর রাজাও ছিল সেই রকম, সবকিছু আগুনটোয়ারা করে দিত তার অনুসারীদের মাঝে। একজন নেতা হিসেবে নেপোলিয়ন সব সময়ই বিজয়ের সুফলের উপর নির্ভর করত। তো এমন রাজকীয়-আত্মনির্ভর শৈলতার চর্চা টিকে ছিল ৫ম শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত। কিন্তু নেপোলিয়ন আবির্ভূত হয় ১৯ শতকে।”

“এখন কথা হলো, অ্যাশবি যে সম্পদের পেছনে ছুটছে, তা বিবেচনা করে তুমি কি মনে করো যে মেরোভিনজিয়ানের বইটা কোনোরকম পথ দেখাতে পারবে?”

“দেখ, সেটা আসলে বইটা না দেখে বলা যাচ্ছে না।”

“ওটা কি এখনো টিকে আছে? কী মনে হয়?”

যতক্ষণ স্টাডিতে ছিল, ততক্ষণ ক্যারালাইন ডড বইয়ের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেনি। বরং নামানরকম লোভনীয় তথ্য দিয়ে অ্যাশবিকে উত্তেজিত করছিলো সে। তারা দুঃজন হয়ত অবস্থান নিয়েও আলোচনা করেছে কিন্তু সেটা অবশ্যই তাদের শোবার ঘরে, আর দুঃখের কথা হলো, খ্রিস্টানদের লোকজন সেই ঘর অবধি তাদের আড়িপাতার যন্ত্র বসাতে পারেনি।

একটু হাসল মুর্যাড। “বইটা আছে। কিছুক্ষণ আগেই আমি খোঁজ নিয়েছি। এটা আছে *Hôtel des Invalides* এ, নেপোলিয়ন যেখানে সমাহিত। সেইন্ট দেনিসকে যে বইগুলো দিয়ে যাওয়া হয়েছিল এটা তারই অংশ। আর সেও এগুলো ১৮৫৬ সালে সেনস শহরে রেখে যায় তার মৃত্যুর আগে। পরে ওগুলো সেনসের পক্ষ থেকে দেওয়া

হয় ফরাসি সরকারকে। বেশীরভাগ বইই ধ্বংস হয়ে যায় যখন *Tuileries Palace* এ আগুন লাগে ১৮৭১ সালে। যে কয়টা ভালো ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেগুলো *Hôtel des Invalides* এ জায়গা পায়, আর সৌভাগ্যবশত ঐ বইটাও বেঁচে যায়।”

“আমরা কি ওটা একটু দেখতে পারি?”

“ততক্ষণ পর্যন্ত না যতক্ষণ তুমি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর না দিচ্ছ, তবে আমি নিশ্চিত তুমি তার উত্তর দিতে চাও না। ফরাসিরা কিন্তু তাদের জাতীয় সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সংরক্ষণশীল। আমি আমার এক কলিগকে জিজেস করেছিলাম বইটার ব্যাপারে। সে বলেছে যে *Invalides* এর জাদুঘরের অংশে ওটা রাখা আছে, কিন্তু ঐ অংশটা এখন বন্ধ, কারণ ওখানে সংস্কারের কাজ চলছে।”

হেনরিক বুবাতে পারছে প্রতিবন্ধকতাগুলো—ক্যামেরা, দরজা, সিকিউরিটি অফিসার। কিন্তু গ্রাহাম অ্যাশবি তো ঐ বইটাই চায়।

“শোন, তুমি কিন্তু আমার জন্য ফি থাকবে,” মুর্যাডকে বলল হেনরিক।

হইস্কিতে চুমুক দিল প্রফেসর। “বিষয়টা কিন্তু সত্যিকার অর্থেই অসাধারণ ঘটনার জন্য দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। নেপোলিয়ন কিন্তু মনে-প্রাণে চাইত যে তার সব সম্পদের মালিক তার ছেলে হোক। খুব সাবধানে সে তার সম্পদ জয়িত্যাছে, ঠিক মেরোভিনজিয়ান রাজারা যেমন করত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, নেপোলিয়ন সম্পদগুলো তাদের মতো করে জমালেও সেগুলো নিয়ে পরে যা করেছে সেটা স্টোর্স্পূর্ণ বুঝ মতো, একেবারে আধুনিক শাসকেরা যেমন করে থাকে। যদি দৌলত সে এন্ন এক হ্রাসে লুকিয়ে রাখল যেটার কথা সে ছাড়া কেউ জানে না।”

এমন সম্পদের কথা কল্পনা করে মানুষ যে কত লুকায়িত হয়েছে সেটা অনুভব করার চেষ্টা করলো হ্রভাল্ডসেন।

“সেন্ট হেলেনায় তাকে নেওয়ার পর ইংলিশ পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রচার করলো যে নেপোলিয়ন অঙ্গে পরিমাণ সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে।” হাসল মুর্যাড। “উত্তরে নেপোলিয়নও এক হাত নিল সমালোচকদের বিরুদ্ধে। সে বলল যে সম্পদ সে গুচ্ছিয়েছে, তবে সেগুলো লুকায়িত না, সবার সামনেই আছে সেগুলো। দ্য লুভর মিউজিয়াম, *the greniers public, the Banque of France*, প্যারিসের পানি সরবরাহ, আবর্জনা যাওয়ার জন্য প্রশস্ত ড্রেন এগুলোই সে উল্লেখ করে সম্পদ হিসেবে, বলে যে এগুলোই তার সৃষ্টি। তার সাহস ছিল বটে, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমার।”

আসলেই ঠিক।

“ভাবতে পার যে কি-কি থাকতে পারে তার সেই সংগ্রহে?” প্রশ্ন মুর্যাডের। “হাজার-হাজার শিল্প সামগ্রী যেগুলো নেপোলিয়ন হাতিয়ে নেওয়ার পর আর কোথাও সেগুলো দেখা যায়নি কখনো। সোনা রূপার পরিমাণ কল্পনাও করতে পারবে না। সেগুলোর অবস্থান যে কোথায় সেটা সে যাথায় করে কবরে নিয়ে গেছে ঠিকই, তার চারশ বই তো রেখে গেছে। যেগুলোকে সে সব সময় বিশ্বাস করত! মৃত্যুর আগে

সেগুলো দিয়ে যায় সেইন্ট দেনিসকে, যে আসলেই বুঝতে পারেনি এগুলোর তাৎপর্য কত হতে পারে। তার স্ম্রাট তাকে যা করতে বলে গেছে সে শুধু স্টেই করে যেতে চেয়েছে। নেপোলিয়নের ছেলেটা যখন মারা যায় ১৮৩২ সালে, ঐ বইগুলোও অর্থহীন হয়ে পড়ে।”

“পোজো ডি বোরগোর কাছে অস্ত না।” ফোড়ন কাটল থ্রভাল্সেন।

মুর্যাড অনেক আগে থেকেই এটা জানে। এলিজা লাঘকের পূর্বপুরুষ এই লোকটা নেপোলিয়নকে কী পরিমাণ ঘৃণা করত স্টো হেনরিক কে আগেই বলেছে সে।

“কিন্তু এই ধাঁধার সমাধান সে করে যেতে পারেনি,” বলল মুর্যাড।

কথা সত্যি, সে পারেনি। কিন্তু তারই বংশের একজন আদাজল খেয়ে লেগেছে এটার সুরাহা করার জন্য।

আর অ্যাশবিও আসছে প্যারিসে।

তাই থ্রভাল্সেন ভালো করেই জানে কী করতে হবে।

“বইটা হাতাব আমি।”

▲

যাদুঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা গাছের সারির মাঝে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাম এবং মিগ্যান। লোহার বেষ্টনীর একটা অংশ ভাঙা, এই জায়গাতেই ম্যালন আর ~~স্টে~~ প্রথমে এসেছিল। রাস্তা পার হয়ে মেট্রো স্টেশনে পৌছে একটা ট্রেনে চড়ে বসতে ভারা। গন্তব্যঃ *Place de la Republique*.

“এটা *Marais*,” বলল মিগ্যান। এখন নীল পোশাকের পরিবর্তে ক্যানভাস কোট, আর জিস তার পরনে। পায়ে বুট। “এটা ফেসময় জলাঞ্চল ছিল। কিন্তু ১৫শ থেকে ১৮শ শতকের ভেতর এটাই প্রধান এলাকায় রূপ নেয়। তারপর আবারও একটু ভগ্নদশায় পতিত হয়। তবে সুদিন ফিরে আসছে আবার বোৰা যায়। প্রচুর পরিমাণে বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে, কোনোটা মেরামত হচ্ছে। এটা একসময় দেখবে এমন একটা জায়গা হবে যেখানে মানুষ আরেকবার তাদের জীবন কাটাতে চাইবে।”

মেয়েটাকে সে আসলে মেপে দেখতে চাইছে, বুঝতে চাইছে ভালো করে। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে যে মেয়েটা নির্দিষ্ট করে পাবার জন্য অহেতুক ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত, আবার এও মনে পরে যাচ্ছে যে, মেয়েটা খুব ঠাণ্ডা মাথার পরিচয় দিয়েছে জাদুঘরে।

ওর থেকেও বেশি শীতল এই মেয়ে।

আর এটাই তার অস্বস্তির কারণ।

“টেম্পলারদের প্যারিস হেডকোয়ার্টার এখানেই ছিল এক সময়। *Rousseau* নিজেও কয়েকটা উপাসনার জায়গা খুঁজে পেয়েছিল এই ঘরবাড়ির মাঝে। ভিট্টর হগো কাছেই বাস করতেন; আর এই জায়গাতেই *Marie Antoinette I Louis XVI-* কে বন্দী রাখা হয়েছিল।”

তাকে থামল স্যাম। “আমরা এখানে কেন?”

থামল সে, তার মাথাটা স্যামের ঠিক গলা পর্যন্ত উঁচু হবে। “তুমি স্মার্ট ছেলে, স্যাম। তোমার ওয়েবসাইট আর ইমেইল থেকে আমি এটা বুঝেছি। আমাদের মতো চিত্তাভাবনা করে এমন অনেকের সাথেই যোগাযোগ হয় আমার, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই আবাল মার্কা, বোঝে তো বোঝে না। কিন্তু তুমি সবার থেকে আলাদা।”

“তাহলে বল তুমি কেমন?”

প্রশ্নট একটা হাসি দিল মেয়েটি। “এটা তো তুমি বিচার করে দেখবে।”

স্যাম ভালো করেই জানে সেই বন্দুকটা এখনো তার পেছনে লুকানো, তার জ্যাকেটের নিচে। যাদুঘর ছেড়ে আসার আগেই ওখানে গুঁজে রেখেছে সে। স্যাম ভাবছে এখন, এই মুহূর্তে সে যদি উল্টো পথে হাঁটা শুরু করে, তাহলে কী করবে মেয়েটা? চুপ থাকবে? নাকি মিউজিয়ামে দেখানো তার ক্যারিশমা আবার দেখাবে? একেবারে পেশাদারী ভঙ্গিতে গুলি করছিলো লোকদু'জনকে।

“নাও, হয়েছে। চল এবার,” ভাবনা সরিয়ে বলল স্যাম।

তারা আরেকটা বাঁক নিয়ে নতুন একটা পথ ধরল। চারপাশে আরও বিল্ডিং রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। খুব বেশি মানুষের উপস্থিতি নেই এদিকে। তাই খুব নিরিবিলি পরিবেশ। যানবাহন যা আছে তা এই ঘনবসতি থেকে বেশখানিক দূরে।

“প্যারিসের লোক বলে ‘অলিগলির মতো পুরনো’, কিন্তু সম্মর্দ্দ বলি জায়গাটা ‘পাহাড়ের মতো পুরনো।’ মেয়েটা বলে উঠল।

স্যাম এরই মধ্যে লক্ষ্য করেছে রাস্তার নামগুলো কিন্তু নীল রঙে লিখে প্রতিটা কর্ণারের বাড়িতে লেখা হয়েছে।

“সবগুলো নামেরই আলাদা অর্থ আছে,” দেখে করলো মিগ্যান। “হয় ওগুলো কারো সম্মানে, বা কোনোকিছুর স্মরণে, অথবা কোনো নাম তোমায় বলে দেবে রাস্তাটা কোথায় গিয়ে মিশেছে, বা তোমায় বলবে এখানকার সবচে নামকরা অধিবাসী কে, আর তাও যদি না হয় তাহলে নাম পড়ে বুঝতে অস্তত পারবে যে এখানে কী ঘটে থাকে। কিছু না কিছু আছেই আড়ালে।”

ইঠাঃ একটা বাঁকে এসে থামল তারা। একটা নীল ও সাদা রঙের এনামেল প্লেটে একটা নামঃ *RUE LÔ ARAIGNÉE*.

“স্পাইডার স্ট্রিট,” ফরাসি থেকে অনুবাদ করে বলল স্যাম।

“তুমি ফ্রেঞ্চও জান?” একটু অবাক হলো মেয়েটা।

“এই কাজ চালাবার মতো জানি আরকি।”

বিজয়ের একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল মেয়েটার চোখেমুখে। “বুঝলাম। কিন্তু তুমি এমন জিনিসের পেছনে লেগেছ যেটা নিয়ে তোমার জ্ঞান সীমিত।” একটা সরু পথের দিকের দেখাল সে। “চতুর্থ বাড়িটা দেখ।”

তাকাল স্যাম সেদিকে। একটা বাড়ি। ঢোকার অংশটা লাল ইটে বানানো, আর কোণাগুলো কালো রঙ করা। জানালাগুলো পাথরে বাঁধানো, খুঁটিগুলো লোহার। বেশ সুপ্রশস্ত একটা খিলানপথ, থেমে গেছে গেটের সামনে

“১৩৯৫ সালে বানানো এটা,” বলল মিগ্যান। “পরে ১৬৬০ সালে পুনর্নির্মাণ করা হয়। ১৭৭৭ সালে এখানে অনেক আইনজীবী থাকত। ওখান থেকেই তারা স্পেন ও ফ্রাসের টাকা পাচার করে দিত আমেরিকান বিপ্লবীদের কাছে। এ একই আইনজীবীরা আবার অন্ত বেচত কন্টিনেন্টাল অর্মিদের কাছে, বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে নিত তামাক ও সেই সময়ের মানে উপনিবেশিক সময়ের নানান রকমের দ্রব্যাদি। আমেরিকানরা যখন জয়ী হলো, তখন আর তাদের ঐসব চুক্তির কথা মনে রেখে লাভ কী, তাই তারা আর তামাক ও পণ্য দিয়ে দেনা শোধ করলো না। আমরা কিছু বলিনি। কি মহৎ মানুষ আমরা, দেখেছ?”

এবারও চুপ থাকল স্যাম। বুঝতে পারছে মেয়েটা কিছু একটা বোঝাতে চাইছে।

“তো এই আইনজীবীরা কিন্তু তাদের পাওনা ঠিকই আদায় করে নিয়েছিল, আর সেটা গোটা আমেরিকানদের থেকেই, ১৮৩৫ সালে। ওরা আসলেই মাল, ঠিক না?”

এখনো চুপ সে।

“১৩শ শতকে লম্বারডিয়ান টাকার কুমিররা এইখানেই আস্থান পেড়ে বসেছিল। একদল লোভী মানুষের আড়া জমত এখানে। তারা চড়া সুদে টাঙ্ক ধার দিত, আর যে পরিমাণ নিয়ে নিত তা বললে বিশ্বাস হবে না তোমার।”

বাড়িটার দিকে ঘুরে গেল সে, আড়চোখে দেখছে স্যামকে।

“এটাই সেই জায়গা, যেখানে প্যারিস ক্লাব বৈঠক করে।”

চৌত্রিশ

সপ্তাহ ৬৪১০

দরজায় আস্তে করে টোকা দিল ম্যালন। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে সরাসরি একটা ট্যাক্সি রিটজ সিটিতে চলে এসেছে। সে আশা করছে এতক্ষণে থ্রিভাল্ডসেন লয়্যার ভ্যালী থেকে ফিরেছে।

দরজাটা খুলে গেল, ওপাশে তার বন্ধুকে দেখে স্বত্ত্বার নিঃশ্বাস ফেলল ম্যালন।

“কুনির ঘটনায় তুমি ছিলে নাকি?” ঘরে চুক্তেই জিজ্ঞেস করলো হেনরিক। “টেলিভিশনে দেখাছিল ওটা।”

“হ্যাঁ, আমাকেই দেখেছ। ধরা পড়ার আগেই বেরিয়ে এসেছিলাম।”

“স্যাম কোথায়?”

ঐ-যা হয়েছে তার সব বর্ণনা দিল ম্যালন, স্যামকে তুলে নেওয়ার কথাও বলল। জিমি ফড়েলের আড়ালে মিগ্যান মরিসনকেও চেনাল সে, তবে স্টেফানির কথা গোপন করে গেল এটা সে পেটের ভেতর রাখবে বলে ভেবেছে। নিজে যদি কোনোভাবে

থ্রিভান্ডসেনকে থামাতে পারে, বা অন্তত ওর কাজে দেরী করিয়ে দিতেও পারে, তাহলেও ওয়াশিংটনের নাক গলানোর বিষয়টা চেপে যাবে তার এই বন্ধুর কাছে।

ভাবতেই অবাক লাগছে যে টেবিলটা কেমন উল্টে গেল।

“স্যাম ঠিক আছে তো?” জিজেস করলো হেনরিক।

সে ভাবল মিথ্যে বলবে তাকে। “আমি জানি না। আর এই মুহূর্তে আমার কিছু করারও নেই এটা নিয়ে।”

থ্রিভান্ডসেনও শুরু করলো এলিজার গঞ্জ, সব বলল তার সাথে কী কথাবার্তা হয়েছে। তার শেষ কথাটা ছিল, “এক জঘন্য মহিলা। দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিলাম ওখানে, আর আমার মাথার ভেতর শুধু সাইয়ের কথাই ঘূরছিল।”

“তা কেন? এলিজা কি তোমার ছেলেকে মেরেছে?”

“এত সহজেই তাকে আমি মুক্তি দিচ্ছি না, দায় তারও আছে। অ্যাশবি তার সাথেই কাজ করে। তাদের ভেতর একটা গভীর সংযোগ আছে, আর এটুকুই যথেষ্ট আমার জন্য।”

তার এই বন্ধুটি আসলেই ক্লান্ত, শ্রান্ত। চোখে-মুখে তার যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে।

“যাকগে, এখন শোন, কটন, অ্যাশবি কিন্তু একটা বইয়ের পেছনে^{অকাউন্ট} উঠেপড়ে লেগেছে।”

নেপোলিয়নের উইল, ও সেখানে উল্লেখ করা *The Merovingian Kingdoms 450–751, A.D.* বইটার কথা ও ইনভ্যালিয়েদসের জাদুয়াকে সেটার অবস্থানের কথা শুনল ম্যালন।

“সবার আগেই আমি ওটা কজা করতে চাই,” বৃহস্পৃষ্ঠান্ধুর থ্রিভান্ডসেন।

মাথার ভেতর ঘূরপাক খাচ্ছে ম্যালনের। মেটফোন চাচ্ছে থ্রিভান্ডসেন ক্ষান্ত দিক। এটা করতে হলে, সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ম্যালনের হাতে নিতে হবে, কিন্তু সেটা রীতিমত দুর্গম গিরি, কান্তার মরু। সে কোনোদিনও চালকের আসন থেকে তার বন্ধুকে সরিয়ে দিতে পারবে না।

“ওটা আমাকে দিয়ে চুরি করাতে চাও?” জিজেস করলো ম্যালন।

“মোটেই সহজ কাজ হবে না এটা। ইনভ্যালিয়েদস এক সময় জাতীয় অস্ত্রাগার ছিল, ওটা একটা দুর্গ।”

“এটা তো উত্তর হলো না।”

“হ্যাঁ, চাই।”

“ধরো বইটা এনে দিলাম। তারপর কী করবে ওটা দিয়ে? হারানো সম্পদ খুঁজবে? অ্যাশবিকে অপমান করবে? তাকে মেরে ফেলবে? খুশি হবে তো?”

“যা-যা বললে, তার সবগুলোই করবো।”

“গতবছর যখন আমার ছেলেকে তুলে নিয়ে গেল, তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলে। আমাকে সাহায্য করেছ, পথ দেখিয়েছ। এখন আমি তোমার কাজে,

এখানে। আমাদের প্রতিটা কাজ মাথা খাটিয়ে করা উচিত। মন চাইল আর একজনকে তুমি মেরে ফেললে—এটা আসলে ঠিক না।”

গভীর সহানুভূতির একটা ছায়া নেমে এল তার প্রবীণ বন্ধুটির মুখে। “গতরাতেই তো আমি মারলাম।”

“এতে কি তোমার খারাপ লাগছে না?”

“না, অতটা না। ক্যান্ডাল আমার ছেলেকে মেরেছে। মৃত্যু ওর পাওনা। অ্যাশবিও ক্যান্ডালের মতই দায়ী। তবে বিষয়টা হলো, তাকে মারার কাজটা আমার নাও করা লাগতে পারে। এলিজা আমার হয়েই কাজটা করে দিতে পারে।”

“এতেই কি সব হয়ে যাবে ভাবছ?”

স্টেফানি তাকে জানিয়েছে যে অ্যাশবি প্যারিসে আসছে, এবং আগামিকালই সে কী ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়ে বিস্তারিত সব তথ্য সরবরাহ করবে তার সাবেক এই বসের কাছে। অ্যাশবির কারণে প্রভান্ডসেনের যা হয়েছে সে জন্য এই ব্রিটিশকে তীব্র ঘৃণা করে ম্যালন। কিন্তু তারপরও যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় অ্যাশবি দিচ্ছে পিটার লায়নের মতো কুখ্যাত সন্ত্রাসীকে ধরার জন্য, সেটাকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

“হেনরিক, সব আমার হাতে ছেড়ে দাও। সব আমিই করছি, আমার মতো করে।”

“থাক, বইটা আমি নিজেই ম্যানেজ করতে পারব।”

“তাহলে আমি এখানে থেকে কী করবো, বল?”

একটা একগুঁয়েমিভরা হাসি দেখা গেল বৃন্দের ঝঁঝে। “আমি তো জানি তুমি এখানে আমাকে সাহায্য করতেই এসেছ।”

চোখ দুটো প্রভান্ডসেনের উপর স্থির করে স্নানের ম্যালন। “হ্যাঁ, করবো, আর সেটা আমার মতো করে করতে দাও।”

“যেকোনো মুল্যে অ্যাশবিকে চাই আমি, কটন। বুঝতে পারছ কি বলছি আমি?”

“বুঝেছি। তবে তাকে মারার আগে আমরা দেখি যে আসলেই কী ঘটতে চলেছে। একটু অপেক্ষা করিঃ তুমিও তো এরকমই বলেছিলে গতকাল। তাহলে ওভাবেই এগোই আমরা।”

“কী হবে না হবে তা নিয়ে মাথা ঘামান বন্ধ করে দিয়েছি আমি, ম্যালন।”

“তাহলে লাঘক আর তার প্যারিস ক্লাবের পেছনে লাগার কী দরকার? অ্যাশবিকে মারলেই তো তোমার কাজ হয়ে যাচ্ছে।”

চুপ মেরে আছে বন্ধুটি।

তারপর প্রশ্ন করলো সে। “স্যামের হলোটা কী? আমার তো চিন্তা হচ্ছে।”

“ওটাও আমি দেখব,” স্টেফানির কথা আবারও মনে পরে গেল তার। “তবে ও তো আর বাচ্চা ছেলে না, জ্ঞান-বুদ্ধি আছে নিজেকে ঠিকই নিরাপদ রাখতে পারবে। অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলোও।”

স্যাম একটা এপার্টমেন্টে চুকল। এটা শহরের যে অংশে দাঁড়িয়ে আছে সেটাৰ নাম মৱিসন বলেছিল Montparnasse. কুনি নিউজিয়াম বা লুক্সেমাবার্গ জাদুঘর থেকে খুব দূরে না এটা। ভেতরটায় পুরনো দিনের আবহ মুক্ত করার মতো। মেট্রো ষ্টেশন থেকে আসার সময়েই অঙ্ককার নেমে এসেছে চারদিকে।

“এখান থেকে কয়েক ব্লক সামনেই লেনিন থাকত এক সময়,” বলল মেয়েটা। “ওটা অবশ্য এখন একটা যাদুঘর, কিন্তু আমি ভাবি যে ওখানে কেউ আদৌ যায় কিনা।”

“সাম্যবাদ পছন্দ কর না?”

“না, বলতে গেলে। পুঁজিবাদের থেকেও খারাপ এটা অনেক দিক থেকে।”

এপার্টমেন্টের সাত তলায় বেশ খোলামেলা একটা স্টুডিও, সাথেই একটা রান্নাঘর, গোসলখানা, সব মিলিয়ে দেখতে একটা ছাত্রের থাকার জায়গার মতো। দেওয়ালে নানান পেইণ্টিং আৱৰ্টাভেল পোস্টার লাগানো, একটারও ফ্রেম নেই। বোর্ড-ব্লক দিয়ে বানানো চমৎকার বুকশেলফগুলো গাদাগাদা পাঠ্যবই আৱ পেপারব্যাক বহিয়ের ভাবে বসে গেছে নিচের দিকে। পুরুষের একজোড়া বুট রাখা একটু চেয়ারের পাশে, আৱ জিপের একটা প্যান্ট পড়ে আছে মেঝেতে, তবে সেটা মাইসনের গায়ে লাগবে না, চের বড় সাইজের।

“আমি কিন্তু এখানে থাকি না,” বলল সে, স্যামের ভৱিনাকে ধৰতে পেরে। “আমার এক বন্ধু থাকে।”

কোটটা খুলে ফেলল মৱিসন, তাৱপৰ বন্দুকটা বেঞ্চ কৰে নিয়ে টেবিলের উপৰ ঠেলে দিল, খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে।

ঘৰেৱ এক কেণায় তিনটে কম্পিউটাৰ এবং একটা ব্লেড সার্ভার।

দেখাল মেয়েটি। “ওটাই GreedWatch. সাইটটা আমি এখন থেকেই চালাই, কিন্তু আমি চাই সবাই ভাৰুক জিমি ফড়েলেৰ কাজ এটা।”

“মিউজিয়ামে আজ কয়েকজন হতাহত হলো,” আবাৱও মনে কৱিয়ে দিল স্যাম। “এটা কিন্তু কোনো খেলা না।”

“অবশ্যই খেলা, স্যাম। একটা বড়, ভয়ঙ্কৰ খেলা। তবে সেটা আমার না। এটা তাদেৱ খেলা, আৱ হতাহতেৱ কথা বলছ? এতে আমার দোষ নেই কোনো।”

“তাই বুঝি? তুমি যদি ঐ লোক দু'জনকে দেখে চিল্লাপাল্লা না কৱতে তাহলে কি আৱ এগুলো হত?”

“আৱে, তুমি তো আসল বিষয়টাই দেখছ না।”

এটা নিয়ে আৱ তৰ্ক কৱবে না বলে ভাবল স্যাম, তাৱচে বৱং সিক্রেট সার্ভিসেৱ শেখানো কৌশল-কথা বলায় ব্যস্ত রাখা প্ৰয়োগ কৱাই ভালো হবে এখন। “বুঝলাম, এখন প্যারিস ক্লাব নিয়ে আমায় খুলে বল।”

“জানতে আব্দী?”

“অবশ্যই, তুমি তো জানোই এটা।”

“আমিও ভেবেছিলাম তোমার কৌতুহল হবে। বললাম না যে তুমি আর আমি একইরকম চিন্তা করি?”

এ কথার সত্যতা নিয়ে তার সন্দেহ আছে, তবে নিজের মুখটা বক্ষই রাখল স্যাম।

“আমি যতটা জেনেছি, ক্লাবটা ছয়জন নিয়ে গঠিত। সবাই ব্যাপক ধনী। আর উচ্চমাত্রায় লোভী। পাঁচ বিলিয়ন ইউরোর সম্পদে ওদের মন ভরে না, তাই সেটাকে ছয় বা সাতের ঘরে নিতে চায় তারা। আমি একজনকে চিনি যে এদের মধ্যে একজনের হয়ে কাজ করে—”

কথার মাঝেই বুটগুলোর দিকে দেখাল স্যাম। “তোমার সেই চেনা লোকের বুট ওগুলো?”

বাঁকা চাদের মতো করে হেসে দিল মেয়েটা। “নাহ, সেটা আরেকজন।”

“তার মানে কেমন হলো বিষয়টা। তোমার যে ব্যন্ততা, সেখানে কারো সাথে সময় কাটানোর সুযোগ কিভাবে—”

“ওহ স্যাম, আমিও তো মানুষ, নাকি?”

“ঠিক করে বলত, কে তুমি?”

“আমি একজন মেয়ে, যে তোমাকে বাঁচাতে চাইছে, বুঝলে মিঃ স্যাম কলিস?”

“আমাকে বাঁচানোর দরকার নেই।”

“আমার মনে হয় দরকার আছে। বরং উল্টো প্রশ্ন তোমায় ~~কেন্দ্ৰীয়~~, তুমি এখানে কী করছ? কিছুক্ষণ আগে বললে যে তোমার বস যারা তারা নাকি ~~তোমার~~ ওয়েবসাইট রাখা আর আমার সাথে যোগাযোগ করার অপরাধে তোমায় বন্ধনস্ত করেছে। কিন্তু সাইটটা এখনো অনলাইনে অ্যাক্টিভ, আর তুমিও চলে এসেছ ~~ই~~ এখানে, তাও আবার খুঁজছ আমাকেই। তাহলে আমি কী বুঝব? এটা কি তোমার অফিসিয়াল কোনো সফর হতে পারে না? তুমি কি তাদের হয়ে কাজ করতে পারে না?”

সত্যটা এখনই বলতে পারছে না ~~স্যাম~~। “তুমি এখন পর্যন্ত প্যারিস ক্লাব নিয়ে একটা শব্দও বলনি!”

একটা ভিনাইলের চেয়ারে আড়াআড়ি ভাবে বসে আছে মেয়েটা। পা দুটো একটা হাতলের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে অপর হাতলে পিঠ লাগিয়ে বসেছে। “স্যাম, স্যাম, স্যাম। তুমি এখনো কিছু বোঝনি, তাই তো? এই মানুষগুলো পরিকল্পনা করছে। খুব ঘায় খেলোয়াড় এরা। টাকা নিয়ে এরা যে কত কী করতে পারে তা ধারণায়ও নেই তোমার বা আমার। এখন এরা সেই কাজগুলোই করতে চাইছে যেগুলো নিয়ে তুমি আর আমি আলোচনা করেছি আগেই। অর্থনীতির বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে এরা। মার্কেটে জালিয়াতি করবে, মুদ্রার দাম কমাবে, আরও কত কী! তোমার মনে আছে যে গত বছর তেলের দামের উপর কেমন প্রভাব পড়েছিল। লোভে জর্জরিত মার্কেটাররাই এমন কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছিল এই লোকগুলোও তাদের মতো, পার্থক্য নেই।

“এতে আমার উন্নতি পাইনি আমি।”

দরজায় টোকা পড়ল হঠাৎ, আর এই প্রথম মেয়েটার চোখে-মুখে ভয়ের সূক্ষ্ম একটা উপস্থিতি দেখতে পেল স্যাম। টেবিলের উপর রাখা বন্দুকের উপর দৃষ্টি আটকে আছে তার।

“কে এসেছে দেখছ না কেন?” জিজ্ঞেস করলো স্যাম।

আরও একটা টোকা পড়ল। খুব আলতো, সাধারণ।

“তুমি কি ভাবছ কোনো শক্র বা খারাপ কেউ?” প্রশ্ন স্যামের। নিজেকে শান্ত রাখতে চাইছে সে। “আর এটা আদৌ তোমার জায়গা না, ঠিক?”

একটা গভীর দৃষ্টি দিল স্যামের দিকে। “তুমি বড় দ্রুত শিখে ফেল সবকিছু।”

“আমি একজন গ্রাজুয়েট, ভুলে গেলে চলবে না।”

মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে সোজা দরজার দিকে হেঁটে গেল।

ওটা খুলতেই ছোটখাটো গড়নের এক মহিলাকে দেখা গেল ওপাশে, গায়ে ওভারকোট। বয়স হতে পারে ষাট বা তার একটু বেশি। কাঁচাপাকা চুল, চোখ দুটো গাঢ় বাদামী। গলায় একটা বারবেরি স্কার্ফ জড়ানো। এক হাতে চামড়ার একটা কেস ও একটা ব্যাজ, তাতে ছবি ও পরিচয় লেখা।

অন্য হাতে একটা বেরেটা পিস্তল।

“মিস মরিসন,” মহিলাটি বলল। “আমি স্টেফানি মেলেই। ইউএস জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট।”

পঁয়ত্রিশ

লয়্যার ভ্যালী

সন্ধ্যা ৭:০০

দীর্ঘ গ্যালারীর ভেতর দিয়ে হাঁটছে এলিজা কান পেতে শুনছে বাইরে শীতের হাওয়া বইছে জোরে, ঝাপটা এসে লাগছে শ্যাতোর জানালাগুলোয়। তার মন্ত্রপঞ্চাঙ্গে এক এক করে গত এক বছরের কথা। অ্যাশবিকে সে অনেক কিছুই বলেছে এই দীর্ঘ সময়ে। কিন্তু আজ এমন একটা সুযোগ এসে তাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল যে তার মনে হচ্ছে বিরাট বড় এক ভুল করে ফেলেছে সে।

ইতিহাস সাক্ষী, নেপোলিয়ন গোটা ইউরোপে সৈন্য পরিমাণ লুটপাট চালিয়েছে। গুনতির বাইরে সেই সম্পদ। মূল্যবান ধাতু থেকে শুরু করে, হিরা-চুনি-পান্না, প্রাচীন দ্রব্য, পেইন্টিং, বইপত্র, ভাস্কর্য-মূল্য আছে ত্রিমন যেকোনো কিছুই। সম্পদের সেই গুদামের অস্তিত্ব আছে ঠিকই, কিন্তু তা যে কোথায় সেটা ঠিক করে কেউই বলতে পারেনি। কিন্তু পোজো ডি বোরগো এটা বুঝতে পেরেছিল যে নেপোলিয়ন তার সম্পদের একটা অংশ হলেও গোপন এক জায়গায় রেখে দিয়েছে যেটার অবস্থান সে

নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। নেপোলিয়নের সময়েই একবার চাউর হয়েছিল বিরাট অংকের সোনা-দানার কথা, কিন্তু সেখানে যাবার পথ কেউ দেখাতে পারেনি।

কুড়ি বছর ধরে তার এক পূর্বপুরুষ এটার খোঁজ করেছে। কিন্তু পায়নি।

বাইরের বাতাস আরও শীতল বোৰা গেল জানালার কাছে এসে দাঢ়াতেই। নিচেই *Cher* নদী বয়ে যাচ্ছে। ঘরের ভেতরের এই আরামদায়ক এই উষ্ণতা খুব ভালো লাগে তার, আর সাথে পরিচিত একটা স্বাণ, যেটা শুধু নিজের বাড়িতেই পাওয়া যায়। তার গায়ে পুরু একটা আলখাল্লা জড়ানো। তার আগের প্রজন্মের কেউ একজন যা পারেনি, সেটা তাকে পারতেই হবে। সেই হারানো সম্পদ খুঁজে পেলেই পোজো ডি বোরগোর কষ্টটা সার্থক হবে, বজায় থাকবে বংশের মর্যাদা, রক্ষা হবে তার পরিবারের ঐতিহ্য।

একটা সত্যিকারের *Vendetta*, একটা চরম প্রতিশোধের সমাপ্তি।

ডি বোরগো বংশটা বেশ দীর্ঘ। কর্সিকার বড় গোষ্ঠীর মাঝে একটা। পোজোর যখন অল্ল বয়স, তখন থেকেই নেপোলিয়নের ভালো বন্ধু সে। কিন্তু সেই সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরল যখন কিংবদন্তী বিপ্লবি নেতা *Pasquale Paoli* ডি বোরগোকে সমর্থন দিল। পাওলি খেয়াল করেছিল যে তার সমর্থন বা আশীর্বাদ পাওয়ার জন্ম~~জন্ম~~ বোরগো অনেক মুখিয়ে ছিল।

একটা খুব শীতল বিবাদ ছড়িয়ে পড়ে যখন তরুণ নেপোলিয়ন একটা ভোটে উপনীত হয়। তখন সে একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। তার প্রাপ্তপক্ষ ছিল পোজো ডি বোরগোর এক ভাই। নেপোলিয়ন ও তার দল যে সুচতুর ক্লেশল প্রয়োগ করে নির্বাচনে জিতেছিল তাতে বোরগো পরিবারের সাথে আরও শক্রভূতির হয় তার। তাদের এই বৈরিভাবের মৌলকলা পূর্ণ হয় যখন ১৭৯২ সনে~~জন্ম~~ বোরগোরা আলাদা হয়ে কর্সিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কাজ শুরু করে, আর নেপোলিয়নরা চলে যায় ফ্রান্সে। পরবর্তীতে পোজোকে কর্সিকার বেসামরিক সরকার প্রধান বানানো হয়। নেপোলিয়নের অধীনে ফ্রান্স যখন কর্সিকা দখল করে, ডি বোরগো পালিয়ে চলে যায়, এবং এরপরের তেইশ বছর সে একটু-একটু করে নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দক্ষতার সাথে কাজ করে যায়।

যত চেষ্টাই করা হোক, জনগণের মন থেকে আমায় মুছে দিতে পারবে না। ফ্রান্সের ইতিহাসবেতারা ঠিকই আমার প্রাপ্ত মর্যাদাটুকু দেবে আমায়।

নেপোলিয়নের উদ্ধৃতা তার মগজকে খেয়ে ফেলেছিল। আর তাই সহজেই ভুলে গিয়েছিল যে রাশিয়া, পোল্যান্ড, প্রশিয়া, ইটালির শত-শত গ্রাম পুড়িয়ে মাটির সাথে সে মিশিয়ে দিয়েছে। বাদ যায়নি আইবেরিয়ার সমতল থেকে শুরু করে পাহাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত। হাজার হাজার বন্দীকে হত্যা করা হয়। লক্ষ-লক্ষ মানুষ মাথা গেঁজার ঠাইটুকু হারিয়ে ফেলে। কত নারী যে ধর্ষিত হয়েছে নেপোলিয়নের *Grande Armée*-র হাতে, তার ঠিক নেই। ত্রিশ লক্ষ বা ততধিক সৈন্য মারা যায় সারা ইউরোপে, পচে মিশে যায় যার যেখানে মৃত্যু হয়েছে সেখানেই। আরও কয়েক লক্ষ আহত হয়, বা স্থায়ী পঙ্কতি

বরণ করে। অর্থনীতি আচল হয়ে পড়ে। ভয় আর আতঙ্ক যেন ছায়ার মতো, পিছু ছাড়ে না কারো। এমন কি ফ্রান্সেও। বিখ্যাত ফরাসি লেখক Émile Zola-র একটা দর্শনের সাথে এলিজা একমত। সে ১৯ শতকের শেষে লিখেছিলঃ যে ইতিহাস লেখা হয়ে যাচ্ছে, সেই ইতিহাসের সত্যকে কেউ চেপে রাখতে পারবে এটা বিশ্বাস করা নিরেট পাগলামো ছাড়া আর কিছুই না।

সত্য...

জার্মানির রাজ্যগুলোর উপর তার ধ্বংসযজ্ঞ, এবং পরবর্তীতে তাদেরকে প্রশিয়া, বাভারিয়া এবং স্যান্ডেনির সাথে একীভূতকরণ জার্মানির জাতীয়তাবাদের সূচনা করে, যা আরও একশ বছর পর তাদেরকে সংহতির দিকে নিয়ে যায়, যে সংহতি উজ্জীবিত করে বিসমার্ক, হিটলার এবং দুটো বিশ্বযুদ্ধকে।

আমাকে আমার প্রাপ্যটুকু দাও।

অবশ্যই।

এলিজাই দেবে তাকে।

চামড়ার হিল জোড়া তাকে গ্যালারী থেকে বের করে আনল। সে পেছনে ঘুরতেই দেখতে পেল তার গৃহাধ্যক্ষ তার দিকেই এগিয়ে আসছে, হাতে ফ্রেন। এই ফোনকলেরই অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ, অপর প্রান্তের মানুষটার পরিচয়ও তার জানা।

ফোনটা হাতে দিয়ে চুপচাপ চলে গেল সে।

“গুড ইভিনিং, গ্রাহাম,” এলিজা বলল।

“দারুণ খবর আছে আমার হাতে,” বলল অ্যাশবি। এত গবেষণা আর এত তদন্ত কাজে দিয়েছে, বিফলে যায়নি। মনে হয় একটু সূত্র পেয়েছি যেটা একেবারে সরাসরি গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যাবে আমাদেরকে।

তার ভেতরটা জেগে উঠল হঠাত।

“এখন আমার একটু সাহায্য দরকার,” অ্যাশবি বলল।

এলিজা শুনছে ঠিকই, কিন্তু তার ভেতরটা খুব সতর্ক এখন, আর সেখানে সন্দেহও দানা বেঁধেছে। তবুও এই লোকটার কঢ়ে যে সফলতার উত্তেজনা, সেটাও তাকে উজ্জীবিত করছে একইসাথে।

তারপর বলল অ্যাশবি, “ইনভ্যালিদেস কিছু তথ্য ধরে রেখেছে, যা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন এটার কি কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে তুমি?”

মনটা যেন সম্ভাবনার সাথে ছুটছে পাল্লা দিয়ে। “হ্যাম, পারব।”

“আমিও ভেবেছিলাম যে তুমি পারবে এটা। ঠিক আছে, আমি সকালেই আসছি।”

সেকেন্ডেরও কম সময়ে সব যেন বুঝতে চাইল এলিজা, তারপর বলল, “ওয়েলডান, গ্রাহাম।”

“এটাতেই কাজ হবে আমার মনে হয়।”

“আর আমাদের ক্রিসমাস উপহারের কত দূর?” জিজ্ঞেস করল এলিজা।

“মাথায় আছে ওটা, সময় মতোই পেয়ে যাবে।”

ঠিক এটাই শুনতে চাইছিল সে। “তাহলে সোমবার দেখা হচ্ছে।”

“হ্যাঁ, মিস করব না।”

বিদায় জানিয়ে কথা শেষ করলো দু'জন।

অ্যাশবি বেঙ্গলানি করতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে ঠিকই, সে ভাবল, কিন্তু এই ব্রিটিশ ঠিকঠাক মতোই কাজ করে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত, আর সেটা যে কারো থেকেই ভালোভাবে।

তারপরও সন্দেহের মেঘ উড়ছে মনের আকাশে।

হাতে দু'দিন সময় আছে আর।

এখন এই দোদুল্যমান পরিস্থিতিগুলো ভালো করেই সামাল দিয়ে রাখতে হবে তার, অন্তত এই দুটো দিন।

▲

স্টেফানি নেলেই ঘরে ঢোকা মাত্রই স্যাম উঠে দাঁড়ালো সোজা হয়ে। দরজাটা বন্ধ করে দিল মিগ্যান। বরফ-শীতল ঘাম ছুটল স্যামের কপাল দিয়ে।

“এটা আপনার আমেরিকা না,” প্রথমেই শক্ত কথা দিয়ে শুরু করলো মিগ্যান, তার কঠে ক্রোধের উপস্থিতি স্পষ্ট। “এখানে এসে কোনো কিছুর বিচার করার এ্যথিয়ার নেই আপনার।”

“তা ঠিক। কিন্তু এই মুহূর্তে যে কারণে তোমাকে ক্লোরিসের পুলিশ অ্যারেস্ট করছে না সেটা শুধুমাত্র আমি। বুঝলে? এখন আমি কিন্তু যাব? তারা এসে তোমায় ধরে নিয়ে যাক, তারপর না হয় হাজতে বসে তোমাকে সাথে কথা বলা যাবে।”

“আমার অপরাধ?”

“অন্ত বহন, পৌর এলাকার ভেতর আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, বিশ্বজ্ঞানের সৃষ্টি, রাজ্য সম্পদ ধ্বংস করা, অপহরণ, বেআইনি হামলা। কিছু বাদ গেল আমার?”

মাথাটা দোলাল মিগ্যান। “আপনারা সবাই একরকম।”

হাসল একটু স্টেফানি। “আমি এটাকে একটা প্রশংসা হিসেবেই নিছি।” তারপর স্যামের দিকে তাকাল সে। “বলাই বাহুল্য, যে তুমি পাহাড় সমান ঝামেলায় পড়েছ। কিন্তু এই সমস্যার কিছুটা আমি বুঝতে পারছি। হেনরিক থ্রিভান্ডসেনকে তো আমি চিনি। তোমার এসবে জড়ানোর পেছনে তাকেও আংশিক দোষ দেওয়া যায়।”

এই মহিলাকে একটুও চেনে না স্যাম, তাই তার কথায় সায় দেওয়া বা তার সাথে হাত মেলানোর ইচ্ছা থাকা উচিত না। আর তাছাড়া থ্রিভান্ডসেনই একমাত্র ব্যক্তি যে তাকে যথেষ্ট সম্মান করে। “কী চান আপনি?”

“বেশি কিছু না। শুধু চাই তোমরা আমার কাজে একটু সাহায্য করো। আর যদি সেটা করো, তাহলে, মিস মরিসন, তোমাকে জেলে যেতে হবে না। আর তুমি, মিঃ স্যাম কলিস, তোমার চাকরীটাও ফিরে পেতে পার।”

তার এমন দয়াময়ী ভাব ভালো লাগল না স্যামের। “আর যদি আমি কোনো চাকরী বা কোনো ক্যারিয়ার না চাই, তো?”

স্টেফানি এমনভাবে তার দিকে দৃষ্টি নিষ্কেপ করলো এবার যেভাবে তার উপরের কর্মকর্তারাই করে থাকত।

“আমি জানতাম তুমি একজন ফিল্ড এজেন্ট হতে চাও। সিক্রেট সার্ভিস থেকে এমনটাই বলা হয়েছে আমাকে। আর আমি শুধুমাত্র এই সুযোগটাই তোমায় দিতে চাইছি, আর কিছু না।”

“আমার কাছ থেকে কী চান আপনি?” প্রশ্ন করলো স্যাম।

“সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মিস মরিসনের ওপর।” বয়স্ক মহিলাটি তাকাল মিগ্যানের দিকে। “বিশাস করো বা না করো, আমি কিন্তু এখানে এলামই তোমাদের সাহায্য করতে। তাই আমাকে এখন খুলে বল সব। তোমার ওয়েবসাইটে যে ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করেছ, তার অস্তিত্ব থাকলে আছে, না থাকলে নাই, কিন্তু এর বাইরে আমাকে অবাক করার মতো কোনো তথ্য বা প্রমাণাদি আছে তোমার হাতে?”

“আপনি মহা ধুরন্ধর।”

“কতটা, তা তোমার জানা নেই।”

হাসল মিগ্যান। “আপনি আমার মায়ের কথা মনে করিয়ে দিলেন। সেও নমনীয়তা কী জিনিস জানত না।”

“এর মানে হলো, আমি বুঝো, আমার কাছে তুমি বক্স হতে চাইছ না, তাই তো?”

“নরম হব কেন? হাতে বন্দুক ধরে আছেন সেজনগুলি।”

দু'জনের চারপাশে একবার ঘুরে এল স্টেফানি, তারপর কিচেন টেবিলের কাছে গিয়ে থামল। মিগ্যানের বন্দুকটা ওখানেই পড়ে আছে। হাতে তুলে নিল অস্ত্রটা। “কুনিতে আজ দু'জন মারা গেছে। আরও একজন হসপিটালে।”

“আর গার্ড?” জিজেস করলো স্যাম।

নড় করলো স্টেফানি। “সে বেঁচে যাবে, অবস্থা ভালো।”

শুনে স্বত্ত্ব পেল স্যাম।

“তোমার কী অবস্থা, মিস মরিসন? এগুলো শুনে তুমিও স্বত্ত্ব পেয়েছ?”

“এতে আবার আমার কী? এগুলো আমার সমস্যা না।” উত্তর দিল মিগ্যান।

“শুরু তো তুমই করলে।”

“কখনোই না। আমি শুধু মুখোশটা খুলে দিতে চেয়েছি।”

“তোমাদের কোনো ধারণা আছে ঐ দু'জন কার হয়ে কাজ করত?”

নড় করলো মিগ্যান। “দ্য প্যারিস ক্লাব।”

“উহ, এটা পুরোপুরি ঠিক না। এলিজা লাঘক নিজে ঐ দু'জনকে ভাড়া করেছিল তোমার পোষা ফড়েলকে অনুসরণ করার জন্য।”

“তাহলে বলব আপনি এখনো কিছুটা আগের যুগেই পড়ে আছেন।”

“বটে, তাহলে আমায় এমন কিছু বল যা এই যুগের, যা আমি জানি না।”

“অল রাইট, স্মার্ট লেডি। তাহলে শুনুন। দু'দিন বাদেই কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা আমি জানি।”

▲

রিটজ হোটেলে নিজের স্যুটে বসে আছে একা প্রভান্তসেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। চলে গিয়েছে ম্যালন কিছুক্ষণ আগে। যাবার আগে নিশ্চয়তা দিয়ে গেছে যে আগামিকালের ভেতর বইটা ইনভ্যালিয়েদস থেকে নিয়ে আসবে। এই বন্ধুকে নিয়ে তার অগাধ ভরসা, এমনকি এই মুহূর্তে তার নিজের ওপরেও এতটা ভরসা পাচ্ছে না সে।

ক্রিস্টালের পাত্র থেকে ব্র্যান্ডি চুমুক দিচ্ছে সে, চেষ্টা করছে নিজের উত্তেজনা দূর করতে। মাথার ভেতর থেকে দুশ্চিন্তার ছায়াগুলো আজকে ভেগেছে, খুব যন্ত্রণা দিয়েছে ওগুলো এতদিন। বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে জীবনে, কিন্তু এবারেরটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যক্তিগত বিষয় না এটা, সম্পূর্ণই আবেগতাড়িত আর এ কারণেই তার ভেতর একটা ভয়ও কাজ করছে। সব ঠিক থাকলে আগামীকালই গ্রাহাম অ্যাশবির সাথে দেখা হতে পারে তার, আর সে এটাও জানে যে ঐ মুহূর্তটা তার জন্য ~~বেশি~~ কঠিন হবে। তাকে খুব শান্ত থাকতে হবে। খুব আস্তরিকতার সাথে হাত মেলান্তে হবে তার ছেলের খুনির সাথে, সব রকমের ভদ্রতাই দেখাতে হবে। একটুও বুঝতে দেওয়া যাবে না সঠিক মুহূর্ত আসার আগ পর্যন্ত।

গলায় আরও খানিকটা অ্যালকোহল ঢেলে দিল ~~বেশি~~ কিন্তু।

সাইয়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ে গেল তার।

কফিনের ডালা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, কারণ বুলেটের আঘাতে এমন অবস্থা হয়েছিল যে তাকে আর দেখানোর অবস্থা ছিল না। তারপরও তার ছেলের মুখের ছবিটা দেখেছিল সে, একরকম জোর করেই। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা সে মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে কারণ সে জানে এই মৃত্যুর পেছনের ঘটনা না জানা পর্যন্ত, এর শেধ না তোলা পর্যন্ত সে একটুও শান্তি পাবে না।

আজ, দু'বছর পর, সে আসল সত্যটা জানতে পেরেছে।

আর প্রতিশোধ মাত্র কয়েক ঘণ্টা দূরেই।

ম্যালনের কাছে মিথ্যা বলেছে সে। সে এলিজাকে কোনোভাবে অ্যাশবির পেছনে লাগিয়ে দিলেও, ঐ বাস্টার্ডকে খুন করবে সে নিজেই।

আর কেউই না।

শুধুই সে।

ঠিক গতরাতের মতো। জেস্পারকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই গুলি চালিয়েছে অ্যামান্দো ক্যাব্রাল আর তার সহকারীকে। সে আসলে কী হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন? একটা

খুনি? না। এক প্রতিশোধ গ্রহণকারী। কিন্তু এই দু'য়ের মাঝে তফাং আসলেই কি আছে?

আলোর বিপরীতে হাতের গ্লাসটা তুলে ধরল। অ্যালকোহলের চমৎকার রঙটা দারুণ লাগে তার। আরও এক চুমুক ব্র্যান্ডি পান করলো সে, দীর্ঘ এক চুমুক, আরও বেশি সুখ ছড়াল ভেতরটায়।

তারপর চোখ দুটো বন্ধ করলো।

মাথার ভেতরের সব এলোমেলো ভাবনা মিলিয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার ফিরে এল। তবে এবার সেগুলো সুন্দর, পরিপাটি অবস্থায়, একের পর এক, যেন প্রজেষ্ঠের পরপর কোনো ছবি দেখাচ্ছে।

ঁটে দুটো একটু কেঁপে উঠল।

প্রায় ভুলে যাওয়া স্মৃতিগুলো—যা বহু বছর সে মনে করেনি—আবার দেখা দিল এক ঝলক, তারপর আবার হারিয়ে গেল।

ছেলে সাইকে সে কবর দিয়েছে পারিবারিক কবরস্থানে, লিজেটের পাশেই, আরও প্রভাস্তসনের মাঝে যারা শত-শত বছর ধরে ওখানে ঘুমিয়ে আছে। শেষ যাত্রায় তার ছেলেকে একটা ধূসর রঙের স্যুট পরান হয়েছিল, বুকে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল একটা হলুদ গোলাপ। এই রঙের গোলাপ সাইয়ের খুব পছন্দের ছিল, যেমনজু ছিল তার মালিজেটের।

কফিনের সেই অদ্ভুত গন্ধ মনে পড়ে গেল তার একটু ঝাঁঝাল, একটু স্যাতস্যাতে, সব মিলিয়ে মৃত্যুর গন্ধ।

তার একাকীভু যেন আবার ফিরে এসেছে নতুন অন্ধকৃত ভর করে!

বাকি ব্র্যান্ডিটুকুও মুখে ঢেলে দিল সে।

বেদনার ঝাপটা এসে আবারও আঘাত করলো তার ভেতরকে।

ভেতরের সব দ্বিধা, সংশয় চাপা পড়ে গেল তাতে।

হ্যাঁ, সে নিজেই গ্রাহাম অ্যাশবিকে খুন করবে।

ছত্রিশ

প্যারিস

সোমবার, ২৪ ডিসেম্বর

বেলা ১১:০০

Church of the Dome এ ঢুকল ম্যালন। জায়গাটা একটু বেমানান লাগে *Hôtel des Invalides* এর সাপেক্ষে। কয়েকশ বছরের পুরনো এই স্থাপনা। ডরিক কলামের উপর দাঁড়িয়ে সামনের অংশটি। যেটার শীর্ষে বিরাট এক সোনালী গম্বুজ। প্যারিসের দ্বিতীয় বৃহত্তম গম্বুজ এটা যার পুরোটাই চমৎকার আলোকসজ্জায় সজ্জিত। মূলত এটা ছিল

রাজপরিবারের উপাসনালয়, *Louis XII*/ এটা তৈরি করে, উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের মহিমাকে প্রকাশ করা। পরে নেপোলিয়নের সময়ে এটাকে যোদ্ধাদের কবরস্থানে রূপান্তর করা হয়। ফরাসি মিলিটারি ইতিহাসের তিন মহান ব্যক্তি-*Tirene, Vanbon, Foch*-এখানে শায়িত। ১৮৬১ সালে নেপোলিয়নকেও এখানে কবর দেওয়া হয়, বিরাট গম্বুজটার নিচে। আর পরে তার দুই ভাই এবং ছেলেকেও রাখা হয় এখানে।

ক্রিসমাসের আগেও এখানে লোকের ভিড়। ভেতরটাও মানুষে গিজগিজ করছে। যদিও এটা আর উপাসনার জায়গা নেই, তবু বড় একটা প্ল্যাকার্ডে অনুরোধ করা সবাই যেন মাথার হ্যাট খুলে ফেলে আর গলার স্বর নিচু রাখে।

গত রাতটা সে রিটজে কাটিয়েছে, প্রভান্তসেন নিজেই ঠিক করে দিয়েছিল ওটা। ঘুমটা ভালো হয়নি, মাথার ভেতর অদ্ভুত সব চিন্তা ভর করে ছিল। একদিকে স্যামকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে তার, কিন্তু স্টেফানির উপর আঙ্গু রাখা যায়, পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে আছে। আরেকদিকে প্রভান্তসেনের প্রতিশোধ, আর এর জন্য মূল্যটা অনেক বেশি দেওয়া লাগতে পারে। এটা সে পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বলতে পারে। এখনো জানে না যে কিভাবে প্রভান্তসেনকে নিয়ন্ত্রণ করবে, তবে যেক্ষেত্রে ভাবেই হোক, তাকে এটা পারতেই হবে।

আর সেটা খুব দ্রুতই।

কোমর সমান উচু মার্বেলের রেলিং ধরে এগিয়ে উপরের প্রমুজের দিকে তাকাল ম্যালন। *Evangelists*, ফ্রান্সের একাধিক রাজা, এবং *Apostles*-এর ছবি আঁকা বড় করে, সবাই তাকিয়ে আছে যেন নিচের দিকে। গম্বুজের নিচে, স্তম্ভের পাশেই একটা পাথরের কফিন। ম্যালন ভালো করে দেখে নিল। ওটা। নেপোলিয়ন শুয়ে আছে ভেতরে।

আরও কিছুটা এগিয়ে চারপাশে ভালো করে দেখতে লাগল সে।

আর তখনই।

মানুষের ভিড়ের মাঝেই গ্রাহাম অ্যাশবিকে দেখতে পেল।

স্টেফানি যেমন বর্ণনা দিয়েছিল এই বিটিশ লোকটার, ঠিকঠিক মিলে গেছে তার সাথে। একটু দূরেই, পেঁচান সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

প্রভান্তসেন তাকে আগেই জানিয়েছে তার লোকজন অ্যাশবিকে অনুসরণ করে আসছে সেই লৰন থেকে প্যারিস পর্যন্ত, তারপর এই স্থান অবধি। তার পাশেই আকর্ষণীয় চেহারার এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ চুলগুলো ছেড়ে দিয়ে। এই মেয়েটাকে দেখে তার আরেক স্বর্ণকেশীর কথা মনে পড়ে গেল, যে গত দুই সপ্তাহ তার চিন্তা-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এমনই এক ভুল ছিল এটা, যার খেসারত হিসেবে জীবনটাই খোয়াতে বসেছিল সে।

রেলিং কোমরটা ছেড়ে উপরে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, পিঠটা একটু বাঁকা হয়ে আছে। একমনে দেখছে উপরে, যেটা দেখে অ্যাশবির আগ্রহও বাঢ়ে মনে হলো। এই

মেয়েটাই সেই ক্যারলাইন ডড। থ্রিভাল্ডসেন এর সম্পর্কে জানিয়েছে তাকে। অ্যাশবির মিস্টেস, তবে তার আরও পরিচয় হলো, সে মধ্যযুগীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের উপর ডিগ্রিধারী এক মেয়ে। তার এখানে উপস্থিতির অর্থ হতে পারে যে অ্যাশবি হয়ত ভাবছে মূল্যবান কিছু পাওয়া যাবে এখানে।

চারপাশের হটগোল আরও বেড়ে গেল। ঘুরতেই ম্যালন দেখল, আরও মানুষের ঢল প্রধান দরজা দিয়ে ঢুকছে এবং প্রত্যেকেই টিকেট কেটে নিচ্ছে।

চারপাশের মনোমুক্তকর মার্বেল পাথরের স্থাপনা, করিত্তিয়াস কলামের দাঁড়িয়ে থাকা অসাধারণ এক গমুজ, সুবিশাল ক্যানভাসের ছবি-সবকিছুই দর্শনার্থীদের মনে করিয়ে দিচ্ছে এটা একসময় রাজাদের উপাসনার স্থান ছিল, কিন্তু এখন এক সম্মাটের বাড়ি।

“নেপোলিয়ন মারা যান ১৮২১ সালে, সেন্ট হেলেনায়,” জার্মান ভাষায় বর্ণনাটা শুনতে পেল ম্যালন, একজন গাইড ব্যাখ্যা করছে একদল মানুষকে। “ব্রিটিশরা এখানেই তাকে কবর দেয়, কোনোরকম আনুষ্ঠানিকতা ছিল না তেমন। কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে তিনি লিখেছিলেন যে তাঁর ছাইভস্ম যেন সেইনে নদীর তীরে কবর দেওয়া হয়-প্রিয় ফ্রাপ্সের জনগণের মাঝে যাদেরকে আমি অনেক ভালবেসেছি ১৮৪০ সালে রাজা লুইস ফিলিপ সম্মাটের এমন ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে তাকে এখানে ফিরিয়ে আনতে মনস্তির করেন। এটা ছিল একই সাথে জনগণের সন্তুষ্টি অর্জন ও ইতিহাসের সাথে ফ্রাপ্সের পুনর্মিলন ঘটানোর এক মাহেন্দ্রক্ষপ্ত দিনে নেপোলিয়নও এক কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছেন। তাই ১৮৪০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর রাজা লুইস এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেপোলিয়নের দেহান্তরে বরণ করে নেন, এবং এই ইনভ্যালিয়েন্সে পুনরায় সমাহিত করেন। কুড়ি বছু লেগে যায় আপনারা এখন এই চার্চকে যেমন দেখছেন এই রূপ দিতে।”

জার্মান দলটা একটু এগিয়ে নিচে রাখা নেপোলিয়নের কফিনকে দেখতে শুরু করলো। এক পাশে সরে গেল ম্যালন; মানুষের আরও দল যোগ দিয়েছে চারদিকে। ম্যালন লক্ষ্য করলো অ্যাশবির সাথেও একজন যোগ দিয়েছে। উচ্চতা মাঝারি। ভাবলেশহীন মুখ। ধূসর পাতলা চুল। একটা ওভারকোট গায়ে জড়নো যেটা তার ছিপছিপে গড়নের কথা বলে দিচ্ছে।

গিন্ডহল।

এই লোকের কথা ও থ্রিভাল্ডসেন বলেছে তাকে।

রেলিং ছেড়ে ঘুরে গেল তিনজন।

বুদ্ধি খাটোও।

এটাই স্যামকে বলেছিল সে। এজেন্টদের এটাই করতে হয়।

মাথাটা দোলাল একটু।

হ্যাঁ, ওটাই করতে হবে এখন।

চার্চ ছেড়ে বেরিয়ে, একটু ঘুরে এসে একটা পথ ধরল অ্যাশবি। দু'ধারে কামান সাজিয়ে রাখা। এটা ধরে এগুলেই ইনভ্যালিয়েদস। বিরাট এই ভবন দুটো চার্চ, একটা কোর্ট অফ অনার, একটা সামরিক যাদুঘর, বাগান, এবং একটা চমৎকার পথকে বেষ্টন করে আছে। ১৬৭০ সালে Louis XIV এটা তৈরি করে আহত সৈন্যদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য।

ওয়েস্টমিনিস্টারের মতই, ইতিহাস এখানেও মিশে আছে। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাইয়ের কথা কল্পনা করলো অ্যাশবি। ফরাসি বিপ্লবের সময় যে অন্ত ব্যবহার হয়েছিল, তা এখান থেকেই নেওয়া। একদল মানুষ সেদিন আক্রমণ চালিয়ে অসংখ্য রাইফেল হাতিয়ে নেয় এখান থেকে। সাত হাজার অভিজ্ঞ মিলিটারি এখানে বাস করেছে এক সময়। আর এখন সেটা পর্যটিকদের আখড়া।

“জাদুঘরের ভেতরে ঢোকার কোনো পথ জানা আছে তোমার?” জিজ্ঞেস করলো ক্যারলাইন।

গতরাত থেকে এই পর্যন্ত তিনবার কথা হয়েছে এলিজা লাঘকের সাথে। আর তালো খবর হলো, এই বিষয়ে তাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে এলিজা।

“আমার মনে হয় না ঢোকাটা কোনো সমস্যা হবে।”

কোর্ট অফ অনারে চুকল তারা, ভেতরে বিরাট এক গ্যালারী স্থান একশ বাই ষাট মিটার হবে। খোলা জায়গাটাতে নেপোলিয়নের বিরাট এক মূর্তি। অ্যাশবি জানে এখানেই কোথাও de Gaulle দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধন্যবাদ জানিয়ে Churchill-কে চুমু দিয়েছিল।

বাঁ দিকে দেখাল অ্যাশবি। ভবনের আরেক অংশে যাওয়ার প্রবেশপথ ওটা। এত চমৎকার করে বানানো যে শুধু আকর্ষণীয় বললেকে হয়ে যায়।

“খাবার ঘর রাজার বেতনভোগী কর্মচারীরা ওখানে খাবার খেত আগে আর আর্মি জাদুঘরটা ওখান থেকেই শুরু।” এবার ডানে ঘুরে গেল সে; এদিকেও আরেকটা খাবার ঘর। “এখানে এসে শেষ হয়েছে। আর এটাই আমাদের গন্তব্য এখন।”

সংস্কার করার জন্য বানানো উঁচু পাটাতনগুলো ঘিরে আছে বাঁ দিকের স্থাপনাকে। লাঘক এটা আগেই তাকে জানিয়েছে যে মিউজিয়ামের প্রায় অর্ধেকটা জুড়েই সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ চলছে। মূলত যে অংশে ঐতিহাসিক বস্তুগুলো রাখা সেই অংশ এবং সম্পূর্ণ দুটো ফ্লোর আগামী বসন্তের আগ পর্যন্ত বন্ধ আছে।

শুধু ভেতরেই না, বাইরের শোভা বর্ধনের কাজও চলছে, বিশেষ করে মূল প্রবেশপথের নকশায় বড় ধরণের পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

কিন্তু আজ কোনো কিছুই হচ্ছে না। ক্রিসমাস ইভ।

সব শ্রমিকের ছাঁটি।

দীর্ঘ একটা আর্কেড হেঁটে পার হলো ম্যালন। প্রতি দশ ফিট অন্তর একটা বন্ধ দরজা, আর প্রতিটার মুখেই একটা কামান প্রস্তুত ভঙ্গিতে রাখা। দক্ষিণ দিক থেকে এখন সে পূর্ব দিকে এগছে। সৈন্যদের একটা চার্চ পার হলো প্রথমে, তারপর একটা বাঁক নিয়ে অস্থায়ীভাবে বানানো একটা প্রবেশপথের সামনে একটু থামল। এখন দিয়েই আপাতত পূর্ব-পাশের বিস্তৃতে যাওয়া যাচ্ছে। এই মুহূর্তে অ্যাশবি তার ছোট দলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোট অফ অনারের ঠিক বিপরিত পাশে। তার মানে তাদের সামনে এখন মিউজিয়ামের পূর্বাংশের বন্ধ করে রাখা অংশ। যে অংশে ১৭শ এবং ১৮শ শতকের ঐতিহাসিক জিনিস মজুদ করা, যেগুলোর মাঝে রাজা চতুর্দশ লুইস থেকে শুরু করে নেপোলিয়নের সংগ্রহ করা অনেক হস্তশিল্প রয়েছে।

খুব ভালো করে সামনের অস্থায়ী প্রবেশপথটা দেখে নেল ম্যালন। এটা সরাসরি চারতলায় গিয়ে শেষ হয়েছে, যেখানে মিউজিয়ামের একটা ম্যাপ খুলে রাখা আছে সবার জন্য, আর তার পাশেই আছে একটা বইয়ের সোকান।

কাঠের সিঁড়িটায় পা রাখল ম্যালন, তারপর উঠতে শুরু করলো উপরে।

তিনতলায় চোখ দিতেই দেখতে পেল, দুটো এলিভেটরের সামনে ক্রস চিহ্ন দেওয়া দুটো তঙ্গ। আরও কিছু কার্টুশের পাটাতন চোখে পড়ল চারপাশে। সাদা রঙের কিছু ধাতব দরজা লাগানো হয়েছে, সব অস্থায়ী আর বন্ধ এখন। উপরে লেখাঃ

প্রবেশ নিষেধ

পাশের দেওয়ালে আরও একটা ল্যাবেল লাগানো, যেটায় লেখা *SALLES NAPOLEON IER. ROOMS OF NAPOLEON 1ST.* প্রথম নেপোলিয়নের ঘর।

দেরী না করে দরজাটার সামনে গিয়ে হাতলে মোচড় দিল।

খুলে গেল দরজাটা।

আটকানোর প্রয়োজন নেই এখন। তাকে বলা হয়েছে যে যেহেতু প্রতি রাতেই বিস্তৃত সীল করে আটকে দেওয়া হয়, তাই গ্যালারীতে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

ভেতরে পা বাড়ল ম্যালন। মৃদু আলো, চুপচাপ এক পরিবেশ পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। মনে-মনে প্রার্থনা করলো যেন আগামী কয়েকটা মিনিটের জন্য বাকি জীবনটা অনুশোচনায় কাটাতে না হয়।

সাইত্রিশ

নিজের বিছানায় শুয়ে আছে নেপোলিয়ন, তাকিয়ে আছে ফায়ারপ্লেসের দিকে। আগুনের উজ্জ্বল শিখা লাল আভা ফেলেছে তার মুখের উপর। আর সেই আলো, উষ্ণতা এবং নীরবতায় ঘূমিয়ে পড়তে চাইছে সে।

“হে দ্রষ্টা, তুমি কি আসবে আমার কাছে?” খুব কোমল কষ্টে জিজ্ঞেস করলো সে।

আনন্দের এক অভিব্যক্তি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে, যেটা তৎক্ষণাত রূপ নিল ক্রোধের বহিপ্রকাশে। “না,” চিৎকার দিল সে, “আমি জানি আসবে না, তুমি মিথ্যুক। আমার ভাগ্যে পরিবর্তন নেই। আমি না আছি শরতে, না আছি শীতে, কী অবস্থা আমার? তুমি বলছ আমার পরিবার-পরিজন আমায় ছেড়ে যাবে? বেঙ্গানি করবে? এটা হতে পারে না। ওদের প্রতি আমার সীমাহীন দয়া, ভালবাসা দেখিয়েছি—” একটু থামল সে। তার মুখের অভিব্যক্তি এখন একজন মনযোগী শ্রোতার মতো। “তাই? কিন্তু সেটা অতিরিক্ত। মোটেই সম্ভব না। সারা ইউরোপ আমাকে কখনোই ছুঁড়ে ফেলতে পারবে না। আমার নিয়তির চেয়েও আমার নাম শক্তিশালী।”

নিজের উচ্চস্বরে নিজেই জেগে উঠল নেপোলিয়ন। চোখ মেলে ঘুমের চারদিকে দেখল একবার। কাঁপা-কাঁপা হাতটা কপালে রাখতেই ভিজে গেল ঘুম।

“কি ভয়কর স্বপ্ন এটা,” নিজেকে বলল সে।

সেইন্ট দেনিস কাছে এগিয়ে এল। বিশ্বস্ত এই ঝনুষটা সর্বদাই তার পাশে। এমনকি রাতে ঘুমায়ও তার খাটের পাশের মেরেতে। কখন কী শুনতে হয় সেজন্য সজাগ থাকে সে।

“আমি এখানে, জাঁহাপনা।”

নিজের হাতে দেনিসের একটা হাতকে পেল নেপোলিয়ন।

“অনেক দিন আগে, যখন মিশরে ছিলাম, এক জাদুকর আমার সাথে কথা বলেছিল পিরামিডের ভেতরে,” বলল নেপোলিয়ন। “সে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে আমি ধৰ্মস হয়ে যাব, আমার সাম্রাজ্যের পতন হবে, আমাকে সে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল যে আমার আত্মীয়রা এবং নেমকহারাম জেনারেলরাই আমার শক্তা করবে।”

কষ্টে কষ্টটা ধরে আসছে তার, কিন্তু তাকে কথা বলতেই হবে।

“সে আমায় বলেছিল যে আমার দুটো স্ত্রী হবে। প্রথমজন হবে রানী, কিন্তু আরেক নারী তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে। দ্বিতীয় স্ত্রী আমাকে একটা পুত্র সন্তান দেবে, কিন্তু আমার যত অবনতি শুরু হবে তার সাথেই। ধন সম্পদ, ক্ষমতা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। আমার সকল আশা-ভরসা শেষ হয়ে যাবে। ভিন্দেশী এক অঞ্চলে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যেটা পাহাড় আর সাগরে ঘেরা।”

ওপরের দিকে দৃষ্টি দিল নেপোলিয়ন, তার চোখে-মুখে রাজ্যের ভয়।

“আমি সেই গণককে আমার লোক দিয়ে শুলি করে মেরেছিলাম,” বলল সে। “আমি ভেবেছিলাম সে একটা নির্বোধ ছাড়া কিছুই না, আর আমি কখনোই নির্বোধের কথা কানে তুলি না।”

নেপোলিয়ন সম্পর্কে এলিজার পরিবার যা জানত, তার একটা অংশের বর্ণনা এলিজার মুখে শুনল থ্রিভাল্ডসেন।

“সেন্ট হেলেনায় যা-যা ঘটেছিল, তার সবকিছু নিয়েই গবেষণা করেছে পোজো ডি বোরগো,” বললে এলিজা। “এইমাত্র যে ঘটনাটা বর্ণনা করলাম সেটা নেপোলিয়নের মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগের।”

খুব মনোযোগের ভাব করে শুনছে হেনরিক।

“খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল নেপোলিয়ন,” বলে গেল সে। “ভাগ্যে বিশ্বাস ছিল তার গভীর, কিন্তু ভাগ্যেরও একটা সীমা যে থাকতে পারে সেটা মানত না সে। সে যা শুনতে পছন্দ করত, শুধু সেটাই শুনতে চাইত।”

Le Grand Véfour এর গোপন একটা কক্ষে বসে আছে তারা। এখান থেকে *Palais Royal Garden* পরিষ্কার দেখা যায়। খাবারের মেনুতে চোখ রাখেছেই বোঝা যায় রেস্টুরেন্টটা কত গর্বের সাথে ঘোষণা করছে যে এটা ১৭৮৪ সালে তৈরি। এমন জায়গা থ্রিভাল্ডসেন যে পছন্দ করে তা না, কিন্তু এলিজা ছাট করে ডিনারের দাওয়াত দেওয়ায় আসতে হলো, আর এই জায়গাটাও এলিজা ঠিক করেছে।

“বাস্তবতা খুব পরিষ্কার,” বলল মেয়েটা। “সেই মিস্ট্রীয় গণক যা-যা বলেছিল তা-তা কিন্তু ঘটে গিয়েছিল। জোসেফিন স্মাজী হলো, আর নেপোলিয়ন তাকে ডিভোর্সও দিল কারণ সে সন্তান জন্ম দিতে পারেনি।”

“আমার তো মনে হয় ডিভোর্সের কারণ ছিল জোসেফিন অবিশ্বস্ত ছিল।”

“তা ছিল, কিন্তু নেপোলিয়ন নিজে কি ধোয়া তুলসি পাতা? আঠার বছর বয়সী অষ্টিয়ার রাজকুমারী *Marie Louise*-কে মনে ধরে তার, তাই তাকে বিয়ে করে। ম্যারি তাকে তার কান্তিক্ষত পুত্রস্তান উপহার দেয়।”

“তখনকার রাজা রাজা এমনই ছিল,” যোগ করলো হেনরিক।

“স্বেফ একজন রাজার সাথে তুলনা করলেন? নেপোলিয়ন শুনলে অপমানিতবোধ করত।।”

হেসে ফেলল হেনরিক। “তাহলে তো বলব, সে আস্ত হাঁদারাম ছিল। তাকে স্বেফ একটা রাজা ছাড়া কিছুই বলব না আমি।”

“ঠিক যেমনটা ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, তেমনটাই হলো। শুরুটা হয় তার দ্বিতীয় বিয়ের পর, ১৮০৯ সালে। নেপোলিয়নের ভাগ্যটা বদলে যায় রাতারাতি ১৮১২ সালে রাশিয়া জয়ে ব্যর্থ হয়, তার সেনাবাহিনী প্রায় ধ্বংস হয়ে যায় সে সময়ে। ১৮১৩ সালে ইংল্যান্ড, প্রশিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া এক জোট হয়ে তার বিরুদ্ধে মাঠে নামে। স্পেন, জার্মান ও হল্যান্ডেও তার পরাজয় হয়। ১৮১৪ সালে ভেঙ্গে পড়ে

প্যারিস, আর তাকেও বন্দী করা হয়। প্রথমে তাকে এলবায় পাঠানো হয়, কিন্তু সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়, এবং রাজা অষ্টাদশ লুইসের কাছ থেকে প্যারিসকে আবারও নিজের দখলে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ১৮ই জুন, ১৮১৫ সালে ওয়াটারলু যুদ্ধে আবারও পতন, এটাই চূড়ান্ত পতন ছিল, কারণ এর পর তাকে সেন্ট হেলেনায় পাঠানো হলে ওখানেই সে মারা যায়।”

“মন থেকেই এই লোকটাকে আপনি ঘৃণা করেন, তাই না?”

“আমাকে যেটা পীড়া দেয় সেটা হলো, আমরা কখনোই এই মানুষটা সম্পর্কে ভালো করে জানতে পারব না। দেখেন, সেন্ট হেলেনায় যখন তাকে পাঠানো হলো তখন সেই পাঁচ বছরে সে কি করেছে জানেন? বসে-বসে জনগণের কাছে নিজের মহিমা তুলে ধরতে চেয়েছে আবারও। একটা আত্মজীবনীও লিখেছে, কিন্তু তাতে সত্যের চেয়ে কল্পনা বেশী, ইতিহাসকে নিজের মতো করে সাজিয়েছে সে। কিন্তু বাস্তবে সে একজন স্বামী ছিল, যে তার স্ত্রী, যানে প্রথমজনকে অনেক ভালবাসত। কিন্তু সন্তান জন্ম দিতে না পারায় তাকে ডিভোর্স দেয়। এর বাইরে সে ছিল একজন জেনারেল, যার অন্তরে তার সেনাদের জন্য অগাধ ভালবাসা ছিল। সাহস ছিল তার, তবে প্রয়োজনে তার লোকদের সে ফেলেও গেছে কখনো। ফ্রাঙ্ককে আজীবন শক্তিশালী করে ফেলে চেয়েছে মনে-প্রাণে, কিন্তু একই সাথে এই ফ্রাঙ্ককে সারাটা সময় যুদ্ধের মাঝে রেখেছে। হয়ত ঠিক এই কারণেই আমি তাকে এত ঘৃণা করি।”

এই সুযোগে একটু খেপিয়ে তোলা যেতে পারে তাকে, ভাস্কেল হেনরিক। “জানেন, নেপোলিয়ন আর জোসেফিন কিন্তু এখানে বসেই থাবার যেয়েছিল? শুনলাম যে ১৯ শতকের শুরুতে এটা যেমন ছিল তেমনই রাখা হয়েছে।

তবে সে হাসল এটা শুনে। “আমি এটা আগ্রহে জানি। কিন্তু মজার কথা হলো, আপনি এই তথ্য জানেন।”

“সেটাই। আচ্ছা, নেপোলিয়ন কি মিসরের সেই গনকঠাকুরকে মেরেছিল?”

“আসলে সে তার এক স্যাভান্টকে আদেশ দিয়েছিল কাজটা করার জন্য

“আপনি কি এখনো এটা বিশ্বাস করেন যে নেপোলিয়নকে বিষ প্রয়োগে মারা হয়েছে?” হেনরিক শুনেছে যে তার খাবার ও জলে অল্প মাত্রায় আর্সেনিক মিশিয়ে দেওয়া হত, যে পরিমাণ শরীরে গেলে একজনের মৃত্যু হতে পারে। আধুনিক গবেষণা বলছে যে তার চুলে উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে।

আবারও একটু হাসল এলিজা। “ব্রিটিশরা কেন তাকে মারতে চাইবে? বলুন? সত্যি বলতে, বিষয়টা ছিল উল্টো। তারা চাইত যে নেপোলিয়ন বেঁচে থাকুক।”

তাদের খাবার পরিবেশনকারী হাজির। হেনরিকের জন্য সাগরের ছোট মালিট মাছ, টমেটো দিয়ে রান্না করা। আর এলিজার জন্য কচি মুরগি, ওয়াইন সসে ডোবান, আর উপরে পনির ছিটিয়ে দেওয়া। পানীয় হিসেবে মারলো, উভয়ের জন্যই।

মাথাটা দোলাল হেনরিক।

“ব্রিটিশরা কেন তাকে কখনোই মারতে চাইবে না, সেটার ব্যাখ্যা বেশ স্পষ্ট।”

একেবারে ফাঁকা গ্যালারী দিয়ে হাঁটছে ম্যালন। কোনো আলো জ্বলছে না। সূর্যের আলো জানালা দিয়ে যেটুকু আসতে পারত সেটাও বন্ধ, কারণ জানালাগুলো প্লাস্টিকের আবরণ দিয়ে ঢাকা। ভেতরের বাতাসটা গরম আর দেওয়ালের নতুন রঙের গন্ধে ভরা। প্রদর্শনীর জন্য রাখা অনেকগুলো কেস কাপড়ে ঢাকা। দেওয়ালের বিভিন্ন জায়গায় মই হেলান দিয়ে রাখা। আরও কিছু মাচাও দেখা গেল। মেঝে থেকে কাঠের পুরনো আস্তরণ তুলে ফেলা হচ্ছে, সেখানে পাথরের টাইলস জায়গা করে নেবে।

কোনো ক্যামেরা নেই কোথাও, না আছে কোনো সেপ্সর। পোশাক, বর্ম, তরবারি, ছোরা, পিস্তল আর রাইফেলের স্তুপ পার হয়ে গেল সে। আদিকালের অন্ত থেকে আধুনিক অন্ত এমনভাবে সাজান যেন দেখেই বোৰা যায় কোনো প্রজন্ম কেমন ক্ষিপ্র ছিল সামনের শক্রকে ঘায়েল করতে। তবে এর কোনোটাই যুদ্ধের ভয়াবহতাকে প্রকাশ করছে না। তার বদলে, যুদ্ধের মহিমাকেই গুরুত্বপূর্ণ দেখানো হয়েছে।

আরও একটা মেরামতের জায়গা পার হয়ে সোজা হাঁটতে শুরু করলো দীর্ঘ গ্যালারী ধরে, পায়ের জুতোয় রাবারের সোল হওয়ায় শব্দ হচ্ছে না কোনো।

পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে, পেছনে ধাতব দরজাগুলো কেউ নেড়েচেড়ে দেখাচ্ছে।

অ্যাশবি দাঁড়িয়ে আছে তৃতীয় তলায়, দেখছে যে শিল্পস্থল দরজাটা খোলার চেষ্টা করছে। খুলে গেলেই নেপোলিয়নের গ্যালারীতে যাওয়া যাবে।

কিছু একটায় আটকে আছে দরজাটা, ধাক্কা দিলেও খুলে যাবে না।

“আমি তো জানি দরজাগুলো খোলা,” ফিস্টমিঙ্কি করে বলল ক্যারলাইন।

লাঘকও বলেছিল যে দরজাগুলো খোলাই থাকবে কারণ মূল্যবান সবকিছুই বলতে গেলে কয়েক সপ্তাহ আগেই বের করে নেওয়া হয়েছে। যা কিছু আছে ভেতরে তার মূল্য খুব সামান্য, আর বাইরের গুদামঘরও ভরে গেছে, তাই ওগুলো ওভাবে রেখেই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। যে কন্ট্রাটর মিউজিয়াম নতুন করার এই কাজ করছে তাকে ল্যায়াবিলিটি ইনসুরেন্স কিনতে হয়েছে শুধুমাত্র সব মালামালের নিরাপত্তার জন্য।

কিন্তু আসল কথা হলো দরজাটা কিছুতে বেধে যাচ্ছে

নিচে দাঁড়ান মহিলাটার মনোযোগ আকর্ষণের কোনো ইচ্ছাই তার নেই, বা উপর তলায় রিলিফ ম্যাপ মিউজিয়ামে যারা কর্মরত আছে তাদেরও। “ধাক্কা দাও,” বিকল্প কিছু নেই অ্যাশবির হাতে। “কিন্তু শব্দ যেন না হয়।”

ফ্রান্সের ছোট যুদ্ধজাহাজ *La Belle Poule* সেন্ট হেলেনায় নোঙ্গর ফেলে ১৮৪০ সালের অক্টোবরে। রাজা লুইস ফিলিপের তৃতীয় পুত্র প্রিস দে জইনভিলের নেতৃত্বে এক নৌবহর পৌছেছে এখানে। তাদের সম্মানে ব্রিটিশ গভর্নর রয়াল নেভির এক চৌকস দল পাঠিয়েছে তাদেরকে সম্মানে গ্রহণ করতে। পরপর একুশবার তোপধ্বনির মাধ্যমে তাদেরকে সম্মান জানানো হয়। অক্টোবরের ১৫ তারিখ, এই দিন থেকে পঁচিশ বছর আগে নেপোলিয়ন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে প্রথম পা রাখে, আর এত বছর পর এই দিনেই এই স্ম্যাটের সমাধি থেকে তার দেহাবশেষ তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলো। ফ্রান্স চায় তাদের নাবিকেরাই এই কাজটা করুক, কিন্তু বিটেন চায় এটা তাদের লোকে করুক। স্থানীয় শ্রমিক ও ব্রিটিশরা সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করেছে। উনিশটি বছর পার হয়ে গেছে নেপোলিয়নকে কবরে রাখার পর। এতগুলো বছর শেষে ইট-সিমেন্টে আটকে দেওয়া কবর থেকে সেগুলো দূর করা যোটেই সহজ কাজ না। একটার পর একটা পাথর আলাদা করে সরানো, এক স্তর ভেঙ্গে আরেক স্তরে যাওয়া, এবং শেষে চারটা ঢাকনা সরিয়ে তারপরেই স্ম্যাটের দেহটা বের করে আনতে প্রাণ বের হবার উপক্রম সবার।

নেপোলিয়নের জীবদ্ধশায় যারা তার সাথেই এই দ্বীপে ছিল, তারা কবর খোঁড়ার কথা শুনে ছুটে এসেছে পুরো প্রক্রিয়াটা নিজ চোখে দেখতে। জেনারেল গৌরগৌড়, জেনারেল বেন্টুস্ট, পেন্ট্রি বানানো বাবুটি পিয়েরন, স্ম্যাটের মোড়া দেখাশোনা দায়িত্বে থাকা আরব্যামবউল্ট, তৃতীয় ভৃত্য নভেরাজ, মারচ্যাস্ট, এবং সেইন্ট দেনিস যে একটা মুহূর্তের জন্যেও স্ম্যাটের চোখের আড়াল হয়নি।

নেপোলিয়নের দেহটা চকচকে স্যাটিন মোড়ান ছিল যার একটা অংশ কফিনের ঢাকনার সাথে উঠে এসেছে। ঘোড়ায় ঢড়ার কালো বুট জোড়া পায়ে দেওয়া ছিল যেগুলোর সেলাই ও জোড়াগুলো এখন আলগা হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে স্ম্যাটের ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া পায়ের পাতা দুটোকে। পায়ের উপরের অংশ এখনো ব্রিচ ট্রাউজারে ঢাকা। মাথার হ্যাটটা বেঁচে থাকতে যেমন পাশে খুলে রাখা হত, এখনেও তেমনই আছে। দুই উরুর মাঝে রূপার একটা পাত্রে তার হৃৎপিণ্ডটা রাখা। হাত দুটো ফ্যাকাশে সাদা হয়ে আছে, ভালো অবস্থাতেই আছে ওগুলো, নখগুলো বেশ বড় দেখা গেল; ঠেঁটের এক জায়গায় একটু কুঁচকে যাওয়ার কারণে তিনটে দাঁত দেখা গেল স্পষ্ট। মুখমণ্ডল খোঁচাখোঁচা দাঁড়িতে ধূসর হয়ে আছে। চোখ দুটো আধ-খোলা অবস্থায়, যেন আলতো করে একটু বুজে আছে। সব মিলিয়ে স্ম্যাটের শরীরটা খুব ভালো অবস্থাতেই পাওয়া গিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন পচে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মাঝে না গিয়ে ঘুমের মাঝেই সময়টা কেটেছে তার।

তার সাথে যে জিনিসগুলো কফিনে রাখা হয়েছিল, তার সবগুলোই পাওয়া গেল সেখানে। মুদ্রা, থালা, চামচ, চাকু, রূপার পানির ফ্লাস্ক, একটা তরবারি, এবং আরও বেশ কিছু জিনিস।

সবাই তাদের মাথার হ্যাট খুলে ফেলল, তখন এক ফরাসি প্রিস্ট এগিয়ে পরিত্র জল ছিটিয়ে দিল আশেপাশে, আর মুখে Psalm 130 থেকে তেলাওয়াত শুরু করলো। “হে প্রভু, আমি গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছি; তাই সাহায্যের জন্য আমি আপনাকে ডাকছি।”

ব্রিটিশ উচ্চর একজন ছিল সেখানে, বলল যে নেপোলিয়নের শরীরটা পরীক্ষা করা জরুরী। কিন্তু জেনারেল গৌরগৌড়, লালচে মুখ ও ধূসর দাঁড়ির হষ্ট-পুষ্ট মানুষটা বাধা দিল এই কাজে। সে বলল, “আপনি বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এগুলো করতে পারবেন না। আমাদের সম্মাট এমনিতেই সীমাহীন অর্মান্দা সহ্য করেছেন।”

সবাই জানে যে লন্ডন ও প্যারিস যৌথভাবে এই দেহ উত্তোলনের কাজটা করছে দুই জাতির মাঝে বিরোধ মিটিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যে। তা সত্ত্বেও, ইংল্যান্ডে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত আরও পরিষ্কার করে দিয়ে বলল, “আমি ঠিক জানি না এই প্রত্যাখ্যানের পেছনে কোনো ভালো উদ্দেশ্য আছে কিনা। কারণ ইংল্যান্ড কুশ্চিনাই এটা বলবে না যে তারা মৃত মানুষকেও জেলে বন্দী করে রাখে, বা রাখতে চায়।”

ব্রিটিশ গভর্নর মিডলমোর এগিয়ে এল। “শরীরটাকে পরীক্ষা করার অধিকার আমাদের আছে।”

“কোন কারণে?” মারচ্যান্ড জিজেস করলো, “কেন্দ্র উদ্দেশ্যে? যখন তাকে কফিনে রাখা হয় আর কফিনটা সীল করে বন্ধ করা হয়ে তখন তো ব্রিটিশরা ছিলই সেখানে। আপনাদের উচ্চর দিয়েই তার ময়না তদন্ত করা হয়, যদিও সম্মাটের বিশেষ নিষেধ ছিল এটা না করতে, তবুও।”

সেই ঘটনার দিনও মারচ্যান্ড এখানে উপস্থিত ছিল, পরিষ্কার মনে আছে কিভাবে ব্রিটিশরা কিভাবে নেপোলিয়নের নিষেধ অমান্য করেছিল। বেশ তিক্ত অভিজ্ঞতা।

আত্মসমর্পণের ভান করে হাত দুটো উপরে তুলে ধরল মিডলমোর। “বেশ, কিন্তু বাইরে থেকেও কি একটু পরীক্ষা করার অনুমতি পাব না? নাকি এতেও আপত্তি? আর তা ছাড়া, সমাধিস্থ করার এত বছর পরও যেহেতু তার দেহটা বেশ ভালো অবস্থায় আছে, তাই একটু পরীক্ষাও দরকার।”

একটু নরম হলো গৌরগৌড়, আর বাকিরা সায় দিল এতে।

তখন উচ্চররা নেপোলিয়নের পা, পেট, হাত, একটা চোখের পাতা ও বুকটা পরীক্ষা করে দেখল।

“তারপর নেপোলিয়নকে কাঠ আর ধাতু নির্মিত একটা কফিনে সীল করে, পাথরের শবাধারে রেখে প্যারিসে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়।” এলিজা বলল।

“তো এই উষ্টরগুলো মূলত চাইছিল কী?” জিজেস করলো প্রভান্ডসেন।

“ব্রিটিশদের একটা ধান্দা আরকি, কিন্তু কাজ হয়নি তাতে। ওরা কৌশলে জানতে চেয়েছিল যে নেপোলিয়নের হারানো সম্পদ কোথায় রাখা আছে।”

“মানে, ওরা ভেবেছিল যে ওগুলো তার কবরের ভেতরে?”

“আসলে ঠিক জানত না ওরা। অড়ুত অনেক জিনিসই তার কফিনে রাখা হয়েছিল। তাই কারো ধারণা যে হয়ত কিছু একটা পাওয়া যেতেও পারে সেখানে। আর এটা বিশ্বাসও করা হয় যে ব্রিটিশরা তার কবর খুঁড়তে সম্ভত হওয়ার পেছনে এটাও একটা কারণ-আরেকবার দেখে নেওয়া যে ভেতরে কী আছে।”

“হ্ম, তো কিছু কি পেয়েছিল তারা?”

ওয়াইনে চুমুক দিল এলিজা। “কিছু না।”

তার কথাগুলো হেনরিকের মনে ধরছে, বুঝতে পারছে এলিজা।

“যেখানে খুঁজতে হবে সেখানে তারা খোঁজেনি, তাই না?” প্রশ্ন হেনরিকের।

সামনের এই ডেনিশ ভদ্রলোককে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। “ধারে কাছেও না।”

“এটাই, মিঃ প্রভান্ডসেন, এমন এক প্রশ্ন, যেটার উত্তর আজকের দিন শেষ হবার আগেই পাওয়া যাবে।”

আটক্রিশ

নেপোলিয়নের দ্রব্যাদিতে ভরা প্রদর্শনীর স্থানে পৌঁছে গেল ম্যালন। সমাটের বিজয় থেকে পরাজয়, উভয় সময়ের অসংখ্য জিনিসপত্রে ঠাসা রয়েছে। এমনকি র্যাটিসবনে যে বুলেটটা আহত করেছিল জেনারেলকে সেই প্রাণ আছে এখানে, দেখল ম্যালন। আরও আছে তার টেলিস্কোপ, পিস্টল, হাতার ছড়ি, পরিধেয় গাউন, এমনকি তার ডেখ মাস্কটিও। একটা ডিসপ্লের পুরো জুড়ে রয়েছে সেন্ট হেলেনার নেপোলিয়নের ঘরটা, যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল সে। ভাঁজ করা খাট, আর একটা চাঁদোয়া-সবই সাজিয়ে রাখা হয়েছে পরিষ্কার করে।

ঘর্ষণের একটা শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো পেছনের হল জুড়ে।

একশ ফিট পেছনে ফেলে আসা ধাতব দরজাগুলোকে অপর প্রান্ত থেকে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে জোরে।

নির্মাণকাজে ব্যবহার হওয়া একটা ভারী প্যালেট দিয়ে দরজার পাল্টাটা আটকে দিয়েছিল ম্যালন, বুঝতে পেরেছিল যে খুব জলদিই আরও মানুষের পা পড়বে এদিকে। অ্যাশবি যখন চার্চ ছেড়ে ইনভ্যালিয়েদসের দিকে রওনা হলো, তখন ম্যালন দেখেছিল তাকে। তারপর কোর্ট অফ অনারের সৌন্দর্যের বন্দনায় যখন ব্যস্ত ছিল সে, সেই সুযোগে দ্রুত ভেতরে ঢুকে যায় ম্যালন। তার ধারণা স্টেফানি তাকে যে পরিমাণ তথ্য দিয়েছে, সেই পরিমাণ অ্যাশবির কাছে নেই। গতরাতেই কথা হয়েছিল তার সাবেক

বসের সাথে, খ্রিস্টানদের কাছ থেকে চলে আসার পর। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় এমন একটা পরিকল্পনা আঁটে, যেটায় স্টেফানির প্রয়োজনও মেটে, আবার খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বও টিকে থাকে।

একটু ভেঙ্গিবাজির ব্যাপার, কিন্তু অনৈতিক হলেও অসম্ভব না।

প্যালেটের ঘর্ষণে মেঝেতে আরও জোরে শব্দ হচ্ছে এখন।

ঘূরে গেল ম্যালন, খুবই মৃদু একটা আলো হলের মাঝে।

সেই আলোতে তিনটা কেস দেখা গেল।

তার একেবারেই সামনের কেসটার গ্লাস আংশিক খোলা, সেখানে রূপার কিছু কাপ-পিরিচ সাজানো। ওয়াটারলুতে এগুলো ব্যবহার করেছিল নেপোলিয়ন। সেন্ট হেলেনার এক বাস্তু চা, আর দুটো বই। একটা ছোট প্ল্যাকার্ড লেখা সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে যে ১৬০০ বই ছিল এই বই দুটোও ছিল সেগুলোর মাঝে। একটার নাম *Memoirs and Correspondence of Joséphine*, যেটা, প্ল্যাকার্ড বলছে নেপোলিয়নের লেখা, ১৮২১ সালে, তার মৃত্যুর অন্ত কিছুকাল আগে। অপর বইটা ছোট, চামড়ায় মোড়ান একটা ভলিউম, মাঝ বরাবর খুলে রাখা। দ্বিতীয় প্ল্যাকার্ড বলছে এটা *The Merovingian Kingdoms 450–751 A.D.*, এটার কথাই নেপোলিয়নের উইলে বিশেষভাবে বলা আছে।

দ্রুত পা ফেলে এগুনোর শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো হল জুড়ে।

▲

পেছনে ছুটে কিছু অর্জন করতে দারুণ লাগে অ্যাশবির।

গল্ল-উপন্যাস বা চলচ্চিত্রে গুপ্তধনের খোঁজে গুগাদের দুর্ঘষ অভিযান সময়ই তাকে মুক্ত করে। কিন্তু বাস্তবে, এটা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়। সময়ের প্রেরণার ভাগই কেটে যায় পুরনো লেখ—হোক সেটা বই, উইল, খবর, ব্যক্তিগত নোট, পেপন ডাইরি অথবা পাবলিক রেকর্ড-ফাঁটতে ও পড়তে। এখানে কিছু তথ্য, তেওঁকিছু আরেক জায়গায়। কখনোই একবারে, এক স্থানে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাতে ধাঁধাটা এক পলকে সমাধান করে দেওয়া যায়। যে সূত্রগুলো খোঁজা হয় তার কিছু বিলুপ্ত বললেই চলে, আর যা পাওয়া যায়, সেগুলোর মর্মোন্দার কম্বল যায় না সাধারণত। সব মিলিয়ে সফলতার থেকে হতাশাই বেশী এই কাজে।

ঠিক এখনকার অভিযানটা একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে।

তবে মনে হচ্ছে, কিছু না কিছু পাবে তারা।

নিশ্চিত করে বলতে হলে আগে *The Merovingian Kingdoms 450–751 A.D.* বইটা দেখতে হবে। আর মাত্র কয়েক মিটার দূরেই অপেক্ষা করছে ওটা।

এলিজা লাঘক তাকে বলেছিল যে মিউজিয়ামে ঢুকে এই কাজটা সারার জন্য আজকের দিনটাই হবে সবচে উপযোগী। কোনো শ্রমিক থাকবে না। স্বভাবতই,

ক্রিসমাসের কারণে বাড়িতে যাওয়ার জন্য সবার মনটাই উড়ু উড়ু করবে। আর পরের দিন মিউজিয়ামও বন্ধ থাকবে।

গিন্ডহল পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সামনে।

কাজ শেষ হলেই প্যারিস ছাড়তে হবে দ্রুত। লভনে তার জন্য অপেক্ষায় থাকবে আমেরিকানরা। তার দেওয়া রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পদেক্ষেপ নেবে তারা। কোথাও দেরী করার কোনো অবকাশ নেই। আর আগামীকালকেই মনে হচ্ছে সবচে দারূণ মুহূর্তটা আসবে।

গিন্ডহল থামতেই অ্যাশবিও দেখতে পেল তার ক্ষুদে সহকারীটি কী দেখে থেমেছে।

গ্লাস কেসের ভেতর যেখানে নেপোলিয়নের দুইটা বই থাকার কথা, সেখানে দ্বিতীয় বইটা নেই। আছে শুধু ছোট একটা কার্ড।

এক মুহূর্তের নীরবতা যেন মনে হলো ঘন্টাব্যাপি।

হতবিহবলতা সরিয়ে কাছে এগিয়ে গেল সে, কার্ডটা হাতে নিল তারপর।

*Lord Ashby, if you're a good boy,
we'll give you the book*

“মানে কী এটার?” জিজ্ঞেস করলো ক্যারলাইন।

“মনে হয়, এটা এলিজা লাঘকের কাজ, আমাকে এভাবেই ঠিক রাস্তায় রাখছে হয়ত।”

মিথ্যাটা বলেও তার ভেতর একটা আশা ঝুঁজে পেল সে।

“এটায় লেখা *We'll*, তার মানে আমরা। আমরা বলতে?”

“ক্লাবকে বুজিয়েছে এলিজা।”

“তোমাকে সব তথ্য সে দিয়ে দিয়েছে। এখানে কিছিবে কী করতে হবেও তাও বলে দিয়েছে।” কথাগুলো যতটা না বক্তব্য তার চেন্টাও বেশী প্রশ্ন।

“এলিজাকে অনেক সতর্কতা মেনে চলতে হয়। হয়ত সে চায় না যে সবকিছু আমাদের হাতে চলে আসুক। হয়ত এখনই স্টেট চায় না।”

“তাকে আগ বাড়িয়ে ফোন করা হিচাব্যনি তোমার।”

পরের প্রশ্নটা কী হতে পারে স্টেট বুঝতে পারল অ্যাশবি, কিন্তু স্টেট করার আগেই বলল, “ইংল্যান্ডে ফিরছি আমরা।”

তারা দ্রুত গ্যালারী থেকে বের হয়ে গেল। মাথার ভেতর কয়েকটা বিষয় ঘুরছে শুধু। ক্যারলাইন কিছুই জানে না যে অ্যাশবি ওয়াশিংটনের হয়ে কাজ করছে একরকম। যে কারণে বইটা নিয়ে এলিজা ও প্যারিস ক্লাবকে দোষ দিয়েছে সে।

কিন্তু আসল সত্যটা তাকে আরও ভয় দিচ্ছে।

আমেরিকানরা তার কাজ-কর্ম সব জেনে গেছে ।

▲

দূরের আড়াল থেকে ম্যালন দেখল, অ্যাশবি তার দল নিয়ে ভেগেছে । তার ইতস্তত ভাব দেখে হাসি পেয়েছিল ম্যালনের যখন ক্যারলাইনকে আবোল-তাবোল বুঝিয়ে দিয়েছে সে । তারপর ম্যালনও আর দেরী না করে পেছনের সিঁড়ি ধরে নেমে উত্তরের গেট দিয়ে বেরিয়ে ট্যাঙ্কি করে সেইনে নদী পেরিয়ে *Le Grand Véfour* এ এসে থেমেছে ।

সম্পূর্ণ ক্ষেপণ আদলে গড়া রেস্টুরেন্টের ভেতরটা দারুণভাবে শজিত । দেওয়ালে চমৎকার সব কারুকার্য করা । ম্যালন দ্রুত খুঁজতে থাকতে থাকল থ্রভাল্ডসেনকে । জল্লবীর চোখ দুটো পেয়েও গেল তাকে । এক সুদর্শন নারীর সাথে বসে আছে তার বন্ধুটি ।

এগিয়ে গেল ম্যালন, তারপর বহুটা দেখিয়ে হাসল সে, এমন ভাব যেন এটা স্ক্রফ একটা হাতের মোয়া ।

▲

এবার থ্রভাল্ডসেন স্বত্তি পাচ্ছে । শক্তির খেলায় এখন তার হাতেই কলকাঠি চলে এসেছে । আর এটা অ্যাশবি বা এলিজা কেউ বুঝতেও পারেনি ।

অন্তত এখন পর্যন্ত না ।

তাই এক পায়ের অপর আরেক পা তুলে চেয়ারে আস্তি করে হেলান দিয়ে বসল হেনরিক । তারপর তার সেবিকার দিকে মনোযোগ ক্ষিপ্ত আনল আবারও । ভেতরের আত্মবিশ্বাস যেন জানান দিচ্ছে-খুব দ্রুতই সব লেন্সদেশ চুকে যাবে ।

খুব দ্রুতই ।

তৃতীয় খণ্ড

উনচল্লিশ
বেলা ১২:১৫

ফি পরিশোধ করে আইফেল টাওয়ারের সীমানায় প্রবেশ করলো মিগ্যান মরিসন এবং স্টেফানি নেলেই, তাদের পেছনে স্যাম। এলিভেটরে চড়ে টাওয়ারের প্রথম ও দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মে উঠার অগ্রহীদের সারিটা বিশাল লম্বা দেখা যাচ্ছে। কমপক্ষে দুই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেই পরে সুযোগ আসবে উঠার। কিন্তু দক্ষিণ দিক থেকে টাওয়ারে ওঠার সারিটা বেশ ছোট, কারণ এদিক দিয়ে প্রথম প্ল্যাটফর্মে ওঠার একমাত্র পথ হলো ৩৪৭ ধাপের একটা সিঁড়ি।

“এই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আমাদের নেই,” স্টেফানি নেলেই বলল।

আগের রাতটা স্যাম লেফট ব্যাংক হোটেলে কাটিয়েছে, এক রুমে সে, আরেক রুমে মিগ্যান। দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট তাদের দরজা পাহারা দিয়েছে সারা রাত। মিগ্যান যেসব তথ্য দিয়েছে সেগুলো মন দিয়ে শুনেছে স্টেফানি। তারপর কয়েক জায়গায় ফোন দিয়েছে সে। মিগ্যানের কিছু বক্তব্যের সত্যতা ফুলে পেল স্টেফানি, তখন সে সিদ্ধান্ত নিল যে এই দু'জনকে নিরাপদ কোনো স্থানে ত্যাগতে রাখতে হবে।

“ফিল্ড এজেন্টদের কি সব সময় এই পোশাক পুঁজি খাকতে হয়?” সিঁড়ি ধরে উঠতে-উঠতে স্যাম জিজ্ঞেস করলো স্টেফানিকে।

“কিছু জেমস বন্ডের মতো টাক্সিডো বা ডিজাইনার ডিগস,” বলল সে। “নিজের মতো করে বানিয়ে নাও, তারপর কাজ কর। তবে এসব না হলও চলে।”

১৩৪ নম্বর রাইজার পার হয়ে গেল তারা। প্রথম প্ল্যাটফর্মটা ১৮৯ ফিট উঁচুতে, তারপর সেখান থেকে মূল খুঁটিগুলো গিয়ে থেমেছে দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মে, ৩৭৯ ফিট। সব শেষে ওগুলো আবারও উঠে গেছে একেবারে শীর্ষে, অবজারভেশন ডেকে-৯০৫ ফিট উঁচুতে। প্যারিসের এটাই সবচে উচু স্থাপনা। বাদামী ধূসর রঙ করা লোহার এই বিরাট শৈল্পিক নির্দর্শনটা পৃথিবীর সুবিখ্যাত স্থাপনাগুলোর মাঝে অন্যতম।

মিগ্যান খুব সহজেই উঠে যাচ্ছে, কিন্তু স্যামের পায়ের মাংসপেশিতে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। গেল সন্ধ্যায়, তাদেরকে হোটেলে নেওয়ার পরে মিগ্যান কিছু বলতে পারেনি স্যামকে। তবে মিউজিয়াম থেকে চলে না গিয়ে মেয়েটার সাথে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে, ভাবল স্যাম। কারণ এখন সে ম্যাগেলান বিলের একেবারে প্রধান কর্মকর্তার সাথে কাজ করছে।

আরও দুই মিনিট ধরে ওঠার পর থামল তারা প্রথম প্ল্যাটফর্মে।

দর্শনার্থীতে গিজগিজ করছে প্রথম ফ্লোরটা। সুভেনির শপ, পোস্ট অফিস, প্রদর্শনী হল, স্ন্যাকসের দোকান, আর রেস্টুরেন্ট আছে এখানে। দু'পাশের এলিভেটরগুলো মানুষদের নিয়ে আবার নিচে নেমে যাচ্ছে, আরেকটা উঠছে উপরে, দ্বিতীয় লেভেলে, ৩৩০ ফিট বা ওরকম উঁচুতে হবে ওটা। প্রথম প্লাটফর্ম থেকেই নিচের সবকিছু চমৎকার দেখা যায়।

লোহার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো স্টেফানি। স্যাম ও মিগ্যানও যোগ দিল তার সাথে। সবাই তাকিয়ে আছে কাঁচের দেওয়াল ও দরজার একটা কক্ষের দিকে, যেটার উপরে লেখা *LA SALLE GUSTAVE EIFFEL*.

“প্যারিস ক্লাবের মিটিং হবে ঐ রুমে আগামীকাল,” ফিসফিস করে স্টেফানিকে বলল মিগ্যান।

“তুমি ঠিক কিভাবে জান এটা?”

গতকালকেও এই একই বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে তার সাথে। বোঝাই যাচ্ছে স্টেফানি সেই পুরনো প্রবাদের অনুশীলন করছে। “একই প্রশ্ন বারবার করো, দেখ যে একই উত্তর পাও কিনা।”

“দেখুন, মিস জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট,” বলল মিগ্যান। “আপনার ক্ষমতা যেভাবে আপনি দেখালেন, সেটা হজম করেছি। এমনকি আমি যথেষ্ট পরিমাণে চিটাও করলাম আপনাকে সাহায্য করতে। কিন্তু তারপরও যদি আপনি আমার বিশ্বাস না করেন, তাহলে এখানে আটকে আছি কেন, বলুন?”

এমন কাটা কথার জবাব দিল না স্টেফানি। তার বক্তৃতা যেমন হেলান দিয়ে ছিল, তেমন থেকেই দূরে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

“আমি জানি, তাই জানি। তারা ওখানে বস্তে কাল,” মিগ্যান বলল আবারও। “এটা খুব বড় একটা কাজ তাদের কাছে। ক্লাবের সবাই ক্রিসমাসে এক হচ্ছে।”

“মিটিংের জন্য একটা উড্ডট সময় বেছে নিয়েছে,” যোগ করলো স্যাম।

“এখানে ক্রিসমাস মানেই একরকম অড্ডত ছুটির দিন। অনেক আগেই শিখেছি আমি। ফ্রান্সের মানুষেরা এই দিনে এত হৈ-হল্লোড় করে না। বেশীরভাগই শহর ছেড়ে চলে যায়, বাকি যারা থাকে তারা যায় বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে। তারা বিশেষ এক ধরণের কেক খায়, নামটা হলঃ *bûche de Noël*. দেখতে গাছের গুঁড়ির মতো, আর খেতে? কি বলব, মনে হয় যেন কাঠকে মাখনের ভেতর চুবিয়েছে। এমন কাজ করে যারা, তারা ক্রিসমাসে মিটিং ডাকলে অবাক হই না আমি।”

“খোলা থাকছে আইফেল টাওয়ার?” জিজেস করলো স্যাম।

মাথা নাড়ল মিগ্যান। “দুপুর একটা থেকে।”

“এবার বল, আর কী-কী জানো তুমি?” স্টেফানি বলল নরম স্বরে।

মিগ্যানকে দেখে মনে হলো বিরক্ত, কিন্তু প্রকাশ করলো না সেটা। “লাঘক ঐ গুস্তাভ আইফেল কুম্টা ভাড় করেছে। ওদের আলোচনা শুরু হবে বেলা ১১টা থেকে, চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এমনকি মধ্যাহ্নভোজেরও আয়োজন করেছে সে। আমার

মনে হয় সে ভাবছে মাটি থেকে দুইশ ফিট উপরে বসে মিটিং করলে সে ও তার সহযোগীরা বাড়তি নিরাপত্তা পাবে।”

“আলাদা কোনো সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকছে?” জিজ্ঞেস করলো স্টেফানি।

“এখন আমি সেটা কিভাবে বলব? তবে আপনি চাইলে জেনে নিতে পারেন—আমি নিশ্চিত।”

কথাটা মিগ্যান খোঁচা দিয়ে বললেও সেটা বেশ মজাই লাগল স্টেফানির। “এই টাওয়ারটা প্যারিসের সম্পদ, তবে *Société Nouvelle d'Exploitation de la Tour Eiffel* এই পুরো সাইটটা দেখাশোনার দায়িত্বে আছে। এদের নিজস্ব একটা ফার্ম আছে যেটা নিরাপত্তার বিষয়টা দেখে। ওদের সাথে প্রয়োজনে প্যারিস পুলিস ও ফ্রেঞ্চ মিলিটারিও যোগ দেয়।”

এখানে আসার সময় স্যাম একটা পুলিশ ছেশন দেখেছে টাওয়ারের দক্ষিণ দিকটায়। খুব কঠিন ভাবভঙ্গির কিছু মানুষ যুদ্ধের পোশাক পরে ঘুরঘুর করছে, হাতে অটোমেটিক রাইফেল।

“আমি খোঁজ নিয়েছি,” বলল স্টেফানি। “আগামীকাল ঐ রুমে একদল মানুষ এক হবার কথা। এখন ঐ নির্দিষ্ট সময়টুকুর জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা^{দেওয়া} হবে জানলাম। মিটিঙের জায়গাটা বন্ধ থাকবে। আর পুরো টাওয়ারও বন্ধ থাকবে একটার আগ পর্যন্ত। এরপর আজকের মতো মানুষের ভিড় হবে এখানে^{যেটা} নেহাত কম না।”

“বললাম তো,” আরও পরিষ্কার করে বলল মিগ্যান ^{Marais} এর বাইরে এই প্রথম কোনো জায়গায় ওরা মিটিং করছে। এর আশেপাশে কোথায় করেছে সেটা গতকাল স্যামকে দেখলাম আমি।”

“এখন তোমার কি হয় যে এখানে সভা করার বিশেষ কোনো তাৎপর্য আছে?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

“তা থাকতেই পারে। ক্লাবটাই একটা বিপদ।”

▲

লে গ্রান্ড ভেফর ছেড়ে একটা ট্যাঙ্কি নিল ম্যালন। একটু লুভরে যেতে হচ্ছে তাকে। খুব কাছেই হওয়ায় বেশী সময় বসে থাকতে হলো না। গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে ভাড়া বুবিয়ে দিল, তারপর *Cour Napolion* এর বিরাট খিলানপথটা পার হলো। কাঁচের বিখ্যাত পিরামিডটা সহজেই চোখে পড়ে এখান থেকে। একটা অন্যরকম দুর্বিত ছড়ায় ওটা নিচের পুরোটা প্রবেশপথ জুড়ে। লুভরের তিন পাশে বিরাট জায়গা জুড়ে প্যারেড গ্রাউন্ড। পূবের খোলা প্রান্ত দিয়ে চুকতেই দেখা যায় মার্বেল পাথরের রোমান কলামগুলো দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাহারা দিচ্ছে প্রবেশপথে।

সাতটা ত্রিভুজাকৃতির গ্রানাইট পাথর কাঁচের পিরামিডকে ঘিরে আছে তার একটায় একজন মানুষ বসা, চিকন গড়ন, বাদামী চুলগুলো ঘন, কানের কাছে কিছু চুল

পেকেছে। ঘন কালো উলের কোট গায়ে, আর হাতে হাতমোজা। যদিও দুপুরের রোদে সকালের শীত অনেকটাই উবে গেছে, তবু, ম্যালন অনুমান করলো, আজকের তাপমাত্রা দশ ডিগ্রীরও নিচে, তাই শীতটা একটু বেশী। থ্রিভাল্ডসেন আগেই জানিয়ে দিয়েছে ম্যালনকে যে লোকটা তার জন্য এখানেই অপেক্ষা করবে। তাই তাকে দেখে এগিয়ে গেল ম্যালন, তারপর শীতল পাথরের এক প্রান্তে বসে পড়ল সে।

“তুমি নিশ্চয়ই কটন ম্যালন,” ইংরেজিতে বলল প্রফেসর মুর্যাড।

জিমি ফড়েলের দেখাদেখি সেও বইটা হাতে নিয়েই ঘুরছে প্রকাশ্যে। লোকটার হাতে তুলে দিল বইটা। “সরাসরি ইনভালিয়েদসের জিনিস।”

“হ্ম, তো, চুরিটা করতে ঝামেলা হয়নি?”

“কী আর ঝামেলা, বসে বসে হাই তুলছিলো, আর আমি তো জানতামই যে কঠিন হবে না কাজটা।”

ভগ্নদশায় উপনীত হওয়া পৃষ্ঠাগুলোর মাঝে আঙুল চালাল মুর্যাড। বই নিয়ে যাবার ও আসার পথে দু'বার ক্যাবের ভেতর বসে ঘেঁটে দেখেছে ম্যালন, তাই সে জানে লোকটার পর্যবেক্ষণ কোথায় গিয়ে থামবে। প্রথমবার বিরতিটা এল বইয়ের মাঝে বরাবরে আলো লাগলে। এখানের লেখাগুলো দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। খালি পাতায় কিছু একটা লেখাঃ

CXXXV II CXI. II L. II LXIII XVII
II VIII IV VIII IX II

প্রফেসরের কপালে একটু ভাঁজ পড়ল, যাতে কিছুটা অনিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, খেয়াল করলো ম্যালন। “এমন কিছু তো আশা করিনি আমি।”

মুখের গরম বাতাস হাতে ফেলে হাতদুটো গরম করতে চাইল মার্টিম। শত-শত পর্যটকেরা আসছে আর যাচ্ছে লুভরে।

“একটু ভেঙ্গে বলা যায়?”

“এটা একটা মুরস নট। জানামতে, এই কোডটা নেপোলিয়ন ব্যবহার করেছিল। এই রোমান সংখ্যাগুলো নির্দিষ্ট একটা লেখাকে নির্দেশ করে। শুধু পৃষ্ঠা আর লাইনের নাম্বার বোঝা যাবে, কারণ এখানে সেটা রয়েছে দুটো। এখন নেপোলিয়ন কোন-কোন শব্দকে বোঝাতে চেয়েছে সেটা জানার জন্য তৃতীয় একটা লাইনও থাকতে হবে, কিন্তু এখানে তা নেই, যার মাধ্যমে সঠিক শব্দগুলো পাওয়া যাবে।”

“এখন আমি কিভাবে জানব যে এটা এরকম কঠিন কিছু হবে?”

হাসল মুর্যাড। “শুধু এটা কেন, নেপোলিয়নের কোনো কিছুই কখনো সহজ ছিল না! সে নাটক করতে পছন্দ করত। কত রকমের বাহানা, আর খেয়ালিপনা যে তার ছিল, তা হিসেবের বাইরে। মিউজিয়ামটা দেখ, উৎকৃষ্ট উদাহরণ পেয়ে যাবে। যে

এলাকাই সে দখল করেছে, সেখান থেকেই মালামাল নিয়ে এখানে জড়ো করেছে সে।
তার সময়ে এই যাদুঘর হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর সবচে সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা।”

“কিন্তু দুঃখের কথা হলো, নেপোলিয়ন ক্ষমতা হারানোর পর, জোটের দেশগুলো
সবকিছুই আবার নিয়ে গেছে এখান থেকে, ১৮১৫ সালের পরে।”

“তুমি তোমার ইতিহাস ভালোই জানো, মিঃ ম্যালন।”

“তা জানার চেষ্টা করি আরকি। আর আমায় কটন বলে ডাকবেন, প্রিজ।”

“বড় অস্ত্রুত নাম একটা। কিভাবে পেলে এটা?”

“নেপোলিয়নের মতোই, এর পেছনেও ম্যালা কাহিনী আছে। এখন মুরস নটের
কী করা যায়? কোনো উপায় কি আছে এর সমাধানের?”

“কোন শব্দ দিয়ে সংখ্যাগুলো লেখা হবে সেটা না জানা পর্যন্ত কিছু করার দেখি
না। বিষয়টা কাজ করত এভাবে, যিনি পাঠাচ্ছে ও যার কাছে পাঠানো হচ্ছে দুজনের
কাছেই একই রকমের বই বা লেখা থাকতে হবে। এখন তৃতীয় সেট না থাকলে সমস্যা,
মিলিয়ে দেখা যাবে না।”

নেপোলিয়নের উইল নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছে প্রভাস্কেন ম্যালনের সাথে।
তার কথার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে প্রফেসরের হাতে যে বইটা ~~গ্রন্থ~~ আছে
সেটাই চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা। তাই তার পর্যবেক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলার বা
করার নেই।

কিন্তু চুপচাপ থাকা লাগল না বেশীক্ষণ।

“আরে, এটা,” বইয়ের শেষ ফ্ল্যাপে পোঁছেই বলে উইল প্রফেসর। তারপর মুখ
তুলে তাকাল ম্যালনের দিকে। “অসাধারণ তো!”

পেঁচান হাতের লেখাটা আগেও দেখেছে ফ্লাইট। কালিটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।
দেখতে আগের রোমান সংখ্যাগুলোর মতোই।

¶

ET FACTUM EST ET VENIT
SABBATO SECUNDOPRIMO &
VIREPERECCETEADISGIPULIAUTEMCILITKISCOE
PEKUNTUELEKEESPICASETFRICANTESMANTBVS + MANDU
CABANTQVADAMAUTEMDEFAKISAEISAT
CEBANTEICCCCQVIAFACIUNTATSCIPULIVVISAB
NQDIZ + QUDONHCLICETKCSPONDENSAUTEMINS
30XIT20400SNUMQVAMHOC
LCC111117QV0dFECITADAVUTdQVdNdo
E3UKUTIPSEETQV1CUMFOERAI + INTKO1VITINDOMUM
dFETPANEPROPOSITORNIJ Kedis
MANDUCAVITETDEGATETQVd
CUMERQVANTUXQVQVIBUSNO
N1C48TMANDUCAVESINON 30L113 SACREDOTIBVS

“আপনি কি বুঝতে পারছেন কি এটা?” জিজ্ঞেস করলো সে।

মাথাটা দোলাল মুর্যাড। “আই হ্যাত নো আইডিয়া।”

মিগ্যানের পক্ষ নিয়ে এগিয়ে এল স্যাম। “এতকিছুর পরও তার নতুন করে প্রমাণের কোনো দরকার নেই। আমি বলব সে যে এতদূর এসেছে এটাই যথেষ্ট।”

“বেশ, বেশ,” বলল স্টেফানি। “অবশ্যে মিঃ কলিঙ্গ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টের মতো করেই ভাবতে শুরু করেছে দেখছি।”

তার এমন খোঁচা মারা কথার ভঙ্গিটা ভালো লাগল না স্যামের, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বাধাও দিতে পারছে না সে। খারাপ কিছু বলেনি স্টেফানি। এখন বুদ্ধি খাটিয়েই সব করতে হবে। তাই একটু ভেবে বলল, “আপনি তো তার ওয়েবসাইটটা নজরে রেখেছেন, সাথে আমারটাও। খোদাই জানেন যে আরও কত সাইট আছে আপনার তালিকায়। এখন কথা হলো, এখানে সত্যিই কিছু ঘটতে চলেছে। এমন কিছু যা সবার মনোযোগকে আকর্ষণ করেছে।”

“হ্ম, এটা এখন সহজ বিষয়,” বলল স্টেফানি। “আর সোজা কথা হলো, আমরা এই প্যারিস ক্লাবের মেম্বারদের জেলে ঢোকাতে চাই, ব্যস।”

তার কথা বিশ্বাস হয় না স্যামের। “বিষয়টা যে এত কম্পিউটার-পানি না, আরও কাহিনী আছে, সেটা আপনি ভালো করেই জানেন।”

তার কথার কোনো উত্তর দিল না স্টেফানি নেক্সেন্ট যে কারণে তার বজ্বেটা নিজের কাছেই আরও মজবুত ঠেকল স্যামের। কিন্তু তাই বলে সে এই মহিলাকে দোষও দিতে পারছে না। এখন তাদের যতটুকু জানা দরকার তার বাইরে কিছুই বলার প্রয়োজন নেই।

আরও কিছু মানুষ এগিয়ে আসছে টাওয়ারের দিকে, যেন এটাতে চড়াই এখন একমাত্র লক্ষ্য। আর যারা নেমে গেছে, তারা বেরিয়ে যাচ্ছে আন্তে-ধীরে।

“এখন আপনি যদি আগামীকালের মিটিঙ্গের সব কথা-বার্তা শোনার পরিকল্পনা করে থাকেন তো,” বলল মিগ্যান, “আমি বলব সেটা পারবেন না আপনি। কোনো শোনার যন্ত্র লুকিয়ে রাখবেন? সেটাও হচ্ছে না। কারণ আমার তথ্যদাতা আমায় জানিয়েছে যে ক্লাবের সবাই মিটিং করার আগে, মিটিঙ্গের মাঝে ও শেষে পুরো ঘর ঝেড়ে বুড়ে পরিষ্কার করে ফেলে।”

“ওসবের কোনো দরকার হবে না আমাদের,” পরিষ্কার বলে দিল স্টেফানি।

স্যাম তাকিয়ে পড়ল তার দিকে, আর সেও তখন চোখ ফিরিয়ে নিল একটা হাসি দিয়ে। হাসিটা ঠিক ভালো লাগল না স্যামের।

“তোমরা দু'জন কথনো টেবিলে খাবার পরিবেশন করেছ? মানে ওয়েটারদের মতো?”

চল্লিশ

হেনরিক প্রভাস্তসেনের সাথে লাখটা সারতে দারুণ লাগছে এলিজার। লোকটা বেশ বুদ্ধিমান, বাজে কথায় সময় নষ্ট করে না। আর উপস্থিত বুদ্ধিও অসাধারণ। যা শোনে, খুব মনোযোগ দিয়েই শোনে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো শুনে নেয় স্পষ্টের মতো, সাজিয়ে রাখে সেগুলোকে সঠিক বিন্যাসে, তারপর খুব দ্রুতই একটা সমাপ্তি টেনে দেয়।

ঠিক তার নিজের মতোই।

“নেপোলিয়ন বুঝতে পেরেছিল,” বলল এলিজা, “যে যুদ্ধ সমাজের জন্য খুবই ভালো জিনিস। আর কোনো কিছুই এমনটা হতে পারে না। এই যুদ্ধই বাধ্য করে সে দেশের সবচে সেরা মাথাগুলোকে সেরা জিনিস চিন্তা করতে। সে বুঝেছিল যে বিজ্ঞানিয়া তখনই সবচে বেশী সজাগ ও সৃজনশীল হয় যখন সত্যিকারের কোনো বিপর্যয় বা হৃষকি সামনে আসে। উৎপাদন বেড়ে যায়, কারণ তাতে উচ্চাবনীক্ষমতা যোগ হয়, কাজের গতিও বৃদ্ধি পায়। জনগণ আরও বাধ্য হয়ে কাজ করে। সে এটাও আবিষ্কার করেছিল যে যখন বড় ধরণের কোনো বিপদ জনগণের সামনে এসে পড়ে, তখন সরকার কোনো আইন ভাঙলেও তারা তাতে কোনো প্রতিবাদ করে না। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সেটাকে ইতিবাচকভাবেই নেয়। কিন্তু অতিরিক্ত কোনো কিছুই যেমন ভঙ্গলা না, তেমন বেশী বেশী যুদ্ধও কিন্তু ধ্বংসাত্মক হতে পারে। মানুষের সহ্যের একটা সীমা ছিল, আছে। নেপোলিয়নের শক্তিরা জনগণকে এটা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে যতটুকু অর্জন করেছে, তার চেয়েও তার লোভ অনেক-অনেক বেশী। ফলে তার পতন আসতে আর বিলম্ব হয়নি।”

“আমি বুঝতে পারছি না যে যুদ্ধকে ভালো বলে আখ্যা দেওয়া হলো কেন,” প্রভাস্তসেন বলল। “যুদ্ধ অনেক খারাপ কিছুও বয়ে আনে।”

“মৃত্যু, ধ্বংস, বিপর্যয়, অপচয়। কিন্তু যুদ্ধ সব সময় ছিল, আছে। যদি এটা এত ভুল বা খারাপ কাজই হত, তাহলে শত-শত বছর ধরে এটা চলে আসতে পারত? উত্তরটা খুব সোজা। যুদ্ধ আসলেই কাজের। মানুষের প্রযুক্তিগত যত অর্জন, তার সবই এসেছে যুদ্ধের ফলে। শেষের বিশ্বযুদ্ধের কথাই ধরো। এটাকে কেন্দ্র করেই পরমাণু ভেঙ্গে ফেলার বিদ্যে শিখে নিয়েছি, বানিয়ে ফেলেছি পারমাণবিক বোমা। আকাশে উড়াও আরও ভালো করে আয়ত্তে এনেছি। আর ইলেক্ট্রনিক্স, মেডিকেল, সায়েন্স, মেডিসিন, এঞ্জিনিয়ারিং এ যে কী পরিমাণ বিপুর এসেছে, সেটা নাহয় বললামই না। আর এই সবই তখন হয়েছে যখন আমরা একে অপরকে মেরে ফেলায় ব্যস্ত।”

একটা নিশ্বাস ফেলে মাথাটা নাড়ল হেনরিক। “তা সত্য বলেছেন।”

“কথা এখানেই শেষ না, জনাব। মূল বিষয়টা আরও রঙিন। একটু কষ্ট করে আমেরিকার ইতিহাসের দিকে লক্ষ করেন। এটার অর্থনীতি কিন্তু খুবই ছন্দের সাথে

চলে, খেয়াল করেছেন? একেবাবে ঘড়ির মতো করে। এই ছন্দে দেখবেন, দাপটও আছে, আবার মন্দাও আছে। কিন্তু এখানেই কাহিনী। লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, আমেরিকায় যখনই চক্র ঘুরে কোনো মন্দা আসে, তার কারণ হিসেবে খুঁজে পাবেন মিলিটারিদের জন্য অপর্যাপ্ত খরচকে। বুঝলেন বিষয়টা? একই রকম মন্দা কিন্তু নেমে এসেছিল আপনার ১৮১২ সালের যুদ্ধের পর, ১৮৬০ সালের গৃহযুদ্ধের পর আর বিশ শতকের ঠিক বছর দুয়েক আগের স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের পরে। আর সবচে বড় যে দুরাবস্থা, যেটাকে বলা হয় দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন, এসেছিল ৩০ এর দশকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তখন আমেরিকার ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি অবস্থা, নিজের দেশ ছাড়া আর কোনো বিষয়ে তিল পরিমাণ নাক গলানোর শক্তিটুকুও ছিল না। আর মিলিটারি? আক্ষরিক অর্থেই বিলুপ্ত হয়েছিল তারা, বা করতে হয়েছিল বলা যায়, যা আবারও ফিরিয়ে আনতে দ্বিতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত দৌড়াতে হয়েছিল।”

“মনে হচ্ছে এই বিষয়ে ভালোই পড়াশোনা করেছেন আপনি।”

“তা করেছি বৈকি! আর এ কারণেই বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার। একটা সমাজের টেকসই শাসনব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে যুদ্ধের মাধ্যমে। এটাই সমাজকে বাধ্য করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা নিয়মনীতিগুলো মেনে নিতে, আর জন্মগুলো এগুলোর উপযোগিতা বুঝেই এগুলো মেনে নেয়। যুদ্ধ বন্ধ তো জাতীয় সার্বভৌমত্বও শেষ, জানা কথা। আর এটাই নেপোলিয়ন বুঝেছিল ভালো করে আধুনিক সমস্করণের মাঝে এই লোকটিই শুধু এটার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছিল সত্যিকার অর্থে।”

Le Grand Véfour এর ডাইনিং রুমটা খালি হতে প্রস্তুত করেছে। দুপুরের খাবার খাওয়ার সময়টা শেষ হলো বলে। এলিজা দেখল লোকজন একে অপরকে বিদায় জানিয়ে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে।

“নেপোলিয়ন যে শুধু ফ্রাঙ্ককেই এই প্রক্রিয়ার ভেতর থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তা কিন্তু না,” বলল এলিজা, “যুদ্ধ করে তার দখল করা সবগুলো অঞ্চলকে এক করে একটা শান্তির সূচনা করতে চেয়েছিল; কিন্তু সে এটাও বুঝেছিল যে এটা করতে হলে যুদ্ধের বিকল্প কিছু দরকার তার। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, তার সময়ে বিকল্প কিছুই ছিল না।”

“যুদ্ধের বিকল্প হিসেবে কী আনা যেত? বলবেন?”

কাঁধ বাঁকাল এলিজা। “আসলে এমন কিছু পাওয়াটা কঠিন। তবে অসম্ভব না তাই বলে। একটা বিকল্প শক্ত তৈরি করতে পারলেই হলো। সেটা হতে পারে কোনো এক হুমকি, সত্যি হোক বা না হোক, মোটামুটি এমন কিছু একটা দাঁড় করাতে পারলেই হলো। সমাজ, মানে সমাজের লোকজন তখন সেই আসন্ন বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষায় সব করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। যেমন, আণবিক অন্তরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কথাই ধরুন। যে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, সেটার গোড়াপত্তন কিন্তু ঐ আণবিক শক্তিকে ঘিরেই। কোনো ক্যাম্পেইন, বা হানাহানি ছাড়াই স্রেফ একটা যুদ্ধ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে চলল, ভাবা যায়? কেউ কারও গায়ে আঁচড় কাটল না, কিন্তু

বছরের পর বছর প্রস্তুতি নিতে-নিতে খরচ হয়ে গেল শত-শত কোটি ডলার এই কোল্ড-ওয়ারের সময়ে সরকারের পেট ফুলে ঢেল হয়ে গেল। আমেরিকান ফেডারেল সিস্টেম নিজেদেরকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেল যে যেটা তারা কোনো দিন ভাবতেও পারেনি। খেয়াল করে দেখেন, পথগুশ থেকে নবৰই, এই চল্লিশ বছরে পশ্চিমা সভ্যতা কোথায় উঠে গেছে। মানুষ চাঁদেও নেমে গেল এই সময়ে, ঠাণ্ডা মাঝায় ভাবলে এই স্নাত্যুন্ধকে একটা ধন্যবাদ না দিয়ে পারবেনই না।”

“মানছি, আপনার কথায় যুক্তি আছে।”

“এমন উদাহরণ আরও আছে, যদিও সেগুলো অতটা চিত্তার্কর্ক মনে হবে না। তাও বলি, এই যে বৈশিক উষ্ণতা নিয়ে চিন্নাপাল্লা করা হচ্ছে, তারপর বলা হচ্ছে খাদ্যের সংকট, ভাটা পড়েছে খাবার জলেও। দেখেন ভালো করে, গত কয়েক বছর ধরেই এগুলো নিয়ে বেশ পাঁয়তারা করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এগুলো, কী বলা যায়, সেই পর্যাপ্ত পরিমাণ হৃৎকি বা বিপদের শক্তি তৈরি করতে পারেনি। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, গৃহায়ন ও পরিবহণ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য বেশ বড় রকমের কিছু পদক্ষেপ নিলে কাজ হতে পারে, কিন্তু এই সবগুলো কাজে সক্রাইকে যুক্ত করেই করতে হবে, মানে সব শ্রেণীর মানুষের জন্যই, এবং এমনভাবে করতে হবে যাতে সবার মনোযোগ শুধুমাত্র এই অর্জনের দিকেই থাকে। আর বলাই বাহ্যিক, এগুলো করতে হলে সম্পদের পাহাড় ভেঙ্গে খরচ করতে হবে। তবে এমন কিছু স্তুতি কিনা সন্দেহ। ছেটখাটো এক যুদ্ধেই ব্যাপক পরিমাণে সম্পদের খরচ হয়ে যায়। যুদ্ধ তো পরের কথা, মিলিটারিদের পুষ্টে আর তাদের প্রস্তুত করতেই যা স্মৃক্ষ হয় তার কোনো হিসেব নেই, আর এইসব খরচের কাছে যে কোনোরকমের সামাজিক উন্নয়নের খরচ নস্য। হ্যা, এটা ঠিক যে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার নামে অচেল পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়, কিন্তু শেষে গিয়ে দেখা যায় এই অপচয় এমন কোনো পর্যায়ে যেতে পারে না যেটাকে যুদ্ধের বিকল্প হিসেবে গন্য করা যায়।”

নিঃশব্দে একটু হাসল প্রভাসেন। “আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনার কথাগুলো হাস্যকর শোনাচ্ছে?”

“খুব ভালো করেই জানি। তবে বিষ্ণে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাটা চান্তিখানি কথা না। দেশ পরিচালনার যে চ্যালেঞ্জ, তা যদি আপনি এড়াতে চান, তো সেখানে নানান রকমের আগ্রাসন জায়গা করে নেবে।”

“ঠিক রোমানরা যেমনটা করেছিল? কলোসিয়ামে? প্লাডিয়েটোর দিয়ে জীবন-মরণ খেলার মাধ্যমে?”

“রোমানরা বুদ্ধিমান ছিল। আমি আজ যা ব্যাখ্যা করছি তা আরও আগেই তাঁরা বুঝেছিল। শান্তি-প্রতিষ্ঠিত সমাজে যদি আভ্যন্তরীণ বিভেদ বা ভাঙ্গন রোধ করতে হয়, তাহলে যুদ্ধের বিকল্প কিছু তৈরি করতে হবে। আর এই খেলাই রোমানদের কাছে ছিল সেই বিকল্প যেটা শত-শত বছর ধরে সাড়মুরে তাদের সমাজের মাঝে চলে এসেছে।”

এলিজা খেয়াল করল তার কথায় লোকটা মজা পাচ্ছে।

“হেনরিক থ্রিভাল্ডসেন, আজ যা শুনলেন, তা বহু আগেই বুঝেছে এমন কী প্রাচীনকালের রাজা-গোজারাও। স্বাভাবিক অবস্থায় শান্তির মূল্য বোঝে না জনগণ, কিন্তু যুদ্ধ এসে পড়লে বোঝে আর তখন শান্তি খোঁজে। এই বিষয়টা কিন্তু আজকের এই আধুনিক গনতন্ত্রের যুগেও সত্য। দেখবেন? আবারো তাকান আমেরিকার দিকে। পঞ্চাশের দশকে এই দেশটাই তার সংবিধানে সংশোধন এনেছিল যখন কমিউনিজম মাথাচড়া দিয়ে উঠল, এটাকে সত্যিকারের বিপ্লব মনে করা হয়েছিল তখন। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম দেওয়া এই বিপদের কাছে আমেরিকার জনগণের বাক-স্বাধীনতার আন্দোলন তখন তুচ্ছ হয়ে পড়লো। এ তো গেল আগের কথা, আপনি অতি সম্প্রতি ঘটা বিষয়ের দিকে তাকান, দুঃহাজার একের এগারই সেপ্টেম্বরের হামলার পরে কী হলো বলি। নতুন আইন পাশ হলো, যেটা আমেরিকার জনগণের কাছে জঘন্য লাগল, আসলে লাগারই কথা, কারণ এমন বিরক্তিকর কোনো আইন আমেরিকার ইতিহাস আগে দেখেনি। *The Patriot Act* নামে যে আইন পাস হলো, সেটা জনগণের স্বাধীনতার চারপাশে দেওয়াল তুলে দিল, একই সাথে তাদের গোপনীয়তায় হামলা চালানোর হার বাড়িয়ে দিল অন্য যেকোনো সময়ের থেকে বেশী। আর সারভেইল্যান্স আইন তো আরও খারাপ অবস্থা তৈরি করল। সাধারণ জনগণের প্রতিষ্ঠিত গোপনীয়তা বা স্বাধীনতা কোনোটাই আর থাকল না গোয়েন্দাদের কঠিন নজরদারি আর আড়িপাতার কারণে। জায়গায়-জায়গায় তল্লাশি থেকে শুরু করে যখন তখন কারও পরিচয় জানতে চাওয়া, নানানভাবে হেনস্ট করা স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়াল, যদিও আমেরিকানরা এগুলো খুবই অপছন্দ করল, তবু তারা একটি অবৈধ হস্তক্ষেপকে মেনে নিল শুধুমাত্র তারা নিরাপদে থাকবে এই স্বার্থে—”

“বা অস্তত নিজেদেরকে বোঝাবে যে তারা নিরাপদে আছে।”

হাসল এলিজা। “একদম তাই। আর ঠিক এটাই আমি বলতে চাচ্ছি। বাইরে থেকে আসা শক্তিশালী বিপদের উপস্থিতি মানেই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসার। যতদিন বিপদটা আসলেই আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারছে, তত দিন এই ক্ষমতাও বাড়তে থাকছে সমানুপাতিক হারে।”

একটু বিরতি নিল সে।

“আর এই ফর্মুলার ভেতরেই লুকায়িত আছে বিরাট অংকের লাভ।”

▲

প্রফেসর মুর্যাডের হাতের বই ও অড্ডুত লেখার দিকে দেখাল ম্যালন। “আমরা যে এগুলো নিয়ে কিছুই বের করতে পারছি না, বিষয়টা হেনরিকের কাছে ভালো লাগবে না।”

ব্যতিক্রম লেখাটাকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে প্রফেসর। “মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। লুভরের ভেতরে একবার চল তো যাই। একটা জিনিস পরীক্ষা করতে হবে।”

▲

এলিজা লাঘক এতক্ষণে যা-যা বলল তা ধীরে-ধীরে হজম করছে হেনরিক থ্রিভাল্ডসেন। বোঝাই যাচ্ছে এই ভদ্রমহিলা তার পরিকল্পনা পেছনে বিস্তর গবেষণা ও বিনিয়োগ করেছে। তবে হেনরিক প্রসঙ্গটা অ্যাশবির দিকে নিয়ে যেতে চাইল।

“আপনার সিকিউরিটি নিয়ে যে সমস্যা, তা নিয়ে কিছু তো আর জানতে চাইলেন না,” খুব কোমল কণ্ঠে বলল হেনরিক।

“আমার মনে হয়, যখন সময় আসবে, তখন এমনিতেই আপনি বলবেন সব।”

ওয়াইনে আরও একটু চুমুক দিয়ে ভাবনাগুলো জড়ে করে নিল সে। “প্রায় ত্রিশ মিলিওন ইউরো খণের বোৰ্ড অ্যাশবির মাথায়। যেগুলোর বেশীরভাগই চড়া সুদের খণ।”

“লর্ড অ্যাশবিকে আমার কাছে একেবারে সোজাসাপ্তা গোছের মানুষ মনে হয়েছে, আমি দেখেছি সে প্রতিটা কাজ, আমি যা যখন যেমন বলেছি তেমনজাতেই মন দিয়ে করে দিয়েছে।”

“একজন চোর আপনার এই লর্ড অ্যাশবি। আর এটা অপ্রয়োগ্যে জানেন যে কয়েক বছর আগে অবৈধ আর্ট কালেক্টরের দলে যোগ দিয়েছিল সুদের বেশীরভাগই আইনের মুখোমুখি হয়েছে—”

“কিন্তু লর্ড অ্যাশবির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।”

“তাতেই যে সে দায়মুক্ত হয়ে যায় তা কিন্তু না, আবারো বলি, আমি জানি সে ওদের সাথে ছিল, জানেন আপনিও এটা। এই কারণেই সে আপনার ক্লাবের অংশ এখন।”

“শুধু অংশই না, সে আমার কথামত সবকিছুই সুন্দরভাবে করে আসছে। আরও বলি, সে এখন এই প্যারিসেই। বেশ সম্ভাবনাময় একটা কিছুর পেছনে আছে। এমন কিছু যা আমাদেরকে সরাসরি কাঞ্চিত লক্ষ্য নিয়ে যেতে পারে। আর এই জন্য, জনাব থ্রিভাল্ডসেন, আমি তার পেছনের কুকর্মের বিষয়টা ক্ষমা করতেই পারি।”

▲

কাঁচের পিরামিড পার হয়ে প্রফেসর মুর্যাডকে অনুসরণ করছে ম্যালন, কয়েকটা এক্সেলেটর ধরে নিচেও নামতে হলো কয়েক দফা। জাদুঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষমাণ দর্শনার্থীদের কোলাহল কানে আসছে মৃদুভাবে। ম্যালন বুঝে উঠে পারছে না যে কোথায়

যাচ্ছে তারা। তবে প্রফেসর পথ কমানোর জন্য টিকিট প্রার্থীদের লম্বা লাইনগুলো আড়াআড়ি পার হয়ে গেলে স্বত্ত্ব পেল ম্যালন। তাদের গন্তব্য এখন বইয়ের দোকান।

এই দ্বিতীয় ভবনটা তথ্য-উপাত্তে ঠাসা, হাজার-হাজার বই সাজানো আছে দেশ ও সময় অনুসারে, সবই বিক্রির জন্য। মুর্যাড এগিয়ে গেল ফরাসি বইপত্রে ঠাসা তাক ও টেবিলগুলোর দিকে। মোটা, ভারী বইগুলো সব নেপোলিয়ন যুগের উপর লেখা।

“সময় পেলেই এখানে চলে আসি আমি,” বিজ্ঞ মানুষটি বলল তাকে। “দুর্দান্ত একটা জায়গা এটা। এখানে এমন প্রাচীন, ও দুর্লভ বেশ কিছু লেখা আছে যেগুলো আর পাঁচটা দোকান বা সংগ্রহশালায় পাওয়া যাবে না কখনোই।”

ম্যালন এমন উচ্ছ্বাসের কারণ বোঝে। বইপ্রেমীরা সব একইরকম। বই দেখলেই সুখ লাগে।

বইয়ের নামের উপর দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল মুর্যাড।

“আমি একটু সাহায্য করি?” জানতে চাইল ম্যালন।

“একটা সময় খুঁজছি, ফরাসিতে লেখা।” চোখ দুটো টেবিলের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। “সেন্ট হেলেনার উপর লেখা ওটা। কয়েক সপ্তাহ আগেই ওটা প্রায় কিনেই নিছিলাম, কিন্তু—” হাত বাড়িয়ে হার্ডকভারের একটা বই টেনে বের করলেস। “এই তো সেটা, পেয়েছি। দামও আছে বইটার। তাই না কিনেই ফিরে গিয়েছিলাম, তবে মন থেকে সরাতে পারিনি বইটা থেকে দূরে থাকলেও।”

একটু হাসল ম্যালন। এই লোকটাকে তার মনে ধরেছে দষ্ট বা অহংকারের ছিটকেফোঁটা নেই এনার মাঝে।

বইটা মেলে ধরেই পৃষ্ঠাগুলোর মাঝে আঙুল চালাতে লাগল মুর্যাড। মনে হচ্ছে যেন সে যা খুঁজছে তা পেয়ে গেছে, চোখ না সরিয়েই ম্যালনকে ইনভ্যালিয়েদস থেকে আনা বইটা খুলে সেই অদ্ভুত লেখাটা বের করতে বলল।

“ঠিক যেমনটা আমি ভেবেছিলাম,” বলল মুর্যাড, যে বইটার খোঁজে এসেছে সেটার দিকে দেখিয়ে। “এটা সেন্ট হেলেনা থেকে লেখা কিছু নোটের ছবি, নোটগুলো লেখা হয়েছিল নেপোলিয়ন যখন নির্বাসনে ছিল। এখন এটা তো আমরা জানি যে নেপোলিয়নের অনেক লেখাই নতুন করে লিখেছিল তারই সেবক সেইন্ট দেনিস কারণ তার হাতের লেখা ছিল খুবই বাজে।” দেখাল মুর্যাড। “এই নমুনা দুটো ভালো করে দেখেন, প্রায় একইরকম দেখতে।”

বই দুটোর লেখাগুলো মিলিয়ে দেখল ম্যালন, আসলেই সাদৃশ্যপূর্ণ। M অক্ষরগুলো গোলাকৃতির, এবং E লেখা হয়েছে বেশ লম্বা করে, F এর গোড়াটা বাইরের দিকে বাঁকানো, অদ্ভুত আকৃতির A, যেটাকে দেখতে হেলানো D এর মতো লাগছে।

“তারমানে, এই মেরোভিনজিয়ান বইতে যা লেখা তা সেইন্ট দেনিসের?” জিজেস করল ম্যালন।

“না, সে লেখেনি।”

মাথায় জট পেকে গেল ম্যালনের।

লুভ্র থেকে নেওয়া বইটার দিকে দেখাল মুর্যাড। “ছবির নিচে কী লেখা পড়েন।”

তা-ই করল ম্যালন, এখন সে বুঝেছে। “এটা নেপোলিয়নের হাতের লেখা?”

সায় দিল প্রফেসর, তারপর ঘেরোভিনজিয়ান লেখাটার দিকে দেখাল। “এই বইতে যা-যা লেখা, তা নেপোলিয়নের নিজেরই লেখা, তারপর এটা সেইন্ট দেনিসের হাতে দিয়ে দেয় সে। এই কারণেই এই লেখাটার গুরুত্ব অনেক বেশী।”

ম্যালনের মনে পড়লো হেনরিক তাকে অ্যাশবি এবং ক্যারলাইন ডডের কথোপকথন নিয়ে যা বলেছিল। মেয়েটা বলেছিল যে সে একটা চিঠির সন্ধান পেয়েছে, যেটাও নেপোলিয়নের নিজ হাতে লেখা। স্মাটের হাতের লেখা দেখার বিষয়টা অসাধারণই বটে, বলেছিল সে অ্যাশবিকে।

কথাগুলো মুর্যাডকে বলে দিল ম্যালন।

“আমিও একইরকম ভাবছিলাম,” বলল প্রফেসর। “হেনরিকও আমায় বলেছে এটা। বেশ কৌতুহলী।”

চৌদ্দ লাইনের অদ্ভুত লেখা ও এলোমেলো চিহ্নগুলো ভালো করে দেখে লাগল সে, নেপোলিয়ন এগুলো নিজ হাতে লিখেছে, ভাবল মনে-মনে।

“এখানে কোনো একটা বার্তা আছে অবশ্যই,” বলল ম্যালন। “কিন্তু একটা নিশ্চিত থাকার কথা।”

এলিজাকে আরেকটু কোণঠাসা অবস্থায় ফেলতে পাইল প্রভান্ডসেন। “ধরুন, আপনি যেটা চান সেটা অ্যাশবি আপনাকে এনে দিতে পারল না, তখন?” প্রশ্ন হেনরিকের।

কাঁধ জোড়া একটু ঝাঁকাল মহিলাটি। “দেখুন, আমার বাপ-দাদারা বাদে, নেপোলিয়নের সম্পদ খোঁজ করেছে এমন লোক নেই বললেই চলে। স্বাভাবিকভাবে এটাকে কল্পকাহিনীই বলে মানুষ। এখন আমি তো আশা করি যে তাদের এই ধারণা মিথ্যে হোক। এখন যদি দেখা যায় অ্যাশবি ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে আমি মনে করি না যে এটা তার নিজের ব্যর্থতা। তার চেষ্টা তো সে চালিয়ে যাচ্ছে।”

“সাথে আপনার চেখ ফাঁকি দিয়ে নিজের পকেট ভর্তি করছে।”

ওয়াইনগ্লাসে আঙুল বোলাল এলিজা। “মানছি, এটা একটা সমস্যা। বিষয়টা আমার কাছেও ভালো ঠেকছে না।” একটু বিরতি নিল সে। “কিন্তু আমি তো কোনো প্রমাণও দেখছি না।”

“যদি অ্যাশবি সেই সম্পদের খোঁজ পেয়ে আপনাকে কিছুই না বলে, কী করবেন আপনি?”

“সে যে এটা করছে তা-ই বা জানব কী করে?”

“জানতে পারবেন না।”

“বেশ, তো আপনার ঝুলিটা এবার খুলুন, কিছু করার থাকলে বলুন।”

এই নারী তার কথার উপর ভরসা করতে চাইছে, এই বিষয়টা এখন হেনরিকের কাছে স্পষ্ট। “শুনুন, এখন সে এই প্যারিসে, ঠিক তো? মনে হচ্ছে তার এখানে আসাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই তার আসা। ভালো কথা। আপনি একটু আগে বললেন যে এখানে যে জিনিসের খোঁজে সে এসেছে সেটা সবকিছুর চাবিকাঠি হতে পারে। এখন আমি যদি তার সম্পর্কে ঠিক ধারণা করে থাকি, তাহলে দেখবেন, সে বলবে যে, সে যেটার জন্য এখানে এসেছিল সেটা নিতে পারেনি, বা সেটা সেখানে নেই, খুঁজে পায়নি, ইত্যাদি, ইত্যাদি, মানে এরকম কিছু অজুহাত দেখাবে। তখন আপনিই বিবেচনা করে দেখবেন যে সে সত্যি, নাকি মিথ্যে বলছে।”

একচল্লিশ

নেপোলিয়নের হাতের লেখা সম্বলিত পৃষ্ঠা দুটো ফটোকপি করে ল্যাভরে ডঃ মুর্যাডের কাছে দিয়ে বইটা নিয়ে চলে এসেছে ম্যালন, এই মেরোভিনজিয়ান বই এখন তার কাছেই রাখতে হবে।

হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সি থামিয়ে সেইনে নদির উপর দিয়ে ছুটে চলছে আইফেল টাওয়ারের দিকে। একটু কাছে যেতেই লোহার স্থাপনার নিচে অপেক্ষমাণ দর্শনার্থীদের চোখে পড়লো, আরও একটু এগুতেই, পরিচিত দুই মুখ দেখা গেল—স্টেফানি, স্যাম। এবং আরও একজন, তিনি মিগ্যান মরিসন।

“যাক, ঠিকঠাক আছ দেখে ভালো লাগল,” ট্যাক্সিখেকে নেমে এগিয়ে যেতেই বলল ম্যালন স্যামকে। “মিউজিয়ামে যেভাবে যাচ্ছেন তারতে বললাম তা একটুও গায়ে বাঁধালে না, বললাম স্থির থাকতে।”

“ওখানে, এই পরিবেশে কিছু না করে স্থির থাকা যায়?”

ম্যালন ঘুরে দাঁড়াল মিগ্যানের দিকে। মেয়েটা স্টেফানির বর্ণনার সাথে হ্বহু মিলে গিয়েছে—ছেটখাটো গড়ন, উতলা ভাবভঙ্গি, তবে দেখতে আকর্ষণীয় এবং একইসাথে বেশ মজারও মনে হচ্ছে।

স্টেফানির দিকে দেখাল মিগ্যান। “ইনি কি সব সময়ই এমন নাছোড়বান্দা?”

“আসলে, এখন তো আরও ঢিলে হয়েছেন তিনি, কয়েক বছর আগে ভয়াবহ অবস্থা ছিল তার।”

“দেখি, মিনিটখানেকের জন্য একটু থাম এবার,” বলল স্টেফানি। তারপর ম্যালনের হাতটা শক্ত করে ধরে নিয়ে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল, আর তারপরেই প্রশ্ন, “ইনভ্যালিয়েদস কিছু পেলে?”

জ্যাকেটের নিচ থেকে বইটা বের করে তাকে দেখাল ম্যালন। “বইটা না পেয়ে লর্ড অ্যাশবির মাথা খারাপের মতো অবস্থা। আমার নেটটা পড়ার সময় আমি তাকে

দেখেছিলাম। আর এটাও খেয়াল করলাম সে ক্যারলাইন ডডের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কিভাবে লাঘকের উপর দোষ চাপাচ্ছিল।”

“যার অর্থ হলো, শ্রভান্দসেন জানে না যে অ্যাশবি আমাদের হয়ে কাজ করছে। সে ভালোই নজরদারি করে যাচ্ছে এখনও। তবু আমার মনে হয় না হেনরিক তার পেছনে ২৪ ঘণ্টাই লোক লাগিয়ে রাখতে পারবে, অথবা তার সব কথোপকথন শুনতে পাবে।”

ম্যালন ভালোই জানে ইনটেন্স সারভেইল্যান্স সম্পর্কে, এই গভীর নজরদারির আওতায় কোনো কাজ যতই গোপনে সারার চেষ্টা করা হোক না কেন, লাভ নেই, ধরা পড়বেই। খুব বেছে, সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয়।

“এদিকে আমাদের কর্মকর্তারা অ্যাশবির উপর নজরদারি করে ভুলই করেছে,” এলিজা বলল। “তার নিজের স্বাধীন চিন্তাভাবনা আছে, যা ইচ্ছা বলতে বা করতে পারে।”

ম্যালন দেখল মিগ্যানের পাশে স্যাম দাঁড়িয়ে আছে তাদের থেকে শ'খানেক ফিট দূরে। “ছেলেটা সব করতে পারছে ঠিকঠাক?”

“সে ফিল্ড এজেন্ট হতে চায়, তাই তাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি আমি।”

“পারবে তো?”

“এখন ও ছাড়া আমার হাতে কেউ নেই, তাই ওকে পারতেই পৰিবে।”

“আর ত্রি মেয়েটা?”

“আরে, ওর মাথা গরম। দুই লাইন বেশী বোবে জুক সময়। স্বতাবে গওগোল আছে।”

“আপনাদের দু'জনের মাঝে চুলোচুলি হবে, আবেশ বুঝতে পারছি।”

হাসল স্টেফানি। “আমার সাথে ফ্রেঞ্চ ইলেক্ট্রিজেন্সের লোকজনও কাজ করছে। পিটার লায়ন সম্পর্কে জানানো হয়েছে তাদেরকে। এখন ওরাও পিটারকে চাচ্ছে পাগলের মতো। প্রায় দশ বছর আগে তিন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে জড়িত এই লোক, এই দুর্ঘটনায় চার পুলিশ মারা যায়।”

“হ্ম, আর ক্লানির ঘটনায় কাউকে ধরা যায়নি, তাই না?”

আরও একটু হাসল স্টেফানি। “পররাষ্ট্র নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের পরিচালক তোমার সম্পর্কে সবই জানেন। তুমি *Belém* ও *Aachen* এর ক্যাথেড্রালে কী-কী করেছে তার সবকিছুই আমাকে বলেছেন তিনি। কিন্তু সে লোক ভালো। তাই তুমি এবং অ্যাশবি ইনভ্যালিয়েন্সে ঢোকা বা বের হওয়ায় কোনো ঝামেলা হয়নি। তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা দেখেছে তার থেকে অনেক ভালো, বিশ্বাস কর।”

“আমার একটা জিনিস দরকার এখন।” বইটার দিকে দেখাল ম্যালন। “এটা চুরি হওয়া নিয়ে পত্রিকায় একটা ঘোষণা দিতে হবে। খুব ফলাও করে না হলেও, মোটামুটি কালকের পত্রিকায় ওটা এলেই হচ্ছে। এতেই কাজ হবে।”

“হেনরিকের কথা ভেবে বলছ এটা?”

নড করল ম্যালন। “তাকে একটু কোণঠাসা করে ফেলতে চাই। তার পরিকল্পনা হলো সে এলিজার কাছে অ্যাশবিকে চোর সাজাতে চায়। এতে তেমন ক্ষতি দেখি না আমি, তাই দেখাই যাক বুড়েটা কী করে।”

“এখন সে কোথায়?”

“এলিজা লাঘক এবং লর্ড অ্যাশবির সুখের ঘরে দুঃখের আগুন লাগাতে ব্যস্ত। বুঝতেই পারছেন তার মতো আমিও দুই পক্ষের হয়েই খেলছি।”

“আর খেলাটা ভালোই খেলেছি আমরা, তাই আশা করতেই পারি যেমনটা আমরা চাই তেমনটা পেয়েও যাবো।”

ক্লান্তি পেয়ে বসেছে ম্যালনকে, গত কয়েক সপ্তাহের ঝক্কি-বামেলার রেশ ফিরে আসছে আবার। মাথার চুলের মাঝে হাত চালাল সে। গ্যারিকে খবর দেওয়া দরকার, আর দু'দিন বাদেই ক্রিসমাস, এ সময়ে বাবা-ছেলেদের মাঝে কথা হওয়াটা দরকার।

“তো এখন কী করব?” জিজ্ঞেস করল সে।

“আমার সাথে লভন যাবে এখন।” উত্তর যেন প্রস্তুত করাই ছিল স্টেফানির।

খালি হাত দুটো কোটের পকেটে ভরে ভিড়ের মাঝে মিগ্যানকে প্রিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম। শীতের আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই, চারদিকে ঘলমলে রোদ।

“তুমি কেন এগুলো করছ?” সে জিজ্ঞেস করল মিগ্যানকে।

“তোমার ঐ বান্ধবী কি বলেছে জানো? বলেছে সে আমি যদি এই কাজে রাজি না হই, তাহলে পুলিশে দেবে।”

“স্টেফানির এই কথায় তুমি এগুলো করছো ননে হয় না।”

সুন্দর মুখে দুশ্চিন্তার কোনো লেশ দেখা গেল না, যেটা গতকাল থেকে বেশ স্পষ্টই ছিল। তার এই ব্যক্তিতে নেতৃত্বাচক কিছু নেই, অস্তত সে চাইছে না এমন কিছু থাকলেও তা প্রকাশ পাক এখন।

“অবশ্যে আমরা কাজটা করতে চলেছি, স্যাম,” বলল মেয়েটা। “আর কোনো কথা নেই। এতদূর যখন এসেছি, কিছু একটা করবই।”

স্যাম নিজেও এমন উদ্দীপনা নিয়েই কাজ করত।

“ওদেরকে আমরা থামাতে পারব। আমি জানতাম ওরা সত্যিই আছে, তুমিও জানতে। আমরা একেবারে নির্বোধ না, স্যাম।”

“বুঝতে পারছ যে স্টেফানি যা করতে বলছে তা আসলেই ভয়ঙ্কর?”

কাঁধ জোড়া ঝাঁকাল মেয়েটা। “কতই বা ভয়ঙ্কর হবে সেটা? কালকে মিউজিয়ামে যা হলো, তার থেকেও খারাপ কিছু? কখনো-কখনো একটু বেপরোয়া হতে হয়, এতে দোষের কিছু নেই, বুঝলে?”

“বেপরোয়া শব্দের অর্থ কী?” সে জিজ্ঞেস করেছিল নরস্ট্রামকে।

“স্বাধীন, খেয়ালী, বিবেচনা না করেই কাজ করে যে।”

মাত্র পনের বছর বয়সে শোনা এই অর্থগুলোকে সে মাথায় ঢুকিয়ে নিয়েছিল। দড়ি না নিয়ে পাথুরে পাহাড়ে ওঠার সময় নিয়ম ভাঙ্গার ঝুঁকিটা সে নিয়েছিল, যদিও নরস্টাম তাকে বলেছিল দড়ি নিতে, কিন্তু সে তা শোনেনি।

“স্যাম, আমরা সুযোগ নিয়েই কাজ করি, আর এভাবে তুমিও করে সফল হবে। কিন্তু বোকামির সুযোগ হলে চলবে না। মনে রাখবে, ঝুঁকি কমিয়ে কাজ করার নামই সফলতা, ঝুঁকি বাড়িয়ে না।”

“কিন্তু দড়ি তো আমার লাগেইনি। ওটা ছাড়াই আমি দারুণ উঠে গেলাম।”

“হ্ম, আর তোমার হাত যদি সরে যেত? বা পা পিছলে যেত? বা কোনো পেশীতে টান খেতে?” এমন প্রশ্নবাণ পরিষ্কারভাবে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে নরস্টাম খুব অসন্তুষ্ট না হলেও কিছুটা আহত হয়েছে এমন অবাধ্যতায়। “তুমি পড়ে যেতে পারতে। আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যেতে পারতে। অথবা মারাও যেতে পারতে। এখন আমায় বল, এরকম ঝুঁকি নিয়েই বা তুমি কী পেলে?”

ভাবনাগুলোকে কথায় সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল সে, বকুনিটা হজম করে নেওয়ার চেষ্টা করল, সাথে বুঝতে পারল যে কী বলা উচিত তার এখন নরস্টামকে কোনোভাবেই দুঃখ দিতে চায় না সে। যখন ছেট ছিল তখন আলাদা কথা, কিন্তু এখন তার যথেষ্ট বোঝার বয়স হয়েছে। আর এটুকু অন্তত তার মেরু উচিত যে এই মানুষটাকে তার হতাশ করা ঠিক না।

“আমি দুঃখিত। খুব বোকামি করে ফেলেছি।”

বৃদ্ধ লোকটি তার কাঁধের উপর হাত রাখল, চাপ দিল শক্ত করে। “মনে রাখবে, স্যাম, এই বোকামিই তোমার মরণ ডেকে আনলে।”

নরস্টামের সেই সতর্কবাণী নতুন করে কানে বাজতে শুরু করেছে যে মুহূর্তে মিগ্যান প্রশ্ন তিনটি করেছে তাকে। আজ থেকে সতের বছর আগে, যখন সে পাহাড়ে চড়েছিল কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করেই, সেদিনই বুঝেছিল নরস্টামের কথাই ঠিক।

বোকামিই তোমার মরণ ডেকে আনবে।

গতকাল জাদুঘরে এই শিক্ষাটাই ভুলে গিয়েছিল সে।

কিন্তু আজ ভুললে হবে না।

স্টেফানি নেলেই তাকে একটা কাজ দিয়েছে। এতে কি কোনো ঝুঁকি আছে? অবশ্যই, আর তা একটু আধটু না। তবে সেগুলো আগে থেকেই মেপেজুপে হিসেব করে নিতে হবে।

আর বেপরোয়া হওয়া চলবে না।

“আমি একটু বুঝে-শুনে পা ফেলতে চাই, মিগ্যান। তোমারও তাই করা উচিত।”

বিয়ান্তি
ইংল্যান্ড
দুপুর ২.৪০

হতঘড়িতে চোখ বুলাতেই অ্যাশবি বুঝল তাকে বহন করা বেন্টলে এক ঘণ্টার একটু বেশী সময় নিয়েছে হিথো বিমানবন্দর থেকে সেলেন হলে তার বাড়ি পর্যন্ত আসতে। তার আরও খেয়াল পড়লো সম্পূর্ণ এস্টেট জুড়ে মানুষের কাজকর্ম-কেউ খোলা জায়গাগুলো পরিষ্কার করছে, কেউ বা অন্য কাজে ব্যস্ত আছে। তবে শীতের জন্য বর্ণা, হৃদ আর ছোট্ট জলপ্রপাতটা শাস্ত দেখাচ্ছে তার কাছে। বিরাট এই প্রাসাদের সবকিছুই ১৮শ শতকের পর থেকে আগের মতই আছে, পরিবর্তন হয়েছে শুধু বিরাট ঘোড়ার আস্তাবল, রান্নাঘর, এবং চাপরাসিদের থাকার জায়গায়। অ্যাশবির পূর্বপুরুষরা চারপাশের বিরাট জায়গা জুড়ে থাকা উঁচু-নিচু টিলা-খন্দ সমান করে বেষ্টনী দিয়ে এখনকার রূপ দিয়েছে। অ্যাশবি যখন এই বাড়ি, ও চারপাশে তাকায়, তার গর্ব হয় এটা ভেবে যে এটা এখনও আগের মতই সুন্দর ও স্বাধীন আছে। এটা তার একান্তই নিজের সম্পত্তি যেটার উপর সরকারের প্রভাব নেই, বা দর্শনার্থীদের টিকিটে পয়সায়ও চলতে হয় না। আর চলবেও না কোনো দিনও। গোটা ব্রিটেন জুড়ে ত্রিমন খুবই কম দেখা যায়।

পাথর ছিটানো রাস্তার শেষ মাথায় এসে থামল বেন্টলে ক্রমলা রঙের ইট আর জানালার দায়ী কাঁচে সূর্যের উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রবেশমুখে দুই বিরাট আকৃতির পাথরের মূর্তি, সমান আকার ও উচ্চতার প্রাঞ্চিসুটো যেন সতর্ক করে দিচ্ছে বহিরাগতদের, বা শক্তদের।

“একটা বিষয় একটু দেখতে হবে আমার, স্টাডিতে যাচ্ছি,” বাড়ির ভেতরে তারা পা রাখতেই ক্যারলাইন বলল।

ভালো। তার নিজেরও একটু চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। সে শিল্পহলকে নিয়ে নিজের স্টাডির দিকে রওনা হলো। ভেতরে চুকে ডেক্সের ওপাশে রাখা নিজের আসনে বসে পড়লো চুপচাপ। দিনটা একেবারেই বাজেভাবে গেল।

প্যারিস থেকে ফেরার পথে সে কোনো কথা বলেনি, যা হবার তা হবেই। তবে কথা এখন বলতেই হবে একজন মানুষের সাথে। ফোনের রিসিভারটা তুলে এলিজা লাঘকের নাহারে ডায়াল করল সে।

“আশা করছি আরও ভালো কোনো খবর দেবেন,” ওপার থেকে আসা প্রথম কথা।

“আসলে, দিতে পারছি না। বইটা ওখানে নেই। হতে পারে না যে ভেতরের কাজ করানোর সময় ওটাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে? ডিসপ্লেটা যেখানে থাকার কথা ছিল সেখানেই আছে, অন্যান্য জিনিসপত্রও দেখলাম, কিন্তু সেই মেরোভিনজিয়ান বইটা দেখলাম না শুধু।”

“আমার কাছে যে তথ্য ছিল সেই হিসেবে ওটা ওখানেই থাকার কথা।”

“নাহ, বইটা নেই ওখানে। আরেকটু দেখবেন ভালো করে?”

“অবশ্যই।”

“কাল সকালে প্যারিসে ফেরার পর, আমাদের মিটিংগের আগেই আপনার সাথে আলাদাভাবে কথা বলে নেব। হবে?”

“সাড়ে দশটা নাগাদ আমি পৌছে যাব টাওয়ারে।”

“ওকে, তাহলে এই কথাই থাকল। দেখা হচ্ছে কাল।”

ফোনটা রেখে আরেকবার ঘড়ি দেখে নিল অ্যাশবি।

হাতে সময় আছে চার ঘণ্টা, এর পরেই তার সাথে আমেরিকানদের যোগাযোগ করার কথা। সে ভেবেছিল, এই আলোচনাই শেষ আলোচনা হবে। একবার এলিজা, আরেকবার আমেরিকান করতে-করতে অধৈর্য ধরে গেছে তার। নেপোলিয়নের সম্পদ হাতানোর ধান্দা ছিল তার, হয়েছে। কিন্তু ইনভ্যালিয়েন্সের যে বইয়ের মাঝে সবচে বড় সমাধান আছে বলা হচ্ছে, সেটাই ফসকে গেল। আর এখন আমেরিকানরা পুরো ঘটনার নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে।

দর-কষাকষির কাজটা আজ রাতেই সারতে হবে মনে হচ্ছে তার।

আগামীকাল অনেক দেরি হয়ে যাবে।

ফোনটা রেখে এলিজা স্বভাবতই ভাবতে শুরু করল, ত্রিমারিক থ্রিভাল্টসেনের করা ভবিষ্যতবাণীর কথা। তাকে নিয়ে আমার ধারণা যদি কিন্তু হয়ে থাকে, তাহলে দেখবেন সে আপনাকে বলবে যে জিনিসটা, সেটা যা-ই হোক হাতে পায়নি, যেমন ওটা সেখানে ছিল না, বা এরকম কোনো অজুহাত দেখাবে। আর লাঞ্চ শেষে রেস্টুরেন্ট ছাড়ার ঠিক আগে যেটা বলেছিল সে সেটাও মনে পড়লো তার। এখন কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে সেটা বিচার করার ভার আপনার উপরেই থাকবে।

প্যারিস ক্লাবের বৈঠক যেখানে হয় সেখান থেকে ম্যারাইসের এই বাড়ি বেশী দূরে না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই বাড়িটি তাদের পরিবারের সম্পত্তি হয়, এখানেই সে সবচে নিরাপদ অনুভব করে। বড়ও হয়েছে এই চমৎকার দেওয়ালগুলোর মাঝে, এবং এখনও সব থেকে বেশী সময় কাটে এখানেই। ফ্রান্স সরকারের ভেতর থেকে তার এক তথ্যদাতা নিশ্চিত করেই জানিয়েছিল যে বইটা খুজেছে সে, সেটা জাদুঘরেই আছে। একটা কম গুরুত্বের ঐতিহাসিক বস্তু। কম গুরুত্বের বলতে, নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি বা তার উইলের কোথাও এটার কথা গুরুত্বের সাথে আসেনি। বলতে গেলে তাকে কোনো প্রশ্নই করেনি তার তথ্যদাতারা, এমনকি বইটা গায়েব হয়ে যাওয়ার পরও তাকে তারা কোনো প্রশ্ন করেনি কারণ তারা আরও আগে থেকে বেশ ভালো করেই জানে মুখ বন্ধ রাখার বিনিময়ে তাদেরকে কী পরিমাণ খুশি করা হয়ে থাকে।

থ্রিভান্ডসেনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে সে লে গ্র্যান্ড ভেফর হোটেল ছাড়ার পর থেকেই। একেবারে শুন্য থেকে উদয় হয়ে এই ডেনিশ বিলিয়নিয়ার যা বলছে তা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো না। প্যারিস ক্লাব সহ হাঁড়ির সব খবর জেনে বসে আছে এই ভদ্রলোক। তারপরও মনে যে দ্বিধা ছিল, সেটাও বলতে গেলে দূর হয়ে গিয়েছে দৈববাণীর সেই বইয়ের কারণে, যেখান থেকে লোকটার মনের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেছে সে। এখন অ্যাশবি ঠিক সেটাই করে দেখাল যেটা থ্রিভান্ডসেন ভবিষ্যতবাণী করেছিল। এর পরেও তার সতর্কবার্তাগুলো আমলে না নেওয়ার কোনো কারণই দেখেছে না এলিজা।

গতকাল থ্রিভান্ডসেনের দেওয়া টেলিফোন নাস্বারটা বের করে ফোন দিল সে। ওপাশ থেকে রিসিভ হতেই এলিজা প্রথমে বলল, “ভেবে দেখলাম, আপনাকে আমাদের দলে নেওয়া যেতে পারে।”

“ধন্য হলাম এমন উদারতায়। তার মানে কি ধরে নিতে পারি যে লর্ড অ্যাশবি আপনাকে একটু হতাশ করেছেন?”

“আসলে...বলা যায় সে আমার কৌতুহলটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কালকে সময় আছে আপনার হাতে? ক্লাবের সবাইকে নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সভা করছি আমারজন্ম।”

“আমি ইহুদী। ক্রিসমাস আমার জন্য উৎসবের দিন না।”

“আমার জন্যেও না। সকালে তাহলে দেখা হচ্ছে, লা স্যান্টেন্টাভ আইফেলে, টাওয়ারের প্রথম প্ল্যাটফর্মে, ঠিক এগারটায়। একটা জনসেশ খাবারদাবারের আয়োজনও করা হয়েছে, আলোচনার পর খাবারের পর্যবেক্ষণ হয়েছে, আয়োজনটা দারুণ লাগবে আপনার।”

“শুনতেই দারুণ লাগছে।”

“তাহলে আর কী, দেখা হচ্ছে কাল।”

ফোনটা রাখল এলিজা।

আগামীকাল।

এই দিনের জন্য সে দীর্ঘ সময় ধরে প্রতীক্ষা করছে। শত-শত বছর ধরে তার পূর্বপুরুষের চামড়ার বইগুলো থেকে যা শিখেছে সেই সব অজানা অধ্যায়গুলো তার দলের সবার সামনে তুলে ধরার পরিকল্পনা করেছে সে। কিছু বিষয় এলিজা থ্রিভান্ডসেনের সাথে আলোচনা করেছে লাঞ্চ সারতে-সারতে, তবে ইচ্ছে করেই আসল কথাগুলো উল্লেখ করেনি সে। শান্তি-ভিত্তিক সমাজে, যুদ্ধ ছাড়া ব্যাপকভাবে কোনো ভয় বা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়াটা, সেটা রাজনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, বৈজ্ঞানিক বা সাংস্কৃতিক, যেটাই হোক, প্রায় অসম্ভব। এখন পর্যন্ত এরকম কোনো প্রচেষ্টাই দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ঠিক ব্ল্যাক প্লেগের মতো, সারা দুনিয়ায় আতঙ্ক সৃষ্টি করল ঠিকই, কিন্তু খুব কাছে এসেও খুব বেশী কিছু করতে পারল না তার কারণ ওটার ভয়াবহতা বা ঠেকানোর সামর্থ্য কোনোটাই স্পষ্ট ছিল না মানুষের কাছে, তাই অনেকটা অবাস্তব বিষয় মনে করেছিল মানুষ এটাকে।

তার মানে একটা বিপদ বা হৃষকি সেটা নিয়ন্ত্রণযোগ্য হতে হবে, মানুষ তখন মনে করবে এই নিয়ন্ত্রণের জন্য সব রকম ছাড় দিতে তাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পরিকল্পনাটা এরকমই। জনগণকে আতঙ্কিত করে তাদেরকে বাধ্য করে তোলা-তারপর তাদের দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের ফায়দা লুটে নেওয়া। সবচে সেরা সমাধানটাই সবচে সহজ। একটা বিপদ আবিষ্কার করা। আর এরকম একটা পরিকল্পনা মানেই এর সাথে অসংখ্য পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা তৈরি হওয়া। ঠিক ৰাঢ়ৰাতিৰ আলো নিয়ন্ত্রণের একটা সুইচের মতো, তবে এটা অসীম ক্ষমতার, ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, যত ইচ্ছা সম্পদ বাঢ়ানো যাবে। আর সুখের কথা কথা হলো এই যে আজকের দুনিয়ায় ইতিমধ্যেই এমন একটা আতঙ্ক বা বিপদের সৃষ্টি হয়েছে যেটা মানুষের মনে স্থায়ী একটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে, মানুষ এখন তৎপর হয়ে উঠেছে এর বিরুদ্ধে।

আর সেটা হলো, সন্ত্রাসবাদ।

যেহেতু এটাকে খোদ আমেরিকাতেই বেশ বড় রকমের একটা হৃষকি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা গিয়েছে, তাই, এলিজা বলছিল থ্রান্ডসেনকে, অন্য দেশগুলোতেও এটা কাজ করবে।

পৈতৃকসূত্রে পাওয়া অমূল্য বইগুলোর বাণী কতটা সঠিক হয় সেটা আগামীকালই দেখতে পাবে এলিজা।

বহুকাল আগে নেপোলিয়ন নিজে যা করতে চেয়েছিল, সে নিজে এখন সেটাই করবে বাস্তবে।

দুইশ বছর ধরে এলিজার পরিবার অন্যের ঘরে স্থাগা আগুনে নিজেদের আলু পুড়িয়ে নিয়েছে। যখনই কেউ রাজনৈতিক গ্যাঁড়াক্ষেত্রে পড়েছে, তখন তার দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের ফায়দা লুটে নিয়েছে ভালো করে। পোজো ডি বোরগো পুরনো বইগুলো থেকে অনেক কিছুই খুঁজে বের করেছে, যেগুলো সে তার সন্তানদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে তার জীবন্দশায়, তারা আবার দিয়েছে তাদের সন্তানদের-এভাবেই চলে এসেছে। এখানে এটা গুরুত্বপূর্ণ না যে এগুলো কার আবিষ্কার, কথা একটাই-টাকার নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে মানেই আসল শক্তি তোমার হাতে।

আর এটা করতে কিছু ঘটনা ঘটাতে ও সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার।

আগামীকাল এটারই একটা পরীক্ষা হতে চলেছে।

আর যদি এতে কাজ হয়?

এমন পরীক্ষা চলবে আরও।

তেজপ্রিশ

লন্ডন

সন্দেশ ৬.৪০

একটু অঙ্ককার খুঁজছে অ্যাশবি, সাথে চারপাশের শ'খানেক মানুষের মুখের দিকে দৃষ্টি তার। হ্যারডস এর সবুজ ও সোনালী সুতোয় বোনা স্কার্ফে মোড়া কাউকে খুঁজে বের করার খেলা খেলতে হবে তার এখন। যারা এখন ভিড় জমিয়েছে চারদিকে, বোৰা যাচ্ছে যে তাদের বেশিরভাগই পর্যটক। তাদের গাইড বর্ণনা করে চলেছে এই স্থানের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি। প্রথমেই, অতি অবশ্যই, জ্যাক দ্য রিপারের কাহিনী। ইস্ট এন্ড নামের লন্ডনের এই জায়গায় একের পর এক “দুর্ভাগা” নাম দেওয়া পতিতারা খুন হতে থাকে নৃশংসভাবে। সেটা শুরু হয়েছিল ১৮৮৮ সালের অগাস্ট মাসে। গাইড ভুলোকটি সেই সময়ের চারপাশের গ্যাস দিয়ে জ্বালানো লাইট পোস্ট থেকে আসা আলো ও অসংখ্য গলির মাঝে আটকে থাকা আধারিতে ঘেরা আতঙ্কময় সময়টা বর্ণনা করছে সবার সামনে। কিভাবে মাতাল নারীগুলোকে হত্যা করে টুকরো-টুকরো করে ফেলে রাখত জ্যাক দ্য রিপার, সেটা সুন্দর বর্ণনায় আরও যেন ভয়াবহ লাঙ্ঘন্তে শুনতে।

নিঃশব্দে একটু হাসল অ্যাশবি।

রিপারকে মনে হলো যেন শুধু ভিন্দেশীদেরই আকৃষ্ট করতে পারছে তার গন্ধ দিয়ে। অ্যাশবি ভেবে কূল পায় না এই মানুষগুলো কি পয়সা খরচ করে নিজ দেশের এরকম কোনো খুনির গন্ধ শুনতে চাইত?

লন্ডনের পূর্ব দিকটায় আছে সে, জায়গাটা হোয়াইট্যাপেলে। ফুটপাথে ছুটে চলা মানুষের কোলাহল। বাম দিকে, রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে টাওয়ার অফ লন্ডন, এর হালকা তামাটে রঙের পাথরগুলো সোডিয়াম আলোয় ধূয়ে যাচ্ছে। এক সময় এখানে বিরাট এক পরিখা ছিল, কিন্তু এখন তা ঘাসে ঢেকে আছে, শীতের শিশির সেগুলোকে করে তুলেছে পান্নার মতো দৃঢ়তিময়। কাছ দিয়েই বয়ে যাওয়া থেমস নদী থেকে শীতল বাতাস এসে আটকা পড়ছে শহরে দালানকোঠার ফাঁদে।

“গুড ইভনিং, লর্ড অ্যাশবি।”

এক নারী এগিয়ে আসছে তার দিকে, ঠিক পাশ থেকেই, ছোটখাট গড়ন, চুল ছোট করে ছাঁটা, বয়স পঞ্চাশের শেষ বা ষাটের শুরুতে, ভাবভঙ্গিতে বোৰা যাচ্ছে আমেরিকান, সবুজ-সোনালী স্কার্ফ পরা। ঠিক যেভাবে বলা হয়েছিল তাকে।

যা-ই হোক।

“আপনি নতুন মনে হচ্ছে,” অ্যাশবির উত্তর।

“এখন আমি দায়িত্বে আছি।”

এই তথ্যে অ্যাশবি আরেকটু নড়েচড়ে দাঁড়াল।

এর আগে আমেরিকান ইন্টিলিজেন্সের সাথে লন্ডনের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত দেখা করতে হয়েছে তার। তারা তাকে কখনো নিয়ে গেছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, কখনো বা

শেক্সপিয়ারের আবাসভূমিতে, ওল্ড মেফেয়ারও বাদ যায়নি, কিন্তু এবার জ্যাক দ্য রিপারের খুনের রাজ্যে।

“আপনার পরিচয়?” হালকাভাবে জিজ্ঞেস করল অ্যাশবি।

“স্টেফানি নেলেই।”

দলটা একটু থামল, গাইডের মুখ থেকে আবারো বেরংচে কথার বর্ণা, এবারের বয়ান সামনের ভবনটা নিয়ে, যেখানে জ্যাক দ্য রিপারের শিকার হওয়া প্রথম নারীর মৃতদেহটা উদ্ধার করা হয়েছিল। স্টেফানি অ্যাশবির হাত ধরল শক্ত করে। বাকিরা গাইডের দিকে মনোযোগ দিতেই তারা ভিড় ঠেলে এগুতে লাগল।

“এখানে আসাটা আমাদের কাজের সাথে একেবারে দারুণ মিলে গেছে,” স্টেফানি বলল। “জ্যাক দ্য রিপার বহু মানুষকে আতঙ্কিত করেছে, কিন্তু কখনো ধরা যায়নি।”

এমন বিদ্রূপাত্মক কথায় হাসি পেলেও তা চেপে গেল সে। “আমার সাহায্য আপনাদের আর দরকার না হলে বলে দেন, চলে যাই।”

আবারো এগোতে শুরু করল তারা।

“মূল্য হিসেবে আপনাকে আমরা কি পরিশোধ করব জানেন? আপনার স্বাধীনতা। কিন্তু তার মানে এই না যে বিষয়টা আমার ভালো লাগছে।”

নিজেকে শাস্তি থাকতে বলল অ্যাশবি। এই মহিলা ও তার প্রজেপির কাছ থেকে কায়দা করে কমপক্ষে আরও চৰিশ ঘণ্টা বাগাতে হবে, অতএব এইটা খুঁজে বের করা পর্যন্ত ওদেরকে আটকাতে হবে।

“আমার মনে আছে যে আমাকে বলা হয়েছিল আমরা এই কাজে একসাথেই নেমেছি।” বলল অ্যাশবি।

“আজকেই আপনার তথ্য দেওয়ার কথা ছিল, আপনিই কথা দিয়েছিলেন। তাই আমি নিজেই এলাম আপনার মুখ থেকেই সব শুনতে।”

আরও একটা উল্লেখযোগ্য স্থানে থামল তারা।

“ইন্ড্যালিয়েদসের চার্চ অফ দ্য ডোম গির্জায় বোমা ফাটানোর পরিকল্পনা করছে পিটার লায়ন, আর সেটা আগামীকাল,” খুব নিচু গলায় বলল অ্যাশবি। “ক্রিসমাসের দিনে এটা করবে, একটা ছোট্ট নির্দর্শন হিসেবে।”

“কিসের নির্দর্শন?”

“এলিজা লাঘক একজন মারাত্মক গোঁড়া মহিলা। তার কাছে প্রাচীন এমন কিছু সম্পদ আছে যেগুলো তার পরিবার শত-শত বছর ধরে নিজেদের কজায় রেখেছে। বিষয়টা আমার কাছে বেশ অদ্ভুতুড়ে, এবং আমার কাজের সাথে যায়ও না। কিন্তু কথা হলো, ফ্রান্সের একটা মৌলবাদী দল আছে, যেরকমটা সব সময়ই থাকে, তাই না? তারা একটা পরিষ্কার বার্তা দিতে চাচ্ছে।”

“তা বুঝলাম, কিন্তু এবার কারা এমন করছে?”

“ফ্রান্সের বৈষম্যমূলক অভিবাসী আইনের শিকার হওয়া একদল মানুষ। মূলত এরা উত্তর আফ্রিকা থেকে এসেছে। অনেক বছর আগে থেকেই এরা আসছে ফ্রান্সে, প্রথম দিকে এদেরকে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে স্বাগত জানানো হলেও তারা এখন ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ। কিন্তু তাদের সেই স্বীকৃতি নেই, দেশের আইনটাই এমন। এখন তারা তাদের অবস্থানের বা ক্ষমতার পরিচায়ক এমন কিছু করতে চায় নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্য। এখন এগুলো করতে লাগবে টাকা, যেটা এলিজার আছে, কিন্তু সে এই টাকা ঢালার পেছনে কোনো নাম কামাতে চায় না, তাই পিটার লায়ন মাঝখানে থেকে দু'পক্ষের একটা মিল করিয়ে দিচ্ছে।”

“তো তার মাঝখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী?”

একটা শ্বাস ফেলল অ্যাশবি। “এটা কি বুঝতে পারছেন না আপনি? ফ্রান্স এখন একটা জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ঠিক মাঝখানে আছে। এখন এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যায় ঐ আফ্রিকান মানে আলজেরিয়া এবং মরক্কোর অভিবাসীরা একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এরা এখন যতটা না আফ্রিকান, তার চেয়ে বেশী ফ্রান্সের, কিন্তু পরদেশীদের প্রতি নাক সিটকাতে থাকা ক্ষমতাসীন দল ও ধর্মনিরেপেক্ষ বাম দল উভয়ই এই ভিন্নদেশীদের প্রতি ঘৃণার জন্ম দিয়েছে। এখন যদি তাদের জন্মহার ঘৃণ্ণন্তা যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে থাকে, তাহলে এই অভিবাসীরাই স্থানীয় ফরাসীদের ছাড়িয়ে যাবে।”

“হ্ম, কিন্তু বোমা মেরে ইনভ্যালিয়েদস উড়িয়ে দেওয়ার স্থাথে এর সম্পর্ক কী?”

“এটা তাদের উপস্থিতির একটা জানান দেওয়া। এই বহিরাগত মানুষগুলো তাদের এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবন-ব্যবস্থার প্রতি ক্ষুঁতি ক্ষুঁতি। তারা মসজিদ চায় উপাসনার জন্য। তাদের স্বাধীনতা চায়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অধিকার চায়, প্রভাব, প্রতিপত্তি, সবই চায়। অন্য সবার যা আছে সবই চায় এক কথায়। কিন্তু ফ্রান্সের জনগণ, মানে আদি ফরাসীদের কথা বলছি, চায় না তারাও সমঅধিকার পাক। আমি জানি, আমাকে বলা হয়েছে যে অনেক আইন পাস করা হয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র এই মানুষগুলোকে দূরে রাখতে।” একটা বিরতি নিল অ্যাশবি। “আর, ইহুদী-বিদ্রেও চরম আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে গোটা ফ্রান্সে। মুসা নবীর এই অনুসারীরা আরও একবার তাদের জীবন নিয়ে শক্তি।”

“এর জন্যেও কি এই সব অভিবাসীদেরকেই দায়ী করা হয়?”

কাঁধ জোড়া উচু করল অ্যাশবি। “হয়ত কিছুটা। তবে আমার কাছে আসল ঘটনা যেটা মনে হয় তা হলো এর জন্য ফ্রান্সের স্থানীয়রাই দায়ী বেশী। তবে গতানুগতিক চিন্তাধারার ক্ষমতাসীন দল ও চরমভাবাপন্ন বামপন্থি দল মিলে এই আফ্রিকানদের দোষারোপ করে একটা ভালো জিনিস বয়ে এনেছে। দেশে কোনো খারাপ কিছু ঘটলেই দোষ কার? সোজা উত্তর-আফ্রিকানদের।”

“আমি আমার উত্তর এখনও পেলাম না।”

আরও একটা দেখার মতো জায়গায় থামল তারা, গাইডও উপস্থিত সঙ্গীরবে।

“এলিজা একটা পরীক্ষা করতে চাইছে,” বলল অ্যাশবি। “ফ্রাসের অভ্যন্তরে জাতিগত আগ্রাসনকে আরও শক্তিশালী একটা রূপ দিতে চায় সে, তবে সেটা যুদ্ধের পর্যায়ের কিছু না। কিন্তু ভয়াবহতা ব্যাপক, এমন। আপনি জানেন যে নেপোলিয়ন হলো ফরাসীদের কাছে একজন নায়ক, এখন তাদের এই প্রিয় মানুষটার সমাধিসৌধে যদি হামলা করা হয় তার অর্থ এটাই হবে যে, যে বা যারা এই হামলা করেছে, সেই চরম্পত্তিরা অবশ্যই ফ্রাসের সার্বভৌমত্বকে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। এখন এলিজা তার এই অপচন্দের মানুষের মাজারে হামলা করলে এর সুত্র ধরে এটা একটা জাতিগত দাঙ্গায় পরিণত হবে। অন্তত এমনটাই তার বিশ্বাস, আর এভাবেই সে ব্যাখ্যা করে বিষয়টা।”

“নেপোলিয়নকে সে এত ঘৃণা করে কেন?”

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাশবি। “সেটা আমি কিভাবে জানব, বলুন? হতে পারে পারিবারিক চর্চা এটাও। মানে অনুমান করলাম। তার পূর্বপুরুষদের ভেতর একজন ছিল যে কর্সিকানদের নিয়ে একটা ভেঙ্গেটা চালিয়েছিল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে। আমি এই বিরোধের বিষয়টা এখনও বুঝি না।”

“হ্ম, তো এবার বলুন, প্যারিস ক্লাব কি আগামীকাল আইফেল টাওয়ারে মিটিং করছে?”

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল সে। “আপনি তো ভীষণ ব্যস্ত আছেন। তাই এটা নিয়ে আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করাটাই কি সমীচীন ছিল না? আপনি দেখতে পারতেন আমি কতটা সত্যবাদী।”

“আমি আসলেই ব্যস্ততার মাঝে আছি, আর আপনার একটা কথা বিশ্বাস করাও আমার প্রয়োজন নেই, করিও না।”

মাথাটা দোলাল অ্যাশবি। “বেশ নির্লজ্জ আরজ্যোভিক আপনি। জানতে পারি কেন এরকম আচরণ? আমি যতটা পেরেছি আপনার লোকদেরকে সাহায্য করেছি—”

“যখন আপনি করতে চেয়েছেন, শুধু তখন; এই যে হামলার ঘটনা আপনি জানতেন কিন্তু ইচ্ছে করেই বলেননি।”

“আপনিও ঠিক এটাই করতেন, আমার জায়গায় থাকলে। কিন্তু এখন তো আপনি জেনে গেলেন, হাতে সময়ও আছে পর্যাপ্ত, ঠেকানোর ব্যবস্থা করুন এটা।”

“আমি কিছুই জানি না। ঘটনাটা কিভাবে ঘটানো হবে?”

“কী ঘন্টণা! এই তথ্য আমি জানব কিভাবে? আমি কি ওদের কেউ?”

“আপনি-ই একমাত্র লোক যে পিটার লায়নের সাথে এটা নিয়ে দেন-দরবার করেছেন।”

“বিশ্বাস করুন, এই হারামিটা আমাকে কিছুই বলেনি এটা কিভাবে কী করতে যাচ্ছে ওরা। সে শুধু জানতে চেয়েছে টাকাটা তাকে পাঠানো হয়েছে কিনা, সেটা কখন। এর বাইরে একটা কোনো কথাও বলে নি আমাকে।”

“এতটুকুই?”

“ক্রিসমাসের জন্য ইনভ্যালিয়েদস বক্স থাকছে। আমার মনে হয় মানুষের জানমালের ক্ষতি নিয়ে ভাবতে হবে না অন্তত।”

স্বষ্টির উপস্থিতি দেখা গেল না মহিলাটির চোখে-মুখে। “প্যারিস ক্লাব নিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও দিলেন না।”

“আইফেল টাওয়ারে আগামীকাল সকালে আমরা বসছি। লেভেল ওয়ানে পুরো একটা কক্ষ ভাড়া নিয়েছে এলিজা, এবং দুপুর নাগাদ সবাইকে সেখানেই জড়ে করার পরিকল্পনা তার। আমি তো বলেছি-ই যে লায়ন সময় মেপে কাজ করতে ভালোবাসে। এখন দুপুর হলো সেই সময় যখন বিক্ষেপণটা হবে একদিকে, আর অন্য দিকে তারাও টাওয়ারের চূড়ায় থাকবে তখন। মানে বিষয়টা যেন নিজেদের সফলতার প্রথম ধাপকেই তুলে ধরছে।”

“দলের বাকি সদস্যরা কি জানে কি ঘটতে চলেছে?”

মাথাটা দোলাল সে। “মাথা খারাপ? কিছু জানে না। শুধু এলিজা এবং আমি আর আফ্রিকানরা। আমার মনে হয় ওদের বেশিরভাগই হতভম্ব হয়ে যাবে।”

“যদিও এখন থেকে ফায়দা লুটতে দ্বিধা করবে না তারা।”

তাদের গাইডটি আরও একটু এগিয়ে গেল সামনে। লভনের সবচেয়ে আঁধারময় পূর্বাঞ্চল এটা।

“লাভের পেছনে ছুটলে তখন আর নীতিজ্ঞান কাজ করে না।” অ্যাশবি বলল।

“বেশ, তো এখন ঠিক করে বলুন আমি যা জানতে চাই। লায়নের সাথে ঠিক কিভাবে যোগাযোগ করতে পারি আমরা?” প্রশ্ন করল স্টেফান।

“আমি যেভাবে করেছি সেভাবে।”

“নাহ, ঠিক সুবিধার হবে না। আমি চাই আক্ষেপেরিয়ে দেওয়া হোক।”

হাটা থামিয়ে দিল অ্যাশবি। “কোন আক্ষেপে আপনি এটা করতে বলেন আমাকে? আমি মাত্র একবার তাকে দেখেছি, আর সে পুরো ছদ্মবেশ নিয়েই এসেছিল। আর তার পছন্দমত জায়গায় সে দেখা করেছে।”

নিচু স্বরেই কথা বলছে তারা, হাঁটছে মূল দলের পিছু। গায়ে পুরু কোট আর হাতে মোজা থাকা সত্ত্বেও বেশ শীত করছে অ্যাশবির। প্রতিবার দম ছাড়তেই উষ্ণ বাতাসটুকু চোখের সামনে বাঞ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে।

“আমি নিশ্চিত আপনি চাইলেই কিছু করতে পারেন,” বলল মহিলাটি। “আপনাকে বিচারের মুখোমুখি করব না এটা বিবেচনা করলেই হবে আশা করি।”

না বলা হৃষিকষ্ট ভালোই ধরতে পারল সে। “আমাকে এভাবে ধন্য করার জন্যই কি আপনার আগমন আজ রাতে? আমাকে শাসাতে এসেছেন আপনি? আপনার চ্যালা-শাগরেদেরাই কি যথেষ্ট ছিল না এর জন্য?”

“খেলা তো শেষ, অ্যাশবি। আপনার প্রয়োজনীয়তা যা ছিল তা দ্রুতই ফুরিয়ে আসছে। এখন আমার পরামর্শ হলো আপনার মূল্য বাড়নোর জন্য আপনি কিছু করুন।

সেটা তো সে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে, কিন্তু এই ভদ্রমহিলাকে তা জানানোর কোনো মানেই হয় না। তাই জিজ্ঞেস করল, “কি কারণে আপনার লোকজন ইনভ্যালিয়েদস থেকে বইটা সরাল?”

হেসে দিল স্টেফানি। “আপনাকে এটা দেখাতে যে শেষ মুহূর্তের ব্যবস্থাপনায় একটু পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন নিয়ম প্রয়োগ হচ্ছে।”

“আপনার পেশার প্রতি আপনি খুবই আন্তরিক দেখছি, ভালো।”

“আপনি কি আসলেই বিশ্বাস করেন যে নেপোলিয়নের লুকিয়ে রাখা কোনো সম্পদ আছে?”

“এলিজা লাঘক দৃঢ়ভাবে করে।”

কোটের নিচে হাত চালিয়ে কিছু একটা বের করে এনে অ্যাশবির দিকে বাড়িয়ে দিল সে। “এটা আপনার প্রতি আমার বিশ্বাসের নিদর্শন, ধরুন।”

মোজায় মোড়া হাত দুটো দিয়ে বইটা নিল সে। কাছের কোনো ল্যাম্পপোস্ট থেকে আসা মন্দু আলোয় দেখতে পেল বইয়ের নামটা। *The Merovingian Kingdoms 450-551 A.D.*

এটাই ইনভ্যালিয়েদসের সেই বই।

“তাহলে এবার,” আরও কঠিন কঠ স্টেফানির, “আমি যা চান্তি তার ব্যবস্থা করেন।”

টেন বেলস এর পানশালার কাছে পৌঁছাতেই তাদের গ্রাইড তাদেরকে ব্যাখ্যা করল যে কিভাবে এই ভবনটা জ্যাক দ্য রিপারকে হত্যাকাণ্ডে তালাতে সাহায্য করেছিল, সন্তুষ্ট সে নিজেও এখানে থাকত। পনের মিনিটের একটা ঘোষণা এল, বলা হলো পানিয়ের ব্যবস্থা আছে ভেতরে।

স্যালেন হলে ক্যারলাইনের কাছে ফেরা উচিত তার। “আমাদের কাজ শেষ হয়েছে?”

“আগামীকাল পর্যন্ত শেষ

“আমার সাধ্যের ভেতর যতটা করার আমি করব, চেষ্টা করব যেটা আপনি চান তা এনে দিতে।”

“আমিও সেটাই আশা করছি,” স্টেফানি বলল। “আপনার নিজের কথা ভেবে হলেও করুন।”

এটাই ছিল তার শেষ কথা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁটে সামনের আঁধারে মিশে গেল সে।

বইটার দিকে চোখ দিল অ্যাশবি। অবশ্যে জায়গার ঘূট জায়গায় ফিরে আসছে।

“গুড ইভনিং, লর্ড অ্যাশবি।”

অনাকাঙ্খিত একটা কঠ ভেসে এল তার ডান দিক থেকে। গলার আওয়াজটা বেশ নিচু আর গম্ভির ধরনের। তার পায়ের জুতো জোড়াও একটা ছন্দময় শব্দ তুলছে পথের উপর। ঘুরে গেল অ্যাশবি। স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোয় যাকে দেখা গেল তার চুলগুলো লালচে, পাতলা ভু। নাকটা দুগলের ঠোটের মতো বাঁকা, মুখে দাগ ভরা, এবং

চোখে চশমা। চারপাশের অন্যান্যদের মতই পোশাক জড়িয়েছে সে-মোটা কোট, মাফলার, হাতমোজা-সবই আছে। এক হাতে সেলফিজ শপিং ব্যাগের দড়ি ধরা।

চোখ জোড়া দেখতে পেল অ্যাশবি।

যেন জুলন্ত শিখা।

“আপনি একই বেশে বারবার চলেন কখনো?” অ্যাশবি জিজেস করল পিটার লায়নকে।

“না, বলতে গেলে।”

“কোনো পরিচয় ছাড়া চলাটা তো বেশ কঠিন কাজ।”

“পরিচয় নিয়ে আমার কোনো সমস্যা হয় না। আমি খুব ভালো করেই জানি আমি কে এবং কী।” কষ্টে এবার প্রায় পরিপূর্ণ আমেরিকান টান।

অ্যাশবির চিন্তা হচ্ছে এখন। পিটার লায়নের এখানে থাকা উচিত না।

“আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে, লর্ড অ্যাশবি।”

চুয়ান্ত্রিশ

প্যারিস, রাত ৮.৫০

সর্পিলাকারের একটা সিঁড়ি ধরে মিগ্যানের পেছন-পেছন নিচে নামছে স্যাম। স্টেফানি নেলেই এর সংরক্ষিত হাজতখানা থেকে অনুমতি পাওয়ার প্রদুর্জনে খাবার খেয়ে নিয়েছে ল্যাটিন কুয়ারটারের একটা ক্যাফে থেকে।

“আমরা যাচ্ছি কোথায়?” গাঢ় অঙ্ককার ধরে নামতে-নামতে জিজেস করল স্যাম।

“প্যারিসের বেজমেন্টে,” উত্তর দিল মিগ্যান।

মেয়েটা হাতে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে সামনে থেকে পথ দেখাচ্ছে। অঙ্ককার গাঢ় হলেও আলোটা পথ চলার পক্ষে যথেষ্ট। একেবারে নিচে পৌছানৱ পর, আরেকটা লাইট স্যামের দিকে এগিয়ে দিল সে। “আমাদের মতো যারা বেআইনিভাবে এখানে আসে তারা লাইট রাখে না কাছে।”

“বেআইনি বলতে?”

স্যামের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। “এখানে আসাটা অবৈধ।”

“এখানে বলতে, কী আছে এখানে?”

“খনি। একশ সন্তুর মাইলের সুড়ঙ্গ। লাইমস্টোন সংগ্রহ করা হত এখান থেকে, যা দিয়ে বিল্ডিং বানানো, প্লাস্টারের জন্য জিপসাম বানানো, ইটের জন্য মাটি ও ছাদের টাইলস বানানো হত। প্যারিসকে তৈরি করতে যা-যা লাগে, সবই নেওয়া হয়েছে এখান থেকে, আর এখন এটা পড়ে আছে। দ্য প্যারিস আন্ডারগ্রাউন্ড।”

“তা আমরা এখানে কী কাজে?”

কাঁধ ঝাঁকাল সে। “আমার ভালো লাগে জায়গাটা। ভাবলাম তোমারও লাগতে পারে।”

আরও একটু সামনে এগিয়ে গেল মিগ্যান। স্যাতস্যাতে চারপাশ, ভালো করে দেখলে বোৰা যায় কঠিন পাথর কেটে এটা বানানো হয়েছে, ভেতরে সাদা রঙের ফ্রেমও আছে যেগুলো, মনে হচ্ছে যেন, ভেতরে দেওয়ালও ছাদকে ধরে রেখেছে। বাতাসটা ঠাণ্ডা তবে পুরো শীতল না, মেঝেটা অমসৃণ, বোৰার উপায় নেই কোথায় কেমন।

“ইঁদুর দেখে চল,” সতর্ক করল মিগ্যান। “ওদের থেকে লেপটো-স্পাইরোসিস রোগ হয়।”

থামল স্যাম। “মানে কী?”

“ঐ এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াবাহিত রোগ। লোকজন মরে এতে।”

“মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?”

এবার মিগ্যান থামল। “ভয় নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ওদের কোনো একটাকে কামড়ানোর সুযোগ না দিচ্ছ, আর হ্যাঁ, ওদের হিশতে তোমার হাত লাগলেও এটা হতে পারে।”

“এখানে কী করছি বললে না?”

“তুমি কি সব সময়ই এত নার্ভাস আর ছটফটে? দেখে যাবোকী করি। একটা জিনিস দেখাব তোমাকে।”

আবারো করিডোরের দিকে ফিরল তারা, মাথার ওপরেই ছাদ ছুইছুই করছে। লাইটের আলোয় সামনের পঞ্চাশ ফিটের মতো দেখা যাচ্ছে ভালো।

“নরম্বোম,” অঙ্ককারে তাকিয়ে ডাক দিল স্যাম।

কেন যে লোকটার অবাধ্য হয়ে এখানে এল সে। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের লোভটা সামলানো কঠিন ছিল। গুহাটা স্কুল থেকে দুরেও না বেশী, আর সবাই এটার কথা জানেও। কিন্তু মজার কথা হলো কেউই এটাকে এতিমখানা বলে না, বলে স্কুল। সব সময়ই এই নাম, বা ইন্সটিউট নাম। কারা তার বাবা-মা? কোনো ধারণাই নেই তার। জন্মের পরেই তাকে ফেলে দেওয়া হয়, এবং ক্রাইস্টচার্চ পর্যন্ত কিভাবে সে এল, কার মাধ্যমে এল তারও হিসেব দেয়নি পুলিশ। স্কুল থেকে শুধু শেখান হয়েছে যে সবাই যেন নিজের দিকেই খেয়াল দেয়। কোনো রহস্যের সমাধান বা গোপন কিছু উদ্ধারে নামা বারণ। তার কাছে নিয়মটা ভালোই লাগে, কিন্তু তার মনে জানার যে তৃষ্ণা, সেটা মেটানোর মতো কিছুই নেই এখানে।

“স্যাম।”

নরম্বোমের গলা।

সে শুনেছে যে প্রথম এই স্কুলে আসার পর তার স্যাম কলিঙ্গ নামটা নরম্বোমেরই রাখা, যার এক প্রিয় চাচার নাম ছিল এটা।

“আপনি কোথায়?” অঙ্ককারের দিকেই চিংকার দিল সে।

“এই তো, কাছেই।”

আলোটা সোজা ধরে সামনে এগিয়ে গেল সে।

“এই তো চলে এসেছি,” মিগ্যান বলল। সুড়ঙ্গটা এখন মিসেছে বিরাট এক গ্যালারীতে যেটার গায়ে বেশ কিছু পথ দেখা গেল যেগুলো দিয়ে বাইরে বের হওয়া যাবে। দেওয়ালগুলো নানান রকমের ছবি, তেলচিত্র, কার্টুন, মোজাইক, কবিতা এমনকি গানের কথাও আছে পুরো গ্যালারীর অমস্ত দেওয়াল জুড়ে। সিলিঙ্গটা বেশ উঁচু এখানটায়।

“সামাজিক ইতিহাসের একটা কলেজ এটা, বুঝলে?” বলল মিগ্যান। “এই ড্রয়িংগুলো যা দেখছ, তার অনেকগুলোই ফরাসি বিপ্লবের সময়কার, কিছু আছে উনিশ শতকের শেষের দিকের প্রশিয়ান শাসনামলের, আর বাকিগুলো চল্লিশের দশকের জার্মান শাসনের সময়ের। যুদ্ধ, মৃত্যু, কিংবা ধ্বংস-যেকোনো রকমের দুর্ঘাগে এই প্যারিস আভারঘাউড সব সময়ই একটা নিরাপদ স্থানের দায়িত্ব পালন করেছে।”

চারপাশে চোখ বুলানোর মাঝেই কথা শুনছে স্যাম। তবে একটা ছবিতে দৃষ্টি আটকে গেল তার। একটা গিলাটিনের ছবি ওটা।

“*Grande Terreur* এর একটা চিত্র এটা,” কাঁধের উপর দিয়ে কঁপিছে দিল মেয়েটা। “দু’শ বছরের পুরনো। এটা সেই সময়ের ভয়াবহতার একটা প্রমাণ বলতে পার, খুন, জখম এগুলো ছিল এখনকার নিত্য ঘটনা। যে ছবিটা দেখছ সেটা ব্যাক স্মোক দিয়ে করা। খনিতে যারা তখনকার দিনে কাজ করত কাছে মোমবাতি আর তেলের কুপি থাকত। তারা শিখাগুলো পাথরের কাছকাছি রাখত, আর তাপ পেয়ে পাথরের গায়ে কার্বনের কালো প্রলেপ পড়ত। তার উপরেই আঁকাআঁকি। বুদ্ধিটা বেশ।”

হাতের আলোটা আরেকটা ছবির উপর ফেলল স্যাম। “এটা কি ফরাসি বিপ্লবের সময়ের?”

সায় দিল মিগ্যান। “এটা একটা টাইম ক্যাপসুল, স্যাম। কয়েকশ বছরের ঘটনা আটকে আছে এখানে। সম্পূর্ণ আভারঘাউড জুড়েই এরকম করা। এখন বুঝেছ কেন এটা আমার পছন্দের জায়গা?”

ছবিগুলো দেখেই চলেছে স্যাম। বেশিরভাগই খুব মন খারাপ করে দেওয়ার মতো, কিন্তু কৌতুক বা বিদ্রূপাত্মক চিত্রও আছে বেশ। সাথে অল্প কিছু হালকা মানের পর্ণগ্রাফিক শিল্পকর্মও দেখা গেল।

“আসলে একটা অসাধারণ জায়গা এটা।” অন্ধকারের দিকে তাকিয়েই বলল মিগ্যান। “এখানে প্রচুর আসি আমি। কেমন শাস্তি আর নিরিবিলি দেখ। যেন মায়ের গর্ভের ভেতর ফেরত এলাম। এখান থেকে উপরের জগতে ফিরে গেলে, আমার কাছে মনে হয়, যেন নতুন করে জন্ম হলো আমার।”

নিজেকে এমন মেলে ধরতে দেখে অবাক হলো স্যাম। মেয়েটার বাইরের আবরণটা যত দৃঢ়ই হোক না কেন, দুর্বল স্থান ভেতরে আছেই, আর সেটা এখন বেশ স্পষ্ট-খুব ভালো করেই বুঝে গেল স্যাম।

“তুমি ভয় পাচ্ছ, তাই না?”

তার দিকে ফিরে তাকাল মেয়েটা। হাতের আলোতে তার চোখের মাঝে থাকা নির্ভেজাল আন্তরিকতাটা স্পষ্ট বোধ যাচ্ছে এখন। “তুমি জানো, আমি ভয় পাচ্ছি।”

“ভয় আমিও পাচ্ছি।”

“একটু ভয় পাওয়াটা খারাপ কিছু না,” তাকে খুঁজে পাওয়ার পর নরস্ট্রাম বলেছিল তাকে। “কিন্তু এই গুহায় তোমার একা আসাটা ঠিক হয়নি।”

এটা ভালোই বুঝতে পারছে সে এখন।

“ভয়কে বন্ধু ভাবতে শেখ,” বলল নরস্ট্রাম। “সব সময় তোমার সাথেই রাখবে, জীবনে যখন যেরকমই সংগ্রাম আসুক। এটাই তোমাকে আরও ধারালো, আরও চতুর করে তুলবে।”

“কিন্তু আমি তো ভয় পেতে চাই না। আই জাস্ট হেইট ইট।”

কাঁধের উপর একটা হাত রাখল নরস্ট্রাম। “সব আমাদের ইচ্ছে~~মন্ত্র~~ হয় না, স্যাম। পরিবেশ, পরিস্থিতিই এরকম ভয়ের জন্য দেয়। এখন তুমি কিভাবে সেটার সাথে পেরে উঠবে সেটা সম্পূর্ণই তোমার হাতে, তোমার নিয়ন্ত্রণে। সেটার ওপরেই মনোযোগ দিতে শেখ, ভয়ের উপরে না। বিজয় তোমার হবেই সব সময়।”

মেয়েটার কাঁধের উপর আলতো করে হাতটা রাখল স্ট্রাম। এবারই প্রথম মেয়েটা নিজেকে সরিয়ে নিল না।

নিজে ভীষণ অবাক, ও একই সাথে ভালো লাগজি তার।

“কিছু হবে না আমাদের, সব ঠিক হয়ে যাবে।” অভয় দিল স্যাম।

“গতকালকে, মিউজিয়ামের ঐ লোকগুলো আমাকে মেরেই ফেলত আমার মনে হয়।”

“এই কারণেই তুমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলে তখন, তাই না? আমি তো চোখের সামনেই দেখলাম সব।”

একটু ইতস্তত করে, তারপর মেনে নিল স্যামের কথাটা।

তার এই স্বীকারোভিতে সন্তুষ্ট হলো স্যাম। “মনে হচ্ছে আমরা দু'জনেই বেশ ভালো প্যাঁচে পড়েছি।”

হাসল মেয়েটা। “তাই তো দেখছি।”

হাতটা সরিয়ে নিয়ে এক মুহূর্ত ভেবে নিল স্যাম। মেয়েটা তার ভেতরের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছে। গত এক বছর ধরে এর সাথে অনেক মেইল চালাচালি হয়েছে স্যামের। সব সময় সে জেনে এসেছে জিমি ফড়েল নামক এক লোকের সাথেই সে কথা বলে। কিন্তু কী অদ্ভুত, ইন্টারনেটের উপর প্রাপ্তে সে একজন নারী, যে মনে করত

নিজের বক্তব্য দিয়ে কাউকে হয়ত উপকার করছে, কিন্তু স্যামের কাছে এটাই স্পষ্টির ছিল যে সমমনা কারও সাথে যোগাযোগ আছে তার।

আলোটা দিয়ে একটা দিকে দেখাল মিগ্যান। “ঐ করিডোরগুলো পার হয়ে গেলেই গণকবর। ষাট লক্ষ মানুষের হাড়গোড় এক জায়গায় জড় করা। দেখেছ কখনো?”

মাথাটা দোলাল স্যাম, দেখেনি।

“না দেখাই ভালো।”

চুপ করে থাকল সে।

“এই ছবিগুলো,” বলে গেল মিগ্যান, “সাধারণ মানুষেরই আঁকা। কিন্তু দেখ, এগুলো এখন সবই ইতিহাসের সচিত্র বর্ণনা। এই দেয়ালগুলো মাইলের পর মাইল জুড়ে ঢেকে আছে ছবিতে। মানুষের জীবন, সময়, ভয় আর কুসংস্কার ফুটে উঠেছে এখানে। এগুলো সবই দলিল, ইতিহাসের দলিল।” একটা বিরতি নিল সে। “আমাদের এখনও একটা সুযোগ আছে, স্যাম, সত্যিই কিছু করতে পারি আমরা। এমন কিছু যেটা অনেক বড় একটা পরিবর্তন আনতে পারে।”

মানুষ দু'জনের মাঝে অনেক মিল আছে। মানুষের প্রতি তীব্র নেতৃত্বশীল চিন্তা ও জন্মনা-কল্পনার মিশেলে গড়া এক জগতে বসবাস দু'জনেরই। এবং উভয়ই ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে।

“তাহলে চল, সেটাই করা যাক,” স্যাম বলল শক্তি সঞ্চয় করে।

আবারো হাসল মেয়েটা। “আহারে, এত সোজা ঘটে হত সব। আমার মনে একটা খারাপ কথা আসছে এটা নিয়ে।”

তাকে দেখে মনে হলো এই মাটির নিচে আল্টোর পর ভেতরে বেশ শক্তি অর্জন করেছে এখান থেকে। শুধু তা-ই না, কিছু প্রজ্ঞাও বৃদ্ধি পেয়েছে যেন।

“কি সেটা, তা বলার ইচ্ছা হবে?”

মাথাটা দোলাল মেয়েটা। “নাহ, পারব না, সত্যি বলতে। শুধু মনে হচ্ছে কেমন যেন, তাই বললাম।”

বলেই কাছে এগিয়ে এল সে। মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে স্যাম। “তুমি কি জানো যে একবার চুমু খেলে তিন মিনিট আয়ু কমে যায়?”

কিসের ভেতর কী কথা, ভাবল স্যাম। তারপর মাথা নাড়ল, জানে না।

“গালের দুই পাশে ওরকম সাধারণ চুমু না। একেবারে আসল চুমু, মানে তুমি যেরকম বুঝছ সেরকম। এরকম একটা চুমু বুকের ধড়ফড়নি এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, আমাদের হৃৎপিণ্ড তখন চার সেকেন্ডে যতটা কাজ করে সাধারণ অবস্থায় তিন মিনিটে সেটা করত।”

“সত্যি? এখন?”

“একটা গবেষণা হয়েছিল এটা নিয়ে। আরে ধ্যাত, সবকিছু নিয়েই গবেষণা হয়, স্যাম। তো হিসেব করে দেখা গেল, ৪৮০ টা চুমু, মানে তোমার সেই কঠিন চুমু,

একজনের আয় কমাতে পুরো একটা দিন। ২৩০০ টা মানে এক সপ্তাহ নেই তোমার জীবন থেকে। আর তাহলে ১২০০০০ হলে? পাক্ষা এক বছর।”

আরও এগিয়ে এল সে।

বুকে ধড়ফড়ানি, মুখে হালকা হাসি স্যামের। “তো এতে কী বোঝাতে চাইছ এখন?”

“আমার জীবন থেকে তিনটে মিনিট কাটা যাক, আমি রাজি, এখন তুমি কবুল বললেই হয়।”

পঁয়তাল্লিশ

লভন

ম্যালন দেখল রাতের অন্ধকারে স্টেফানি হারিয়ে যেতেই আরেকজন লোক গ্রাহাম অ্যাশবির দিকে এগিয়ে গেল, হাতে সেলফুজের শপিং ব্যাগ। দর্শনার্থীদের দলের ভেতরেই ম্যালন ছিল এতটা সময়। তার দায়িত্ব ছিল স্টেফানির নিরাপত্তা দেওয়া, চারপাশে সজাগ দৃষ্টি রাখা। তবে এতক্ষণে মনে হচ্ছে বিশেষ কিছু একটা পেতে চলেছে তারা।

অ্যাশবির নতুন এই সঙ্গীর বৈশিষ্ট্যগুলো টুকে নিতে শুরু করল ম্যালন।

লালচে চুল, পাতলা নাক, মাঝারি গড়ন, ওজন হতে পাঁচে ষো থেকে ৮০ কেজির মধ্যে, পোশাক উপস্থিত বাকি লোকজনের মতো-উল্লের পেটা কোট, মাফলার, হাতে মোজা। কিন্তু কিছু একটা আছে তার মাঝে যার জন্মে সবার সাথে মিশছে না।

দর্শনার্থীদের বেশীরভাগই টেন বেলস প্রেস গোনশালায় চুকেছে, নানা রকমের কথার স্রোত বাইরে এসে আছড়ে পড়ছে একসাথে। ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা হাঁক দিয়ে জ্যাক দ্য রিপার টি-শার্ট বিক্রি করছে, কেউ বা স্মারক হিসেবে রেখে দেওয়ার নানান ডিজাইনের ঘগ। অ্যাশবি এবং স্যামের মাঝে বেশ কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ। চারদিকে ফ্ল্যাশলাইট জলছে হরদম, পানশালার সুসজ্জিত ফটকের সামনে পাল্লা দিয়ে চলছে ছবি তোলা, জায়গাটা ঘিরে আঁধারের ছিটেফোঁটা নেই। সে নিজেও সেই হৈ-হল্লোড়ে চুকে গেল, এবং এক বিক্রেতার কাছ থেকে একটা টি-শার্ট কিনল ধীরে সুস্থে।

▲

অ্যাশবির মাথায় দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে।

“মনে হলো, আজ রাতে কথা বলাই সবচে ভালো হবে,” পিটার লায়ন বলল তাকে।

“আমি যে এখানে, সেটা আপনি জানলেন কী করে?”

“একটা মহিলাকে দেখলাম। আপনার পরিচিত?”

স্টেফানির নেলেই এর সাথে হওয়া আলোচনার কথা মনে পড়ে গেল তার। যথাসম্ভব নিচু স্বরেই কথা বলেছে তারা, এবং মূল ইউগোল থেকে একটু দুরেও ছিল দু'জনে। ধারে-কাছে কাউকেই দেখেনি তখন। তারপরও কি লায়ন কিছু শুনে ফেলেছে তাদের কথা?

“অনেক ভদ্রমহিলার সাথেই আমার পরিচয় আছে।”

হাসল লায়ন। “হ্যাঁ, তা আমি জানি, আছে। নারীরা সর্বোৎকৃষ্ট সুখের সরবরাহ করে, আর সবচে বাজে সমস্যারও।”

“আমাকে খুঁজে পেলেন কী করে?” আবারো জিজ্ঞেস করল সে।

“আপনি কী যে আপনার কাজকর্ম, গতিবিধি-এগুলোর উপর আমি নজর রাখব না?”

পা জোড়া কাঁপতে শুরু করল তার, আর সেটা শীতের কারণে না।

রাস্তার অপর প্রান্তের দিকে হাঁটা শুরু করল লায়ন, জায়গাটা পানশালার বিপরীত দিকে, খুব অল্প কিছু মানুষ সেখানে, আর কোনো আলোও জ্বলছে না। কম্পমান পা দুটো অনুসরণ করছে লায়নকে, কিন্তু ভয় লাগলেও অ্যাশবি এটা বুঝতে পারল যে লায়ন এখানে, এত মানুষের সামনে কোনো অঘটন ঘটাবে না।

তাহলে কী করবে সে?

“শুরু থেকেই আমেরিকানদের সাথে আপনার যোগাযোগের প্রবলয়ে আমি সতর্ক ছিলাম,” লায়ন বলল অ্যাশবিকে, খুব নিচু ও নিয়ন্ত্রিত প্রসঙ্গে। “নিজেকে আপনি অনেক সেয়ানা মনে করেন, খুবই অবাক হলাম আপনার কথাজে।”

মিথ্যে বলার সুযোগ নেই। “আমার বিকল্প কোনো পথ ছিল না।”

কাঁধ ঝাঁকাল লায়ন। “আমাদের সবার-ই ক্ষেত্রে না কোনো পথ থাকে, তবে আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমার প্রয়োজন আপনার টাকা, আর আপনার প্রয়োজন আমার সেবা, ব্যস। আর আমার মনে হয় আপনি এখনও সেটাই চান, ঠিক?

“হ্যাঁ, যেকোনো সময়ের চাইতেই বেশী।”

অ্যাশবির দিকে আঙুল উঁচিয়ে ধরল লায়ন। “তাহলে রেগুলার ফি-টা তিনগুণ হতে হবে। প্রথম ভাগটা আমার সাথে বেঙ্গমানির জন্য, আর দ্বিতীয়টা আমায় ঝামেলায় ফেলার জন্য।”

দর কষাকষির পরিস্থিতিতে এখন নেই অ্যাশবি। আর তাছাড়া, সে তো ক্লাবের টাকাই খরচ করছে। “সে ব্যবস্থা করা যাবে।”

“মেয়েটা একটা বই দিয়েছে দেখলাম কিসের সেটা?”

“এটাও কি নতুন আয়োজনের অংশ? আমার সব কাজের খবরই কি আপনার রাখতে হবে?”

“লর্ড অ্যাশবি, আপনি জানেন না আমি খুব কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছি, একটা বুলেট আপনার দুই চোখের মাঝখানে ভরে দেওয়ায় জন্য হাত নিশ্চিপ্ত করছে। যাদের

কোনো চরিত্রই নেই, তাদের দেখলে আমার বমি আসে। আর মিস্টার, সেই চরিত্র আপনারও নেই।”

চোরের মায়ের বড় গলা, শালা নিজে খুনোখুনিতে ওস্তাদ, এখন আবার চরিত্রের বয়ান দেয়। কিন্তু ভেতরের কথাগুলো বাইরে আনার কোনো মানেই হয় না অ্যাশবির।

“যদি আপনার টাকা-পয়সার সাথে এর কোনো যোগাযোগ না থাকে,” বিরতি নিল লায়ন। “দয়া করে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার চেষ্টা করবেন না।”

লোকটার উপদেশ মেনে নিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিল অ্যাশবি। “এটা একটা প্রজেক্ট, বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছি এটা নিয়ে। একটা গুণ্ঠনের খোঁজ। এখন ঐ আমেরিকানরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁ হাতিয়ে নিয়েছে যেটা আমার দরকার। ওরা তো আর সেটা এমনিতেই দেবে না, তাই আমাকে ওদের বাধ্য রাখতেই ওটা আমার কাছে দিয়েছে।”

“গুণ্ঠন? আমি জানতাম আপনি বড় মাপের এক সংগ্রাহক ছিলেন এক সময়ে। চুরি যাওয়া জিনিস আবার চুরি করতেন। সেগুলো রেখে দিতেন নিজের জন্য। ভালোই বুদ্ধি আছে, মানতেই হবে। কিন্তু পুলিশ মাঝখানে একবার বাগড়া দিল।”

“ওটা সাময়িক।”

হাসল লায়ন। “ঠিক আছে, লর্ড অ্যাশবি, আপনি আপনার গুণ্ঠন খোজেন। কিন্তু টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েন। সকালের আগেই। আমি চেক করতে থাকুন, সব ঘটনা ঘটতে শুরু হওয়ার আগে।

“ওটা চলে যাবে ওখানে।”

গাইডের কষ্ট শোনা গেল, সবাইকে ডাকছে নেওয়া বলছে সামনে এগিয়ে বাকি স্থানগুলো দেখতে হবে।

“ওদের সাথেই যাব ভাবছি,” লায়ন বলল। “জ্যাক দ্য রিপারকে বেশ মজার লাগছে।”

“আগামীকালের কী হবে? জানেনই তো, আমেরিকানরা সবই দেখছে।”

“ওটা আমার কাজ। কালকেই দেখবেন, দেখার মতো হবে ওটা।”

▲

লাল চুলের লোকটা গাইডের সাথে যোগ দিতেই আবারো ভিড়ের সাথে মিশে গেল ম্যালন। অঙ্ককারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। লালচুলোকে দৃষ্টিসীমার মাঝে রেখেই এগুচ্ছে ম্যালন, তার কাছে এখন অ্যাশবির থেকে এই লোকটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ঘুটঘুটে অঙ্ককার ধরে আরও কুড়ি মিনিট হাঁটল দলটি, থামল আভারগ্রাউন্ড স্টেশনে। লালচুলের লোকটি তার ট্রাভেল কার্ড ব্যবহার করে টারপ্টাইলের ঘূর্ণায়মান দরজাটা পার হয়ে গেল। ম্যালন দ্রুত টোকেন মেশিন থেকে চারটা বোর্ডিং পাস নিল, তারপর দ্রুত এক্সেলেটরের দিকে এগিয়ে গেল, তার টার্গেট এখন এক্সেলেটর থেকে

নেমে গেছে। অনেক আলো ঐ দিকটায়, কিন্তু এখন আর আড়ালে থেকে চোখ রাখা যাচ্ছে না। ম্যালনও দ্রুত নেমে গেল এক্সেলেটর ধরে।

মাত্র কুড়ি ফিট দূরে দাঁড়িয়ে আছে ম্যালন তার থেকে।

ইলেক্ট্রনিক বিলবোর্ড দেখাচ্ছে পরবর্তী ট্রেনটা মাত্র ৭৫ সেকেন্ড দূরে। দেওয়ালে টানানো পাতাল ট্রেনের পথ-চিত্রটা দেখে নিল ম্যালন। এই স্টেশন থেকে আন্তঃজেলা ট্রেন চলাচল করে, দেখা যাচ্ছে লাইনটা থেমস নদীর সমান্তরালে গিয়ে পূর্বাঞ্চল থেকে সরাসরি পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে থেমেছে। এই প্লাটফর্মটা পশ্চিমমুখী যাত্রীদের জন্য। এখন থেকে ট্রেনে চাপলে সেটা টাওয়ার হিল হয়ে ওয়েস্টমিনিস্টারের নিচ দিয়ে, ভিস্টোরিয়া স্টেশন পার হয়ে কেঙ্গিংটন অতিক্রম করবে।

ট্রেন চলে এসেছে, আরও যাত্রী নিচের প্লাটফর্মে জড় হয়েছে।

একটা দূরত্ব রেখে চলছে ম্যালন। তার লোকটা এখন বগির ভেতর চুকেছে, ম্যালনও একই কাজ করল। তারপর থেমে স্টিলের একটা পোল ধরে দাঁড়াল সে, টার্গেট তার থেকে ত্রিশ ফিটের মতো দূরে, একইভাবে দাঁড়ানো সেও। এত লোক চারপাশে যে নির্দিষ্ট একটা মুখের দিকে খেয়াল করে থাকাটা কঠিন।

ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে শহরের নিচ দিয়ে, আরও একবার দেখে ট্রেন ম্যালন তার টার্গেটিকে। বয়স নেহায়েত কম না, সান্ধ্যকালীন ভৰ্মনে বের হয়েছে হয়ত লড়ন শহরে।

চোখ দুটো ভালো করে দেখতে পেল এবার।

হলুদ আর কমলার মাঝামাঝি একটা রঙ। অ্যাম্বার, ম্যাজেন ভাবল।

সে জানে পিটার লায়নের মাঝে একটা ব্যতিকূল বিষয় আছে। যতই ছদ্মবেশ নিয়ে চলুক সে, চোখের এই জেনেটিক খুঁত আকে সবার থেকেই আলাদা করে দিয়েছে। শুধু তাই না, সে কন্ট্রু লেসও পড়তে পারে না তার প্রতি সন্দেহ বেড়ে যেতে পারে এই ভয়ে। তারচেয়ে চোখে চশমা ব্যবহারই নিরাপদ, আর সেটাই করে সে। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম, কোনো চশমা নেই।

ম্যালন দেখল একজনের সাথে কথা শুরু করেছে লায়ন, একজন নারী, পোশাক-আশাকে সন্তুষ্ট শ্রেণীরই ঘনে হচ্ছে। কী করা যায় ভাবা শুরু করতেই, মেঝেতে পড়ে থাকা দি টাইমস পত্রিকার একটা সংখ্যা নজরে এল ম্যালনের। চারপাশের যাত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করল যে এটা তাদের কারও কিনা। কেউই দাবী না করায় ওটা তুলে নিয়েই পড়ার ভাব ধরল সে। কিছুক্ষণ পরপর চোখ দুটো টার্গেটের দিকে দিতে সুবিধা হচ্ছে এখন।

স্টেশনের দিকেও খেয়াল রাখতে হচ্ছে তাকে।

পনেরটা স্টেশন পার হয়ে যাবার পর, আরলস কোটে নামল লায়ন। এই স্টপেজের লাইনগুলো দু'ধরনের ট্রেন চলাচলে ব্যবহার হয়। আন্তঃজেলা, আর স্থানীয়। একটা নীল ও আরেকটা সবুজ রঙের চিহ্ন পার্থক্য করে দিচ্ছে যাত্রীদের। লায়ন নীল সাইন দেওয়া পথে এগিচ্ছে, তার মানে সে পশ্চিমেই যাচ্ছে। কিন্তু এতক্ষণ যেভাবে

জানালা দিয়ে এক বগি থেকে আরেক বগিতে নজর রেখেছে, এখন আবার সেটাই করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

দরজার উপরে সাঁটানো ম্যাপে তাকাল ম্যালন। ওটা বলে দিচ্ছে যে তারা এবার সরাসরি হিংস্র বিমানবন্দরে যাচ্ছে।

চেচল্লিশ প্যারিস

মেরোভিনজিয়ান বই থেকে কপি করে আনা পৃষ্ঠা দুটো নেড়েচেড়ে দেখল থ্রিভাল্ডসেন। সে আশা করেছিল পুরো বইটাই ম্যালন মুর্যাডের হাতে তুলে দেবে ল্যুভরে দেখা করার সময়, কিন্তু কোনো কারণবশত সেটা হয়নি।

“আমার কাছে মাত্র দুটো পৃষ্ঠা ধরিয়ে দিল সে,” মুর্যাড বলল। “তারপর বইটা নিয়ে চলে গেল।”

তারা দু’জন আবারো বসে আছে রিটজ এর হেমিংওয়ে বারে।

“কটন কি বলেছে একবারও সে কোথায় যাচ্ছে?”

মাথা দোলাল মুর্যাড। “কিছুই না। ল্যুভরে সারাটা দিন ছিলাম আমি, নেপোলিয়নের হাতের লেখার সাথে এটা মিলিয়ে দেখছিলাম। এই পৃষ্ঠার চৌদ্দ লাইনের এই চিঠিটা নিশ্চিতভাবেই নেপোলিয়নের লেখা। এই রোমান সংখ্যাগুলো নিয়েই যা একটু সন্দেহ, তবে এটাও নেপোলিয়নেরই হবে।

বারের পেছনের দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাল সেই রাত প্রায় এগারটা। এরকম ধোয়াশার মধ্যে থাকতে ভালো লাগছে না তার মনে নিজে এরকম কত মানুষের সাথে করেছে তা ঈশ্বর জানেন, কিন্তু এবার যখন তার নিজের পালা এসেছে, তখন মেনে নেওয়ার বিষয়টা একটু ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক।

“যে চিঠিটার কথা বলেছিলেন আমায়,” বলল মুর্যাড। “মানে কর্সিকা থেকে অ্যাশবি যেটা এনেছিল, ওটায় বড় অক্ষরের কোড ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো আবার নির্দেশ করছে বাইবেলের ৩১ নামার স্তবককে। পরিবারের কাছে লেখা নেপোলিয়নের যেকোনো চিঠিই মাথা ঘামানোর মতো হলেও তা কোনো কাজে আসে না শেষ পর্যন্ত। তার দ্বিতীয় স্ত্রী, ম্যারি লুইস ১৮২১ সালে অপর এক পুরুষের সন্তানের জন্য দেয়, কিন্তু তখনও সে খাতা-কলমে নেপোলিয়নেরই স্ত্রী। সম্রাট একথা কখনো জানতে পারেনি। তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার নির্দশন হিসেবে তার একটা ছবিও সে টানিয়ে রেখেছিল সেন্ট হেলেনায়, তার ঘরে। নেপোলিয়ন খুব শ্রদ্ধাও করত তাকে। এদিকে ম্যারি ফিরে গেল তার বাবার কাছে। তার বাবা তখন সেদেশের রাজা, শুধু তা-ই না। লোকটা নেপোলিয়নকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য জার আলেকজান্ডারকে সাহায্যও করে। এখন এমন কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না, যেটা বলে নেপোলিয়নের লেখা এই চিঠিটা তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছেছিল বা তার ছেলের কাছে। সত্যি বলতে, নেপোলিয়ন মারা যাবার

পর, বার্তাবাহক ভিয়েনায় এসেছিল নেপোলিয়নের শেষ কিছু চিঠিপত্র নিয়ে, কিন্তু তার স্ত্রী ম্যারি সেগুলো প্রত্যাখ্যান তো করেছেই, সেই লোকটার সাথে দেখাও করেনি পর্যন্ত।”

“ভালোই হয়েছে আমাদের জন্য।”

সায় দিল মুর্যাড। “নারীদের বিষয়ে নেপোলিয়ন খুব নির্বোধের পরিচয় দিয়েছে। যে মানুষটা নেপোলিয়নকে আসলেই সাহায্য করতে পারত, তাকেই সে ত্যাগ করে। জোসেফিন-তার প্রথম স্ত্রী। একদিকে সে বন্ধ্যা, কিন্তু ওদিকে নেপোলিয়নের দরকার বৎশ রক্ষার। তাই তাকে ডিভোর্স দিয়ে ম্যারি লুইসকে বিয়ে করল।” ফটোকপি দুটোর দিকে ফিরল প্রফেসর। “দেখেন, এই হলো নেপোলিয়ন, এতকিছুর পরও সে দ্বিতীয় স্ত্রীকে চিঠি পাঠায় গোপন সংকেত দিয়ে, আর ভাবে, তার স্ত্রী এখনও তার পক্ষেই আছে।”

“অ্যাশবির পাওয়া চিঠি থেকে কোনো সূত্র পাওয়া গিয়েছে? আমি বাইবেলের সেই স্তবকের কথা বলছি।” জানতে চাইল হেনরিক।

মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাল বিজ্ঞ লোকটি। “কখনো সেই স্তবকটি পড়েছেন আপনি? মনে হয় যেন এটা নিজের মতো করে নিজের জন্যই দুঃখ প্রকাশ করা। যা-ই হোক, আজ বিকেলে একটা জিনিস দেখে ভালোই লাগল। দেখলাম লুভ্যরে এরকম একটা লেখা বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে। ১৮১৪ সালে নেপোলিয়ন বন্দী হবার পর প্যারিসের নতুন সরকার লোক পাঠিয়েছিল অরলিয়েসে, ম্যারি লুইস এর জামা-কাপড়, থালা-বাসন, হীরা সহ সব রকমের মূল্যবান জিনিসগুলো জরু করার জন্য। তারা ম্যারিকে প্রশ্ন করেছিল নেপোলিয়নের সম্পদের বিষয়ে, কিন্তু সে বলেছিল যে কিছুই জানে না, আর এটাই হয়ত সত্যি।”

“তার মানে, খোজাখুঁজির বিষয়টা তখন থেকেই শুরু হয়েছিল, তাই না?”

“হ্ম, তা বলতে পারেন।”

“আর এখনও সেটা চলছে।”

অ্যাশবির কথা মনে চলে এলো এই পর্যায়ে।

আগামীকালই মুখোমুখি হচ্ছে দু’জন।

কিন্তু ম্যালনের কী অবস্থা।

করছেটা কী সে?

Bangla
Digitized by srujanika@gmail.com

টেন থেকে নেমেই লায়নকে অনুসরণ করছে ম্যালন। তারা এখন হিথু বিমানবন্দরের দ্বিতীয় টার্মিনালে। তার টার্গেট আবার লড়ন ছেড়ে না চলে যায় এমন চিন্তা ঘুরছে ম্যালনের মাথায়, কিন্তু লোকটা কোনো টিকেট কাউন্টার বা সিকিউরিটি চেকের ভেতর দিয়ে না গিয়ে টার্মিনালটা পার হয়ে গেল, তারপর একটা চেকপয়েন্টে থামতে হলো তাকে, দূর থেকে মনে হচ্ছে আইডি কার্ডের ছবির সাথে তার চেহারা মিলিয়ে দেখা

হচ্ছে সেখানে। ঐ পর্যন্ত অনুসরণ করতে যাওয়াটা সম্ভব না ম্যালনের পক্ষে, আর করিডোরটাও ফাঁকা, তবে শেষ প্রাণ্টে একটা দরজা দেখা গেল। ম্যালন দেওয়ালের একটা খাঁজে নিজেকে লুকিয়ে নিয়ে পকেট থেকে সেলফোনটা বের করেই স্টেফানির ফোনে।

“আমি হিথু এয়ারপোর্টে, চেকপয়েন্টের সামনে, নাম্বার ৪৬-ই, ওটা পার হবার ব্যবস্থা করুন, জলদি। আর ওখানে একটা মাত্র গার্ড, কাছে রেডিও আছে।”

“ওখানেই থাক, ঠিক যাকে দরকার সেই মানুষটাই আমার কাছে এখন।”

যেকোনো সমস্যা মুহূর্তেই হজম করার অসাধারণ ক্ষমতা আছে স্টেফানির, কোনো প্রশ্ন, বাক্যব্যয় ছাড়াই সব ব্যবস্থা করে ফেলে।

আড়াল থেকে বের হয়ে তরুণ গার্ডটির দিকে এগিয়ে গেল ম্যালন। লায়ন নেই ওখানে, দূরের ঐ দরজা দিয়েই চলে গেছে। গার্ডের কাছে নিজের পরিচয় দিল, সাথে নিজের পাসপোর্টটাও দেখাল, এবং বোঝাতে চাইল যে দরজার ওপাশে তারও যাওয়ার দরকার।

“তা হচ্ছে না,” গার্ড বলল। “লিস্টে আপনার নাম থাকতে হবে।” চিকন একটা আঙুল দিয়ে ডেক্সের উপর খোলা নোটবুকের উপর টোকা দিল সে।

“এইমাত্র যে ভদ্রলোকটা গেলেন ওদিকে, কে উনি?” চেষ্টা করে যাচ্ছে ম্যালন।

“সেটা আপনাকে বলতে যাব কেন? কী হয়ে পড়েছেন আপনি?”

রেডিওটি হঠাতে শব্দ করে উঠল, সাথে-সাথে সেটা খুলে মিলে উন্নত দিল গার্ডটি। স্পিকারটি কানের সাথে লেগে থাকায় কিছুই শুনতে পেল না ম্যালন, কিন্তু তার দিকে এখন যেভাবে তাকান হচ্ছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে অনেকস্থাটা তাকে নিয়েই।

কথা শেষ হলো গার্ডের।

“আমিই কলটা করিয়েছি,” ম্যালন বলল। “এবার বলুন যে লোকটা গেল এখান থেকে কে সে?”

“রবার্ট প্রাইস।”

“কী করে সে?”

“তেমন কিছু বলা নেই কোথাও, তবে এর আগেও এখানে এসেছেন তিনি। আপনার ঠিক কী জানা প্রয়োজন, মিস্টার ম্যালন?”

সম্মানীদেরকে ইংরেজরা যেভাবে সম্মান দেয়, সেটা ভালো লাগে তার।

“প্রাইস কোথায় যাচ্ছে জানেন?”

“তার কাগজপত্রে বলা আছে, হ্যাঙ্গার নাম্বার ৫৬-R এ তার কাজ।”

“ওখানে কিভাবে যাব বলুন।”

একটা কাগজে দ্রুত একটা ম্যাপ একে দেখাল গার্ডটি এবং দূরের দরজাটা দেখাল শেষে। “ঐ পথে গেলেই সোজা এইপ্রনে পৌছে যাবেন।”

এক রকম ছুটেই দরজাটা পার হয়ে বাইরে পা রাখল ম্যালন।

হ্যাঙ্গার 56-R দ্রুতই পাওয়া গেল, তিনটা জানালা দিয়ে কমলা ও হলদে রঙের আলো আসছে বাইরে। দূর থেকে বিমানের বড় ইঞ্জিনের গর্জন ভেসে আসছে ব্যস্ত হিথুর বাতাসে ভর করে। চারপাশে নানান রকমের ছোট-বড় বিল্ডিংগের সারি। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, এটা বেসরকারি বিমান কম্পানি ও কর্পোরেট জেট বিমানের এলাকা।

একটা জানালা দিয়ে একটু উঁকি দিয়ে দেখে নেওয়াটা সবচে নিরাপদ মনে হলো। বিল্ডিংটার চারপাশে ঘুরে এসে দরজাটা পার হলো সে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে খুব সাবধানে জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল। এক ইঞ্জিনের একটা *Cessna Skyhawk* বিমান দাঁড়ানো ভেতরে। নিজেকে রবার্ট প্রাইস নাম দেওয়া পিটার লায়ন বিমানটির ডানা ও ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে মনে হচ্ছে। ফিউসেলাজের সাদা রঙের উপর সারিসারি নীল ও হলুদ রেখা টানা। লেজের গায়ে বিমানের পরিচিতি নাম্বারটা মুখ্যত করে নিল ম্যালন। এই হ্যাঙ্গারে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না, আর লায়নও ব্যস্ত নিজের দেখে শুনে নেওয়ার কাজে। বাইরে বের হবার একটা দরজার কাছেই, মেঝের উপর সেই সেলফ্রিজের ব্যাগটা পড়ে আছে।

লায়ন প্লেনটাতে ঢেকে বসেছে এবার, কয়েক মিনিট থাকল ভেতরে, তারপর বেরিয়ে এল আবার, এবং সজোরে কেবিনের দরজাটা আটকে দিল। শপিং ব্যাগটা তুলে নিয়ে হ্যাঙ্গারের বাতিগুলো নিভিয়ে দিল সে।

সময় থাকতে দৌড়ে পালানোর সুযোগ আছে যেহেতু ভেতর সেটাই করা দরকার এখন। যেকেনো সময়ে চোখে পড়ে যেতে পারে।

একটা ধাতব দরজা খোলার শব্দ পেল ম্যালন, তারপরেই আবার বন্ধ হলো সেটা।

একেবারে জমে গেল ম্যালন, প্রার্থনা করল যেন লোকটা আবার টার্মিনালের দিকে ফেরত যায়। কিন্তু এদিকে এলে পালানোর সুযোগ নেই এক রাত্তির।

বিল্ডিংর কোণা ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে একটু উঁকি দিল সে

লায়ন আবার টার্মিনালেই ফেরত যাচ্ছে, কিন্তু একটু থেমে দুই হ্যাঙ্গারের মাঝের অঙ্ককারে থাকা কোনো একটা ডাস্টবিনে হাতের সেলফ্রিজের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ঐ ব্যাগটা ম্যালনের দরকার, কিন্তু এদিকে টার্গেটকেও হারানো যাবে না।

তাই লায়নের টার্মিনালে পুনঃপ্রবেশের অপেক্ষায় থাকল সে, তারপর এক দৌড়ে আবর্জনার স্তুপের কাছে পৌঁছাল। কিন্তু ভেতরে খোঁজার মতো সময় হাতে নেই, তাই আবারো টার্মিনালের দরজার দিকে ছুটল সে, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে, সাবধানে দরজাটা খুলল।

শুধু গার্ডকেই দেখা যাচ্ছে, নিজের বসে আছে এখনও।

চুকেই জিজ্ঞেস করল ম্যালন, “কোন দিকে গেল লোকটা?”

মেইন টার্মিনালের দিকে দেখাল গার্ডটা।

বাইরের ডাস্টবিনে একটা সেলফিজের ব্যাগ ফেলা আছে। ওটাকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নিন, এঙ্গণই। ভেতরে কী আছে না আছে তা একটুও ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার নেই। আমি আবার আসছি, বুবেছেন?”

“না বোঝার কী আছে?”

তরুণ কর্মীটির ভাবভঙ্গী পছন্দ হলো ম্যালনের।

টার্মিনালের মাঝ বরাবর তাকাল সে, লায়নকে চোখে পড়লো না। এক দৌড়ে পাতাল টেনের স্টেশনে এসে দেখা গেল আগামী দশ মিনিটের ভেতরও কোনো টেন আসছে না। আবার আগের রাস্তায় ফেরত এসে গাড়ির কাউন্টার, দোকান, কারেন্সি এস্কচেঞ্জের দোকান সবকিছুর উপর দিয়েই ছুটে চলল চোখ দুটো। বেশ কিছু লোকজন জড়ে হয়েছে এক জায়গায়, হয়ত ক্রিসমাসের প্রথম মুহূর্তটা উদযাপন করতে চায়। এখন বাজে প্রায় দশটা।

পুরুষদের একটা শৌচাগারে চুকল ম্যালন।

ডজনখানেক চেম্বার ফাঁকা পড়ে আছে, নিচের সাদা টাইলসগুলো বকমক করছে বাইরের উজ্জ্বল ফুরোসেন্ট আলোর প্রতিফলনে। উষ্ণ বাতাসে খ্রিচিং এর গন্ধ। একটা চেম্বার ব্যবহার করে হাত দুটো ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে মুখটাও ধুয়ে নিল ম্যালন।

শীতল জলটা ভালোই লাগছে তার

সাবানের ফেনা দূর হয়ে গেলে একটা পেপার টাওয়েল ছাঁড়ে নিল পাশ থেকে। ভালো করে মুখ, কপাল, চোখ থেকে পানি মুছে নিল স্টে, আর যখন চোখ মেলে তাকাল আয়নার দিকে, দেখল একজন দাঁড়িয়ে আছে অন্তর্পেছনে।

“কে আপনি?” গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করুন্তে জ্বায়ন, কণ্ঠে এখন ইউরোপ থেকে আমেরিকান টান বেশী।

“এমন কেউ যে তোমার ঠিক মাথার ভেতর একটা বুলেট চালাতে চায়।”

হলুদাভ চোখ দুটো ম্যালনের চোখের দিকে চেয়ে আছে, ওগুলোর চকচকে দীপ্তি যেন অভিশাপ ছুঁড়ে দিচ্ছে তার দিকে।

খুব ধীরে কোটের পকেট থেকে হাত বের করে আনল লায়ন, স্বল্প ক্ষমতার ছেট একটা পিস্তল আটকে আছে সেখানে। “লজ্জার কথা, সেটার সুযোগ আর পাচ্ছেন না। ভ্রমণটা কেমন লাগল? জ্যাক দ্য রিপারকে দারুণ লেগেছে।”

“স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সে তোমাকে নিয়ে কী করত।”

হালকা একটা হাসি দিল লায়ন। “এরকম বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা ভীষণ উপভোগ করি আমি এখন—”

একটা ছোট ছেলে হড়মুড় করে ঢুকে বসল দরজা ঠেলে, তারপর দৌড়ে খোলা জায়গাতায় এক পাক খেয়েই বাবাকে ডাক দিল। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেয়েই ম্যালন ডান বাহু দিয়ে সজোরে আঘাত করল লায়নের বন্দুক ধরা হাতে।

হাত থেকে বন্দুকটি না ছুটলেও তা গর্জে উঠল একবার, বুলেট দিয়ে বিধল উপরের সিলিঙ্গে।

ম্যালন নিজেকে সামনের দিকে ধাক্কা দিয়ে লায়নকে চেপে ধরতে চাইল মার্বেলের পার্টিশনের মাঝে। বাঁ হাত দিয়ে লায়নের বন্দুক ধরা হাতের কজিটা ধরে আছে শক্ত করে, নলটা এখনও ছাদের দিকে।

ছেলেটার চিংকার কানে এল তার, এরপরেই আরও কিছু কষ্ট যোগ হলো।

হাঁটু দিয়ে লায়নের পেটে সজোরে আঘাত করতে চাইল ম্যালন, কিন্তু লোকটা মহা ধুরঙ্কর, নিজেকে বাঁকা করে দারুণ সামলে নিল সেটা।

লায়ন বুঝতে পারছে যে ধীরে-ধীরে সে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে, তাই সে মেঝের দিকে ঝুঁকে গেল। ম্যালনও কম গেল না, ঘুরেই এক বাহু দিয়ে গলাটা পেঁচিয়ে ধরল। একটা হাত মুখের উপর জোরে চাপ দিয়ে কাবু করার চেষ্টা তার, কিন্তু তখনই কপালের উপর ধপ করে বাড়ি পড়লো ম্যালনের।

চোখের তারা কেটে গেল তার, ঝলকানি দিয়ে চোখের সামনের আলো যেন নিভে গেছে মনে হলো।

নিজেকে বা লায়নকে, কাউকেই ধরে রাখতে পারল না ম্যালন।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই অঙ্ককারে হারিয়ে গেল দরজা ঠেলে।

টালমাটাল পা দুটোয় ভর করে তার পেছনে ছুটতে চাইল ম্যালন, কিন্তু মাথার ডেতর যেন যন্ত্রণার স্নোত বইছে, আর সেটা কোনোভাবেই ত্বরিত করতে দিল না। ঝাপসা চোখে দেখতে পেল ইউনিফর্ম পরা এক গার্ড ভেঙ্গে ছুটে এসেছে। কপালের দু'পাশে একটু ডলা দিয়ে নিজের ভারসাম্য ঠিক করতে রাষ্ট্রে ম্যালন।

“এখানে একটা লোক ছিল। লালচুলের, দেখতে বুড়ো, হাতে অঙ্ক।” তখন তার নিজের হাতের দিকে খেয়াল পড়তেই দেখল কিছু একটা ধরে আছে আঙুলগুলো। লায়নের সাথে ধ্বন্তাধন্তির সময়ে এটা তার কাছে চলে এসেছে। “ওকে সহজেই পাওয়া যাবে।”

সিলিকনের একটা টুকরো তুলে ধরল সে সামনে, গঠন ও রঙে সেটা হ্বহু একটা মানুষের নাক। গার্ড একেবারে হতভম।

“ওর মুখে মুখোশ পরা, যেটার এক অংশ আমার হাতে।”

গার্ড এক দৌড়ে ছুটে গেল বাইরে, আর ম্যালন টলতে-টলতে টার্মিনালে পৌছাল আবার। লোকের একটা জটলা বেঁধেছে বাইরে, আরও কিছু গার্ডকেও দেখা গেল। তাদের মধ্যে একজন সেই তরুণ নিরাপত্তাকারী।

এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল ম্যালন, “শপিং ব্যাগটা পেয়েছেন?”

“আসুন আমার সাথে।”

দু'মিনিট পরে সে এবং গার্ড একটা ছোট ইন্টারভিউ কক্ষে জড় হলো, ঘরটা সিকিউরিটি অফিসের কাছেই। লেমিনেট টেবিলের উপর সেলফ্রিজের ব্যাগটা রাখা।

হাতে নিয়ে একটু ওজন করল সে। হালকা। ভেতরে হাত চালিয়ে সবুজ রঙের একটা প্লাস্টিক ব্যাগ বের করে আনল যেটাকে দেখে বোৰা যাচ্ছে ভেতরে অদ্ভুত আকৃতির কিছু আছে।

লেগে আছে একটার সাথে একটা।

টেবিলের উপর সেটা রেখে খুলে ফেলল ম্যালন।

বিশ্বেরক জাতীয় কিছু থাকতে পারে এরকমটা ভাবার দরকারই নেই, কারণ স্পষ্ট বোৰা যাচ্ছে যে ব্যাগের ভেতর যা ছিল, সেটা আগেই সরিয়ে নিয়েছে লায়ন। টেবিলের উপর ব্যাগটা উপুড় করে ঢেলে দিল সে, বেরিয়ে এলো আইফেল টাওয়ারের চারটে ছেট রেশিকা। দেখেই চোখ দুটো বড় হয়ে গেল তার। প্যারিসের যেকোনো জায়গা থেকেই এরকম জিনিস কেনা যায়।

“এর মানে কী?” জিজেস করল তরুণ কর্মীটি।

ঠিক একই প্রশ্ন ম্যালনেরও।

সাতচল্লিশ

স্যালেন হল

রাত ১১.০০

স্টেফানি নেলেই এর উদারচিত্তে দিয়ে দেওয়া বইটা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে ক্যারলাইন, চুপচাপ দেখছে অ্যাশবি। একটু মিথ্যে বলেছে সে ক্যারলাইনের কাছে; বলেছে যে লাঘকের সাথে কথা বলে তাকে রাজি করিয়েছে বইটা দেওয়ার জন্য, তারপর প্রস্তুত কুরিয়ারের মাধ্যমে এটা আনিয়েছে।

“হাতের লেখাটা নেপোলিয়নের,” ক্যারলাইনের প্রথম কথা কঠিতে উত্তেজনা। “সন্দেহ নেই।”

“এর কোনো তাৎপর্য আছে?”

“থাকতে হবে। এখন যে তথ্য আছে আমাদের কাছে সেগুলো আগে জানতাম না। পোজো ডি বোরগো সারা জীবনে যতটা জানতে পেরেছে এখন তার থেকেও বেশী জানি আমরা। এলিজা লাঘকের দেওয়া প্রতিটা লেখাই আমি বিশ্লেষণ করেছি। খুব বেশী কিছু পাইনি ওগুলো থেকে। পোজো ডি বোরগো ঐতিহাসিক তথ্য বা সূত্রের উপর নির্ভর না করে গুজব-গল্লের উপর নির্ভর করেই কাজ করত বেশী। আমার মনে হয়, নেপোলিয়নের প্রতি তার ঘৃণাই তার সক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল, না হলে সে আরও স্বাধীনভাবে, আরও সুচারুভাবে সমস্যার সমাধানে কাজ করতে পারত।”

ঘৃণা নিজের বিচার-বুদ্ধিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই কারণেই নিজের আবেগকে সুযোগ দেয় না সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার। “দেরী হয়ে যাচ্ছে, কলকেই প্যারিসে থাকতে হবে আমাকে।”

“আমিও কি সাথে আসব?”

“এটা ক্রাবের কাজকর্ম। আর এখন তো ক্রিসমাস। দোকানপাটও বন্ধ থাকবে।”

অ্যাশবি জানে মেয়েটার ঘুরতে খুব ভালো লাগে, বিশেষ করে মন্ডিয়ানে অ্যাভিনিউ এর পোশাকের দোকানগুলোতে। সাধারণত সে-ই তাকে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু কালকে হচ্ছে না সেটা।

মেরোভিনজিয়ান বইটা দেখে চলেছে ক্যারলাইন। “আমার মনে হচ্ছে, পাজলের সবগুলো টুকরোই আমাদের হাতে আছে এখন।”

কিন্তু এখনও পিটার লায়নকে নিয়ে মনের ভয় দূর হচ্ছে না তার। ইতিমধ্যে তার দাবী করা অতিরিক্ত টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি এটা না করত সে, ফলাফলটা খুব খারাপ হতে পারত—এমন একটা আতঙ্ক কাজ করেছে মনের ভেতর। কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো, আমেরিকানদের নিয়ে সবকিছুই জানে এই আফ্রিকান মাথা গরম লোকটা।

“আমি জানি তুমি সব টুকরোগুলো জোড়া দিতে পারবে,” বলল অ্যাশবি।

“বুবাতে পারছি, এখন আর পোশাক দেখতে ভালো লাগছে না আমার গায়ে।”

হাসল অ্যাশবি। “এটা তো আরও আগে থেকেই ভাবছি।”

“আমি কি আগামীকাল যেতে পারি তোমার সাথে?”

মেয়েটার চোখে যে দুষ্টুমি খেলা করছে তাতে ধরাশায়ী না হয়ে উপায় ~~নেতৃত্বে~~ “আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে শর্ত হলো, আজ রাতে আমাকে খুশি করতে হবে, তা না হলে—”

“মনে হচ্ছে তা করা যাবে।”

দুষ্টুমি সত্ত্বেও অ্যাশবি খেয়াল করল যে মেয়েটার মন অকেবারে ভুবে আছে নেপোলিয়নের বার্তাগুলোর মাঝে। হাতে লেখা একটা লেখাপত্র দিকে দেখাল সে। “এটা ল্যাটিন। বাইবেল থেকে নেওয়া। ইসা মসীহ এবং তার শিস্যদের নিয়ে সাবাথের দিনে খাবার খাওয়ার ঘটনা। এই গল্পটার তিনটা সংক্ষরণ আছে, লুক, ম্যাথিউ এবং মার্ক-প্রতিটায় একটা করে। আমি লাইন চৌদ্দটা আলাদা আবার লিখেছি যাতে পড়তে পারি আমরা।

ET FACTUM EST ETIUM IN
SABBATO SECUNDO PRIMO A
BIRE PER SACEROTES DISCIPULI ALITEM ILLIRIS CDE
PERUNT VELLER SPICAS ET FRINCANTES MANIBUS + MANDU
CARANT QCIDAM ALITEM DE FARISAIS DI
CEBANT EI ECCE QUA FACIUNT DISCIPULI TUI SAB
BAUS - QUIT NON LICET RESPONDENS ALITEM INS
SE IXIT AD EOS NUMQUAM HOC
I.FECISTIS Q(KD) FECIT DAVID Q(ANTO)
ESURUT IPSE EI QUI CUM EO ERAJ + INTROIBOT IN DOMUM
DEI ET PANES PROPOSITIONIS
MANDUCA VIL EI DEDIL EI QUI
CUM ERANT UXIO QUIBOS NO
N LICEBAT MANDUCARE SI NON SOLIS SACERDOTIBVS

“বেশ কিছু ভুল আছে এখানে। যেমনঃ *Discipuli* বানান করা হয় c দিয়ে, g দিয়ে না। তাই ওটা মূল বইয়ের ঘতো না তুলে ঠিক করে লিখেছি। তারপর নেপোলিয়ন *ipse dixit* এর বিষয়টাতেও তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। তারপর দেখেন, এই যে uxio, এটার কোনো অর্থই নেই। এখন সব বাদ দিয়ে এরকমটা দাঁড়িয়েছে। পড়ছি।

“আর তারপর দ্বিতীয় সাবাথের দিনে সে ভুট্টার ক্ষেত দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার শিষ্যরা হাত দিয়ে তোলা শুরু করল ও হাতে ঘষে খাওয়া শুরু করল। কিছু ধার্মিকেরা বলল, “দেখুন, আপনার অনুসারীরা সাবাথের দিনে যা করছে, তা পাপের কাজ।” উন্নরে সে বলল, “তুমি কি জান না ডেভিড কি করতেন তার যখন ক্ষুধা লাগত? সে তার সাথীদের নিয়ে ঈশ্বরের ঘরে প্রবেশ করতেন, এবং পরিত্র রুটি ভক্ষণ করতেন, এবং তার সাথীদেরও দিতেন, এমন মানুষেরও দিতেন যাদের খাবার নিষিদ্ধ ছিল, শুধু পুরোহিতরা ব্যতিত।”

মুখটা তুলে উপরে তাকাল ক্যারলাইন। “কি অদ্ভুত, তাই না?”

“তা বললেও কম হয়ে যায়।”

“বাইবেলের তিনটা ভার্সনের কোনোটার সাথেই মেলে না এটা। বেশিরভাগই বানানো। কিন্তু তার থেকেও অদ্ভুত একটা বিষয় আছে এতে।”

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে অ্যাশবি।

“নেপোলিয়ন ল্যাটিন জানত না।”

▲

প্রফেসর মুর্যাডকে বিদায় দিয়ে উপর তলায় নিজের স্যুটে ফিরে এল থ্রিভান্ডসেন। বারটা বাজতে বাকি নেই বেশী, কিন্তু প্যারিস যেন না ঘুমান্তে শুশ করেছে। রিটজ হোটেলের লবিতে মানুষ আসছে আর যাচ্ছে, চারদিকে ঝোলাহল। এলিভেটর থেকে তার ফ্লোরে পা রাখতেই সিরিয়াস ভাবভঙ্গির এক লোক সোফায় বসে আছে দেখল সে। গায়ের রঙ তামাটো, চুলগুলো একেবারে সোজা ও ঘন কালো।

একে তো হেনরিক ভালো করেই চেনে। মুক্ত বছর আগে সাই মারা গেলে সেটার তদন্ত করার জন্য লোকটাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তার ডেনমার্কের কর্মস্থল থেকে। যোগাযোগ যা হয় সেটা ফোনের মাধ্যমে। আর লোকটার ইংল্যান্ডে থাকার কথা এখন, অ্যাশবির গতিবিধির উপর নজর রাখবে, কিন্তু সে এখানে কী করছে, তা ভেবে কূল পেল না হেনরিক।

“তোমার সাথে এখানে দেখা হবে আশা করিনি,” বলল সে।

“লঙ্ঘন থেকে আরও আগেই এসেছি আমি, কিন্তু এখানে কী-কী ঘটছে সেগুলো ভালো করে দেখার দরকার, তাই জানাইনি।”

কিছু একটা ঘাপলা আছে তাহলে। “আসো, হেঁটে-হেঁটে কথা বলি।”

একটা নিরিবিলি করিডোরে পৌছাল তারা।

“কিছু বিষয় আছে, যেগুলো আপনার জানা দরকার।”

হাঁটা থামিয়ে তার তথ্যদাতার দিকে তাকাল হেনরিক।

“প্যারিস ছাড়ার পর থেকেই আমরা অ্যাশবিকে ফলো করছি। কয়েক ঘণ্টার জন্য বাড়ি গেল, তারপর আবার বের হলো সন্ধ্যার পর। তারপর জ্যাক দ্য রিপারের উপর একটা ওয়াকিং ট্যুরে যোগ দিল।”

লভনের কোনো বাসিন্দার পক্ষে এমন করাটা অস্বাভাবিক।

একটা ছবি এগিয়ে দেওয়া হলো তার দিকে। “এই মহিলার সাথে তার দেখা হয়েছে। কোনোমতে ছবিটা তুলেছি।”

মুখটা চেনার জন্য একটা ছোট্ট মুহূর্তই যথেষ্ট।

স্টেফানি নেলেই।

মাথার ভেতর যেন কয়েকশ ঘণ্টার বাড়ি পড়া শুরু করেছে তার, তবে সেগুলো কষ্ট করে হলেও চেপে রাখল নিজের ভেতরেই।

“আর, ম্যালনও ছিল সেখানে।”

ঠিক শুনছে তো সে? “কী? ম্যালন?”

মাথাটা নাড়ল ইনভেস্টিগেটর, তারপর আরও একটা ছবি দেখাল আস্কে। “ঐ যে দেখেন সে, ভিড়ের ভেতর। মহিলাটা চলে যাওয়ার পরপরই সেও চলে যায়।”

“ম্যালন কি অ্যাশবির সাথে কোনো কথা বলেছে?”

“না, কিন্তু সে একজনকে অনুসরণ করতে-করতে এগিয়ে যায় যে আবার অ্যাশবির সাথে কথা বলেছিল। আমরা দু’জনকেই ছেড়ে দিলাম, আর পিছু নিলাম না, পাছে কোনো ঝামেলা হয়ে বসে।”

বার্তাবাহকের চোখে-মুখে অস্পষ্টির বিষয়টা শুনে লাগল না তার। “পরিস্থিতি আরও খারাপ, তাই না?”

মাথাটা নাড়ল সে।

“ছবিতে যে মহিলাকে দেখলেন, সে-ই অ্যাশবিকে একটা বই দিয়েছে।”

আটচল্লিশ

প্যারিস

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২৫

সকাল ১০.৩০

ইনভ্যালিয়েন্স এর চার্চ অফ দ্য ডোমে এক চক্কর দিল ম্যালন। ছয়টা চ্যাপেলের কেন্দ্র এক জায়গায়, প্রতিটাই আলাদা-আলাদা বীরের সম্মানে বানানো এবং সবগুলোই হয় ভার্জিন মেরী না হয় রোমান ক্যাথলিক চার্চের ফাদারদের উৎসর্গ করা। সিঁড়ি ধরে নিচে নামছে সে, মূল স্তর থেকে কুড়ি ফিট নিচে নেপোলিয়নের সমাধি, চারপাশটা ভালো

করে দেখতে হবে। গ্যারিকে এখনও খবর দেয়নি সে, আর এজন্য তার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যে রাতটা গেল সেটা ভয়াবহ ছিল।

“কিছু পেলে?” উপর থেকে জিজেস করল স্টেফানি।

মার্বেলের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে ম্যালনের দিকে।

“কিছু লুকিয়ে রাখার মতো কোনো জায়গা দেখছি না এখানে, বোমার মতো কিছু তো নয়-ই।”

কুকুর দিয়ে ইতিমধ্যে জায়গাটা ভালো করে পরীক্ষা করা হয়েছে। কিছুই পাওয়া যায়নি। সমস্ত ইনভ্যালিয়েদস জুড়েই খোঁজ করা হচ্ছে, কিছু নেই। কিন্তু অ্যাশবি যেহেতু বলেছে এই চার্চই প্রাথমিক লক্ষ্য, তাই এটার প্রতিটা বগইঞ্চি জায়গা জুড়েই খোঁজা হচ্ছে।

ছোট একটা গ্যালারীর প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে আছে ম্যালন, পুরনো ব্রাশ ল্যাম্পে আলো জ্বলছে। ভেতরে দ্বিতীয় নেপোলিয়নের একটা সূতিস্তু। কিং অফ রোম উপাধি পাওয়া এই মানুষটা খুব অল্প বয়সেই মারা যায়। ১৮১১ সাল থেকে ১৮৩২, মাত্র একুশ বছর। ছেলের কবরের এক প্রান্তে বাবার একটা বিরাট স্তুতি দাঁড়িয়ে আছে, আপাদ্যস্তক রাজকীয় আলখাল্লায় ঢাকা, হাতে রাজদণ্ড ও ক্রুশসহ গোলক।

হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নিল স্টেফানি। “মিটিঙের সময়টা হচ্ছিয়ে আসছে। এখানে কোনো কিছু নেই, কটন। মনে হচ্ছে, অন্য কোথাও কোনো স্ফুরণস্থা আছে।”

গত রাতে পিটার লায়ন টার্মিনাল ছেড়ে পালিয়ে যাবার পর হ্যাঙ্গারে গিয়েছিল তারা, তারপর প্লেনটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছে তেস্ব প্লেনটার রেজিস্ট্রেশন কাগজপত্রে দেখে গেছে এটা বেলজিয়াম কর্পোরেশন অফিসের অধ্যাত এক কোম্পানির নামে নিবন্ধন করা, যেটার মালিকের নাম-ঠিকনা ভুয়া তথ্য দেওয়া। তিনি মাসের অধিম ভাড়া দেওয়া আছে।

“লায়ন যে আমার মুখোমুখি হলো সেটার পেছনে কারণ ছিল,” বলল ম্যালন। “সে চেয়েছে আমরা যেন জানি যে এখানে আমাদের উপস্থিতি তারও জানা। ঐ আইফেল টাওয়ারগুলো সে আমাদের জন্যেই ফেলে গিয়েছে। কী সাহস, দেখুন, ওর চোখ দুটো পর্যন্ত ঢাকেনি। এখন প্রশ্ন হলো, অ্যাশবি কি জানে যে আমরা জানি?”

মাথা ঝাঁকাল স্টেফানি। “এখন সে আইফেল টাওয়ারে, কয়েক মিনিট আগে পৌঁছেছে। যদি কিছু জেনেও থাকত, সেটা এতক্ষণে আমাদের কানেও আসত। আমাদের সোর্স আমাকে বলেছে যে অ্যাশবি খুব ঠেঁটকাটা ধরনের লোক, ভেতরের রাগ-ক্ষেত্র কোনোকিছুই পুষে রাখতে পারে না।”

কিন্তু ম্যালনের ভাবনা আটকে আছে কী-কী ঘটতে পারে, সেসব নিয়ে। ইতোমধ্যে থ্রিভাল্সেন তিনবার ফোন দিয়েছে তাকে, কিন্তু একবারও রিসিভ করেনি, কলব্যাকও করেনি পরে। গত রাত সে লভনে কাটিয়েছে একগাদা প্রশ্ন এড়ানোর জন্য, বইটা নিয়ে সেই প্রশ্নগুলোর একটারও উত্তর সে দিতে পারত না। অস্তত এখন তো নয়-ই। যা বলার পরেই বলবে সে। এদিকে প্যারিস ক্লাব তাদের মিটিঙের জন্য

হাজির। দুপুর ১টা পর্যন্ত আইফেল টাওয়ার বন্ধ। শুধুমাত্র ক্লাবের সদস্যরা, আপ্যায়নের কর্মী, এবং নিরাপত্তা দেওয়া কিছু লোক উপস্থিত হবে প্রথম প্ল্যাটফর্মে। ফেঞ্চ ইন্টিলিজেন্সের গোয়েন্দাদের আড়িপাতার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর ব্যবহার বুকির হয়ে যেতে পারে, এমনটা চিন্তা করে স্টেফানি আগেই সেগুলোর বিরোধিতা করেছে। পরিবর্তে, দুই জোড়া চোখ ও কান পাঠাচ্ছে সভা কক্ষে।

“স্যাম আর মিগ্যান কি জায়গামত আছে?” জানতে চাইল ম্যালন।

মাথা নাড়তে দেখা গেল। “হ্যাঁ, দু’জনেরই খুব অগ্রহ দেখলাম।”

“বেশী অগ্রহ আবার ভালো না।”

“আমার মনে হয় না তারা কোনো বিপদের মাঝে আছে সেখানে। লাঘক বলেই দিয়েছে কারও কাছে কোনো অস্ত্র বা কথা পাচার করার কোনো যন্ত্র থাকবে না।”

নেপোলিয়নের বিরাটাকারের সমাধির দিকে তাকাল ম্যালন। “জানেন, কবরের ঐ পাথরটা কিন্তু লাল পোরফাইরি পাথর দিয়ে বানানো না। ওটা ফিনল্যান্ড থেকে আনা অ্যাভেন্টুরিন কোয়ার্টজ পাথর।”

“ফ্রান্সের জনগণকে ও কথা ভুলেও বলতে যেও না,” উপদেশ দিল স্টেফানি। “তবে আমার কাছে বিষয়টা জর্জ ওয়াশিংটন ও চেরি গাছের গল্লের মতো স্ট্রাই জানে গল্লটা সত্যি, কিন্তু আসলে না।”

ডিং করে মোবাইলটা বেজে উঠল স্টেফানির, ম্যালন দেখল যে ফোনটা কানে ধরে চুপচাপ শুনে গেল তার বস, তারপর কেটে দিল লাইনট।

“ঝামেলা তো আরেকটা হয়েছে,” বলল সে।

মুখ তুলে তাকাল ম্যালন তার দিকে। “কী?”

“হেনরিকও আইফেল টাওয়ারে, ক্লাব মিসিঙ্গে ছেকচে।”

খাবার-দাবার আপ্যায়নকারীদের মতো ছোট জ্যাকেট আর কালো ট্রাউজার পড়েছে স্যাম, সবই স্টেফানি নেলেই এর কারণে। মিগ্যানও একই কাজের জন্য সেজেছে। তারা দু’জনই এখন এগার জন কর্মী বাহিনীর সদস্য যারা ইতিমধ্যে ভোজনকক্ষ সাজানো-গোছানোর কাজ শেষ করেছে। পুরোটা জায়গায় মাত্র দুটো গোলটেবিল, প্রতিটাই সোনালী রঙের লিনেন কাপড় ও খুব উন্নতমানের চিনামাটির থালাবাসনে ঢাকা। হলুকুমটা হয়ত পঁচাত্তর বাঁই পঞ্চাশ ফিট আকারে। এক প্রান্তে একটা স্টেজ করা আছে। মাত্র দুটো টেবিল এত বড় এই ঘরে বেমানান লাগছে।

কফি কাপ ও জল গরম করা স্যামোভার নিয়ে ব্যস্ত আছে স্যাম, সময়মত সব যেন ঠিকঠাক কাজ করে এটাই চিন্তা তার এখন। মেশিনটা কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তার, তাই দলের বাকি সদস্যদের কাছাকাছি থেকে সব

বুঝে নিতে হচ্ছে। ডান দিকে দীর্ঘ একটা প্লেট-গ্লাসের জানালা দিয়ে সেইনে নদী ও রাইট ব্যাক্সের অসাধারণ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে এত উপর থেকে।

তিনজন বয়স্ক ভদ্রলোক ও দু'জন ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে এসে গেছে, প্রত্যেককেই সাদরে বরণ করছে ধূসর রঙের ফিটফাট পোশাকের এক নারী।

এলিজা লাঘক।

তিন ঘণ্টা আগে স্টেফানি ক্লাবের সাতজন সদস্যদের ছবি দেখিয়েছে স্যামকে, এখন সে ছবির সাথে মানুষগুলোর চেহারা মিলিয়ে নিচ্ছে। তাদের মাঝে তিনজন শীর্ষস্থানীয় ঋশ প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রক, একজন ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য। প্রত্যেকেই ২০ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে অংশ নিয়েছে আজ এখানে যা ঘটছে তাতে-যার কল্যাণে, স্টেফানি বলেছে, ইতিমধ্যে ক্লাবের পকেটে অবৈধ ১৪০ মিলিয়ন ইউরো জায়গা করে নিয়েছে।

এতদিন ধরে যাদেরকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছে সে, আজ চোর্টের সামনেই তারা মূর্তিমান ভদ্রলোক হয়ে উপস্থিত।

স্টেফানি শুধু চোখ আর কান দুটো খোলা রাখতে বলেছে তারকে ও মিগ্যানকে। সর্বোপরি খুবই সতর্ক থাকতে হবে, এবং হটহাট করে এমন কিছুই করা যাবে না যাতে তাদের পরিচয় বেরিয়ে পড়ে।

কফি মেশিন ঘাঁটাঘাঁটি শেষ করে বের হবার জন্মের দাঁড়াল স্যাম।

আরও একজন অতিথি এসে পৌছাল।

বাকি লোকদের মতো তার গায়েও দামী পোশাক-কালচে ধূসর সৃষ্টি, সাদা শার্ট এবং হালকা হলুদ টাই।

হেনরিক প্রভান্ডসেন।

▲

লা স্যালে গুস্তাভ আইফেল টাওয়ারে প্রবেশ করতেই প্রভান্ডসেনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল এলিজা লাঘক। হাতটা বাড়িয়ে দিল সে, ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিল এলিজা।

“খুব খুশি হয়েছি আপনি আসাতে,” এলিজা বলল। “সুটটায় দারুণ লাগছে আপনাকে।”

“এরকমটা পরি না বললেই চলে। কিন্তু ভাবলাম, আজকের অনুষ্ঠানের জন্য মানানসই কিছু গায়ে দেওয়া উচিত।”

খুশি মনে একটা নড় করল এলিজা। “আপনার এমন বিবেচনার জন্য ধন্যবাদ। আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন আজকে।”

তার দৃষ্টিটা এলিজার উপর স্থির করে দিয়ে আছে হেনরিক। কথা সত্যি, দিনটা এই মহিলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেনরিকের কথা বিবেচনা করে। দলের অন্য সদস্যরা এদিক-সেদিক হাঁটাচলা করছে আর নানান বিষয়ে কথাবার্তা বলছে, খেয়াল করছে হেনরিক। আপ্যায়নের জন্য নিয়োজিত যারা, ব্যস্ত আছে হালকা নাস্তা পরিবেশন নিয়ে।

বহু আগেই নিজেকে একটা মূল্যবান জিনিস শিক্ষা দিয়েছে সে। যেকোনো ঘরে ঢোকার দুই মিনিটের মাঝেই বুঝে নিতে হবে যে তুমি বন্ধু নাকি শক্তদের মাঝে আছ।

যাদের সে দেখছে তাদের অন্তত অর্ধেক মানুষকে সে চেনে। ব্যবসা-বানিজ্য ও অর্থ নিয়ে কাজ-কারবার এদের। তবে দু'জনকে দেখে খুব অবাক লাগছে তার, এরকম কেউ যে এত বড় ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে ধারণা ছিল না। তারা সবাই বিস্তবান, কিন্তু সেই বিত্ত অচেল পরিমাণে না, অন্তত তার সাথে তুলনা করার মতো তো নয়-ই, তাই রাতারাতি, অতি সহজে হিসাবের বাইরে বেশ কিছু অর্থ কামানোর সুযোগটা এরা নেবেই তার আর সন্দেহ কী?

সৌজন্যতা শেষ করে সবার সাথে যোগ দেওয়ার ঠিক আগেই লম্বা, শ্যামলা বর্ণের এক লোক এগিয়ে এল। পাকা দাঢ়িগুলো ছেঁটে ছোট করা, চোখের রঙ গাঢ় ধূসর।

একটু হেসে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল এলিজা, নতুন মানুষটাকে তার আরও কাছে এগিয়ে দিল। তারপর বলল, “আসুন, আরও একজনের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই।”

হেনরিকের দিকে তাকাল এলিজা।

“হেনরিক, ইনি হলেন লর্ড গ্রাহাম অ্যাশবি।”

উন্মত্তগাশ

মার্বেলের সিঁড়ি ধরে নেপোলিয়নের সমাধি ছেড়ে উপরে উঠে এক ম্যালন, একেবারে শেষ প্রান্তে দুই পাশে দুটো তামার মূর্তি, একটা বহন করছে ধার্জমুকুট ও ন্যায়বিচারের প্রতীক, আরেকটা বহন করছে তলোয়ার ও গোলক। স্টেফানি অপেক্ষা করছে তার জন্য, চার্চের বিরাট বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে। দু'পাশের দুটো পেঁচানো আকৃতির কলাম সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকার স্থপতি বারনিনির স্মৃতি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

“হেনরিকের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে হচ্ছে,” স্টেফানি বলল। “ক্লাবের আমন্ত্রণও বাগিয়ে নিয়েছে।”

“সে তো একটা লক্ষ্য নিয়ে কাজে নেমেছে। বিষয়টা বুঝতে হবে আপনার।”

“তা বুঝেছি। কিন্তু লক্ষ্য আমার নিজেরও একটা আছে, আর সেটা তোমারও বুঝতে হবে। পিটার লায়নকে আমি চাই।”

শান্ত চার্চের দিকে তাকাল ম্যালন। “পুরো বিষয়টাই যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। লায়ন জেনে গেছে আমরা ওর পেছনে লেগেছি। হিথু বিমানবন্দরে প্লেন নিয়ে ওসব কাজের কোনোই মানে নেই।”

“কিন্তু সে এটাও জানে যে আমরা আওয়াজ দিয়ে কোনো কাজ করতে পারব না।”

যে কারণেই চার্ট অফ ডোমের চারপাশে পুলিশ দিয়ে ঘেরা হয়নি। একই কারণে ইনভ্যালিয়েদসের হাসপাতাল ও বয়স্ক কেন্দ্রগুলোও খালি করা হয়নি। চার্চের পাশেই অত্যধূনিক চিকিৎসাকেন্দ্র ও সংলগ্ন ভবনে প্রায় শ'খানেক লোক বসবাস করে, পরিবর্তন আনা হয়নি সেখানেও কোনো। সম্ভাব্য সব রকম বিক্ষেপকের অনুসন্ধান খুব দেকে-সেরে শুরু হয়েছে গত রাত থেকে। এখন পর্যন্ত চিন্তায় ফেলার মতো কিছুই পাওয়া যায়নি। সব কিছুই হয়েছে একেবারে চুপচাপ। ঘটা করে, ঘোষণা দিয়ে এগুলো করতে গেলে পিটার লায়ন বা প্যারিস ক্লাব দুটোই ফসকে যেতে পারে।

কিন্তু এখনই টের পাছে তারা যে এভাবে কাজ করা কতটা কঠিন।

পুরো ইনভ্যালিদেস কয়েক লক্ষ বর্গফুট জুড়ে আছে, এর মধ্যেই কয়েক ডজন বহুতল ভবন। বোমা লাগানোর মতো জায়গার কোনো অভাব নেই।

সাথে থাকা রেডিওটায় স্টেফানির নাম বেজে উঠল, তারপর একটা পুরুষ কষ্ট বলল, “কিছু পেয়েছি আমরা।”

“কোথায়?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

“গম্বুজের ভেতর।”

“আমরা আসছি এক্ষনি।”

A

হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিল থ্রিভাল্ডসেন। গাহাম অ্যাশবি নামক এই চতুর্থ শক্তির সাথে হাত মেলাতেই তার ভীষণ যুদ্ধ করা লাগছে নিজের সাথে, সেখানে ক্ষুধা একটু হাসি আনার জন্য ঠোঁটের উপর বল প্রয়োগ করতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। “পরিচিত হয়ে ভালো লাগল।” শক্তির সাথে প্রথম কথা থ্রিভাল্ডসেনের।

“আমারও ভালো লাগল। আপনাদের পরিবালুক তো আমি অনেক আগে থেকেই জানি। আপনার চিনেমাটির পন্যগুলো ভীষণ পছন্দ আমার।”

প্রশংসাটা গ্রহণ করল সে মাথা নেড়ে

থ্রিভাল্ডসেন বুঝতে পারছে এলিজা তার কথাবার্তা, হালচাল সবকিছুই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। তাকে ও অ্যাশবিকে নিয়ে এই ভদ্রমহিলা এখন নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণে ব্যস্ত। তাই থ্রিভাল্ডসেনও বসে থাকবে কেন, নিজের হাতের টেক্কাগুলো বের করে খেলা দেখানো শুরু করতে হবে তাকে।

“এলিজার কাছ থেকে শুনলাম,” বলল অ্যাশবি, “যে আপনি নাকি যোগ দিতে চান ক্লাবে।”

“মন্দ হবে না মনে হলো, তাই আরকি।”

“আশা করি, আমাদের দলটাতে ভালোই লাগবে আপনার। আমাদের কাজকর্ম মাত্র শুরু হলো যদিও, কিন্তু আজকের এই এক হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবার কাছে।”

ঘরজুড়ে আরও একবার চোখ বুলাল সে, গুনে দেখল সাতজন সদস্যকে, অ্যাশবি ও লাঘক সহ। আপ্যায়নের দায়িত্ব পাওয়া লোকগুলো একইরকম পোশাক পরে এদিক-সেদিক ঘুরঘুর করছে, তবে কাজেই আছে তারা। কাজ সেরে এক-এক করে বের হয়ে যাচ্ছে দূরের দরজা দিয়ে।

কাঁচের দেওয়াল ভেদ করে ঝকঝকে রোদ এসে ঘর ভরে দিয়েছে, সেই আলোয় লাল কাপেট এবং দামী প্লাশ লেদারের আবরণ ভিন্নরকম দৃতি ছড়াচ্ছে চারদিকে।

সবাইকে বসার জন্য ইঙ্গিত দিল লাঘক।

হেঁটে একদিকে সরে গেল অ্যাশবি।

দুই টেবিলের সবচে কাছেরটায় পা বাড়াল থ্রিভাল্ডসেন, কিন্তু বসার আগেই অন্ধ বয়সী এক ছেলের দিকে চোখ পড়লো তার। খাবার আনা-নেওয়ার লোকদের একজন সে, অতিরিক্ত চেয়ারগুলো স্টেজের পেছনে নিয়ে যাচ্ছে এক-এক করে। প্রথমে মনে হলো যেন ভুল হচ্ছে তার, কিন্তু আরও একবার যখন ছেলেটা চেয়ার নিতে এগিয়ে এল, তখন নিশ্চিত হয়ে গেল পুরোপুরি।

স্যাম কলিঙ্গ।

এখানে!

ম্যালন এবং স্টেফানি শীতল একটা ধাতব মই বেয়ে বাইরের ভেতরের দেওয়ালের মাঝের জায়গাটায় পৌঁছাল। গম্বুজটা দেখতে একক স্থাপনামূলক হলেও আসলে তা না। গম্বুজের ভেতরে আরেকটা স্তর আছে, যেগুলোয় কাঁচের জানলা বসান, আর ভেতর থেকে সেগুলোকেই দেখা যায়। সে হিসেবে এটা দিল্লীয় গম্বুজ যেটাকে সম্পূর্ণ ঘিরে আছে বড় গম্বুজটা, এই বড়টার ভেতরের অংশ দেখতে হলে ছোটটার উপরে উঠতে হয়। বাইরে থেকে আলো বড় গম্বুজের ফাঁক গলে ছোট গম্বুজের জানলার কাঁচ ভেদ করে চার্চের ভেতরের অংশটা আলোকিত করে। খুবই উভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ হয়েছে এই নকশায়, আর এটাই এক সময়ে সবচে উঁচু ছিল, কী উচ্চতায়, কী মহিমায়।

বড় গম্বুজের ভেতরের দেওয়ালের সাথে ছোট একটা প্ল্যাটফর্ম লাগান। কাঠের পুরু খুঁটি ও সাম্প্রতিক সময়ে লাগান স্টিলের বীমগুলো একটা আরেকটাকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করেছে, আর প্ল্যাটফর্মটা ঠিক বিমগুলোর মাঝেই। ওখান থেকে আরও একটা ধাতব মই উঠে গেছে মাঝ বরাবর দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের দিকে, সেখান থেকে সর্বশেষ মইটা গিয়ে মিশেছে একেবারে শীর্ষে, যেখান থেকে আলো প্রবেশ করে। চার্চের একেবারে চূড়ার কাছেই পৌঁছে গেছে তারা, মাটি থেকে প্রায় তিনশ ফিট উপরে এখন। গম্বুজের শীর্ষবিন্দুর ঠিক নিচে, দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের উপর ফ্রান্সের একজন নিরাপত্তাকারী দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক ঘণ্টা আগেই ইন্ড্যালিদেসে এসেছে সে।

একেবারে উপরের দিকে দেখাল লোকটা।

“ওখানে।”

খুব ফুরফুরে মেজাজে আছে এলিজা। সাতজনের সবাই তো উপস্থিত আছেই, সাথে হেনরিক প্রভাস্তসেনও আছে। সবাই বসে গেছে পছন্দমত জায়গায়। ইচ্ছে করেই দুটো টেবিলের কথা বলেছিল সে যাতে কোলাহলের পরিবেশ না লাগে কারও কাছে। তার নিজের কাছেও ঘন সন্নিবেশ ভালো লাগে না। এই অভ্যাস তার হয়েছে হয়ত পুরোটা যৌবন একা পার করে দেওয়ার কারণে। এমনটা না যেকোনো পুরুষ তার জীবনে বৈচিত্র্যময় আনন্দের সৃষ্টি করতে পারত না, অবশ্যই পারত, কিন্তু নিজেকে গভীর কোনো সম্পর্কে জড়ালে নিজস্ব অনুভূতি, ভাবনাগুলো সঙ্গীর কাছে জানাতে হবে, এবং সঙ্গীর ভাবনাগুলো তারও জানতে হবে—এই বিষয়টাই মেনে নিতে পারেনি কখনো, তাই ওভাবে সংসার নিয়ে ভাবা হয়নি তার।

প্রভাস্তসেনের সাথে গ্রাহাম অ্যাশবির পরিচয় পর্বের সময়ে দু'জনকেই খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করেছে সে। দু'জনের কারোরই তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। স্পষ্ট মনে হয়েছে দুই অপরিচিত লোক একে অপরের সাথে পরিচিত হলো মাত্র।

হাতের ঘড়িটা দেখে নিল সে।

সময় হয়ে গেছে।

সবার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কিছু বলার ঠিক আগ মুঠুর্তেই, প্রভাস্তসেন এগিয়ে এসে খুব নিচু স্বরে বলল, আজ সকালের *Le Parisien প্রিকাটা পড়েছেন?*"

“না, তবে পড়ে নিতাম দিনের এক ফাঁকে। সকালে বেশ ব্যস্ত ছিলাম আজ।”

এলিজা দেখল পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা ক্লিপিং বের করছে লোকটা। “তাহলে এটা একটু দেখে নেওয়া দরকার আপনার 12A পৃষ্ঠায়, ডানের কলামের সবচে উপরের খবরটা।”

কাগজটায় খুব দ্রুত চোখ বুলাল সে, একটা চুরির খবর ছেপেছে, চুরিটা হয়েছে গতকাল উত্তেল দেস ইন্ডিয়ালিদেসে। ওখানকার গ্যালারিগুলোতে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ চলছে, আর চুরিটা হয়েছে ঐ গ্যালারীগুলোর একটায়। নেপোলিয়নের জিনিসপত্রে ভরা একটা কেস থেকে একটা জিনিস চুরি গেছে।

একটা বই।

The Merovingian Kingdoms 450-751 A.D

বইটার তাৎপর্য বলতে শুধু এটুকুই যে এটার কথা সম্বাট নেপোলিয়ন তার উইলে একবার উল্লেখ করেছিল, কিন্তু এ ছাড়া এটার মূল্য নেই তেমন, আর একটা কারণ ওটাকে গ্যালারীতে ফেলে রাখার। জাদুঘরের কর্মকর্তারা জিনিসপত্রের তালিকার সাথে বাকি জিনিসগুলো মিলিয়ে দেখছে যে বইটার সাথে আরও কিছু খোয়া গেল কিনা।

প্রভাস্তসেনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সে। “আপনার ঠিক কেন মনে হলো যে এটা আমার সাথে কোনোভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে?”

“আপনার বাড়িতেই তো সব পরিষ্কার করে বললাম, আপনাকে ও তাকে খুব ভালোভাবেই বোঝার চেষ্টা করেছি আমি।”

থ্রিভান্ডসেনের দেওয়া গতকালের সতর্কবার্তাটা আবারো কানে বাজল তার।

আমি যদি তার সম্পর্কে ঠিক ধারণা করে থাকি, তাহলে দেখবেন, সে বলবে যে, সে যেটার জন্য এখানে এসেছিল সেটা নিতে পারেনি, বা সেটা সেখানে নেই, খুঁজে পায়নি, ইত্যাদি, ইত্যাদি, মানে এরকম কিছু অজুহাত দেখাবে।

আর ঠিক এই কথাগুলোই গ্রাহাম অ্যাশবি তাকে বলেছে।

পঞ্চাশ

দ্বিতীয় মেঝের ভেতর দিতে একেবারে গম্ভুজের চূড়ায় পৌছাল ম্যালন। হিমশীতল বাতাস আর সূর্যের আলো তাকে স্বাগত জানাল বাইরের পরিবেশে। এত উপর থেকে চারপাশের দৃশ্য অনবদ্য লাগছে। সেইনে নদী এঁকেবেঁকে পথ খুঁজে নিয়েছে উত্তরের দিকে, একটু সরে গিয়ে লুভর দাঁড়িয়ে আছে উত্তরপূর্ব কোণে, আর পশ্চিমে সবাইকে ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে আইফেল টাওয়ার, দুই মাইলেরও কম দূরত্ব এখানে।

স্টেফানিও উঠে এল উপরে। নিরাপত্তাকর্মীটিও উপরে এল তবে সেই মহায়ের শেষ ধাপেই দাঁড়িয়ে রইলো। তার মাথা ও কাঁধজোড়া দেখা যাচ্ছে শুধু।

“গম্ভুজটা আমি একাই পরীক্ষা করে দেখব বলে ভাবছিলাম,” বলল লোকটা। “কিন্তু কিছুই পেলাম না, তাই একটা সিগারেট খাওয়ার জন্য উপরে এলাম, এসেই দেখি ওটা।”

লোকটার আঙুল দিয়ে দেখানো দিকটায় জাফাতেই একটা নীল রঙের বাক্স দেখতে পেল ম্যালন, চার বর্গইঞ্চির মতো হতে পারে আয়তনে, আলো ঢোকার জায়গায় ঠিক পাশের সিলিঙ্গে আটকানো। মোট চারটা পথ করা আছে গম্ভুজের চারদিকের দেওয়ালে। প্রতিটাই সুসজ্জিত রেলিঙে ঘেরা। খুব সাবধানে ম্যালন একটায় উঠে দাঁড়াল, বাক্সটা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে সে। খুব চিকন একটা তার দেখা গেল, ফুটখানেক লম্বা, একদিকে একটু বুলে আছে, দুলছে বাতাসে।

নিচে দাঁড়ানো স্টেফানির দিকে তাকাল ম্যালন। “একা একটা ত্রাঙ্গস্পন্ডার। এখান থেকেই সিগন্যাল পাঠাবে ত্রি বিমানটায়, আর সেই সিগন্যাল ধরেই বিমানটা আসবে এখানে।” ইউনিটটা টেনে খুলে নিল ম্যালন। খুব শক্তিশালী আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে। “রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে চালান যায় এটা, মানে এরকমই হয় এগুলো। কিন্তু এখানে এটা লাগাতে বেশ ঝক্কি সামলাতে হয়েছে।”

“পিটার লায়নের মতো মানুষের কাছে এটা কোনো সমস্যাই না। এর চেয়েও কঠিন কাজে হাত পাকানো তার।”

নিচে নেমে এল সে ওটা হাতে নিয়ে, তারপর ওটার পাশে লাগানো একটা সুইচ টিপে বন্ধ করে দিল যন্ত্রটা। “এই কারণেই এটা করা তার জন্য কঠিন।” স্টেফানির

হাতে ওটা দেওয়ার মাঝেই বলল সে। “কারণ আপনি জানেন এরকম কাজ খুবই সহজ তার পক্ষে। আর বেশী সহজ বলেই কাজটা কঠিন তার কাছে।”

স্টেফানিও সায় দিল তার কথায়।

আরেকটা রেলিঙের দিকে এগিয়ে গেল ম্যালন। দূরের রাস্তা-ঘাট আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আজ, ক্রিসমাস হওয়ায় মানুষের আনাগোনা বা গাড়ি-ঘোড়া সবই কম। এতে সুবিধাই হয়েছে, কিছু ঘটলেও সেটার ক্ষতির পরিমাণ কম হবে। ইনভ্যালিদেস ও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পুলিশ কোনোরকম চোখে পড়ার মতো কিছু করছে না।

খুব হালকা রঙের একটা মাইক্রোবাস চোখে পড়লো ম্যালনের, ছুটছে উত্তরের দিকে, ইনভ্যালিদেসের ভেতর দিয়ে দ্রুত ছুটে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে তুগভিল অ্যাভিনিউ হয়ে এক চক্র দিয়ে চার্চ অফ ডোমের মূল ফটকের সামনের দিকে এগিয়ে এল ওটা।

স্টেফানিও তার দৃষ্টি অনুসরণ করল।

গতি কমাল গাড়িটা, তারপর ডানে বাঁক নিয়ে মূল পথ ছেড়ে পাথরের ছোট সিঁড়ি ধরে উঠে গেল, এবং চার্চের প্রধান দরজার সামনে গিয়ে থামল।

একটানে রেডিওটা তুলে নিল স্টেফানি।

গাড়িটা মূল দরজা দিয়ে চুকে ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে আরও কিছু সিঁড়ির গোঁড়ায় একটু থামল আবারো।

ড্রাইভারের পাশের দরজাটা খুলে গেল।

রেডিওটা চালু করে স্টেফানি কিছু বলার আগেই একটা লোক গাড়ি থেকে বের হয়েই দৌড় দিল আরেকটা গাড়ির দিকে।

গাড়িটায় ঢোকা মাত্রাই সেটা এক টানে ছুটে দেয়ে গেল সেখান থেকে।

আর তারপরেই মাইক্রোবাসটা বিস্ফোরিত হলো।

▲

“আপনাদের সবাইকে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা,” দলের সবার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলল এলিজা। “আমি ভীষণ খুশি যে সবাই আমরা এক হতে পেরেছি। আজকের এই বৈঠকের জন্য এই স্থানটাই বেছে নিলাম, আশা করি সবার ভালো লাগছে। আয়োজনটা একটু ব্যতিক্রম মনে হতে পারে আপনাদের। টাওয়ারটা বেলা একটা পর্যন্ত বন্ধ আছে, তাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের গোপনীয়তা খুব ভালোভাবেই বজায় রাখতে পারছি,” একটু থামল সে। “এবং আমাদের জন্য খুব মজাদার খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে লাক্ষে।”

এত খুশির মাঝেও তার বিশেষ আনন্দ লাগছে কারণ রবার্ট ম্যন্ট্রিয়ানিও যোগ দিয়েছে, প্লেনে দেওয়া কথাটা রেখেছে সে।

“আমাদের হাতে ঘন্টাখানেক সময় আছে কথা বলার জন্য, তারপর শেষ করে আমরা টাওয়ারের উপরে যাব, আর সেটা দর্শনার্থীরা আসার আগেই আমার বিশ্বাস,

সময়টা খুবই উপভোগ্য হবে সবার কাছে। আইফেল টাওয়ারের শীর্ষে এত অন্ন সংখ্যক মানুষ নিয়ে ঘূরতে আসার সুযোগটা বারবার আসে না। আর আমি এই সুযোগটাই নিশ্চিত করেছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য।”

সবারই সম্মতি দেখা গেল এতে।

“শুধু তা-ই না, আজকে আমরা উপস্থিত করতে পেরেছি দলের সর্বশেষ দু'জন সদস্যকে।”

একথা বলেই সে ম্যন্ত্রযানি এবং থ্রিভাল্ডসেনকে পরিচয় করিয়ে দিল সবার সাথে।

“আপনাদের দু'জনকে আমাদের মাঝে পেয়ে খুবই আমরা খুবই আনন্দিত। সংখ্যায় এখন আমরা আটে, আর আমার মনে হয় এখানেই আমাদের থামা উচিত। কারও কোনো আপত্তি আছে?”

কেউ কোনো শব্দ করল না।

“চমৎকার।”

সবার আগ্রহী মুখগুলোর উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল সে একবার। এমনকি গ্রাহাম অ্যাশবিকেও উচ্ছিত দেখাচ্ছে। সে কি তাহলে মেরোভিনজিয়ান বইটা নিয়ে তার কাছে মিথ্যে বলেছে?

সেরকমই মনে হচ্ছে।

সত্তা শুরুর আগেই তারা কথা বলেছে দু'জনে, এবং তখনও অ্যাশবি বলেছে যে বইটা ডিসপ্লে কেসের ভেতর ছিল না। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছে সে, খেয়াল করেছে তার প্রতিটা অঙ্গভঙ্গি, এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে হয়েছেই লোকটা সত্যি বলছে, নাহয় তার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ মিথ্যেবাদীদের একজন।

কিন্তু বইটা আসলেই চুরি হয়েছে। প্যারিসের সার্বস্থানীয় পত্রিকা সেরকম খবরই ছেপেছে ফলাও করে। এদিকে থ্রিভাল্ডসেনও অনেক কিছুই জানে, কিন্তু কিভাবে? অ্যাশবি কি আসলেই তার দলের একটা দুর্বল পয়েন্ট? এই প্রশংগুলোর উভয় খোঁজার সময় এখন নেই। হাতের কাজের দিকেই মনোযোগ দিতে হবে তার।

“শুরুতেই একটা গল্প শোনাতে চাই আপনাদের। মিস্টার ম্যন্ত্রযানি আমি দুঃখিত এটা পুনরায় শুনতে হচ্ছে আপনাকে। কয়েকদিন আগেই এটা ওনাকে বলেছিলাম আমি। কিন্তু বাকি যারা আছেন, তাদের জন্য এটা একটা দিক-নির্দেশনা বলতে পারেন। কাহিনীটা নেপোলিয়ন যখন মিশ্রে ছিল সেই সময়ের।”

।

চার্চ অফ দ্য ডোমের ছিন্নভিন্ন দরজা ভেদ করে দৌড়ে বের হলো ম্যালন। স্টেফানিও পেছনে। বাস্টা এখনো ঝুলছে আগুনে, ঠিক সিঁড়ির গোড়ায়। চার্চের কাঁচের দরজাগুলোই যা গেছে, আর কোথাও তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। ম্যালন হিসেব করে দেখল যে এরকম বিস্ফোরক বোবাই করা গাড়ি অনায়াসেই দক্ষিণের এই অংশটা

উড়িয়ে দিতে পারত, শুধু তা-ই না, কাছের বাড়িগুলো ও হসপিটালও উড়ে যেতে পারত।

তার মানে...

“খুব বেশী বোমা ছিল না এতে,” বলল সে। “কোনোরকমের একটা বিস্ফোরণ ঘটানোর মতো যতটা লাগে।”

দূরে সাইরেন বাজছে। পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের লোকজনও চলে এসেছে ধারেকাছে। জুলন্ত গাড়িটা থেকে তাপ এসে চারপাশের শীতলতা সরিয়ে দিয়েছে।

“হয়ত ঠিকমত আক্রমণটা করতে পারেনি, হতে পারে না এমন?” জিজেস করল স্টেফানি।

“আমার তা মনে হয় না।”

সাইরেন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

হাতের রেডিওটা শব্দ করে উঠল। উত্তর দিল স্টেফানি, এবং ম্যালন শুনতে পেল অপর প্রান্তের মানুষটা কী বলল।

“কোর্ট অফ অনার-এর প্রাঙ্গনে একটা আত্মঘাতী বোমাহামলাকারীকে দেখা গেছে।”

এলিজার বলা মিশরের গল্লটা শোনা শেষ হলো থ্রিভান্ডসেনের প্যারিস ক্লাবের আসল ভাবনাটা যে নেপোলিয়নেরই ছিল, সেটার ব্যাখ্যাও শুবলতাকারের মুখে। এলিজার সংগ্রহে থাকা চারটা প্যাপিরাসের মোটামুটি একটা বস্তু দিল সে। থ্রিভান্ডসেন খেয়াল করল যে অনেক কিছুই তাদের এই বক্তা বলা যোগ্য নিজেকে বিরত রেখেছে যেগুলো তার কাছে সে বলেছিল। বোঝাই যাচ্ছে সে আলোচনাটা আরও সতর্কতার সাথেই করতে চাইছে। পত্রিকায় সংবাদটা পড়ার একটা প্রভাব নিশ্চিত পড়েছে তার মনে।

প্রভাব না পড়েই বা যায় কোথায়?

মেয়েটার অভিব্যক্তিতেও বোঝা যাচ্ছে অনেক কিছু। অ্যাশবি এখনো বোধ হয় এলিজাকে বলেনি যে বইটা তার কাছেই। মনে-মনে স্টেফানি এবং কটনকে ধন্যবাদ দিল সে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই কাজে ম্যাগেলান বিলের নাক গলানোর কী দরকার?

গত রাত থেকে আজকে সকাল পর্যন্ত ম্যালনকে ফোনে অনেকবার চেষ্টা করেছে সে, তার বহুটি ফোন ধরেনি। তাকে ম্যাসেজও দিয়েছে, কিন্তু উত্তর আসেনি। রিটজে ম্যালনের রুমটা খালি পড়ে ছিল গত রাতে। আর যদিও তার তথ্যদাতারা অ্যাশবিকে দেওয়া স্টেফানির বইটার নাম জানতে পারেনি, কিন্তু সে ভালো করেই জানে সেটা ইনভ্যালিদেসেরই বই।

এ ছাড়া কি-ই বা হবে আর?

স্টেফানির হাতে ম্যালনের বইটা ভুলে দেওয়ার পেছনে অবশ্যই ভালো কোনো উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু সেটা কী, তা ভেবে কূল পাচ্ছে না সে।

টেবিলের অপর প্রান্তে অ্যাশবি বসে আছে শান্তভাবে, মনোযোগ দিয়ে শুনছে লাঘকের কথা। থ্রিভাল্ডসেন নিজেকেই প্রশ্ন করছে যে এখানে উপস্থিত মানুষগুলো কি জানে ঠিক কি কাজে পয়সা খরচ করে নিজেদের নাম লিখিয়েছে তারা? দু'নম্বরি পথে টাকা ইনকামের ধান্দা এলিজার আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে তার। এই নারীর সাথে দুটো বৈঠকে সে যা বুঝেছে তা হলো, এই মানুষটা একটা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে, আর সেটা অবশ্যই টাকা উপার্জনের জন্য যতটা না, তার চেয়েও বেশী হলো তার চিন্তা-ভাবনা, মতবাদ প্রমাণ করার জন্য। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সেই অবহেলিত ধ্যান-ধারণাগুলোর সত্যতা হ্যাত যাচাই করতে চাইছে সে। অথবা ইতিহাস নতুন করে লিখতে চাইছে। তবে যেটাই হোক, সেটা শুধু টাকা উপার্জনের চেয়েও বেশী কিছু। দলের সবাইকে জড়ো করেছে সে, ক্রিসমাসের মতো দিনে, আইফেল টাওয়ারের মতো কোনো এক জায়গায়, অবশ্যই কারণ আছে এর পেছনে।

তাই নিজেকে সে বোঝাল, এই মুহূর্তের জন্য হলেও ম্যালনের কথা ভুলে গিয়ে যে সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য মাটি থেকে এতটা উপরে উঠে এল, সেদিকেই খেয়াল করবে এখন।

বড়ের বেগে ছুটে কোর্ট অফ অনারের কাছে পৌছাল ম্যালন এবং স্টেফানি, ভবনের সামনের খোলা জায়গাটার দিকে চোখ দু'জনেরই। কুমুদীসী এক নারী দাঁড়িয়ে আছে খোলা জায়গাটার মাঝখানে। বত্রিশ-তেত্রিশের মেশীইবে না বয়স, ঘন কালো লম্বা চুল মাথায়, কড়ের মোটা ফুলপ্যান্ট পরনে, চটে যাওয়া সাদা রঙের একটা শার্ট দেখা যাচ্ছে কালো কোটের নিচে। এক হাতে কিছু একটা ধরে রেখেছে।

দু'জন নিরাপত্তাকর্মী বন্দুক তাক করে রেখেছে তার দিকে, পেছনের ভবনের আড়ালে তাদের অবস্থান, আর ওখান থেকেই ম্যালন গতকাল জাদুঘরে ঢুকেছিল। তৃতীয় ব্যক্তিটি অবস্থান নিয়েছে বাঁ দিকে, ইনভ্যালিদেসের উত্তর প্রান্তে নিয়ে যাওয়া খিলানপথের কাছে, লোহার ভারী গেটগুলো বন্ধ।

“কী হচ্ছে এখানে?” বিড়বিড় করে বলল স্টেফানি।

পেছন থেকে একজন এগিয়ে এল, কাঁচের দরজা দিয়ে ঢুকে খিলানপথ ধরে এসেছে সে, ঐ পথটা সোজা জাদুঘরে গিয়ে মিশেছে। তার পরনে বুলেটপ্রফ জ্যাকেট। একজন ফরাসি পুলিশ কর্মকর্তা।

“মাত্র কয়েক মিনিট আগেই একে দেখতে পাই,” লোকটি বলল তাদেরকে।

“আমি ভাবছিলাম যে আপনি কোনো বিক্ষেপক আছে কিনা তা দেখার জন্য ঐ বিল্ডিংগুলো সার্চ করেছেন,” বলল স্টেফানি।

“ম্যাডাম, এখানের বিল্ডিংগুলোয় হাজার-হাজার বর্গমিটার জায়গা। আমরা যতটা পারি দ্রুত করার চেষ্টা করছি, কোনোরকম কাউকে বুঝতে না দিয়েই, ঠিক আপনার কথামত। এখন এই ধীর গতির সুযোগ নিয়ে কেউ যদি আমাদের চোখ ফাঁকি দিতেই চায়, তাহলে সেটা অসম্ভব হবে না তার জন্য।”

কথা ঠিকই আছে।

“কী বলতে চায় সে?” তাকে জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

“সে সবাইকে বলছিল যে তার কাছে বোমা আছে, যেকোনো সময়ে সেটা ফাটিয়ে দিতে পারে, আরও বলছিল যে কেউ যেন না নড়ে, স্থির হয়ে থাকে। এর পরেই আপনাকে আমি রেডিওতে জানাই।”

এবার প্রশ্ন করল ম্যালন, “চার্চের সামনে বোমা বিস্ফোরণের আগে নাকি পরে একে দেখা গেছে এখানে?”

“ঠিক পরেই।”

“ঠিক কী ভাবছ তুমি?” জানতে চাইল স্টেফানি।

মেয়েটার দিকে তাকাল ম্যালন। কিছুটা ঘুরে গিয়ে তার দিকে তাক করে রাখা অন্তর্গুলোর দিকে তাকাল সে। একটা হাত কন্ট্রোলারের উপর থেকে^{স্ট্রাচে} না মোটেই।

“গ্যাষ দি ভ্য দিসতঙ্গে বেইসি লিজ্যাঘম,” চেঁচিয়ে বলল মেঁকেট।

নিঃশব্দে অনুবাদ করল ম্যালন। দূরে থাকুন, অন্ত নিচে তামাম।

কেউ-ই শুনল না তার কথা।

“*Il se pourrait que la bombe soit à l'hôpital. Ou à l'hospice. Faut-il prendre le risque?*” আরও জোরে চিংকার দিল। এবার, কন্ট্রোলারটা ভালো করে দেখাচ্ছে সে। বোমাটা হসপিটালে থাকতে পারে, বা বয়স্কদের এপার্টমেন্টেও থাকতে পারে। এখন আপনারা কি ঝুঁকি নেবেন? বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না ম্যালনের।

পুলিশের লোকটা পেছন থেকে ফিসফিস করে জানাল, “যে দুটোর কথা বলছে সে, প্রথমেই ঐ দুটো ভালো করে খুঁজে দেখেছি। কিছুই নেই।”

“*Je ne le redirai pas.*” আবারো হাঁক দিল মেয়েটা। আমি আর একবারও এটা বলব না।

ম্যালন বুঝতে পারছে এখন যা কিছু আদেশ স্টেফানিরই দিতে, আর সে-অনুযায়ী কাজ করবে ফ্রান্সের পুলিশ। আর স্টেফানিকে বোকা বানানো সহজ না।

সবাই চুপ হয়ে আছে।

একেবারে স্থির।

“অন্তর্গুলো নামিয়ে ফেল,” আদেশ দিল স্টেফানি নেলেই।

হলের এক প্রান্তে বানানো স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল এলিজা। হাতঘড়িতে একবলক সময়টা দেখে নিল সে।

11:35 a.m

পঁচিশ মিনিট বাকি আছে আর।

“আমরা খুব শীঘ্ৰই একেবারে উপরে ঘুৰে আসব। তবে প্ৰথমেই আমি আমাদের আগামীদিনের জন্য কুৱা পৰিকল্পনাটা আপনাদের সামনে তুলে ধৰতে চাই।”

সবার দিকে ঘুৰে দাঁড়াল সে।

“গত কয়েক দশক ধৰে আমরা দেখেছি বিশ্ব-অৰ্থনীতিৰ বাজারে বিৱাট পৱিত্ৰণ এসেছে। একটা সময় ছিল যখন নিজেদেৱ পণ্য মাৰ্কেটে টিকিয়ে রাখাৰ মাৰ্কেই ভবিষ্যৎ দেখত উৎপাদনকাৰীৱা, কিন্তু এখন তাৰ পৱিত্ৰণে বড় ধৰণেৰ জুয়া খেলে তাৱা। ভেঙ্গে বলি, এখন এমন অনেক পণ্যই কেনাবেচা হয় যেগুলোৱ বাস্তবে কোনোই অস্তিত্ব নেই। আৱ শুধু তা-ই না, সেগুলোৱ অস্বাভাৱিক দাম ওঠে বাজারে। কী অদ্ভুত, শুনতে অবিশ্বাস্য লাগছে জানি। একটু পেছনে ফিৰে দেখেন, কয়েক মুক্তিৰ আগে তেলেৰ দাম প্ৰতি ব্যারেল কোথায় উঠল? ১৫০ ডলাৰ। কিন্তু এৱ সময়ে সৰবৱাহেৰ কোনো সম্পৰ্ক ছিল না, তবু এমন দাম ইতিহাসে আৱ দেখিনি আমৰা ফলে কী হলো? মাৰ্কেট সঞ্চুচিত হলো, আৱ দামও পড়ে গেল দ্রুত।”

উপস্থিত বেশিৱভাগই তাৰ কথাৰ সাথে সম্মতি দেলল, যেটা ভালো লাগছে এলিজাৰ কাছে।

“এক নম্বৰে দোষ দিতে হবে আমেৰিকাকে কিন্তু জানিয়ে দিল সে। “১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে যে আইন পাশ হয় তাতে এৱ কম দূৰকল্পনামূলক আক্ৰমণেৰ পথ সুগম হয়ে যায়। আপনাৱা হয়ত জেনে থাকবেন, যে আইনটা পাশ হলো, সেটা পূৰ্বেৰ আইনকে বাতিল কৰে দেয়, যেটা ১৯৩০ এৱ দশকে কুৱা হয়েছিল, আৱ এটা এমনভাৱে কুৱা হয়েছিল যেন কোনোভাৱেই কোনো একটা বাজাৰ ভেঙ্গে না পড়ে। আৱ এখন এৱ কম কোনো ঢাল না থাকায় ত্ৰিশেৱ দশকেৰ সেই সমস্যা আবাৱো ফিৰে এসেছে। এখন বাজাৰেৰ এৱ কম অবমূল্যায়ন ঘটা মোটেই অবাক কৱাৱ মতো কিছু না।”

কয়েকটা মুখে কৌতুহলেৰ অভিব্যক্তি ধৰতে পাৱল সে।

“এটা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ে আছে। যে আইন পৱিত্ৰণ আৱ ত্যাগেৰ উপৱে লোভ এবং দায়িত্বহীনতাকে স্থান দেয়, সেই আইন তো চৱম ফলাফলই ডেকে আনবে, স্বাভাৱিক।” একটা বিৱতি নিল সে। “কিন্তু এৱ মাধ্যমেই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।”

পুৱো ঘৰটা চুপ।

“২০০১ এৱ ২৬ অগস্ট থেকে ১১ই সেপ্টেম্বৰ এৱ মধ্যে একদল লোভী পৱিকল্পনাকাৰী একটা তালিকা বিক্ৰি কৰেছিল, সেটা কিসেৱ জানেন? ৩৮টা স্টক

মার্কেটের একটা তালিকা। যে মার্কেটগুলো খুব নাজুক অবস্থায় ছিল, এবং এটাও বলা হয়েছিল যে আমেরিকায় যেকোনো রকমের হামলা হলেই এই মার্কেটগুলো ভেঙ্গে পড়বে। জার্মান এবং কানাডিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের বাইরে তাদের কার্যক্রম ছিল। তাদের আওতায় ছিল ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স, আমেরিকান এয়ারলাইন্স, মরগ্যান স্ট্যানলে, ডিন উইটার, মেরিল লিফ্স। ওদিকে ইয়োরোপের কোম্পানিগুলোর মধ্যে তাদের টার্গেট ছিল ইস্পুরেন্স কোম্পানিগুলো-মিউনিখ রে এবং এএক্সএ। শুভ্রবার আক্রমণের আগে, মেরিল লিফ্সের এক কোটি শেয়ার বিক্রি হয়ে যায়। সাধারণত, আমরা জানি, দিনে চার মিলিয়ন মানে চাল্লিশ লাখের বেশী কোনোভাবেই বিক্রি হয় না। ইউনাইটেড এবং আমেরিকান এয়ারলাইন্স উভয়ই এরকম অস্বাভাবিক কার্যক্রম দেখেছিল হামলার ঠিক কয়েকদিন আগেই। অন্য কোনো এয়ারলেইন্স এরকমটা দেখেনি।”

“এখন আপনি কী করতে চাইছেন?” একজন সদস্য জানতে চাইল।

“ইজরায়েলে এক সন্ত্রাস-বিরোধী চিন্তাবিদ একবার ওসামা বিন লাদেরনের সম্পদের পরিমাণ জানার কাজে নেমেছিল। তো তার গবেষণায় দেখা গেল শুধুমাত্র ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার পরেই প্রায় কুড়ি মিলিয়ন ইউএস ডলার মুক্তি^{গ্রহণ} করেছিল বিন লাদেন। আর এগুলো জানার পর সেই ইজরায়েলি যা করেছিল ঠিক সেটাই করতে চাই আমি।”

মাথার উপর হেলিকপ্টারের গর্জন শুনেই উপরে তারিখে^{গ্রহণ} ম্যালন দেখল রয়্যাল নেভি ওয়েস্টেল্যান্ড লিফ্স খুব নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

“ন্যাটো,” জানাল স্টেফানি।

আদেশ অনুসারে বোমার কন্ট্রোলার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার চারপাশের পুলিশ নিজেদের অস্ত্র নামিয়ে নিয়েছে।

“আমরা তোমার কথামত কাজ করেছি,” ফরাসি ভাষায় চেঁচিয়ে বলল স্টেফানি।

উত্তর দিল না মেয়েটা। পঞ্চাশ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে, দেখছে কোর্ট অফ অনারের চারপাশের পথগুলোর দিকে। এখনো অস্থির আর খিটমিটে আচরণ করছে সে, আর হাতের কন্ট্রোলারটা নাড়াচ্ছে অবিরাম।

“কী চাও তুমি?” স্টেফানি জিজ্ঞেস করল।

ম্যালন স্থির দৃষ্টি দিয়ে আছে মেয়েটার উপরে, আর সে একটু অন্য দিকে তাকাতেই জ্যাকেটের পকেট থেকে বেরেটা পিস্টলটা বের করে নিল সে, কয়েক ঘন্টা আগে স্টেফানি দিয়েছে তাকে ওটা।

“আমি এখানে এসেছি এটা প্রমাণ করার জন্য,” ফরাসিতে বলছে মেয়েটা। “যে আমাদেরকে যারা ঘৃণা করে, তাদেরকে সেই ঘৃণার জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে।”

বন্দুকটা আরও শক্ত করে ধরল ম্যালন।

কঢ়োলার ধরে রাখা হাতটা যেমন নড়ছে, তেমন নড়ছে সে নিজে, মাথাটা একবার এদিক, একবার ওদিক।

“আমরা বলতে কারা?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

ম্যালন বুঝতে পারছে তার বস সময়ক্ষেপণ করছে, ভালো কোনো সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে নিজে, রেখেছে অন্যদেরকেও। এটা বেশ সনাতন পদ্ধতি-আক্রমণকারীকে ব্যস্ত রাখ, ধৈর্য ধর, তারপর ঘোপ বুঝে কোপ মার।

মেয়েটা এবার স্টেফানির চোখের দিকে তাকাল। “ফ্রাসের অবশ্যই জানতে হবে যে আমাদেরকে আর অবজ্ঞা করা যাবে না।”

ম্যালন অপেক্ষা করে আছে তার নিয়ন্ত্রণসীমার মাঝে মেয়েটার আবারো ফিরে আসার।

“কারা সেই—” কথা শুরু করেছিল স্টেফানি।

‘ কঢ়োলারে রাখা হাতটা সাঁই করে বাঁ দিকে সরে গেল।

মেয়েটার মাথাটা বিপরীত দিকের খিলানপথের দিকে সরে যেতেই, দ্রুত বন্দুকটি বের করে তার দিকে তাক করল ম্যালন।

▲

সভাকক্ষের ঠিক পেছনেই নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে স্যাম ক্রেডই দেখতে পাচ্ছে না তাকে। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘরের মাঝে লুকানোর কংজটা সফলভাবেই করেছে যখন বাকি কর্মীরা চলে যাচ্ছিল এখান থেকে। পরিকল্পনাটো ছিল, তাদের একজনকে যে কোনোভাবে ভেতরে থাকতে হবে, আর সেটা এমন দূরত্বে যেন সবার কথা সে শুনতে পায়। মিগ্যান একবার চেষ্টা করেছিল এই কাজটা করতে, কিন্তু অন্যান্য কর্মীরা খাবারের ট্রিলি টেনে নিতে ডাক দেওয়ায় সে পারেনি, স্যামও ছিল সেখানে। মিগ্যান খুব হতাশ হয়েছিল আর তার সেই হতাশা যেন বলে দিচ্ছিল কিছু একটা করার দায়িত্ব এখন স্যামের।

নিরপত্তাকর্মীরা কেউ এখন নেই ভেতরে। সবাইকে আলাদা এক স্থানে রাখা হয়েছে কোনো ভয়ই নেই এখন, হট করে কেউ চুকে পড়ে ব্যালকনির দিকে যাবার মতো সুযোগও নেই। দুঃ ফিট উপরে থাকার বড় একটা সুবিধা এটা।

এলিজা লাঘকের কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছে সে, এবং খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে সে যা-যা বর্ণনা করেছে। শর্ট সেলিং তখন হয় যখন কেউ অন্য কারও শেয়ার বিক্রি করে দেয় এই আশায় যেন পরে আরও কম দামে সে সেগুলোই আবার কিনতে পারে। এতে লাভ করার সুযোগ থাকে শুধুমাত্র দাম কমে গেলেই।

নানান রকমের পদ্ধতির মাঝে এটাও একটা লাভ করার পদ্ধতি, তবে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রথমে, যে স্টকগুলো বিক্রি করলে লাভ হতে পারে এমন স্টক নির্ণয় করতে হয়, তারপর সেসব স্টকের মালিকের কাছ থেকে সেগুলো ধার নিতে হয়। কিছু শর্তে সেগুলো নেওয়ার পর, বর্তমান বাজারদর অনুসারে সেগুলো বিক্রি করে শর্ট সেলাররা। যখন সেই স্টকের দাম আরও কমে যায়, তখন সেগুলোই আবার কম দামে কিনে যার কাছ থেকে স্টক প্রথমে নেওয়া ছিল, তাকে সেগুলো ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়, মাঝখানে লাভটা রেখে দেয় শর্ট সেলাররা। তবে একবার বিক্রি করার পর সেলাররা যখন অপেক্ষা করে দাম আরও কমার, তখন যদি তার উল্টোটা ঘটে, দাম যদি বেড়ে যায়, তখন সেটা বেশী দামে লোকসানে কেনা ছাড়া উপায় থাকে না, কারণ যার স্টক তাকে ফেরত দিতে কিনতে তো হবেই। কিন্তু পুরো বিষয়টা সম্পূর্ণ উল্টে যেতে পারে যদি শর্ট সেলাররা জানতে পারে যে কোন-কোন স্টকের দাম নেমে যাবে, এবং ঠিক কখন এটা হবে, তাহলে আর কোনো ধরণের ঝুঁকিই থাকে না।

আর এতে লাভের পরিমাণ কল্পনাতীত।

আর এই কৃট-কৌশলের কথা অন্যান্য বিষয়ের সাথে পোস্ট করা হয়েছিল তার ও মিগ্যানের ওয়েবসাইটে।

সিক্রিট সার্ভিসের ভেতরে থাকাকালীন সে নিজেও শুনছে বিন লাদেনের অর্থ হাতানোর কথা, এই তদন্তগুলো খুবই গোপন ছিল, আর সেগুলো নাড়াঢ়া করত তার অনেক উপরের কর্মকর্তারা। তাই হতে পারে সে যখন এই সংক্রান্ত কথাগুলো তার সাইটে প্রকাশ করেছিল তখন তার উপরের লোকজনগুলো একরূপ বাধ্য হয়েই চাপ করতে শুরু করে তার উপর। আর এখন এলিজা লাঘবেন্দ্র কৃষ্ণার সাথে তার নিজের যে সন্দেহ এবং আশংকা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলো মিলিয়ে নিচ্ছে।

সত্যের যে কতটা কাছে ছিল, সেটা কখনো বুঝতেও পারেনি সে।



খুব আগ্রহের সাথে লাঘকের কথাগুলো শুনছে অ্যাশবি। তার পরিকল্পনাটার আসল চিত্রটা ফুটে উঠছে ধীরে-ধীরে। পিটার লায়নের সাথে দেন-দরবার করার জন্যই মূলত তাকে নিয়োগ দিয়েছিল এলিজা, কিন্তু তার ক্লাবে যুক্ত হবার পরও তার পরিকল্পনার পুরোটা জানত না অ্যাশবি।

“বিন লাদেন যেভাবে কাজ করেছিল, তাতে সমস্যা ছিল দুটো,” বলে চলেছে এলিজা। “এক, আমেরিকার স্টক মার্কেট টানা চারদিন ধরে বন্ধ ছিল হামলার পর। আর দুই, শর্ট সেলিং ধরার জন্য কিছু স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি আছে, তখনও ছিল। কোথায় কোন স্টক কী পরিমাণ কাদের মাধ্যমে কেনা-বেচা হচ্ছে তার সব তথ্যাদি, আপনারা জানেন, ‘ব্লু শীট’ এ প্রকাশ করা হয়। আর এই বিবরণী বিশ্লেষণ করলেই সব বোঝা যায় যে কোথায় কী হচ্ছে। যেহেতু চারটে দিন মার্কেট একেবারে অফ, এই সময়টাতে এগুলো বিশ্লেষণ করার মতো যথেষ্ট সময় পেয়েছিল কর্তৃপক্ষ। অন্তত আমেরিকায় এটা

হয়েছিল। কিন্তু বাইরের মার্কেটগুলো তো আর বন্ধ ছিল না, তাই এমন দুই নম্বরি চলতে থাকে আমেরিকার বাইরে বড় বাজারগুলোয়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাড়ি-কাড়ি টাকা বের করে নিয়ে গেছে চোখের পলকে।”

অ্যাশবিরও মনে পড়ে গেল ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ এর হামলার পরবর্তী সময়ের কথা। লাঘক ঠিকই বলেছে। ইয়োরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম বীমা কোম্পানির নাম মিউনিখ রে, এরাও প্রায় দুশ' কোটি ডলার খুইয়েছে আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পর। শুধু তা-ই না, এর স্টকের পরিমাণও কমতে শুরু করে হামলার পর। চোখ-কান খোলা রাখা যেকোনো শর্ট সেলাররা হয়ত লক্ষ ডলার কামিয়ে নিয়েছে সেই সুযোগে।

অন্যান্য মার্কেটগুলোর অবস্থার কথাও মনে পড়ে গেল তার।

Dow Jones কম্পানির সূচক নেমে যায় ১৪%, *Standard & Poor* এর ৫০০ সূচক কমে যায় ১২%, *NASDAQ* কম্পজিট নেমে যায় ১৬%। একই চিত্র দেখা যায় অন্যান্য দেশের বাজারেও হামলার পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে। তার নিজের অবস্থাও খারাপ হয়ে গেছিল, সত্যি বলতে অঘটনের শুরুর দিকেই ছিল সে, যেটা দিন যত গড়িয়েছে, আরও খারাপ হয়েছে।

যে ডেরিভেটিভসের কথা এলিজা বলেছে, সেটাও সত্য। লোকে টাকার খণ্ড নিয়ে যেভাবে বন্য জুয়ায় মেতে ওঠে, তা ভাবা যায় না। সূদের হার, বৈদেশিক মুদ্রা, স্টকের দাম বা কর্পোরেট বাজারে ধস, সব রকম দিক থেকেই বাজারে নামে তারা, আর এদের পেছনে টাকা ঢালে বিনিয়োগকারী, ব্যাঙ্ক এবং ক্রেডিটরেজগুলো। অ্যাশবির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা একবার তাকে বলেছিল যে একমাত্র ৮০০ ট্রিলিয়নেরও বেশী ইউরো খুঁকির মাঝে পড়ে আছে সারা বিশ্বজুড়ে।

আর এখন সে বুঝতে পারছে এই টাকাগুলো কীভাবে থাকা অবস্থাতেই এর থেকে লাভ করা সম্ভব।

একবার যদি সে পথটা শুধু জানত।

▲

ম্যালন খেয়াল করল তার হাতের বন্দুকটা মেয়েটা দেখামাত্রই দৃষ্টিটা স্থির করে রাখল সেটার ওপর।

“বেশ,” ফরাসিতে বলল ম্যালন। “যা পার কর।”

কন্ট্রোলারে চাপ দিল মেয়েটা।

ঘটল না কিছুই।

আবারো চাপল সেটা।

সব চুপ, কোনো বিস্ফোরণ নেই।

বিস্রলতা নেমে এল সারাটা চোখে-মুখে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কথা শুনছে প্রভাস্তসেন, কিন্তু মনোযোগ দিতে পারছে না। একজন মহিলা বর্ণনা করে যাচ্ছে কিভাবে সন্তাসী খেতাব পাওয়া একটা মানুষ অন্যকে মেরে নিজের পকেট ভর্তি করেছে। তার কথায় কোনো নিন্দা, সমালোচনা কিছুই নেই, বরং সেই লোকের এমন অর্জনকেই বড় করে দেখাতে চাইছে এলিজা লাঘক।

একইভাবে গ্রাহাম অ্যাশবিকে দেখেও খুবই মজা পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। তারমত এমন নীতিহীন মানুষের পক্ষে অন্যের দুর্দশা থেকে ফায়দা লোটা কোনো বিষয়ই না। সে ভাবল যে মেঞ্চিকোতে যে সাতজন মানুষ মারা গেল সেই অনুভূতিটা যদি কোনোভাবে অ্যাশবির মাথায় ঢোকান যেত, কেমন হত তাহলে? সেই সাতজনের নাম পর্যন্তও যে এই লোক জানে না, এটাই স্বাভাবিক। যদি জানত, তাহলে একটু আগে যখন তার সাথে পরিচয় হলো তখনই একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যেত তার ভেতর। কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। আর তাছাড়া নামগুলো জানার প্রয়োজনও তো নেই, তার কী আসে যায় এতে? এসব জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য অ্যামান্দো কেইব্র্যাল তো ছিলই। আর এগুলোর বিস্তারিত অ্যাশবি যতই জানবে ততই মঙ্গল।

“এগুলো আগে কখনো জানতে পারিনি আমরা, কিন্তু কেন?”^{ক্ষেপণ} করল অ্যাশবি।

“মাত্র কয়েক বছর হলো ইন্টারনেটে এটা নিয়ে কানুনী শুরু হয়েছে,” লাঘক বলল। “*Les Echos* নামের খুব নামকরা ফিনান্সিয়েল প্রতিকা একটা আর্টিকেল ছেপেছিল এই বিষয়ের উপর, ২০০৭ সালে। আমেরিকান বেশকিছু পত্রিকা ঐ প্রবন্ধটা থেকে কিছু উল্লেখ করেছিল তাদের পত্রিকায়। ইন্টার্নেট সরকারের যাদের সাথে আমার যোগাযোগ আছে তারা বলেছে আমায় যে এই পুরো বিষয়টাকে ক্লাসিফাইড ঘোষণা দিয়ে গোপন করা হয়। এগুলো যে গুজব না, সত্যি, সেটা সবাই জানুক আমেরিকা তা চায় না। ওদিকে এটা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছে যে এগুলো সবই গুজব, এরকম অবৈধ কোনোকিছুর সাথে তাদের কারো কোনো সম্পৃক্ততা নেই।”

হাসল অ্যাশবি। “এটাই আমেরিকানদের স্বভাব। ধামাচাপা দিয়ে ছেড়ে দিয়েই মনে করে ঝামেলা শেষ।

“হয়েছেও তো তা-ই,” আরেক সদস্য বলল।

“কিন্তু এখান থেকে আমাদের শেখার আছে,” আবারো এলিজা এল। “আর সত্যি বলতে, বেশ কিছুদিন ধরে এটা নিয়েই গবেষণা করছি আমি।”

নিরাপত্তাকর্মীরা মেয়েটাকে ঘিরে ফেলতেই হাতের অস্ত্রটা নামাল ম্যালন। হাত, বাহু ভলো করে আটকে নিয়ে তাকে কোর্ট অফ অনার থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

“কিভাবে বুঝলে মেয়েটা ভুয়া দিচ্ছে?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

“বাইরে যে বোমাটা ফাটল, সেটা বলতে গেলে কিছুই না। বোমার মতো বোমা হলে পুরো চার্চই উড়ে যেত। লায়ন আসলে বড়শীর সুতো ছেড়ে দিয়ে মাছের দৌড় দেখছে।” একটু ঘুরে গিয়ে হাতের বেরেটা দিয়ে কঠোলারটা দেখাল ম্যালন। “ওটার সাথে কোনোকিছুরই সংযোগ নেই, একেবারেই ভুয়া।”

“আর তোমার চিন্তা যদি ভুল হত?”

“হত না।”

মাথাটা দোলাল স্টেফানি।

“লায়ন আমাদেরকে এখানে টেনে এনেছে মেরে ফেলার জন্য না,” ম্যালন বলল। “সে জানেই যে অ্যাশবি দু'পক্ষের হয়েই কাজ করছে। আর তাই সে চেয়েছে বলেই আমরা এখন এখানে।”

“কিন্তু মেয়েটাকে দেখে তা বোৰা গেল না, এগুলোর কিছুই ঘৰে হয় জানত না সে। ওর চোখে-মুখে যে ভাব দেখলাম, তাতে মনে হলো, যেকোনো কিছুই উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত সে।”

“প্রত্যেক কাজের জন্যেই একজন মাথামোটা থাকে। মেয়েটা সেরকমই এক্ষেত্রে। আর লায়ন এটা করেছে যেন সে আরও কিছুটা সময় স্বায় আমাদেরকে ব্যন্ত রেখে, অন্তত আমাদের সাথে চূড়ান্ত কিছু করার আগে নিজেই যেন রেডি হয়ে নিতে পারে।”

চারপাশে ইনভ্যালিদেসের বড়-বড় ভবনের আড়ালে আইফেল টাওয়ার ঢাকা পড়েছে। স্যাম আর হেনরিকের কী হচ্ছে ওদিকে, কে জানে। কিন্তু এখন তার ভাবনাটা আবারো গম্ভীর পাওয়া ট্রাঙ্গপ্রভারের দিকে নিয়ে এল ম্যালন। “আমার মনে হয়, যে মুহূর্তে আমরা যন্ত্রটা বন্ধ করে দিয়েছি, সে মুহূর্তে আমরা সংকেতও দিয়ে ফেলেছি যে খেলা শুরু।”

স্টেফানির রেডিওটা সচল হলো।

“আর ইউ দেয়ার?” চিকন ও গুরুগম্ভীর, এ দুয়ের ঠিক মাঝের একটা কষ্ট, খুব সহজেই চেনা যায়। প্রেসিডেন্ট ড্যানি ড্যানিয়েলস।

মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল স্টেফানির।

“ইয়েস, আই অ্যাম হিয়ার,” উত্তর দিল সে।

“কটনও আছে ওখানে?”

“হ্যাঁ, আছে।”

“স্টাফরাই এই যোগাযোগটা সেরে দিতে চাইছিল, কিন্তু ভাবলাম, আমার নিজেরই কথা বলা উচিত। শোন, অতো ব্যাখ্যা করার সময় নেই, কথার মাঝে কথাও বলবে না। আমরা এখান থেকেই সবকিছুতে চোখ রাখছি, আর তুমি ওখানকার বামেলা নিয়ে আছ। এখন এদিকে ঘটেছে আরেক ঘটনা। ছয় মিনিট আগে একটা ছোট বিমান নির্ধারিত পথ ছেড়ে আড়াআড়ি পথে এরোপোর্ট দে প্যারিসে নেমেছে। জায়গাটা লে বোরগেতে।”

ফিল্ডটা চেনে ম্যালন, এখান থেকে সাত মাইল উত্তরপূর্বে। কয়েক দশক ধরে এটা প্যারিসের একমাত্র এয়ারপোর্ট ছিল, আর এটা বিখ্যাত, কারণ চার্লস লিউবার্গ ১৯২৭ সালে ট্রান্স-আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এখানেই অবতরণ করেছিল।

“প্লেনটা এখন তোমাদের দিকেই যাচ্ছে,” বলল ড্যানিয়েল।

বিন্দুগুলো একে-একে মিলে গেল ম্যালনের কল্পনায়। “এই কারণেই লায়ন সময় নিয়েছে।” বলল সে।

“তো, এখন কী করতে বলেন আপনি?” জিঞ্জেস করল স্টেফানি।

“ইনভ্যালিদেসের উত্তরদিকে এতক্ষণে ন্যাটোর একটা হেলিকপ্টার নেমে যাওয়ার কথা। ওটায় উঠে পড়। বাকি কথা ওখানেই হবে।”

সময়টা খুবই উপভোগ করছে এলিজা। তার কথাগুলো শ্রোতাদেরকে দারুণভাবে অনুগ্রামিত করেছে যার প্রমাণ খুঁজতে চাইলে সবার মনের দিকে তাকানোই যথেষ্ট। সঠিক লোকদেরকেই বেছে নিয়েছে সে। প্রত্যেকেই যুবসাহসী ও দৃঢ়চিত্তের।

“বিন লাদেন ব্যর্থ হয়েছিল কারণ তার অতি কল্পনা তার বাছ-বিচারকে নষ্ট করে দিয়েছিল। মোটেই সতর্ক ছিল না সে। একটা পরিষ্কার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল লাদেন।” মাথাটা একটু দোলাল এলিজা। “কিন্তু বারবার একইভাবে লাভের আশা করাটা খুবই বোকামি।”

“যা-ই বলুন না কেন, আমি কিন্তু মানুষ মারতে পারব না,” ম্যান্স্ট্রিয়ানি বলল।

“আমিও না। আর এটার দরকারও নেই। শুধু জনগণকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো একটা হমকি তৈরি করতে পারলেই হলো। আর সেই আতঙ্ক চলাকালীন সময়ের ভেতরেই কাজ সেরে নেব আমরা।”

“পৃথিবীটা কি যথেষ্ট আতঙ্কের ভেতর নেই?” জিঞ্জেস করল একজন।

“অবশ্যই আছে,” উত্তর দিল এলিজা। “এখন আমাদের সেটাই ব্যবহার করে কাজ সারতে হবে।”

তার মায়ের শেখান একটা বিষয় মনে পড়ে গেল এখন। শ্রোতাদের আত্মবিশ্বাস বা আস্থা বাড়ানোর সবচে সেরা উপায় হলো তাদেরকে বোঝাতে হবে যে তুমি তাদেরকে খুব বিশ্বাস কর এবং তাদের কাছে খুব গোপন কিছু বলে দিয়েছ।

“প্যাপিরাস থেকে পাওয়া জ্ঞান আমাদের কাছে আছে। আর এই প্যাপিরাস থেকেই নেপোলিয়ন অনেক কিছুই শিখেছিল। আর বিশ্বাস করুন, এরাই আমাদেরকে বলে দেবে যে কী করতে হবে, কখন করতে হবে।”

থুব গভীর একটা ভাব ফুটিয়ে উঠাল মুখে।

“পৃথিবীর মানুষ এমনিতেই এখন ভয়ের মাঝে আছে। কারণ সন্ত্রাসবাদ আসলেই মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমরা কেউই সেটার পরিবর্তন করতে পারব না। এখন, এই বাস্তবতা কিভাবে আমরা কাজে লাগাব সেটাই বিষয়।”

“*Cui bono,*” একজন বলে উঠল।

হাসল এলিজা। “ঠিক বলেছেন। লাভটা কাদের। এই ল্যাটিন প্রবাদটা আমাদের কাজের সাথে মিলেছে ভালো।” আরও শুরুত্তের সাথে বোঝাতে একটা আঙুল উঁচু করল সে। “আপনারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে সন্ত্রাসবাদের কারণে কাদের লাভ হয়? এয়ারপোর্ট এবং বাসস্থানে নিরাপত্তা জোরদার হয়। এগুলো কারা নিয়ন্ত্রণ করে? আকাশপথে যারা ভ্রমণ করে, সংখ্যাটা মুখ্য না। যারা এই সেবাগুলো দেয়, তারাই লাভ করে। ইনস্যুরেন্স বিজনেস সরাসরি ক্ষতিহস্ত হয় এতে। জলে, স্থলে, সমুদ্রে বা মহাশূন্যে, সব জায়গাতেই ব্যাপকভাবে মিলিটারি বা সৈন্য বসান হচ্ছে। উৎসুকতিতে। যেকোনো হৃষি থেকে আমাদের নিরাপদে রাখার জন্য যে খরচ সেটা বহন করা যোটেই অসম্ভব না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দরকার হয় খুব কাশলী সহায়তার, সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কস্ট্রাকশন সেবা তো আছেই, আর এই সব সেবার পেছনে যে পরিমাণ খরচ সেটা অকল্পনীয়। আমরা দেখি মিলিটারিটি যুদ্ধ করছে, কিন্তু মাঠের যুদ্ধের থেকে কন্ট্রাক্টরদের যুদ্ধই আরও বেশী শক্তিশালী। আর এই কন্ট্রাক্টর কোথায় টাকা ঢালে? যুদ্ধে। এই যুদ্ধ স্বেফ একটা ব্যবস্থা ভাদ্যের কাছে। আর এই বিনিয়োগ যখন লাভ বয়ে আনতে শুরু করে, সেটার শেষ কোথায় তা জানে না কেউ। আপনারা দেখে থাকবেন, যুদ্ধ-সহায়তা কেন্দ্রিক সেবা যেসব কোম্পানি দেয় সেগুলোর শেয়ারের দাম পাঁচশ থেকে আটশ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০১ এরপর থেকে আজ অবধি।”

একটা ক্রু উঁচিয়ে একটু হাসল সে।

“লাভ করার কিছু উপায় আছে যেগুলো সহজেই বোঝা যায়, বা মানুষে জানে। কিন্তু এর বাইরেও কিছু সূক্ষ্ম পথ আছে, আর সেগুলো নিয়েই আমি আলোচনা করব লাক্ষের পর।”

“আপনার পরিকল্পনাটা কী?” জিজেস করল অ্যাশবি। “আমার তো আর তর সইছে না।”

এতে অবাক হবার কিছু নেই এলিজার। তার নিজেরই তর সইছে না, কিন্তু কথা হলো, অ্যাশবি কি বন্ধু, নাকি শত্রু?

“বিষয়টা এভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। ১৯৯০ এর শেষের দিকে দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া সবগুলো দেশের অর্থনীতি প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ তখন তাদেরকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিল দৈন্যদশা থেকে মুক্ত করতে। আমাদের মাঝেই উপস্থিতি রবার্ট ম্যন্সন সে সময়ে আইএমএফে কাজ করতেন, উনি বিষয়টা জানেন যে আমি কী বলছি।”

মাথা নেড়ে সায় দিল ম্যন্সন।

“আচ্ছা, যখন সেই টাকা এই দেশগুলোয় চুকল, বিনিয়োগকারীরা হামলে পড়লো তিন দেশের অর্থনীতিতে, একেবারে কচুকাটা করে কড়ায়-গণ্য হিসেব করে প্রাপ্য পাওনা বুঝে নিয়েছে। হাতে যদি আপনার সঠিক তথ্য সঠিক সময়ে থাকে, তাহলে অনেক ঝুঁকির মাঝে থাকা মাকেট থেকেও কোটি-কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া যায়। আমি প্রাথমিকভাবে কিছু কাজ অবশ্য শুরু করে দিয়েছি। তিনশ মিলিয়ন ইউরো এক জায়গায় লাগিয়েছি, আর সেটা আগামী চৰিশ মাসের ভেতরেই উঠে আসবে আশা করছি। কিন্তু পরিমাণটা কেমন হবে? হিসেব করে দেখলাম, সেটা চার দশমিক চার থেকে আট বিলিয়নের মাঝে থাকবে। আর আমি আবার একটু মিতব্যয়ি হবার চেষ্টা করছি, তাই যে টাকাটা আসবে, সেখান থেকে একটা টাকাও ফালতু ট্যাক্স হিসেবে খরচ করব না। অন্যভাবে বলতে গেলে, পুরো টাকাটা আয়কর-মুক্ত অবস্থাতেই জমা হবে।”

সবার মাঝে উচ্ছাসের উপস্থিতি দেখা গেল এলিজার এমন ভীষ্মৎবাণীতে। একজন টাকাওয়ালা মানুষকে তার টাকা যতটা না টানে, তার জেনে বেশী টানে আরও টাকা বানানোর সুযোগে। তার দাদা একেবারে ঠিক কথাটাই হলে গেছেন-যত পার টাকা কামাও, তবে সেগুলো নিয়ে বসে থেক না, খরচ কর টাকায় টাকায় টাকা আনে।

“সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা সফল হব কিন্তু সেটাই ভাবছি,” বলল এক সদস্য।

কাঁধ ঝাঁকাল এলিজা। “কিভাবে হব না, বলুন? সরকার এখনো এই সিস্টেমকে ঠিকমত ম্যানেজ করতে পারে না। সত্যি বলতে, সরকারের ভেতরের কেউ এটা ভালো মতো বোঝেই না। সমাধান তো আরও দূরের ব্যাপার। আর সাধারণ জনগণ এটার বিন্দু-বিসর্গও জানে না। নাইজেরিয়ানরা প্রতিদিন কী করে দেখুন। লক্ষ লক্ষ সরল-সোজা মানুষকে ইমেইল করে, বলে যে বিরাট অংকের একটা লাভ করার সুযোগ আছে আপনার, এই কাজে এত লাভ, সেই কাজে এত লাভ। এখন সেই লাভ করতে হলে সামান্য কিছু ফি দিতে হবে তাকে, এরপর সে জানিয়ে দেবে বিস্তারিত। সারা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ প্রতারিত হচ্ছে এর মাধ্যমে। টাকার গন্ধ পেলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাই আমি বলব, আমাদের কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে সবার।”

“এখন কিভাবে আমরা সেগুলো শুরু করব?”

“লাক্ষের পরেই আমি সেটা বলব আপনাদের। এখন শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি যে আমরা এই মুহূর্তে...অনেকটা বলতে পারেন...মূলধন সংগ্রহে নেমেছি, যেগুলো বিনিয়োগ করে আমরা কয়েক বিলিয়ন ঘরে তুলে নেব। যে টাকা আমরা সবার

স্বার্থে বিনিয়োগ করতে যাচ্ছি, সেটার অস্তিত্ব খাতা-কলমে নেই, কিন্তু বাস্তবে আছে। যা-ই হোক, আমরা এখন কয়েক মিনিটের জন্য টাওয়ারের একেবারে শীর্ষে উঠবো, চলুন।”

উঠে দাঁড়াল সবাই।

“আমি নিশ্চিত করেই বলছি,” এলিজা বলল, “সময়টা একটুও অপচয় হবে না।”

তেক্ষণ

ওয়েস্টল্যান্ড লিঙ্কসের এই হেলিকপ্টার গাড়ি প্রস্তুতকারক বিখ্যাত রোলস রয়েসের বানানো। ম্যালন চুপ করে ওটার পাখার শব্দ শুনছে। সে যখন নেভিতে ছিল, তখন শিখেছে কিভাবে বিমান চালাতে হয়, সৈন্যদেরকে পৌঁছে দিতে হয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে। লগবুকে তার যত ঘন্টা উড়ার কথা লিপিবদ্ধ আছে সেটা রীতিমত সমীহ করার মতো। কিন্তু হেলিকপ্টার সে চালায়নি কখনো।

পেছনের অংশে বসে আছে সে, শীতল বাতাসে ভর করে উড়ে যাওয়া দেখছে।

স্টেফানি বসেছে তার পাশেই।

সামনের কক্ষিট থেকে একটু শব্দ হতেই তাকাল ম্যালন, ছোট জামালাটা থেকে আসছে ওটা। পাইলট নিজের কানে লাগানো হেডমেট দেখিয়ে দেওয়ালে ঝুলানো আরও দুটো হেডমেটের দিকে দেখাল। একজন সামরিক কর্মকর্তা এগিয়ে এসে তাকে ও স্টেফানিকে হেডফোন দুটো দিয়ে গেল।

মাথায় জড়াতেই কানের সাথে লাগানো স্পিকার পাইলটের কঠ ভেসে এল। “একটা এনক্রিপ্ট করা ম্যাসেজ আছে আপনার জন্ম।”

মাইক্রোফোনের নমনীয় তারটা একটু বাঁকা করে মুখের কাছে নিয়ে এল ম্যালন। “হ্যাঁ, দিন। শুনি।”

কয়েকটা ক্লিকের শব্দ হলো, তারপর আবার একটা কঠ। “আই অ্যাম ব্যাক।”

“এবার কী বলা যায় যে ঠিক কী হতে চলেছে?” ম্যালন জিজ্ঞেস করল ড্যানি ড্যানিয়েলসকে।

“প্লেনটা পথ হারিয়েছে, তা সন্দেহ নেই। প্রথমে এটা শহর থেকে দূরে উত্তর দিকে উড়ে গেল, এখন আবার দক্ষিণে ঘূরে গেছে। কোনো রেডিও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না ওটার সাথে। এখন আকাশে থাকতেই ওটাকে আমরা ধ্রংস করে দিতে পারি, কিন্তু তার আগে আমি চাইছিলাম যে তোমরা দু'জন একটু দেখ এটা। ফ্রাসের প্রেসিডেন্ট এখন আমার ফোনের লাইনেই আছেন, তাকে হোল্ডে রেখে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তিনি ইতিমধ্যে একটা ফাইটার প্লেন পাঠিয়েছেন। ঠিক এই মুহূর্তে টার্গেট বিমানটা ফাঁকা অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ছে, লোকজন নেই নিচে, তাই ওটাকে ভূপাতিত করা যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সেটা করতে চাই না, খুব বেশী দরকার না হলে করব না। নানান রকমের ফিরিস্তি করতে হবে ওটা করলে।”

“এটা কি আসলেই ভয়ের কোনো বিষয়? মানে, আপনি নিশ্চিত কিনা সেটাই জানতে চাইছি।” বলল ম্যালন।

“কি যে বল, কটন, আমি নিশ্চিত না বলেই তো গড়িমসি করছি, তবে হিথু পোর্টে একটা প্লেন রাখা ছিল লায়নের। তুমি যেটা পেয়েছিলে। আর আমার মনে হয়, লায়ন চেয়েছিল যেন আমরা ওটা খুঁজে পাই—”

“তার মানে, কাল রাতের ঘটনা আপনি জানেন?”

“প্রত্যেকটা ঘটনাই জানি। আমি ঐ হারামিটাকে চাই। গ্রীসের এসাসিতে যখন বোমা মারল, আমার কয়েকজন খুব কাছের বন্ধু মারা যায়। এ পর্যন্ত যত মানুষ মেরেছে সে, ঐ তুলনায় এটা সামান্য। ওকে এবার আমরা দেখে ছাড়ব।”

কক্ষপিটের দরজাটা খুলে একজন পাইলট এদিকে এগিয়ে এল, সেই সুযোগে আকাশটা দেখে নিল ম্যালন। মেঘ যেন ফ্রান্সের উপর দিয়ে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে, দেখে ঠিক সেরকম মনে হলো উপর থেকে। একটু দূরেই নীল ও হলুদ স্ট্রাইপ দেওয়া একটা প্লেন চোখে পড়লো, ভালো করে দেখতেই বোঝা গেল, এটাও গত রাতে দেখা সেসনা স্কাইবকের মতোই আরেকটা। প্রায় পাঁচ হাজার ফিট উপরে উড়ছে এখন।

“গ্যাপটা একটু কমাও,” বিমানটার আরও কাছে যেতে বলল ম্যালন পাইলটকে।

“দেখতে পাচ্ছ?” জিজ্ঞেস করল ড্যানিয়েল।

বাতাস কেটে আরও দ্রুত এগিয়ে চলেছে হেলিকপ্টারটা। লেখাগুলোর শক্তি ভালোই বুঝতে পারছে ম্যালন।

প্লেনের ধাতব শরীরে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

“ওটার পেছনেই থাক, ভিশন ফিল্ডের ভেতরে আছে না,” মাইক্রোফোনে বলল ম্যালন।

লাল অঙ্করে লেখা প্লেনটার আইডি নামারটা মিলিয়ে দেখতেই বুঝতে পারল এটা গত রাতের সেই প্লেনটাই।

“এটার আইডি আর হিথুর প্লেনটার আইডি একই,” হেডসেটে ম্যালন বলল।

“তুমি কি বলতে চাইছ লায়ন নিজেই ঐ প্লেনে?” জিজ্ঞেস করল ড্যানিয়েল।

“এরকমটা হলে অবাক হব,” উত্তর দিল ম্যালন। “সে লোকদেরকে খেলায় বেশী, কিন্তু নিজে খেলে কম।”

“ওটা ঘূরে যাচ্ছে,” পাইলট বলল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখা গেল স্কাইবক পূর্বে বাঁক নিয়েছে।

“আমরা এখন কোথায়?” জিজ্ঞেস করল পাইলটকে।

“প্যারিসের উত্তর দিকে, চার মাইল দূর হতে পারে। সেই হিসেবে বলা যায় প্লেনটা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে সরে গেছে। যার মানে আমরা পিছু নিলে শহর ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।”

সব টুকরো-টুকরো বিষয়গুলো একসুতোয় গাঁথার চেষ্টা করছে ম্যালন। টুকরোগুলো খুবই এলোমেলো, কিন্তু সম্পর্ক একটা আছেই।

“ওটা আবারো ঘুরে যাচ্ছে,” বলল পাইলট। “এবার যাচ্ছে পশ্চিমের দিকে। প্যারিস থেকে সম্পূর্ণ উলটো দিকে, ঠিক করে বললে ভারস্যাইলেস এর দিকে।”

এয়ারফোনটা টান দিয়ে খুলে ফেলল সে। “সে আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে?”

“সম্ভাবনা কর্ম,” বলল পাইলট। “তার কাজের ধরণ খুবই আনাড়ি মনে হচ্ছে।”

“আমরা কি উপর থেকে এগিয়ে যেতে পারব?”

মাথা নাড়ল পাইলট। “যতক্ষণ না সে প্লেনের ছাদে চড়ে বসছে, টের পাবে না আশা করি।”

“তাহলে তা-ই কর।”

লেজের উপর লাগানো রাডারটা নড়েচড়ে উঠল, হেলিকপ্টারও ঘুরে গেল কিছুটা, তারপর আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে শুরু করল প্লেনের দিকে, দুই যানের দূরত্বটা কমে আসছে।

কো-পাইলট আবারো হেডসেটের দিকে দেখাল। “সেই লোক আবার লাইনে আছে, কথা বলুন।”

একটানে হেডফোনটা নিয়ে পরে নিল সে। “হ্যাঁ, কি হয়েছে?”

“প্লেনটা উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে ফ্রাঙ্স,” ড্যানিয়েল বলল। “এখন অদ্যুক্তির বলব ওদের?”

বাহুতে একটা চাপ অনুভব করল সে, পাশ থেকে স্টেল্লার দিয়েছে ওটা। সামনের উইঙ্গশিল্ডের দিকে এগিয়ে গেছে সে ম্যালনকে খোঁচাদিয়ে। ঘুরে গিয়ে সামনে তাকাল ম্যালন, ক্ষ্যাইহকের বাম পাশের কেবিন-দরজাটা ঝাল্টে গেছে।

“কি করছে—”

প্লেন থেকে লাফ দিয়েছে পাইলট।

অ্যাশবি সবার শেষে এলিভেটরে উঠল। কাঁচের ঘেরা দেওয়া তিনটে এলিভেটর দলের আট সদস্যকে নিয়ে দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে আরও ১৭৫ মিটার উপরে উঠছে। এত উপরে উঠলে মাথা ঘোরাটাই স্বাভাবিক, তার উপর লোহার জঞ্চালে চেপে আছে চারপাশ থেকে। সব মিলিয়ে অস্পষ্টিকর।

নিচের জগতটাকে উজ্জ্বল আলোয় ভাসিয়ে রেখেছে সূর্যটা। আড়চোখে সেইনে নদীটা দেখে নিল সে। সেইনে অর্থ আঁকাবাঁকা পথে চলা, আর ঠিক সেটাই করেছে নদীটা। প্যারিসের মাঝ দিয়ে বড় তিনটা বাঁক নিয়ে বয়ে গেছে ওটা। ক্রিসমাসের কারণে সদা-ব্যস্ত প্যারিসের রাস্তা-ঘাট, অলিগনি, উড়ালসেতু সবই এখন অনেকটাই ফাঁকা। দুরেই নটর ডেমের বিরাট অবয়ব দেখা যাচ্ছে, যেটার অনেকটাই আবার ঢাকা পড়েছে চার্চের ডোম, দস্তার ছাদ, এবং অসংখ্য চিমনীর আড়ালে। লা দেফেসের অ্যাভিনিউ এবং উঁচু-উঁচু ভবনগুলোও একনজর দেখে নিল সে। আইফেল টাওয়ারের

গায়ে লাগানো ইলেকট্রিক তারগুলোও চোখে পড়লো তার, আর এগুলোই রাতের আইফেল টাওয়ারকে আলোকিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ বহন করে।

ঘড়িটা দেখে নিল সে।

১১.৪৩

আর বেশী বাকি নেই।

▲

প্যারাসুটটা খুলে গেল, তখনই সেটা দেখতে পেল ম্যালন। স্কাইহকটা এখনো পশ্চিমে এগিয়ে যাচ্ছে, উচ্চতা এবং গতি দুটোই ধরে রেখেছে ওটা। নিচে বিরাট অঞ্চল জুড়ে মাঠ, বন, গ্রাম এবং রাস্তা-ঘাট বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। ক্রমেই প্যারিস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে উভয়ই।

প্লেনটা দেখিয়ে পাইলটকে বলল ম্যালন। “আরও কাছে নিয়ে চল, কাছ থেকে দেখতে হবে, কুইক।”

চপারটা গতি আরও বাড়িয়ে স্কাইহকের দিকে এগিয়ে গেল। জায়গা ছেড়ে উঠে গেল ম্যালন, তারপর একপাশে সরে গিয়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা কর্মসূত্র লাগল সিঙ্গেল ইঞ্জিনের বিমানটাকে।

“ভেতরে কেউই নেই,” মাইক্রোফোনে বলল সে।

বিষয়টা একেবারেই ভালো লাগছে না। ম্যালন মিলিটারি ইউনিটের লোকটার দিকে ঘুরে গেল। “বাইনোকুলার আছে কাছে?”

তরুণ কর্মীটি দ্রুত একজোড়া দূরবীন এগিয়ে দিল তাকে। হাতে পেয়েই স্কাইহকের দিকে তাক করল ম্যালন।

“আরও একটু সামনে এগিয়ে যাও।” পাইলটকে বলল সে।

সমাত্তরালে এগিয়ে যাওয়াটা বন্ধ হলো তাদের, এখন প্লেনটা থেকে একটু এগিয়ে আছে তারা। বাইনোকুলারের ভেতর দিয়ে তার দৃষ্টি হেলিকপ্টারের উইভশিল্ড ভেদ করে প্লেনের কক্ষপিটে গিয়ে পড়েছে। পাইলটের দুটো আসনই খালি। ঝাঁকুনিতে সিটিয়ারিংটা একটু হেলেন্দুলে উঠছে। কো-পাইলটের আসনে কিছু একটা পড়ে আছে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। পেছনের আসনগুলোর দিকে তাকাল ম্যালন, সংবাদপত্রে মোড়ানো কয়েকটা প্যাকেট পরে আছে সেখানে।

বাইনোকুলারটা নামাল। “কিছু একটা বহন করছে প্লেনটা,” বলল সে, “সেটা কী, তা বলতে পারছি না, তবে খুব খারাপ কিছু আছে এতে।”

স্কাইহকের ডানা দুটো নিচে নেমে গেল, ঘুরে গেল প্লেনটা, এবার দক্ষিণের দিকে। এমন নিয়ন্ত্রিত বাঁক নিচ্ছে ওটা মনে হচ্ছে যেন কেউ চালাচ্ছে।

“কটন,” হেডফোনের স্পিকারে ড্যানিয়েলসের কষ্ট শোনা গেল। “কী বুবলে, বল?”

কী বলবে, কোনোকিছু নিয়েই নিশ্চিত না সে। তাদেরকে সামনে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে, সত্য বলতে, সে ভেবেছিল প্লেনটাই সর্বশেষ অধ্যায় হবে এই নাটকের, কিন্তু—

“ঠিক আছে, এতে কোনো সমস্যা নেই আমাদের,” মাইক্রোফোনে বলল ম্যালন।
“স্টেফানি, তুমিও কি একমত?” জিজ্ঞেস করল ড্যানিয়েলস।

“হ্যাঁ, একমত।”

ম্যালনের বিচার-বুদ্ধির উপর তার এখনো আস্থা আছে দেখে ভালো লাগল, যদিও তার ভাবভঙ্গী উলটো কথাই বলছে।

“তাহলে আর কী, আমাদেরও সমস্যা কোথায়?” জিজ্ঞেস করল প্রেসিডেন্ট।

তারপরও মনের ভেতর খুঁতখুঁত করছে ম্যালনের। “ফ্রাসের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল দিয়ে পুরো এলাকাটা স্ক্যান করিয়ে নিন। এখানে বা আশেপাশে আরও কোনো বিমান উড়ছে কিনা সেটা নিশ্চিত হতে হবে আমাদের।”

“ওকে, একটু অপেক্ষা কর।”

।

এলিভেটর থেকে বের হয়ে সামনের খোলা জায়গায় পা রাখল এলিজা। এটাই অবজারভেশন ডেক। মাটি থেকে পঁচাত্তর তলা উঁচুতে এখন তারা। “মিস্ট্রিবিলি এখানে ঘূরতে একটু ভয়-ভয় লাগতে পারে,” দলের সবার উদ্দেশ্যে বলল সে। “সাধারণত এখানে লোকজনে ভরা থাকে।”

ধাতব সিঁড়িটা দেখাল সে, ওটা দিয়েই উপরের মিলিন্ডের ভেতর দিয়ে একেবারে উপরের প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে সবার।

“আসুন, উঠে পড়ি।”

সবাই একে-একে সিঁড়ি ধরে উঠছে, অ্যাশবি দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। যখন সবাই দরজাটার ওপাশে চলে গেল, সে ঘুরে গেল তার দিকে। “সব ঘটবে তো?”

মাথা নাড়ল অ্যাশবি। “আর ঠিক পনের মিনিটের মধ্যেই।”

চুয়ান্ন

একদৃষ্টিতে স্কাইবককে দেখে চলেছে ম্যালন। আবারো গতি বদলেছে প্লেনটা, এখন আরও খানিকটা দক্ষিণের দিকে তার মুখ, মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা খুঁজছে ওটা।

“ফাইটার প্লেনটা কি এসেছে এখানে?” হেডফোনে জিজ্ঞেস করল ম্যালন, ভাবছে তারা এখানে একা, নাকি সঙ্গি আছে ধারে-কাছে।

“জায়গায়মতই আছে সেটা,” বলল ড্যানিয়েলস।

দ্রুতই সিদ্ধান্তটা নিল ম্যালন। “হাতে সময় থাকতে এটা ধ্বংস করে দিন তাহলে নিচে মাঠ-ঘাট ছাড়া কিছু নেই এখনো, কিন্তু দেরী করলে শহর এসে পড়বে নিচে।

জানালায় ধাক্কা দিয়ে পাইলটকে বলল ম্যালন, “দ্রুত বের হয়ে যাও এখান থেকে, খুব দ্রুত।”

হেলিকপ্টারটা গতি কমাতেই স্কাইহক এগিয়ে গেল সামনে।

“ওকে, অর্ডার দেওয়া হয়েছে ওদেরকে,” জানাল ড্যানিয়েলস।

▲

ডিসেম্বরের শীতল বাতাসে বাইরে পা রাখল থ্রিভাউসেন। কোনো দিন আইফেল টাওয়ারের চূড়ায় ওঠা হয়নি তার। না ওঠার পেছনে নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। তার স্ত্রী লিজেট বেশ কয়েক বছর আগে একবার ধরেছিল তাকে এখানে আসার জন্য, কিন্তু ব্যবসায়িক ব্যস্ততা তাকে আসতে দেয়নি, সে তখন বলেছিল, আগামী গ্রীষ্মে যাব আমরা, কিন্তু পরের গ্রীষ্ম এল, আবার চলেও গেল, তারপর আরও কত গ্রীষ্ম চলে গেল, এক সময় তার স্ত্রী মারাও গেল। এরপর আর কেউ বলেনি এখানে আসার জন্য। তার ছেলে সাই বেশ কয়েকবার এখানে এসেছে, আর প্রতিবারই এখানকার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছে তার কাছে, যেটা এখন নিজ চোখে দেখে মনে হচ্ছে, একটুও বাড়িয়ে বলেনি তার ছেলে। একটা প্ল্যাকার্ড সেঁটে দেওয়া আছে রেলিঙে, যেটা বুলেন্ডে পরিষ্কার দিনে, মেঘ-কুয়াশা না থাকলে এখান থেকে ষাট কিলোমিটার পর্যন্ত দেখায়।

আর আজকের দিনটাকে পরিষ্কার দিনের উপাধিটা দেওয়া যায়। শীতকালে এরকম দিন কয়েকটা আসে, মেঘ থাকবে না আকাশে, রোদ ঝুঁক্যাল করবে চারপাশে। গায়ে তার সবচে পুরু উলের কেট, হাতমোজা, আর মাঞ্জলার থাকায় সে খুশি হলো বেশ, কিন্তু ফ্রাসের শীত তার সঙ্গীদের উপর তেমন প্রভাব ফেলছে না বলেই মনে হলো।

প্যারিস সব সময়ই তাকে ধাঁধায় ফেলে দেয়। শহরটা কেন যেন কখনোই তাকে মুক্ত করতে পারেনি সত্যি বলতে, বিষয়টা ভাবতে গেলে পান্তি ফিকশন ছবির একটা লাইন মনে আসে তার। ছবিতে জন ট্রাভেল্টা খুব স্বাভাবিকভাবে একটা কথা বলেছিল ! *Things are the same there as here, just a little bit different.* আসলেই ঠিক, জিনিস এখানেও যা, সেখানেও তা, পার্থক্য বলতে খুব সামান্য একটু। কয়েক বছর আগে সে এবং জেস্পার মিলে ছবিটা দেখেছিল। একদিকে যেমন মুক্ত হয়েছিল ছবির আসল বার্তাটা বুঝতে পেরে, অন্যদিকে জমে গিয়েছিল নিষ্ঠুরতায় ভরা চিত্রনাট্যে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ছাড়া, মারামারি বা খুনোখুনি একেবারেই বরদাস্ত করত না সে, কিন্তু সে নিজ হাতে অ্যামান্দো ক্যার্ব্যাল এবং তার সশস্ত্র সঙ্গীকে খুন করেছে, এবং এটা নিয়ে তার ভেতর একটুও অনুত্তাপ নেই।

আর এজন্যই চিন্তা হচ্ছে তার।

ম্যালন ঠিক কথাই বলেছিল।

সে মানুষ মারতে পারে না, আর যা-ই হোক।

কিন্তু গ্রাহাম অ্যাশবি এবং তার পাশে দাঁড়ানো লাঘকের দিকে এক শীতল দৃষ্টি দিয়ে সে ভাবছে, এই লোকটাকে মারতে পারলে তার ভীষণ সুখ লাগবে। তবে অবাক হচ্ছে যে তার জগতটা ঘৃণার সিমানার কারণে আলাদা হয়ে আছে সবার থেকে। তবে মনের ভেতর থেকে এগুলো এখন দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, ভালো-ভালো ভাবনা আনতে হবে মনে। কথা, কাজ বা ভাবভঙ্গী কোনোকিছুতেই তার ভেতরের চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন দেখানো যাবে না।

অনেক দূরে চলে এসেছে সে এখন।

সমাপ্তির খুব কাছেই।

▲

অ্যাশবি জানে এলিজা লাঘক কী আশা করে আছে। একটা ছোট প্লেন হবে, ভেতরে বিস্ফোরকে বোঝাই, গিয়ে বিব্রত্ত হবে ইনভ্যালিদেসের চার্চ অফ ডোমে।

দেখার মতো এক দৃশ্য।

এই ঘটনা ঘটানো ও সম্পূর্ণ দায়ভার যারা নিতে রাজি হয়েছে তাদের কাছে আইডিয়াটা পছন্দ হয়েছে। পুরো কাজের মাঝে ৯/১১ এর পৈশাচিক আক্রমণ আছে, কিন্তু সেটা অনেক ছোট পরিসরে। কারো জীবনের ক্ষতি করা চলবে না। এই কারণেই ক্রিসমাসকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ইনভ্যালিদেস এবং চার্চ দুটোই ক্ষেত্রে।

প্যারিসের এই আক্রমণের সাথে আরও দুই জায়গায় আক্রমণ করা হবে। মুস্যে দে অ্যাকুইতাইন এবং প্যালাইস দেস পেইন্স, প্রথমে বংশদুর্য এবং দ্বিতীয়টা অ্যাভিগননে অবস্থিত, দুটোই জাতীয় সৌধ, বন্ধ ক্রিসমাসের জন্য।

প্রত্যেকটা কাজই প্রতীকী অর্থ বহন করছে।

অবজারভেশন প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়ানোর সময়ে দূরেই একটা গাড়িকে জ্বলতে দেখেছিল অ্যাশবি। ধোঁয়া উড়েছিল ঠাণ্ডা বাতাসে, আর ঘটনাটা ঘটেছে ইনভ্যালিদেসের চার্চের সামনে। দলের আরও কয়েকজন দেখেছিল, কেউ-কেউ কিছু মন্তব্যও করেছে, কিন্তু চিন্তায় ফেলার মতো কিছুই বলেনি কেউ। সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে আছে মনে হচ্ছে। কাজটা যে লায়ন করেছে সেটা বোঝা গেলেও এই দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটার পরিকল্পনার তিল পরিমাণও জানে না সে, কিছুই জানানো হয়নি, আর সে নিজেও জানতে চায়নি।

যা দরকার তা হলো, ঠিক দুপুর বেলায় ঘটনাটা ঘটার।

আরও একবার ঘড়িটা দেখে নিল।

আর থাকা যায় না।

সবাইকে চারপাশটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে লাঘক, এই সুযোগে সে একটু পিছিয়ে নিয়েছে নিজেকে। সে খেয়াল করল, এলিজা উত্তরদিকের দৃশ্যগুলো দেখাতে শুরু করেছে, তারপর পশ্চিমের প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে গেল। দলটা ঘুরে দক্ষিণ দিকে যেতেই সে দরজা দিয়ে দ্রুত নিচের অবজারভেশন ডেকে নেমে এল তারপর সাবধানে

কাঁচের প্যানেল সরিয়ে বের হলো, এবং নিচের অংশে লাগানো একটা ছোট লক ঘুরিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে আটকে দিল। মিস্টার শিল্ডহল এর আগেই সম্পূর্ণ জায়গাটা ঘুরে গেছে, এবং তাকে জানিয়েছে এই আবন্দ ডেক থেকে দুটো দরজা আসে উপরে যেতে, দরজাগুলো ছোট বোল্ট দিয়ে আটকে দেওয়া যায়। বাইরে থেকে যেগুলো ভেতর থেকে খোলা যায় না, চাবি লাগে, সেগুলো থাকে নিরাপত্তা কর্মীর কাছে।

কিন্তু আজকের দিনটা ভিন্ন। কোনো কর্মীরই থাকার কথা না।

লাঘক পয়সা খরচ করে টাওয়ারের একেবারে শীর্ষে এক ঘণ্টা সময় কাটানোর জন্য ছাড়পত্র নিয়েছে। তাই এরকম চাবি বা চাবি বহনকারীর ঝামেলা নিতে চায়নি সে। তাদের ভ্রমণটা বারটা চল্লিশের দিকে শেষ হবার কথা। ২৭৫ মিটার নিচে দর্শনার্থীদের জন্য টিকিট দেওয়া শুরু হয় কুড়ি মিনিট আগে থেকে, আর তখনই শেষ হবে লাঘকের ভ্রমণ।

দ্রুত আরও বেশখানেকটা নেমে গিয়ে কিছুটা পুর দিকে সরে গেল সে। লাঘক এবং অন্যান্যরা এখনো দক্ষিণ পাশের দৃশ্য অবলোকন করছে। লোহার সিঁড়ি ধরে দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছাল অ্যাশবি, তারপর কাঁচের দরজাটা অতিক্রম করে বাইরে থেকে লক করে দিল এটাও।

তার মানে প্যারিস ক্লাব এখন উপরেই আটকা পরেছে।

খুব দ্রুত পা চালিয়ে নেমে এল সে, তারপর থেমে থাকা একটা প্রাইভেটেরে চুকেই নিচের দিকে নামা শুরু করল সে।

“আরও তথ্য পেলাম এইমাত্র।” ড্যানিয়েলস ব্লক ম্যালনের হেডফোনে। “প্যারিসের আকাশসীমার ভেতর এখন মোট ছয়টা প্লেন। এর ভেতর চারটা বানিজ্যিক জেট, যাচ্ছে অরলি এবং শারলস দে গলের দিকে। বাকি দুটো প্রাইভেট প্লেন।” একটা বিরতি নিল প্রেসিডেন্ট “দুটোই অদ্ভুত আচরণ করছে।”

“একটু ভেঙ্গে বলুন,” স্টেফানি বলল।

“একটা রেডিও বার্তায় কোনো সাড়া দিচ্ছে না আরেকটা সাড়া দিলেও যেটা করতে বলা হয়েছে, তা না করে করছে উন্টেটা।”

“আর দুটোই এই দিকে আসছে,” উত্তরটা বুরোই গিয়েছে ম্যালন।

“একটা আসছে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে, আরেকটা দক্ষিণ-পশ্চিম। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে যেটা আসছে সেটা দেখেছি আমরা। এটা একটা বিচ্ক্র্যাফট।”

কক্ষপিটের জানালায় গিয়ে আছড়ে পড়লো ম্যালন। “দক্ষিণ-পূর্বে যাও,” পাইলটকে আদেশ দিল সে।

“ঠিক বলছ?” জিজ্ঞেস করল ড্যানিয়েল।

“হ্যাঁ, সে ঠিক বলছে,” উত্তর দিল স্টেফানি।

বিরাট এক বিস্ফোরণ হলো শূন্যের উপর, তাদের থেকে মাইল পাঁচেক দূরে।

স্কাইহকটা ধৰংস হয়েছে।

“এইমাত্র জানানো হলো যে প্রথম বিমানটা ধৰংস হয়েছে,” ড্যানিয়েলস বলল।

“আমি বাজি ধরে বলতে পারি, স্কাইহক আরও একটা আছে ওদিকে,” ম্যালন বলল। “দক্ষিণ-পূব দিকে, এদিকেই আসছে।”

“ঠিক বলেছ, ম্যালন,” বলল ড্যানিয়েলস। “এইমাত্র দেখা গেল ওটা। একই রঙ, আর একইরকম চিহ্ন, এইমাত্র যেটাকে শেষ করলাম ঠিক ওটার মতোই।”

“ওটাই আমাদের টাগেটি,” বলল ম্যালন। “এটাকেই লায়ন বাঁচাতে চাইছে।”

“কিন্তু সমস্যা আরও একটা আছে,” প্রেসিডেন্ট বলল।

“তা আমি জানি,” বলল ম্যালন। “এটাকে উড়িয়ে দিতে পারছি না আমরা, একেবারে শহরের উপরে উড়েছে।”

ড্যানিয়েলসের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল ম্যালন। “কোনো ফন্দি আছে হারামিটার।”

▲

দূর থেকে বিস্ফোরণের একটা শব্দ ভেসে এল এলিজার কানে। অবজারভেশন ডেকের দক্ষিণ দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে সে। তার সামনে চ্যাম্প দে মারস দেখা যাচ্ছে, বাড়িঘর আর বেশকিছু বিলাসবহুল ফ্ল্যাট সমান্তরালে দাঁড়িয়ে আছে পুরো জ্যোতি জুড়ে। আগে ওখানে প্যারেড গ্রাউন্ড ছিল, বিরাট কুচকাওয়াজ হত।

বাঁ দিকে একনজর ইনভ্যালিদেসকে দেখে নিল সে, এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে চকচকে গম্ভুজটা। এত দীর্ঘ সময় নিরে সে পরিকল্পনা সে করেছিল, সেটার বাস্তব রূপ দেখতে এখনো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে তাকে অ্যাশবি তাকে আগেই জানিয়েছে প্লেনটা উত্তর দিক থেকে উড়ে আসবে সেইনে নদীর উপর দিয়ে, ঠিক যেখানে হামলা করতে হবে সেখানে আরও কয়েক দিন আগেই একটা লোকেটর রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানটা ইনভ্যালিদেসের গম্ভুজ। ওখান থেকে পাঠানো সিগন্যাল ধরেই প্লেনটা ছুটে এসে আছড়ে পড়বে।

যুব শক্তিশালী বিস্ফোরকে ঠাসা থাকবে ওটা, আর জ্বালানীও থাকবে একেবারে গলা পর্যন্ত। দুটো যখন একসাথে বিস্ফোরিত হবে, তখন সেটা হবে অতি চমৎকার, দেখার মতো একটা দৃশ্য। এলিজা সবাইকে সাথে নিয়েই সেটা উপভোগ করতে পারবে মাটি থেকে প্রায় তিনশ মিটার উঁচুতে দাঁড়িয়ে।

“আসুন না, নিচে নামার আগে পূব দিকটায় আরেকবার ঘুরে আসি।” এলিজার প্রস্তাব।

এক জ্যোতি জড়ো হলো সবাই।

এলিজা আগে থেকেই হিসেব করে রেখেছে, কখন কোন দিক থেকে ঘুরে কোথায় সবাইকে দাঁড় করাবে, যেন ঘটনা ঘটার সময়ে সবার মুখটা পূবের ইনভ্যালিদেসের দিকে থাকে।

চারপাশটা একবার দেখে নিল সে। “কেউ কি লর্ড অ্যাশবিকে দেখেছেন?”

কয়েকজন মাথা নাড়ুল ।

“আমি দেখছি,” বলল থ্রিভাল্ডসেন ।

বাতাস কেটে স্কাইহকের দিকে ছুটে যাচ্ছে ওয়েস্টল্যান্ড লিঙ্কস । জানালার বাইরে দৃষ্টি আটকে আছে ম্যালনের । দেরী হলো না প্লেনটাকে খুঁজে পেতে ।

“ইলেভেন ও'ক্লক,” সামান্য বাঁ দিকে যেতে বলল ম্যালন । “পাশ দিয়ে উড়ে যাও ।”

একটু চক্র দিয়ে প্লেনটাকে পেছনে ফেলল তারা । বাইনোকুলার দিয়ে চোখ রাখতেই আগের প্লেনটার মতোই সব দেখল এখানেও । আসন দুটো খালি, স্টিয়ারিংটা নড়ছে, যেন হিসেব করেই দেওয়া হয়েছে কখন কোন দিকে ঘুরাবে প্লেনটা, কো-পাইলটের আসনে কিছু একটা রয়েছে, আর পেছনের আসনে নিউজপেপারে মোড়ানো কিছু জিনিস ।

“এটা ঠিক আগেরটার মতোই,” বাইনোকুলার নামিয়ে বলল ম্যালন । “স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উড়ছে । কিন্তু এটাই আসল অঘটনটা ঘটাবে । লায়ন এফিজ্যুলে সময় বেঁধে কাজ করেছে যে এটাকে আটকানোর সুযোগ নেই বললেই চলে । নিচে ভূমির দিকে তাকাল সে । মাইলের পর মাইল জুড়ে ঘর-বাড়ি আর পথ-স্কেচ ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না । “কোনো উপায় দেখছি না ।”

হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ম্যালন দ্রুদ্রুকাজে ব্যবহার হওয়া একটা লিফট চোখে পড়লো তার, ষ্টীলের মোটা তার দিক্ষেত্রে মুক্ত করা বাঁকানো প্রান্তটা ।

কী করতে হবে সেটা পরিষ্কার, কিন্তু এবংশটা করার ইচ্ছা তার নেই । সে কোরম্যানের দিকে ঘুরে গেল ।

“ঐ কপিকলের সাথে ঝোলার মতো জ্যাকেট আছে সাথে?”

মাথা নাড়ুল সে ।

“নিয়ে এস জলদি ।”

“কী করার কথা ভাবছ?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি ।

“ঐ প্লেনে কেউ একজনকে যেতে হবে ।”

“সেটা কিভাবে করবে?”

বাইরে দেখাল ম্যালন । “এখান থেকে একটা লাফ দিলেই হবে ।”

“তা হতে দিচ্ছি না ।”

“তাহলে আপনিই বলুন কী করব? আরও ভালো বুদ্ধি থাকলে দিন ।”

মাথাটা দোলাল স্টেফানি । “না, নেই । কিন্তু আমি এখানে সিনিয়র অফিসার । আর আমার কথাই ফাইনাল ।”

“কটন ঠিক বলেছে,” বলল ড্যানিয়েলস । “এটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই । প্লেনটার নিয়ন্ত্রণ নিতেই হবে । কারণ ওটাকে ধ্বংস করা যাচ্ছে না ।”

“আপনি তো আমার সাহায্যই চেয়েছিলেন,” বলল ম্যালন স্টেফানিকে। “তাহলে সেটাই করতে দিন আমায়।”

তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে স্টেফানি যেন বলতে চাইছে, ভূমি কী মনে কর আদৌ এটা করার কোনো দরকার আছে?

“এটাই একমাত্র উপায়,” ম্যালন বলল।

অবশ্যে সায় দিল স্টেফানি।

কান থেকে হেডসেটটা খুলে ফেলে গায়ে ফ্লাইট স্যুটটা পড়ে নিল ম্যালন। তারপর মেটা বর্মটা বুকের সাথে জড়িয়ে নিল শক্ত করে। কোরম্যান ভালো করে পরীক্ষা করে নিল সব ঠিকমতো জোড়া দেওয়া হয়েছে কিনা।

“বাইরে কিন্তু ভালো বাতাস বইছে,” তরুণ কোরম্যান বলল ম্যালনের গায়ে পোশাক জড়ানোর সময়ে। “দড়ি ধরে ঝোলার সাথেই আপনাকে পেছনে ঠেলে নিয়ে যাবে বাতাসে। পাইলট চেষ্টা করবে আপনাকে যতটা পারা যায় কাছে রাখতে।” একটা প্যারাসুট হাতে দিল সে, যেটা বর্মের উপরে পরে নিল ম্যালন।

“একটু সতর্ক হতে শিখেছ তাহলে, ভালো।” উঁচু গলায় বলল স্টেফানি।

“চিন্তার কিছু নেই। আমি আগেও এসব করেছি।”

“মিথ্যে বলাটাও ভালো করে শিখলে না,” স্টেফানির কঢ়ে হতাশ।

উলের একটা ক্যাপ মাথায় ঢোকাতেই সম্পূর্ণ মুখটাই ছাঁক পড়লো তাতে, ভালোই হলো তার জন্য। একজোড়া গগলস পরে নিল চোখে।

কোরম্যান তার দিকে ঘুরে জানতে চাইল সে প্রস্তুত অঙ্গুষ্ঠি কিনা।

মাথা নাড়ল সে।

কম্পার্টমেন্টের দরজাটা খুলে গেল। হিমশীতল বাতাস ঢুকল হুহু করে। হাতে একজোড়া বিশেষ হাতমোজা জড়িয়ে নিল ম্যালন। ষালের হুকটা তার হারনেস জ্যাকেটের সাথে আটকে দেওয়া হলো।

পাঁচ থেকে উল্টো গুল ম্যালন, তারপরেই ঝাঁপ দিল নিচে।

পঞ্চান্ত

কাঁচের ঘেরা দেওয়া ডেকের উত্তর পাশ থেকে ঘুরে পশ্চিমে এসে দাঁড়াল প্রভান্ডসেন। তার ডানেই কয়েকটা জানালা, যেগুলো দিয়ে মোমের দুটো ভাস্কর্য দেখা যাচ্ছে। একজন গুস্তাভ আইফেল, অন্যজন থমাস এডিসন। এমনভাবে তাদেরকে বানানো হয়েছে, দেখে মনে হয় যেন দু'জনে খোশ-গল্লে ব্যস্ত। সবকিছুই শান্ত চারপাশের, শুধু বাতাস একটু জানান দিচ্ছে বাইরের সরব জগতের কথা।

অ্যাশবিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

আরও একটু এগিয়ে থামল সে, লক্ষ্য করল কাঁচের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। দলের সবাই কয়েক মিনিট আগে যখন এখান দিয়ে গিয়েছিল তখন এটা খোলা ছিল। দরজার হাতলটা ধরে একটু টানাটানি করল সে।

আটকানো।

কোনো স্টাফ এটা আটকে দিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কেন? কিছুক্ষণের ভেতরেই এটা সবার জন্য খুলে দেওয়া হবে। তাহলে উপরে যাওয়ার দুটো পথের একটা এভাবে বন্ধ করার মানে কী?

আবারো পূর্ব দিকে ফেরত এল সে, যেখান থেকে দরজার ভেতর দিয়ে দূরের দৃশ্য দেখা যায়। এবং এই দ্বিতীয় দরজাটাও বন্ধ, পরীক্ষা করে দেখল সে।

এলিজা লাঘক দূরের কিছু স্থাপনা দেখাচ্ছে, তার কথা শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। “ঐ যে ওটা, ইন্ড্যালিসেস! এখান থেকে হয়ত তিনি কিলোমিটার দূরে হবে। নেপোলিয়নের সমাধি ওটার ভেতরেই। মনে হচ্ছে, ওদিকটায় কোনো ঝামেলা হয়েছে।”

চার্চের সামনে আগুন জ্বলতে দেখল থ্রিভান্ডসেন, বেশ কিছু টাক আর পুলিশের গাড়ি ভিড় করেছে রাস্তায়, ধোঁয়া উড়ছে আশেপাশে, সব মিলিয়ে বিশ্বজ্ঞান পরিবেশ। এই বিশ্বজ্ঞান পরিবেশের সাথে এই বন্ধ দরজা দুটোর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, তা ভাবছে সে। কাকতালীয়তা কাকতালীয়ভাবে ঘটে না।

“ম্যাডাম লাঘক,” তার মনোযোগ আকর্ষণ করল থ্রিভান্ডসেন।

তার দিকে তাকাল স্টেফানি।

“এখান থেকে বের হবার দুটো দরজাই বন্ধ।”

তার চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। “তা কিভাবে সম্ভব?”

উত্তরটা সে একটু অন্যভাবে দেওয়ার চিন্তা করল। “এবং আরও একটা খারাপ খবর আছে।”

গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে সে।

“লর্ড অ্যাশবি নেই কোথাও।”

▲

প্রথম প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে স্যাম, আর ভাবছে, পাঁচশ ফিট উপরে কী হচ্ছে। প্যারিস ক্লাবের লোকজন সভাকক্ষ ছেড়ে বের হবার পরই সে অন্য কর্মীদের সাথে গিয়ে মিশেছে যারা এখন লাঞ্ছের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

“কী খবর? কী হল?” ফিসিফস করে মিগ্যান বলল তাকে, টেবিল গোছানোর কাজে হাত লাগিয়েছে সে।

“এই লোকগুলোর বিরাট পরিকল্পনা আছে,” বিড়বিড় করে বলল সে।

“একটু বলা যায় আমাকে?”

“এখন না। শুধু এটুকুই বলি, আমাদের কথাই ঠিক।”

টেবিল দুটো প্রস্তুত করা শেষ। ভাপানো সবজি আর মাংসের ছিল থেকে যে অপূর্ব শ্রাণ আসছে তা জাগিয়ে দিল স্যামের ক্ষুধাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে খাবার খাওয়ার ভাবনা দূরে রাখতে হবে।

চেয়ারগুলো আরও একবার ঠিকঠাক আছে কিনা তা দেখে নিল সে।

“ওরা উপরে গেছে প্রায় আধ-ঘণ্টা হতে চলল,” কাজের ফাঁকে মিগ্যান বলল।

তিনজন নিরাপত্তাকর্মী চোখ রাখছে সবার উপর। তাই এবার আর ভেতরে লুকিয়ে থাকা যাবে না। হেনরিক থ্রিভাল্ডসেন যখন স্যামকে দেখল তখন তার অভিব্যক্তিটা ভালোই খেয়াল করেছে সে। লোকটা অবশ্যই ভাবনা-চিন্তা করেছে এখানে স্যামের উপস্থিতি নিয়ে। স্টেফানি তাকে আগেই বলেছে যে আমেরিকা যে এদের পেছনে লেগেছে সেটা থ্রিভাল্ডসেন কিছুই জানে না, এবং সে সাফ জানিয়ে দিয়েছে বিষয়টা গোপন রাখতে হবে। স্যাম ঠিক বুঝে পারে না, যে এটা থ্রিভাল্ডসেনের কাছ থেকে গোপন করার মতো বিষয় হলো কিভাবে। কিন্তু এটা নিয়ে বড়দের সাথে তর্কে জড়তে চায়নি সে।

আপ্যায়নকর্মীদের প্রধান যিনি, তিনি সবাইকে ঘর থেকে বের হতে বললেন।

মিগ্যানকে সাথে নিয়ে প্রধান দরজা দিয়ে বের হয়ে স্যাম। কাছের একটা রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করবে তারা, খাওয়ার পর্ব শেষ হলেই থালা-কাট নিয়ে যাবে এসে। উপরে তাকাতেই চলমান কিছু একটা নজরে এল তার তার মানে, দ্বিতীয় লেভেল থেকে একটা এলিভেটর নিচের দিকে যাচ্ছে।

সে খেয়াল করল মিগ্যানও দেখছে এটা।

মাঝের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল দুজন, তাদের সামনেই রেস্টুরেন্টে ঢোকার দরজা। বাকিরাও ভেতরে চুকল।

তাদের লেভেলে এসে থামল এলিভেটরটা।

গ্রাহাম অ্যাশবি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

একা।

এলিভেটর থেকে বের হয়েই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল সে, তারপর নিচে নেমে গেল দ্রুত।

“খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে তাকে,” বলল মিগ্যান।

সায় দিল স্যাম। কিছু একটা ঝামেলা আছে।

“ফলো হিম,” আদেশ দিল স্যাম। “বাট বি কেয়ারফুল।”

কর্ষে হঠাতে এমন রূপ্ততা দেখে অবাক হলো মেয়েটা।

“কী জন্যে পিছু নেব?”

“যা বললাম কর।”

তর্ক করার সময় নেই তার।

“তুমি যাচ্ছ কোথায়?” প্রশ্ন করল মিগ্যান।

“উপরে।”

বাতাসে ভাসমান অবস্থায় নিজের পেছনে হেলিকপ্টারের দরজা ধাম করে বন্ধ হবার শব্দ আগে কোনো দিন শোনেনি ম্যালন। ধাতব তারটা পাক খুলতে শুরু করেছে, সেও নিচে নামছে। হাত দুটো পাশ বরাবর রেখে পা দুটো বাইরের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সে। শক্ত তারটা মজবুত করে ধরে রাখায় মুক্তভাবে পড়ার অনুভূতিটা হচ্ছে না বেশী।

আরও একটু নিচে নামতেই, কোরম্যানের কথামতই বাতাসের তোড়ে খানিকটা পেছনে সরে গেল শরীরটা। স্কাইহকটা তার পঞ্চাশ ফিট নিচ দিয়ে উড়ছে। কপিকলটা ঘুরছে, তার বের হচ্ছে, নিচে নামছে ম্যালন ছকের সাথে দেহটা ঝুলিয়ে দিয়ে। প্লেনের ডানাটা খুব কাছে চলে এল।

ঠাণ্ডা বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে তাকে। স্যুট এবং উলের ক্যাপটা তাকে কিছু সুরক্ষা দিলেও নাক এবং ঠোঁট দুটো জমে যাচ্ছে হিমশীতল বাতাসে।

পা দুটো প্লেনের ডানা স্পর্শ করল।

বহিরাগতকে ভালোভাবে স্বাগত জানাল না স্কাইহক, একটু দুলে উঠল, কিন্তু তারপরই আবার স্থির হয়ে গেল আগের মতো। মাথার উপরের হেলিকপ্টারের গতি, নিচে প্লেনের গতি, মৃদুমন্দ বাতাসের গতির সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে খুব সাবধানে ঠেলে সামনের কেবিনের দিকে নিয়ে যেতে লাগল ম্যালন। তার স্টিগেটি পাইলটের পাশের দরজাটা।

ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা তাকে ঠেলে দিচ্ছে পেছনে, ক্ষমতাম্য রাখতে ভীষণ কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার।

কোনোমতে নিজেকে সামলে নিল সে।

এটা একটা হাই-উইং এয়ারক্রাফট, ডানাগুলো শরীরের একটু উপর দিকে থাকে, জানালা বা দরজার সমান্তরালে না। তাই এটার ভেতরে ঢুকতে হলে ডানার উপর দিয়ে ঢোকা যাবে না, নিচ দিয়ে ঢুকতে হবে। সে হেলিকপ্টারের দিকে ঘুরে গেল, তারপর সংকেত দিল তাকে আরও নিচে নামানোর। পাইলটকে মনে হলো, সহজেই এটা বুরতে পেরেছে। ক্ষটারটা একটু কাত করে ম্যালনকে ভাসিয়ে নিয়ে কেবিনের জানালা বরাবর ঝুলিয়ে রাখল।

ভেতরে উঁকি দিল সে।

পেছনের আসনগুলো সরিয়ে সেখানে নিউজপেপারে মোড়ানো কিছু প্যাকেট মেঝে ও ছাদের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। শরীরটা দুলছে খুব, এদিকে চোখে গগলস থাকার পরও শুক্ষ বাতাস চোখ থেকে জল শুকিয়ে দিচ্ছে।

ধাতব তারটা আরও ছাড়তে সংকেত দিল ম্যালন। ওটা আরও ঢিলা হতেই, ডানার একটা প্রান্ত ধরে ফেলল, তারপর নিজের শরীরকে কেবিনের দিকে আরও একটু টেনে নিয়ে ল্যাভিং গিয়ারের খাঁজে একটা পা গুঁজে দিল। নিজের ওজন এক পাশে পড়তেই প্লেনটা একটু কাত হয়ে দুলে উঠল।

তারটা এখনো ছাড়া হচ্ছে, বাঁকা হয়ে প্লেনের নিচ অবধি ঝুলছে ওটা। তারপর সেটাও থেমে গেল, কোরম্যান বুঝতে পেরেছে তারটা টানটান অবস্থায় নেই আর।

কেবিনের জানালার কাছে মুখটা নিয়ে ভেতরে তাকাল ম্যালন।

বাদামি রঙের ছোট একটা বাস্তু রাখা যাত্রীর আসনে। বিভিন্ন রকমের তার বের যুক্ত হয়ে আছে ওটার সাথে। আবারো পেছনের প্যাকেটগুলোর দিকে তাকাল সে। সামনের দুই আসনের মাঝে, নিচের দিকে প্যাকেটগুলো খোলাই রাখা, আর সেখানে হালকা বেগুনী রঙের বস্তু দেখা যাচ্ছে।

Plastique explosives.

C-83

চিনতে পারল ম্যালন সহজেই।

খুবই শক্তিশালী বিস্ফোরক।

ফাইব্রেকের ভেতরে চুক্তে হবে তাকে। কিন্তু কিভাবে সেটা ভাবার আগেই সে দেখল দড়িটা পেছনে দিকে গোছান হচ্ছে। উপর থেকে তাকে আবার ফিরিয়ে নিতে চাইছে কিন্তু সে তাদেরকে কোনো সংকেত দিতে পারছে না মাথার উপরের ডানার জন্য।

এখান থেকে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

তাই ধাতব দড়িটা তাকে টান দিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে নেওয়ার আগেই বুকের সাথে লাগানো ডি-ক্ল্যাম্প ছক্টা খুলে ফেলে ছুঁড়ে দিল বাইরে। উপরে উঠে যাচ্ছে ওটা।

নিজেকে আরও শক্ত করে ধরে নিয়ে কেবিনের দরজার দিকে হাত বাড়াল সে।

দরজাটা খুলেও গেল।

কিন্তু সমস্যা হলো অ্যাঙ্গেল নিয়ে। সে যেখানে এখন, সেখানে দরজাটার কবজা, তার মানে দরজার খোলা প্রান্তটা প্লেনের মুখের দিকে প্রোপেলার থেকে যে বাতাস আসছে, সেটা সরাসরি তাকে পেছন দিকে ঠেলছে। তাই দরজা ধরে সামনের দিকে যাওয়াটা অসম্ভব।

বাম হাত দিয়ে দরজাটার বাইরের প্রান্তটা শক্ত করে ধরল ম্যালন। ডান হাত দিয়ে স্টাট ধরে আছে এখনো। নিজের অবস্থান থেকেই দেখতে পেল সে হেলিকপ্টারটা নিচে এসেছে তাকে দেখার জন্য। দরজাটা খুলে ফেলল সে, কিন্তু কবজাগুলো নবৰই ডিগ্রী পর্যন্ত ঘুরে থেমে গেল, তার মানে ঢোকার জন্য যতটা মেলে যাওয়া দরকার, তার অর্ধেকের মতো মেলেছে।

আর একটা উপায় আছে এখন।

প্লেনের মূল কাঠামোর স্টাট ছেড়ে দিয়ে দরজাটা দু-হাতেই ধরল সে, এবং নিজের শরীরকে হাতের উপর ভর দিয়ে ককপিটের দিকে ঠেলে দিল। বাতাসের ঝাপটা দরজাকে বন্ধ করে দিতে চাইছে, আর পিঠে বাঁধা প্যারাসুটটা আছড়ে

পড়ছে ফিউজেলাজের উপর। দরজাটা একটু খুলতেই বাতাস আরও বেশী বাধার সৃষ্টি করল। আরও শক্ত করে দরজার ফ্রেমটা ধরে ডান পা ককপিটের ভেতরে রাখল সে, তারপর সাবধানে নিজের শরীরকে ভাঁজ করে ভেতরে নিয়ে গেল। ভাগ্য ভালো যে পাইলটের আসনটা একেবারে পেছনে হেলানো, বেশখানিকটা জায়গা পাওয়া গেছে ঢোকার জন্য।

চুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল ম্যালন, তারপর স্বত্ত্বির নিঃশ্বাস ফেলল অবশ্যে।

প্লেনটা ডানে-বামে দুলেই চলেছে।

ইস্টমেন্ট প্যানেলে দিক-নির্দেশকটা খুঁজে পেল সে। প্লেনটা এখনো উত্তর-পশ্চিমের দিকেই যাচ্ছে। একটা পূর্ণাঙ্গ জিপিএস ম্যাপ, যেটা, ম্যালন অনুমান করল, প্লেনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অটো-পাইলটের সাহায্যে। কিন্তু দেখে এমনটা মনে হলেও ম্যালন অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে প্লেনের অটো-পাইলট সিস্টেমটা নিষ্ক্রিয় করা।

চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পেল হেলিকপ্টারটা বাম দিকে তার সমান্তরালে উড়ছে। কেবিনের জানালায় একটা চিহ্ন ও সংখ্যা একে রাখা হয়েছে^{তার} জন্য। স্টেফানি হেডসেটের দিকে দেখাল এবং তারপর সংখ্যার দিকে দেখাল।

বুবল ম্যালন।

ক্ষাইহকের রেডিওটা ডান দিকেই। ইউনিটটা চালু করে স্টেফানির দেখানো সংখ্যা অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সিটা টিউন করে নিল। তৎপর মাথা থেকে উলের ক্যাপটা খুলে ফেলে এয়ার এবং মাইক্রোফোন লাপ্টপে^{অন্তর্ভুক্ত} যন্ত্রটা বসাল মাথায়, এবং বলল, “প্লেনটা বিস্ফোরকে ভর্তি।”

“এটাই শুনতে চাইছিলাম আমি,” বলল স্টেফানি।

“এবার ওটাকে তাহলে নামিয়ে আনো মাটিতে,” ড্যানিয়েলস ঘোগ করল।

“অটো-পাইলট বন্ধ করাই—”

হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে গেল ক্ষাইহক। বাতাসের কারণে না, একেবারে নিয়ন্ত্রিত একটা বাঁক নিয়েছে ওটা। ম্যালন দেখল হাতলটা কিছুটা সামনে এগিয়ে আবার পেছনে সরে এল, পায়ের প্যাডেলগুলো আগ-পিছ হচ্ছে আপনাতেই, বিমানের রাডারটা নিয়ন্ত্রণ করছে, বা সঠিকভাবে বললে, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এমনিতেই।

আরও একবার মোড় নিল প্লেনটা, এবং জিপিএস বলছে যে ওটা এখন আরও পশ্চিমে ঘুরে গিয়েছে, বেড়েছে উচ্চতাও। এখন আট হাজার ফিট। গতিবেগ একশ নটের কাছাকাছি, তার মানে দুইশ ছুঁই-ছুঁই।

“কী হলো, কী হচ্ছে ওখানে?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

“এটা তো মনে হচ্ছে নিজের খেয়াল-খুশি মতোই চলছে। দেখলেন, কিভাবে একেবারে ষাট ডিগ্রী ঘুরে গেল।”

“কটন,” ড্যানিয়েলস বলল। “ফ্রান্সের এয়ার কট্রোলার তোমার গতিপথ হিসেব করে ফেলেছে। এখন তুমি সরাসরি ইনভ্যালিদেসের দিকে আগাছ।”

কক্ষনোই না। হিসেব ভুল হচ্ছে ওদের। এই খেলার শেষটা কিভাবে হবে সেটা বুঝে নিয়েছে ম্যালন, গত রাতে সেলফ্রিজের ব্যাগ থেকে কি বের হয়েছিল সেটা বিবেচনায় না থাকার কোনো কারণই নেই।

উইলশিল্ডের ভেতর দিয়ে দূরে তাকাল ম্যালন, প্লেনের আসল টার্গেটটা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে।

“ওদিকে যাচ্ছ না আমরা। প্লেনটা যাচ্ছে আইফেল টাওয়ারে।”

হাস্তান্ত

কাঁচের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাতলটা কয়েকবার টেনে দেখল এলিজা।

পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে ওপাশে লাগানো লকটা দেখা যাচ্ছে, আটকে দেওয়া হয়েছে বাইরে থেকে। দুর্ঘটনাবশত ওটা নিজে থেকে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

“ও দিকের দরজাটারও একই অবস্থা,” থ্রভাল্ডসেন বলল।

সব যেন হিসেব করেই বলেছে এমন সুর তার গলায়, আর এতেও তার অবাক হওয়ার কিছু নেই বলে মনে হলো।

দলের একজন সদস্য এগিয়ে এল এলিজার দিকে। “গ্রেট্যাটফর্ম থেকে নামার অন্য কোনো রাস্তা নেই দেখলাম, কল বৰু বা কোনো টেলিফোনও নেই কোথাও।”

মাথার উপরে, প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালগুলো যেমন্তে মিশেছে সেখানে, সমস্যার সমাধানটা খুঁজে পেল এলিজা। একটা ক্লোজড স্ট্যাকট টেলিভিশন ক্যামেরা তাদের দিকে লেস্টা তাক করে আছে। “সিকিউরিটির কেউ অবশ্যই আমাদেরকে দেখছে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেতে হবে আমাদের।”

“আমার মনে হয় না সেটা এত সহজ হবে,” আশাটা ভেঙ্গে দিল থ্রভাল্ডসেন।

তার মুখের দিকে তাকাল এলিজা, ভয় লাগছে তার পরের কথাগুলো শুনতে, বা কী ঘটতে চলেছে তা জানতে।

“অ্যাশবি যা-ই পরিকল্পনা করুক না কেন,” থ্রভাল্ডসেন বলছে, “সে সবকিছু মাথায় রেখেই তা করেছে। ক্যামেরা এখানে আছে এটা যেমন সে জানত, আমাদের কেউ মোবাইল ব্যবহার করতে পারে এটাও জানত সে। তাই সব পথ আগে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছে। এখানে বাইরে থেকে কেউ আসতে হলেও কয়েক মিনিট সময় দরকার। তার মানে যা-ই ঘটুক না কেন, সেটা কারো আসার আগেই ঘটবে।”

৪

ম্যালন বুঝতে পারছে, প্লেনটা নিচে নেমে যাচ্ছে। অল্টিমিটারের দিকে দৃষ্টি ‘আটকে আছে তার

৭০০০ ফিট এখন, আর ক্রমাগত কমছে সেটা ।

“হচ্ছেটা কী—”

৫৬০০ ফিটে এসে স্থির হলো ওটা ।

“ফাইটারকে এই পথে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন,” মাইক্রোফোনে বলল ম্যালন । “আকাশে থাকতেই এটাকে ধ্বংস করে দিতে হবে ।” নিচের বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট আর মানুষের দিকে তাকাল সে । “আমি চেষ্টা করছি এটা গতিপথ বদলাতে ।”

“খবর পেলাম, তিনি মিনিটের আগেই ফাইটার পৌঁছে যাবে তোমার কাছে,” আশ্বস্ত করল ড্যানিয়েলস ।

“তুমই না বলেছিলে যে শহরের উপর বিস্ফোরণ করানো যাবে না? এখন উল্টোটা করছ না?”

“আইফেল টাওয়ারকে ভীষণ পছন্দ করে ফ্রান্সের মানুষ। তাই এটা বাঁচাতে যেকোনো কিছুই তারা করতে—”

“তাহলে আমার কী হবে?”

“দেখুন, টাওয়ার নিয়ে এই কথাটা আপনি বলেছিলেন, আমি না ।”

যাত্রীদের আসনের দিকে এগিয়ে গেল ম্যালন, তারপর ধূসর রঙের বাস্তুটা তুলে নিল হাতে, ভালো করে দেখল বাইরের অংশটা । সময় খুব কম । একটা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র মনে হচ্ছে, একটা ল্যাপটপও হতে পারে, তবে আববু চারদিক থেকে । কোনো সুইচ নেই কোথাও একটা তার ধরে হাঁচকা টান দিল সে, কিন্তু ছিড়ল না । বাস্তুটা নিচে ছুঁড়ে ফেলল সে, তারপর দুই হাত দিয়ে টেনে, মোচড় দিয়ে ইস্টমেন্ট প্যানেলের সাথে ওটার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল । একটা বৈদ্যুতিক স্লিপিং হলো, তার সাথেই প্লেনটা ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠল । ছেঁড়া তারগুলো এক প্লেনেফেলে দিয়ে মূল অংশটা তুলে নিল সে

তার পা দিয়ে অব্যাহতভাবে প্যাডেলে আঘাত করছে যদি নিয়ন্ত্রণটা আসে, কিন্তু ডানা দুটো ও রাডারটা এখনো চলছে নিজের খুশিমত । স্কাইহক এখনো উত্তর-পশ্চিমমুখী ।

“কী হয়েছে?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি ।

“মূল মেশিনটাকে শেষ করেছি, অন্তত একটাকে তো করেছি । কিন্তু এটা এখনো আগের পথেই যাচ্ছে, আর কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না ।”

কলামটা ধরে বাঁয়ে ঘোরাতে চাইল প্লেনটা ।

একদিকে যাবার জন্য পথ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পর পথ বদলানোর আদেশ পালন করতে প্লেনটা যুদ্ধ করছে যেন, একটা ভিন্নরকম শব্দ আসছে প্রোপেলারের ডেতের থেকে । এক-ইঞ্জিনের প্লেন সহ অনেক ধরনের প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতায় ভরা ম্যালন বুঝতে পারছে এরকম শব্দ আসাটা ভালো না ।

হঠাৎ প্লেনের সামনের অংশটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেই আবার উপরে উঠতে শুরু করল

থ্রোটলটা নিচে নামিয়ে উঠাটা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল ম্যালন, কিন্তু স্কাইহক উঠেই চলেছে। অল্টিমিটারে দেখাচ্ছে ৮০০০ ফিট, আর এবার থামল প্লেনটা। যা হচ্ছে তা মোটেই সুবিধার ঠেকছে না ম্যালনের কাছে। প্লেনের গতি খুব দ্রুতই উঠা-নামা করছে। কন্ট্রোল প্যানেল ধরেই বিগড়ে গেছে। এখন ইঞ্জিনটা সহজেই থামিয়ে দেওয়া যায়, আর এটাই সর্বশেষ কাজ যেটা তাকে করতে হবে প্যারিসের উপরে বোমা-বারুদে ভর্তি এই প্লেন থেকে বের হবার আগে।

সামনে তাকাল সে।

এই পথে, এই গতিতে চললে বড়জোর দুই মিনিট লাগবে টাওয়ারে পৌঁছাতে।

“ফাইটার প্লেন কই?” প্রেসিডেন্ট বা স্টেফানি একজন শুনলেই হবে।

“ডানে তাকাও,” উত্তর দিল স্টেফানি।

একটা টর্নেডো এয়ার ইন্টারসেপ্টর ফাইটার প্লেন। ডানাগুলো পেছনের দিকে চাপানো, তার নিচেই শূন্য-থেকে-শূন্যে আঘাত হানতে সক্ষম দুটো মিসাইল আঠকে আছে।

“ওর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন?” জিজ্ঞেস করল ম্যালন, ফাইটার প্লেনকে দেখিয়ে।

“অবশ্যই, ওকে যা করতে বলব তা-ই করবে।”

“তাহলে একটু পিছিয়ে গিয়ে রেডি হতে বলেন।”

টর্নেডোটা গতি কমাল এবং ম্যালন নিজের প্লেনের দিকে মনোযোগ দিল আবারো।

“চপারটা এখান থেকে সরান,” হেলিকপ্টারটা মিলিটারি সরিয়ে নিতে বলল সে স্টেফানিকে।

ধূসর বাক্সটা তুলে নিল ম্যালন।

“ওকে ডার্লিং,” বিড়বিড় করে বলল সে, “এবার আরও বড় ঠ্যালা সামলাও তবে।”

Bamalabook.org

প্যারিসের আকাশে কিছু যেন ঝুঁজছে প্রভান্তসেন। প্যারিস ক্লাবের সবাইকে উপরে বন্দী করে গ্রাহাম অ্যাশবি হাওয়া। পূবদিকে পুলিশ আর দমকলকর্মীরা এখনো ইনভ্যালিদেসের আগুন নেভাতে ব্যস্ত।

প্ল্যাটফর্মের চারদিকে আরও একবার ঘুরে এল সে।

এবং ঠিক জিনিসটাই দেখল।

এক-ইঞ্জিনের একটা প্লেন, পেছনেই একটা মিলিটারি হেলিকপ্টার, এবং খুব কাছেই একটা ফাইটার জেট নিয়ে ছুটে আসছে, তবে প্লেনটা একটু বাঁক নিচ্ছে মনে হলো।

তিনি রকমের আকাশযান একসাথে, অবশ্যই খারাপ কিছুকে নির্দেশ করছে

হেলিকপ্টারটা পথ বদলে দূরে সরে গেল, প্লেনটা একটু বিশ্বিষ্টভাবে দুলছে ডানায় ভর করে।

সে দেখল দলের বাকি সবাই এসে ভিড় করেছে তার পেছনে, লাঘকও আছে সাথে।

আঙুল উঁচিয়ে দেখাল থ্রিভাল্ডসেন। “ওটাই আছে আমাদের কপালে।”

আবারো আকাশে দৃষ্টি নিবন্ধিত করল সে। প্লেনটা অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে এতক্ষণে, আর ওটার প্রোপেলার ঠিক আইফেল টাওয়ারের ডেকের দিকে তাক করা এখন, আর এই ডেকেই সবাই দাঁড়িয়ে। ধাতব কিছু একটা চকচক করে উঠল সূর্যের আলোয়, আর চকচকে বস্তুটা হেলিকপ্টার ও প্লেন থেকে পেছনে, উচ্চতায় সবার থেকে উপরে।

মিলিটারি জেট।

“মনে হচ্ছে যেন সমস্যাটা কেউ মিটিয়ে দিতে চাইছে,” শান্তভাবে বলল সে।

কিন্তু সে এটাও বুঝতে পারছে যে প্লেনটাকে এভাবে শূন্যের উপর ধ্বংস বা ভূতাতিত করতে চাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

তাই সে ভাবছে।

কী আছে তাদের ভাগ্যে?

ম্যালন খুব শক্তি দিয়ে কলামটা বাম দিকে চেপে ধরে রাখুক চেষ্টা করছে যেন প্লেনটা বাঁয়ে ঘুরে যায়, কিন্তু তাকে অবাক করে ওটা আবর শূব্ধখানে চলে আসছে। যেন পাঞ্জা লড়ছে মানুষ আর যন্ত্রে। প্রথমে ধ্সর রঞ্জের ভোক্সটাকেই যনে করেছিল সবকিছুর জন্য ওটাই দায়ী, কিন্তু স্কাইহকের অভ্যন্তরে বিরাট রকমের পরিবর্তন আনা হয়েছে বোো যাচ্ছে হয়ত আরও একটা কন্ট্রোলার প্লেনের অন্য কোনো জায়গায় বসানো, যেটা এমনভাবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে ম্যালনের কোনো প্রচেষ্টাই ওটার গতিপথ বদলাতে পারছে না।

প্লেনের হাল বা রাডারকে একটু বাগে আনতে প্যাডেলের উপর ক্রমাগত চাপ দেওয়ার পরও প্লেনটা কোনোরকম সাড়াই দিল না।

সোজা আইফেল টাওয়ারের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ওটা। সে অনুমান করল, হয়ত ওখানেও ইনভ্যালিদেসের চার্চের গম্বুজে লুকিয়ে রাখা যন্ত্রের মতো কোনো যন্ত্র লুকানো আছে, যেটার আকর্ষণে স্কাইহকটা ছুটে যাচ্ছে।

“টর্নেডোকে মিসাইল রেডি করতে বলুন,” বলল ম্যালন। “আর চপারটা এবার সরানো যায় না এখান থেকে?”

“প্লেনের ভেতর তুমি থাকতে আমি মিসাইল ছুঁড়তে পারব না,” স্টেফানি বলল।

“আপনার যে এতো খেয়াল, তা জানতাম না তো।”

“তোমার নিচে কত মানুষ, জানো?”

একটু হাসল ম্যালন, সেটা সে ভালো করেই জানে। ঠিক তখনই একটা বুদ্ধি এল তার মাথায়। যদি ইলেক্ট্রনিক্স কোনো যন্ত্রে প্লেনটাকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সেই নিয়ন্ত্রণের পথটা বন্ধ করে দিলেই হয়।

ইঞ্জিন থামিয়ে দেওয়ার কাটঅফ সুইচ টেনে প্রপেলারটা থামিয়ে দিল সে।

পাখাগুলো থেমে গেল প্রোপেলারের।

“কী হলো, ম্যালন?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

“মন্তিক্ষে রক্ত যাওয়ার রাস্তা কেটে দিলাম।”

“তুমি কি ভাবছ এতে নিয়ন্ত্রণটা নিন্ধিয় হয়ে যাবে?”

“যদি না হয়, তাহলে সত্যিই বড় বিপদ সামনে।”

নিচের বাদামী-ধূসর সেইনে নদীর দিকে তাকাল ম্যালন। খুব দ্রুত উচ্চতা হারাচ্ছে সে। ইঞ্জিন যেহেতু থেমে আছে তাই কলামটা একটু চিলা হলো, তবে এখনো শক্ত। আরও নেমে গেছে প্লেনটা।

পাঁচ হাজার ফিট।

“বিষয়টা রিক্ষি হয়ে গেল মনে হচ্ছে।”

তাহলে এতক্ষণ সে যা করল সেগুলো কী? ভাবল স্টেফানি।

এলিভেটর থেকে ছুটে বের হলো স্যাম। টাওয়ারের দ্বিতীয় অবজারভেশন ডেকে সে এখন। তবে এখান থেকে একটু সতর্কতার সাথে এগুচ্ছ হবে, ভাবল সে। অ্যাশবিকে নিয়ে তার ধারণা যদি ভুল হয়, তাহলে এখানে আশীর্বাদ কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। বেশ ঝুঁকিই নিচ্ছে সে, কিন্তু ঝুঁকিটা যেন নিন্দিত হবে তার মন বলছে।

বাইরের খোলা পাশটা ভালো করে দেখে নিল প্রথমে, তারপর পূর্বদিকটা, এবং শেষে উত্তর ও দক্ষিণ পাশটা দেখে নিল সে।

একটা প্লেন চোখে পড়লো তার। দ্রুতই এগিয়ে আসছে। কাছেই একটা মিলিটারি হেলিকপ্টার।

কী হতে চলেছে তা ভেবে গায়ে কাঁটা দিল তার।

দ্রুত উপরের ডেকে ওঠার সিঁড়িতে ঝাপিয়ে পড়লো স্যাম। কাঁচের দরজাটা বন্ধ এবং বাইরে থেকে আটকে দেওয়া যেরকম লক, তাতে চাবি ছাড়া খোলা অসম্ভব। এদিকটা বাদ ঘুরে অন্য দরজার দিকে ছুটে গেল সে।

এখানেও একই অবস্থা।

হাত মুঠো করে জোরে একটা আঘাত করল পুরু কাঁচের দরজায়।

হেনরিকও আছে ওখানে।

কিন্তু কারো কিছু করার নেই।

প্রোপেলার থেমে গিয়ে প্লেনটা নিচে নেমে আসছে, এক দৃষ্টিতে দেখছে এলিজা। প্লেনটা এক কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে চলে এসেছে, এবং সেটা সরাসরি এদিকেই আসছে।

“প্লেনটার কি মাথা খারাপ হলো?” এক সদস্য বলল।

“সেটাই দেখার বাকি আছে,” শান্ত স্বরে বলল থ্রাভাল্ডসেন।

এই ডেনিশ লোকটার মানসিক শক্তি দেখে অবাক হলো এলিজা। এরকম কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও লোকটাকে পুরোপুরি শান্ত মনে হচ্ছে।

“কী হচ্ছে বল তো?” রবার্ট ম্যান্সন জিজ্ঞেস করল এলিজাকে। “এসবের শিকার হবার জন্য আমি আসিনি এখানে।”

ইটালিয়ান ভদ্রলোকটার দিকে ঘুরে তাকাল থ্রাভাল্ডসেন। “বেশী কিছু না, মরার জন্য প্রস্তুত হন।”

▲

প্লেনটা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যুদ্ধ করছে ম্যালন।

“ইঞ্জিনটা চালু কর এক্ষণই,” স্টেফানি বলল রেডিওতে।

“চেষ্টা করছি তো।”

সুইচটা ঘুরাল একবার, মোটরটা ঘরঘর করে উঠল, কিন্তু ঘুরাল না। আবারো চেষ্টা করল সে, আরও খারাপ শব্দ এল এবার।

খুব দ্রুত নিচে নেমে আসছে ম্যালন, আইফেল টেঁওয়ারের চুড়াটা এক মাইলেরও কমে এসে পড়েছে।

আরও একবার চেষ্টা করল সে, আর এবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ইঞ্জিনটা চালু হলো। প্রপেলারটা ঘোরা শুরু করতেই বাতাসে ধাক্কার গতি বেড়ে গেল। ইলেক্ট্রনিক অংশকে আবার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সুযোগ না দিয়েই ফ্রোটলটা সামনে ঠেলে দিয়ে প্লেনকে সবচে জোরে ছুটতে আদেশ দিল সে।

ডানা ঘুরিয়ে প্লেনটা কাত করে ঝড়ের বেগে ছুটে পার হয়ে টাওয়ারটা, লোকজন দাঁড়িয়ে আছে ওটার উপর, দেখছে উপরের দিকে।

একটা ছোট প্লেন খুব কাছে চলে এসেছে। কিছুই করার নেই স্যামের। হাল ছেড়ে সে দ্রুত ছুটে গেল দক্ষিণের জানালার দিকে। প্লেনটা গর্জন করতে-করতে পার হয়ে গেল, পেছনেই একটা হেলিকপ্টার।

এলিভেটরের দরজাটা খুলে গেল, এবং কিছু নিরাপত্তাকারী ছুটে এল তার দিকে।

তাদের মাঝে একজনকে একটু আগেই নিচের রেস্টুরেন্টে দেখেছে সে।

“উপর তলার দরজাগুলো বন্ধ,” তাদেরকে বলল সে। “চাবি লাগবে খুলতে।”



সেসনা স্কাইহক যখন তাদেরকে অতিক্রম করে গেল, খুব কাছ দিয়েই উড়ে গেল সেটা। একশ মিটার বা একটু বেশী হবে বড়জোর। ককপিটের দিকেই লক্ষ্য করছিল শ্রভান্ডসেন, আর পাইলট এমন ব্যক্তি যাকে চেনার জন্য দ্বিতীয়বার তাকাতে হয় না।

কটন ম্যালন।

BengaliBook.org

“আই হ্যাত কন্ট্রোল,” ম্যালন বলল রেডিওতে।

আরও উপরে উঠে যাচ্ছে সে। ৩০০০ ফিট উপরে গিয়ে আমার চিন্তা করল সে।

“আরেকটু হলেই হয়েছিল,” আবারো বলল সে।

“শোন, জিঞ্জেস করতে হচ্ছে,” বলল স্টেফানি। “বৈধ কাজ করছে ঠিকমত?”

“একটা এয়ারপোর্ট লাগবে এখন।”

“দেখছি আমরা।”

অরলি বা শারলস দে গলে নামাটা ঝুঁকির হতে পারে, তাই ওদিকে যেতে চাইছে না সে। “ছোটখাটো কোনো ফিল্ড খোঁজেন। সামনে কোন এলাকা?”

“শহরটা পার হয়ে কয়েক মাইল সামনেই একটা বনভূমি আর জলভূমি আছে। ওখানেই ল্যাগনেতে একটা ফিল্ড আছে, ওটার নাম দেখাচ্ছে ক্রেতেইল, আর আরেকটা ফিল্ড আছে তুঘন্যানে।”

“তা ওগুলো কত দূরে?”

“কুড়ি মাইল হবে।”

জ্বালানি পরীক্ষা করে নিল ম্যালন। মিটারটা বলছে এখনো পঞ্চাশ লিটার আছে, তার মানে ট্যাঙ্ক বলতে গেলে পুরোটাই ভরা। বোঝাই যাচ্ছে পরিকল্পনাটা যার-ই হোক, সে C-83 বিফ্ফোরকের সম্বৰহারের জন্যই ট্যাঙ্ক ভরে গ্যাসোলিন নিয়েছে।

“একটা রানওয়ে খুঁজে দিন,” সে বলল স্টেফানিকে। “প্লেনটা নামাতে হবে নিচে।”

“ত্রিশ মাইল সামনে একটা প্রাইভেট ফিল্ড আছে, জায়গাটা এভিতে। কেউ থাকে না বলতে গেলে। খবর পাঠানো হয়েছে জায়গাটা পরিষ্কার করে দিতে। প্লেনের কী অবস্থা?”

“একেবারে বশে আনা মেয়ের মতো।”

“তাহলে তো ভালোই।”

প্রপেলারটা শুরু করে উঠল।

উইন্ডশিল্ডের ভেতর দিয়ে ইঞ্জিনের সামনে তাকাল সে, একটু কেঁপে উঠে প্রোপেলার আবার থামতে শুরু করেছে।

তারপর ইঞ্জিনটা আবার নিজ থেকেই চলা শুরু করল।

হাতে ধরে থাকা কলামটা ছুটে গিয়ে নিজেই নড়তে শুরু করল, প্লেনটাও ঘুরে গেল ডান দিকে। কিছু একটা বা কেউ একজন এটার নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে আবার।

“কী হলো আবার?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

“প্লেনটা আমার মাতৃর পছন্দ করছে না মনে হচ্ছে। ও নিজের খেয়াল মতো চলতে চাইছে।”

প্লেনটা এবার ভূমির সমান্তরালে উড়ছে, কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকে একটু কাত হয়ে গেল ওটা। সম্ভবত ইলেক্ট্রনিক্স অংশটা ঠিক সিগন্যালটা ধরতে পারছে না, তাই প্লেনটাও বুবাতে পারছে না ঠিক কোন দিকে যাবে। আইফেল টাওয়ারের দিকে যাওয়ার সময় তাহলে এরকম কোনো সিগন্যালই পাচ্ছিল এটা!

ক্ষাইহক আবারো উপরে উঠতে শুরু করল, কিন্তু আবার ইঠাং করেই থেমে গেল। তীব্র ঝাঁকুনি খয়ে উঠল প্লেনের ভেতর থাকা সবকিছু ডুস্তা ও লেজ সবই দুলে উঠল ওপর-নিচে, ডানে-বাঁয়ে।

“নাহ, মনে হচ্ছে এতে কাজ হবে না। ফাইটারকে বলুন সব রেডি রাখতে। আমি এটাকে যতটা পারি উপরে নিয়ে যাচ্ছি, তারপরে লাফ দেব আমি! বলে দিন যেন আমাকে সরে যাওয়ার একটু সময় দেয়, তারপর বাকি কাজ ওদের।”

কিছুই বলার নেই স্টেফানির।

প্লেনটা আরও উপরে নিয়ে যেতে চাইছে ম্যালন। ক্ষাইহক না চাইলেও থ্রোটল, প্যাডেল সবকিছু সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা তার। ইঞ্জিনটা ঘড়ঘড় করে উঠল উপরে উঠতে-উঠতে, যেন কোনো গাড়ি খাড়া কোনো পথে ওঠার চেষ্টা করছে।

তার চোখ দুটো অল্টিমিটারে।

৪০০০ ফিট। ৫০০০...৬০০০...

কানে তালা লেগে যাচ্ছে তার।

৮০০০ ফিট হলেই চলবে, ভাবল সে। তারপর মিটারেও ওটা যখন দেখাল, হাতলটা ছেড়ে দিল সে। প্লেনটা সমান্তরালে আসার জন্য অপেক্ষার ফাঁকে কান থেকে হেডসেটটা খুলে ফেলে উলের ক্যাপটা আবারো পড়ে নিল। আগামী কয়েক মিনিটে কী হবে, তা দেখার কোনো ইচ্ছে নেই তার।

হাতল টেনে দরজাটা খুলে ফেলল সে ।

প্যানেলটা খুলে যেতেই ঠাণ্ডা বাতাস এসে চুকল ভেতরে । ভয়-ভীতির হিসাব করার সময় নেই এখন । একবার নিচে তাকিয়ে কল্পনায় মাপজোখ করে নিল যে কিভাবে তাকে কত জোরে লাফালে ফিউজেলাজের সাথে ধাক্কা লাগবে না, আর ভেবে নিয়েই লাফ দিল শুন্যে । সারাজীবনে মাত্র দু'বার সে প্লেন থেকে লাফ দিয়েছে । একবার ফ্লাইট ট্রেনিংের সময়ে, আরেকবার গত বছরে সিনায় উপত্যকার উপর । কিন্তু নেভিতে থাকার সময়ে লাফানো নিয়ে যে বাণীটা তাকে বারবার শোনান হত সেটা কখনোই ভোলে না সে । পিঠ বাঁকা হবে ধনুকের মতো । আর হাত পা ছড়িয়ে দিতে হবে । কখনোই শরীরকে পাক খেতে দেবে না, এতে নিয়ন্ত্রণ থাকে না । তার কাছে কোনো অল্টিমিটার না থাকায় সে বুবাতেও পারছে না কত উপরে সে আছে । তাই সংখ্যা গুনে একটা হিসাব রাখতে হবে তাকে । ৫০০০ ফিট উপরে থাকতেই প্যারাসুটটা খুলতে হবে । ডান হাত দিয়ে বুকের সাথে লাগানো প্যারাসুটের দড়িটা খুঁজল সে । কখনো দেরী করবে না, তার ওড়ার প্রশিক্ষক প্যারাসুট খোলা নিয়ে সব সময় সতর্ক করে দিত তাকে । আর এমন ভীতিকর পরিস্থিতিতে সেটা খুঁজে পেতে দেরী হলো তার, কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই ডি-রিংটা খুঁজে পেল তার আঙুলগুলো ।

একটু উপরে উঁকি দিতেই স্কাইহককে দেখা গেল অস্তির ভ্রমণে এখনো মজে আছে সেটা । ওটার টাগেটিকে খুঁজছে হন্যে হয়ে, ইঞ্জিনটা গর্জন করছে থেকে থেকে, আর উচ্চতা কখনো বেশী, কখনো কমে যাচ্ছে ।

শীতের বাতাস ফুঁড়ে নিচে নামতে দিয়ে সময়টা যেন ক্ষুর মনে হলো ম্যালনের ।

নিচে খোলা প্রান্তের আর বনাঞ্চল বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে । ডান দিকে হেলিকপ্টারটা চোখে পড়লো, এখনো নজরে রাখছে তার প্রতি ।

দশ থেকে উল্টো গোনা শুরু করে শূন্যের আসতেই প্যারাসুটের রিপ কর্ডটা হ্যাঁকা টান দিল ম্যালন ।

A

ছুটে আসা মানুষের পায়ের শব্দ আসতেই পেছনে তাকাল এলিজা । নিরাপত্তাকর্মীরা ছুটে আসছে ডেকের বাইরের প্রান্ত ধরে ।

“সবাই ঠিক আছেন আপনারা?” প্রধান লোকটা জিজেস করল ফরাসি ভাষায় ।

নড় করল এলিজা । “আমরা ঠিক আছি । কিন্তু কী হচ্ছে বলুন তো?”

“ঠিক বুঝতে পারছি না আমরা । মনে হচ্ছে, কেউ একজন দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে, আর ওদিকে ছোট্ট একটা প্লেন এখানে প্রায় চুকেই যাচ্ছিল ।”

যা শুনল, তাতে প্রভাবসেনের কথাই সত্যি প্রমাণিত হলো ।

ডেনিশ লোকটার দিকে তাকাল এলিজা ।

কিন্তু এদিকে তার কোনো খেয়াল নেই । প্ল্যাটফর্মের একপাত্তে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাত দুটো কোটের পকেটে চুকানো, তাকিয়ে আছে দক্ষিণ দিকে, ওদিকেই প্লেনটা

বিস্ফোরিত হয়েছে। তার ঠিক আগেই পাইলট লাফিয়ে পড়েছে প্যারাসুট নিয়ে। একটা হেলিকপ্টার তার চারপাশে উড়ছে, খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখছে তার প্রতি।

কিছু একটা ঘাপলা আছে এখানে।

আর সেটা গ্রাহাম অ্যাশবির বেঙ্গমানির থেকেও গুরুতর!

▲

প্যারাসুট খুলে যেতেই উপরে তাকাল ম্যালন, দেখল কোনো দড়ি পেঁচিয়ে গেল কিনা। পাগলা হাওয়া চেপে ধরেছে তাকে চারদিক দিয়ে। এখনো অনেক উপরে সে, প্রায় ৫০০০ ফিট হবে, কিন্তু কিছু আসে যায় না এতে। তার প্যারাসুটটা খুলে গেছে আর সে খুব ধীরে নিচে নেমে আসছে।

তিনি বা চারশ মিটার দূরে লম্বা লেজওয়ালা দেখতে একটা মিসাইল ছুটে গিয়ে আঘাত করেছে প্লেনকে। তার এক মুহূর্ত পরেই আগুনের বিরাট এক গোলা দেখা গেল আকাশে, যেন বিরাট কোনো নক্ষত্র বিস্ফোরিত হয়ে সুপারনোভায় রূপ নিচ্ছে, আর বিস্ফোরণের ধরণই বলে দিচ্ছে স্কাইহকের ভেতর C-83 উপস্থিতির কথা।

যেরকমটা আশা করছিল ম্যালন, বিস্ফোরণটা সেরকমই হলো।

প্লেনটাই আসল সমস্যা ছিল।

টর্নেডো উড়েছে মাথার আরও উপরে, হেলিকপ্টারটা আধ-মৃত্যুর দূরে, তার নিচে নেমে আসাটা দেখছে।

সবচে ভালো একটা জমি খুঁজছে সে নামার জন্য ক্ষেত্রের টুগলটা ধরে টেনে আয়তাকার প্যারাসুটটা নিচে নামাতে শুরু করল সে। চক্ষুকারে ঘুরে নামা শুরু হতেই গতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমাগত।

ত্রিশ সেকেন্ড পর তার পাঁদুটো মাঠের মাটিকে স্পর্শ করল, তারপরেই একটু উপুড় হয়ে পড়ে গেল। নিড়ানি দেওয়া মাটির গন্ধে নাক ভরে গেল তার।

কিন্তু এখন এসব গন্ধে কিছু যায় আসে না।

সে বেঁচে আছে, এটাই আসল কথা।

▲

দূরের প্যারাসুটের দিকে চেয়ে আছে প্রভান্তসেন। যা চেনার চেনা হয়ে গেছে তার। গ্রাহাম অ্যাশবি তার আসল রূপ দেখিয়েছে। দেখিয়েছে ম্যালন নিজেও। এই মুহূর্তে যেটা হলো তার পেছনে সরকারও জড়িত। যার অর্থ, ম্যালন হয় স্টেফানির সাথে কাজ করছে, বা ফ্রান্সের হয়ে, অথবা দু'পক্ষেই।

আর এমন বেঙ্গমানির ফল পেতেই হবে, তা সে যে-ই হোক।

চতুর্থ অধ্যায়

আটান্ন

একেবারে নিচের লেভেলে নেমে এল অ্যাশবি। সময় হিসেব করে পালিয়ে আসার কাজটা সারতে হয়েছে তার। সে জানত নিচে পর্যন্ত আসতে খুব মূল্যবান কয়েকটা মিনিট তার হাতে আছে। পরিকল্পনাটা ছিল গুস্তাভ আইফেল এভিন্যু পার হয়ে চ্যাম্প দে মারসের ভেতর দিয়ে জ্যাকুয়েস রঞ্জেফ এর দিকে এগিয়ে যাওয়া, জায়গাটায় আগে প্যারেড হত। ওখানেই, একটু পূর্ব দিকে, এভিন্যু জে. বৌভারদের ভেতরে ক্যারলাইন অপেক্ষা করছে তার জন্য গাড়ি নিয়ে। যা কিছু হতে দেখবে মেয়েটা সেগুলো ব্যাখ্যা করতে হতে পারে তাকে, কিন্তু চিন্তার কিছু নেই, মিথ্যেগুলো আগে থেকেই সাজানো আছে তার।

শুরু ধরে নেমেই চলেছে অ্যাশবি।

পিটার লায়নের সাথে তার যে চুক্তি হয়েছিল সেটা স্পষ্ট হয়েছে তার কাছে। লাঘক যেরকম চেয়েছে সেরকমটা চুক্তি-ই হয়নি লায়নের সাথে। লাঘকের কথা ছিল চার্চ অফ ডোমে হামলা হবে, সাথে একইরকম আরও দুটো হবে অ্যাভিসন এবং বৃংগদঙ্গে। কিন্তু তার বদলে, অ্যাশবি পিটার লায়নকে বলেছে প্যারিসের ভেতরেই হামলা করতে হবে, আর সেটা আইফেল টাওয়ারে। লাঘকের পরিকল্পনা কিছুই এত দিন সে বোঝেনি, তবে আজ তার বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে কিছু কথা বেশ ভালোই বলেছে মহিলাটি।

আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারলে মুনাফার সুযোগ তৈরি হচ্ছে!

শেষ সিঙ্গিটা পার হলো সে। অনেক শক্তি পুঁজিত হলো, কিন্তু মাটিতে পা রেখে ভালো লাগছে তার। খুব শান্ত থাকতে হবে, নিজেকে বোঝাল সে। তারপর ধীরে হেঁটে অটোমেটিক রাইফেল হাতে টহল দিতে থাকা সামরিক পোশাকের লোকজন পার হয়ে গেল লোহার বিরাট ভীতের কাছে কয়েকশ লোক সোরি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, বেলা একটায় টাওয়ার খুলে দেওয়ার অপেক্ষায় তারা।

কিন্তু, দুঃখের কথা আজ আর টাওয়ারটা খোলা হচ্ছে না, ভাবল মনে-মনে।

আইফেল টাওয়ার আজকের পর আর থাকবে না এখানে।

এলিজা লাঘকের পরিকল্পনার পরিবর্তন করে সেখানে ইন্ডিয়ান্সে হামলার কথা রাখলেও সেটা সবার মনোযোগটা অন্যদিকে নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র, তার মূল লক্ষ্য টাওয়ার। লায়ন কখনোই জানত না যে অ্যাশবি গোটা প্যারিস ক্লাবকেই ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে, এমন কী লাঘক সহ। এটা জানা তার কাছে জরুরীও না। আর, কেউ মারা গেলেও বা লায়নের কী? ক্লায়েন্টের চাহিদামত কাজ করবে, টাকা নেবে, শেষ। আর এক্ষেত্রে তার ক্লায়েন্ট হলো অ্যাশবি। যত যা-ই ঘটুক না কেন, সব দায়ভার লায়নের উপর চাপালেও ক্ষতি নেই। তার কাজই এটা। এখন আমেরিকানরা যদি তাকে টাওয়ার থেকে নেমে আসা নিয়ে প্রশ্ন করে, তাহলে সে উত্তরে কী বলতে সেটাও

ঠিক করে ফেলছে। বলবে যে লাঘক নিজেই তাকে দিনের বাকি কাজগুলো থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, কারণ তাকে খুব জরুরী একটা কাজে পাঠিয়েছিল মেয়েটা।

কে অবিশ্বাস করবে ওর কথা?

দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পথ শেষ করে টাওয়ার থেকে দূরে সরে গেল অ্যাশবি। হেঁটেই চলেছে বিরতিহীনভাবে, মাথার ভেতর ঘড়ি চলছে তার টিকটিক করে। হাতঘড়িতে সময়টা দেখল আরও একবার। ঠিক মাঝ দুপুর।

প্লেনটা যে কোন দিক থেকে আসছে, তার কোনো ধারণাই নেই, তবে এখানেই যে এসে পড়ছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

এভিন্যু দে গুস্তাভ আইফেল পার হয়ে চ্যাম্পস দে মারসে ঢুকে গেল সে।

তার এখানে কোনো দোষই নেই, তাই নিজেকে শান্ত থাকলে বলল আবারো। পিটার লায়ন পৃথিবীর বুকে সবচে ভয়ঙ্কর খুনিদের মাঝে একজন। আমেরিকানরাও এর সাথে যুক্ত হয়েছে লায়নকে ধরার জন্য, কিন্তু তারা লায়নের ছায়ার কাছেও যেতে পারেনি। আর এখন, একটু পরেই যা ঘটতে চলেছে, সেটা নিয়েই বেশ ব্যস্ত থাকতে হবে তাদের। স্টেফানি নামের মহিলার কাছে সে ইনভ্যালিদেসের কথা বলেছে হামলার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে, যেন নিজের স্বার্থটুকুও বজায় থাকে। আর এখানেই হাঁচের সামনে একটা গাড়ি যেহেতু পুড়েছে, তাই আমেরিকানদের কাছে সে ঠিক তথ্যই দিয়েছিল এই সাহস নিয়েই কথা বলতে পারবে। লায়ন তার পরিকল্পনায় আবারো পরিবর্তন এনেছে, তবে মনে হচ্ছে, এই দক্ষিণ আফ্রিকান সবাইকেই ঘোরা বানিয়েছে, এমনকি অ্যাশবিকেও।

আর তার ফল কী হবে? আমেরিকান বা এলিজা গ্রাঘক, উভয়ের কাছ থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে সে, আর সব যদি ঠিকঠাক চলে আছে ক্লাবের সব জমা টাকা নিজের পকেটে ভরে নেপোলিয়নের বাকি সম্পদটুকুও খুঁজে বের করবে, তারপর সব নিজেই ভোগ করবে।

পারিশ্রমিক একেই বলে।

তার বাবা আর দাদা বেঁচে থাকলে ভীষণ খুশি হত, গর্ব বোধ হত তাদের।

হেঁটে চলেছে সে, বিস্ফোরণের অপেক্ষায় আছে তার সব ইন্দ্রিয়, একেবারে প্রস্তুত যে কোনোরকমের ধাক্কা সামলাতে।

একটা কিছু এদিকেই উড়ে আসার শব্দ হচ্ছে, ত্রিমেই গাঢ় হচ্ছে ধ্বনিটা।

এবং তার ঠিক পরেই ঘূর্ণায়মান রোটরের শব্দ।

হেলিকপ্টার নাকি?

হাঁটা থামাল অ্যাশবি, তারপর উপরে তাকাল। একটা সিঙ্গেল-ইঞ্জিনের প্লেন ডানাদুটো একেবারে কাঁত করে দিয়ে টাওয়ারের প্রথম প্ল্যাটফর্মটার কয়েকশ মিটার দূর দিয়ে উড়ে চলে গেল।

একটা মিলিটারি হেলিকপ্টারও ছুটছে ওটার পেছনে।

ভয় আর বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় হয়ে গেল তার।

প্যারিস ক্লাবের বাকি সদস্যদের সাথে এলিভেটর থেকে বের হলো থ্রিভান্ডসেন। সবাই এখন প্ল্যাটফর্মের প্রথম লেভেলে। উপরের ডেকের দরজার তালা খুলে দেওয়া নিরাপত্তাকর্মীটি তাদেরকে কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি কিভাবে তারা আটকা পড়লো সে বিষয়ে। কিন্তু উত্তরটা থ্রিভান্ডসেন জানে। গ্রাহাম অ্যাশবি আরও একটা বড় ধরনের গণহত্যার পরিকল্পনা করেছিল।

সবাই মিটিং রুমে এসে পড়েছে। দলের বেশীরভাগ সদস্যই ঘাবড়ে গিয়েছে কিন্তু সবাই সেটা সামলে আত্মবিশ্বাসী ভাবটা ধরে রেখেছে। আটকা পড়ার পর নিজ থেকে তেমন কোনো মন্তব্য করেনি সে, তবে গ্রাহাম অ্যাশবিকে নিয়ে করা তার পর্যবেক্ষণে অন্যদের প্রতিক্রিয়া খেয়াল করেছে ভালো করেই। শুধু তা-ই না, লাঘকের ক্রোধটুকুও তার চোখ এড়ায়নি। আর এই ক্রোধ যেমন অ্যাশবির প্রতি, তেমন তার প্রতিও।

বাইরের দিকের রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আছে থ্রিভান্ডসেন, হাতমোজায় ঢাকা হাত দুটো কোটের পকেটে ঢোকানো। এলিজা এগিয়ে গেল তার দিকে।

“দেখুন, আমি আর মিথ্যের ভেতরে থাকতে চাই না।” বলল থ্রিভান্ডসেন। “আর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না। আপনি কি এরকমই করে থাকেন?”

“মানে?”

“মানে? আপনার গ্রাহাম অ্যাশবি আমাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করল, নাকি এটাও ভুল বলেছিঃ?”

“সেটা ভালো করেই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এগুলোকি অন্যদের সামনে না বললেই হত না? শুধু আমাকে বলতে পারতেন।”

কাঁধ ঝাঁকাল সে। “তাদের ভাগ্যে কী ঘটতে চলেছে, সেটা তাদের জানা উচিত। কিন্তু আমার চিন্তা হলো, আপনি আসলে কীভাবে চাচ্ছিলেন? শুধু চারপাশের সৌন্দর্য দেখানোর জন্য উপরে নিয়ে যান নি আমাদের।”

অবাক দৃষ্টি দিয়ে এলিজা তাকাল তাঁর দিকে।

“আপনি আসলে বুঝতে পারছেন না যে আপনার পাগলামির শিকার হয়ে যাচ্ছিলাম আরেকটু হলেই। কী সব হাবাজাবা মার্কা বুদ্ধি দিলেন একটু আগে। শুনে এগুলো পাগলামি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছি না আমি।”

তার এমন ঘৃণা-ভরা ক্রোধ দেখে এলিজা বিস্মিত, হতভম্ব। আর একমুহূর্তও এই লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না তার।

“এখানে আমার আসা শুধুমাত্র গ্রাহাম অ্যাশবির জন্য,” পরিষ্কার জানিয়ে দিল সে। “আমি আপনাকে ব্যবহার করেছি তার কাছে পৌছাতে। প্রথমে ভেবেছিলাম যে সব গাল-গল্প আপনি বলছেন সেগুলোর প্রতিবাদ করব। হয়ত এটাই করা উচিত। কিন্তু এখন আর আমার কিছু যায় আসে না এতে। বিশেষ করে আপনার লোক অ্যাশবি যা করতে চাইল সেটা দেখার পর।”

“আপনি জেনে রাখুন মিস্টার প্রভান্ডসেন, আমি তামাশার পাত্র না। আর লর্ড অ্যাশবি সেটা খুব শীত্রই জানতে পারবে।”

নিজের কঠে খুব শীতলতা নিয়ে এল সে, “ম্যাডাম, এবার আমার কথাও শনে নেন। আপনার এরকম দুই-নম্বরি কারবারের সাথে থাকার বিন্দু পরিমাণ ইচ্ছা নেই আমার, আশা করি খুশি হবেন এতে। আর যদি থাকতামও, আপনাকে এগুলো করতে দিতাম না। কিন্তু আসলে এতে আমার কিছুই যায় আসে না। শুধু আমি মাথা ঘামাব কেন? তবে আপনার কিছু সমস্যার কথা আপনাকে বলে যাই। এক নম্বরে, অ্যাশবি। দুই নম্বরে আমেরিকান সরকার। যে প্লেনটা এখানে আমাদেরকে মারতে যাচ্ছিল, ওটার পাইলট কে জানেন? বিচার বিভাগের একজন প্রাক্তন এজেন্ট, নাম কটন ম্যালন। তার বসত, ঐ একই ডিপার্টমেন্টের, এখানে উপস্থিত। এবং আমার ধারণা সে খুব ভালো করেই জানে এখানে কী করছেন আপনি। আপনার পরিকল্পনা আর গোপন নেই, ম্যাডাম।”

প্রস্থানের জন্য ঘুরে গেল প্রভান্ডসেন।

তার হাতটা ধরে ফেলল এলিজা। “নিজেকে কী মনে করেন আপনি? আমাকে অগ্রহ করা এত সহজ না।”

সারা শরীর রাগে জ্বলে যাচ্ছে তার। যা কিছু হলো এতক্ষণে তাত্ত্বিক রকমের ধাক্কা খেয়েছে সে। প্লেনটা যখন টাওয়ারের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন তার মনে হচ্ছিল জীবনটা এভাবেই শেষ হতে চলেছে বুঝি। খুব তড়িঘৰ্ষণ করে এদের সাথে যোগ দেওয়ার এমন বাজে সিদ্ধান্তের জন্য তার চৃড়ান্ত লক্ষ্য থেকে সে একেবারেই ছিটকে পড়ত কপালটা খারাপ হলে। একদিক থেকে সে খুশিটুঁয়ে প্লেনটা ম্যালন থামিয়েছে একেবারে শেষ সময়ে। কিন্তু অন্য দিক থেকে তিসেব করলে, তার বন্ধুর এরকম বেঙ্গিমানি তাকে ভীষণভাবে আহত করেছে, কল্পনাতীত কষ্ট পেয়েছে সে।

ম্যালন, স্টেফানি এবং অ্যাশবি-তিনজনকেই এখন তার প্রয়োজন সবকিছুর ইতি টানার জন্য। প্যারিস ক্লাব এখন আর মূল হিসেবের অংশ না। এমনকি তার দিকে ঘৃণা-ভৱা চোখে তাকিয়ে এই কূট-চালবাজ মহিলাও না।

“হাত ছাড়ুন,” দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে।

ধরেই রাখল এলিজা।

বাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে।

“সরে যান সামনে থেকে,” আদেশ দিল প্রভান্ডসেন।

“আমি কি আপনার হুকুমের গোলাম?”

“জানে বাঁচতে চাইলে সেটাই হতে হবে আপনার। কারণ এরপর আর কোনো দিন যদি কোনো কিছু নিয়ে আমাকে খোঁচান, তাহলে আমি আপনাকে গুলি করে মারব।”

বলেই হেঁটে চলে গেল ডেনিশ লোকটা।

অপেক্ষমাণ গাড়িটি দেখতে পেল অ্যাশবি। ফুটপাথের ঠিক পাশেই দাঁড় করানো, এবং ক্যারলাইনও আছে ভেতরে। চ্যাম্প দে মারসের সমান্তরালে থাকা রাস্তার উপরে গাড়ির ভিড় জমতে শুরু করেছে। গাড়ির দরজা খুলে সবাই উপরে তাকিয়ে আছে।

দুশ্চিন্তা কাবু করে ফেলছে ভেতরটাকে।

এখান থেকে সরে পড়তে হবে তাকে।

প্লেনটা আইফেল টাওয়ারকে আঘাত করেনি। আরও খারাপ কথা হলো, এলিজা লাঘক টের পেয়ে গেছে যে সবাইকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল সে।

টের না পাওয়ার কোনো কারণ আছে?

কিন্তু হলোটা কী? লায়ন কি তাহলে চোখ উলটে নিল? ফির প্রথম অর্ধেক টাকা ঠিকই পাঠানো হয়েছে তাকে, এবং সেটা তার জানারও কথা। তাহলে কাজ করল না কেন সে? কিন্তু সে যদি রাজিই না হবে, তাহলে ওদিকে চার্চ অফ ডোমের সামনে ওটাই বা কেন ঘটাবে ঝুঁকি নিয়ে? পূবদিক থেকে যে পরিমাণ ধোঁয়া আসছে তাতে বোৰা যাচ্ছে, আগুনটা এখনো জ্বলছে সেখানে।

আর বাকি টাকাও তাকে দেওয়া হয়নি।

তিনগুণ করে পাঠানোর কথা। টাকার অংকটা মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো।

গাড়িতে চুকল সে অ্যাশবি।

ক্যারলাইন বসেছে পেছনের সিটে, সামনের চালকের অসমনে মিস্টার গিল্ডহল। আর একেই এখন তার কাছে রাখতে হবে।

“প্লেনটা টাওয়ারের কত কাছ দিয়ে উড়ে দেখলে?” জিজ্ঞেস করল ক্যারলাইন।

“হ্যাঁ, দেখেছি।” মনে-মনে খুশি হলো যে বিশী ব্যাখ্যা করতে হলো না তাকে।

“তোমার কাজ শেষ হয়েছে?”

হলে ভালোই হত। “এখনকার মতো।” মেয়েটার হাসিমাখা মুখের দিকে তাকাল সে। “হাসছ যে?”

“নেপোলিয়নের ধাঁধাটা সমাধান করে ফেলেছি।”

উনষাট

শীতে জমে যাওয়া বাদামি ঘাসের উপর শুয়ে আছে ম্যালন, তাকিয়ে দেখছে হেলিকপ্টারটার মাটিতে নেমে আসা। পেছনের কম্পার্টমেন্টের দরজাটা খুলে যেতেই স্টেফানি লাফিয়ে পড়লো নিচে, তার পেছনে কোরম্যান নেমে এল। প্যারাসুটের জ্যাকেট খুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল ম্যালন। আশা করল তার শরীরের সব কলকজা ঠিক আছে।

প্যারাসুট থেকে পুরোপুরি মুক্ত করে নিল নিজেকে। “ফ্রান্স সরকারকে জানিয়ে দিন যে আমরা নিরাপদে আছি।”

হাসল স্টেফানি।

“আর এটাও জানান,” বলল ম্যালন। “ওরা আমার কাছে খণ্ডী।”

মেলে থাকা প্যারাসুট গোছাতে ওরু করল কোরম্যান।

“লায়ন ভীষণ রকমের উগ্র, আবারো বুবলাম,” ম্যালন বলল স্টেফানিকে। “একেবারে আমাদের মুখের উপর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। দেখুন, কালকে লভনে ও আগে থেকেই ছোট আইফেল টাওয়ারগুলো নিজের কাছে রেখেছে, ও বুবেই গিয়েছিল যে আমাদের কারো সাথে ওর দেখা হবে, শুধু তা-ই না, নিজের ওরকম চোখ দুটো ঢাকার চেষ্টাও করেনি। এগুলোর অর্থই হলো সে ইচ্ছা করে আমার মুখোমুখি করতে চাইছিল। হিসেব করে দেখেন ওর পরিকল্পনাটা, ওর কাজের ফলাফল যেটাই হোক, সেটাই লাভ। প্লেনটা আমরা থামিয়ে দিলে অ্যাশবিকে আক্রমণ করবে সে, ক্ষেত্রে তার উপরে পুরনো রাগ আছে লায়নের। আবার প্লেনটা যদি না থামানো যেত তাহলে তার ক্লায়েন্ট খুশি হত, কারণ পরিকল্পনামাফিক কাজ হয়েছে তাই। সত্যিভূতে, পরিণতি যেটাই হোক, তা নিয়ে লায়নের আদৌ কোনো মাথাব্যথা আছে বলজ মনে হয় না।” আর মাথাব্যথা নেই বলেই ইনভ্যালিদেসের ঐ ঘটনা সহ অসুস্থ কয়েকটা প্লেন দিয়ে সবার মনোযোগ অন্য দিকে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল সে, ভাবল ম্যালন। “তবে সবার আগে অ্যাশবিকে খুঁজে বের করতে হবে।”

“সমস্যা আরও বড় একটা হয়েছে,” স্টেফানি বলল। “টাওয়ারের মাথার কাছ থেকে উড়ে যাওয়ার সময়, ওখানে হেনরিককে দেখলাম।”

“আমাকে কক্ষিটে বসা দেখেছে সে।”

“আমিও ঠিক ওটাই ভাবছিলাম।”

কোরম্যান একটু এগিয়ে এসে স্টেফানিকে তার ছোট রেডিওটা চালু করার ইঙ্গিত দিল। একটু সরে গিয়ে স্টেফানি কথা বলে নিল, তারপর ফিরে ম্যালনের কাছে।

“বিরতি পর্ব শেষ,” হেলিকপ্টারের দিকে ঘুরে গিয়ে বলল স্টেফানি। “প্লেনগুলোয় যে সিগন্যাল পাঠানো হচ্ছিল সেগুলোর কেন্দ্রস্থল খোঁজ করছিল স্পেশাল টিম। ওরা খুঁজে পেয়েছে সেটা। উপর থেকে না, নিচ থেকেই সিগন্যাল যাচ্ছিল। চল, যেতে হবে এখন।”

▲

এক নিরাপত্তাকর্মী আটকে দেওয়া দরজাগুলো খুলে দিতেই স্যাম এক দৌড়ে উপরে চলে গিয়েছিল, সবার পরিস্থিতি জানতে। কিন্তু স্টেফানির সতর্কবার্তাটাও একই সাথে মনে রাখতে হয়েছে তাকেং কোনোভাবেই কারো নজরে পড়ার মতো কিছু করা যাবে না। সব দেখে নিয়ে প্যারিস ক্লাবের সদস্যরা আবার সভাকক্ষে ঢোকার আগেই প্রথম প্ল্যাটফর্মে ফিরে এসেছে। এলিজা ও হেনরিকের ভেতর কথাবার্তা চলেছে কিছু সময়ে

ধরে, না শুনতে পেলেও দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে তাদেরকে। কোনো সাধারণ আলোচনা যে হয়নি তা বোঝাই যাচ্ছিল, বিশেষ করে হেনরিক যখন এলিজার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। স্টেফানির আর কোনো কথাবার্তাই শুনতে পায়নি সে, আর মিটিংরুমে ঢোকার সুযোগও ছিল না, তাই জায়গাটা ত্যাগ করতে হয়েছে তাকে।

কেউ একজন প্লেন্টাকে আইফেল টাওয়ারে ফেলতে চাইছিল, সফলও হয়ে গিয়েছিল প্রায়। মিলিটারি পিচু নিল ওটার, ওরাই তাড়িয়ে নিয়ে গেল প্লেন্টা।

এখন স্টেফানির সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

গলার টাই টিলা করে শার্টের সবচে উপরের বোতামটা খুলে দিল স্যাম। তার জামা-কাপড় আর কোট নিচের পুলিশ স্টেশনে রাখা, মিগ্যানও ওখান থেকে পোশাক বদলেছে।

প্রথম লেভেলের খোলা জায়গাটায় থামল সে, নিচে তাকিয়ে দেখল, কয়েকশ মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের থেকে নয়শ ফিট উপরে, এই টাওয়ারের গায়ে প্লেন্টা যদি আছড়ে পড়ত, ভয়াবহ অবস্থা হত। যে হটগোল শুরু হয়েছিল উপরে, সেটাও এখন আর নেই। যেন কিছুই ঘটেনি। এখানেও স্টেফানি নেলেই এর সম্পৃক্ততা আছে বুঝতে পারছে স্যাম।

রেলিং ছেড়ে নিচে নামার পথ ধরল সে। হেনরিক প্রভান্ডসেন চালি গেছে। তার সামনে না পড়ার সিদ্ধান্তই নিয়েছিল স্যাম। আর পারাও যেত না, বিস্তুর করে এখানে।

মাঝ পথে আসতেই তার সেলফোনটায় ভাইব্রেশন হলো।

তাকে ও মিগ্যানকে একটা করে ফোন দিয়েছে স্টেফানি। প্রত্যেকের নামার সেইভ করা আছে ওটায়।

বের করে রিসিভ করল সে।

“আমি একটা ক্যাবে এখন, বলল মিগ্যান। “অ্যাশবিকে ফলো করছি। ভাগ্য ভালো যে গাড়ি পেয়েছি এই সময়ে। অ্যাশবি দৌড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু একবার থামল প্লেন্টাকে দেখার জন্য, সময় নিয়েই উড়ে যেতে দেখল সে। ওকে খুব ভীত মনে হলো, স্যাম।”

“ভয় আমরাও পেয়েছি।”

“আমি ওটা বুঝাইনি।” তার কঠে বিস্ময়। “প্লেন্টা মিস করেছে এটা দেখে ভয় পেয়েছে সে।”

।

সবার দিকে মুখ করে তাকাল এলিজা। মাথার ভেতর নানান রকমের চিন্তা ঘুরপাক থাচ্ছে। এরকম অবস্থায় একটা কিছুতে মনোযোগ দেওয়াটা কঠিন।

“ঠিক কি হয়েছে বুঝতে পারছেন?” জিজ্ঞেস করল এক সদস্য।

“সিকিউরিটি লোকজন বিষয়টা দেখছে, মনে হলো যেন প্লেন্টা’ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে সময়মত সমস্যাটা সামলে নেওয়া গেছে।”

“কিন্তু দরজাগুলো বন্ধ হলো কিভাবে?”

সত্যি কথাটা কিভাবে বলবে সে? “সেটার উত্তরও খুব শীত্রই জানতে পারব আমরা।”

“মিস্টার থ্রিভাল্ডসেন যখন বললেন যে প্লেনটাই আমাদের নিয়তি, আমরা মরতে যাচ্ছি, তারপর লর্ড অ্যাশবি এর সাথে জড়িত, এসব দিয়ে কী বোঝালেন তিনি?”

এগুলো শুনে সে নিজেই শক্ষায় আছে আগে থেকে। “এটা বোঝা যাচ্ছে যে লর্ড অ্যাশবি এবং মিস্টার থ্রিভাল্ডসেনের ভেতর একটা বৈরি সম্পর্ক আছে। যেটা আমি কিছুক্ষণ আগ অবধি জানতাম না। এখন নিজেদের মধ্যে এমন শক্রতাপূর্ণ আচরণ নিয়ে চলা যায় না। তাই আমি তাকে সসম্মানে তার মেম্বারশিপ তুলে নিতে বলেছি, আর তিনি রাজি হয়েছেন। এবং যে কথা-বার্তা বলে আপনাদের সবাইকে ভয় বা অস্বাক্ষিতে ফেলে দিয়েছেন সেসবের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।”

“কিন্তু এতেও তো পরিষ্কার হচ্ছে না বিষয়টা, মানে সে যে কথাগুলো বলল সেগুলো।” বলল ম্যান্স্রয়ানি।

“আমার মনে হয় এগুলো সব তার অতি-কল্পনা থেকেই বলেছেন তিনি।”

তার দলের নতুন এই সদস্যটা খুব বেশী সন্তুষ্ট হতে পারল না। “অ্যাশবি কোথায় এখন?”

আরও একটা মিথ্যে বানাল সে। “চলে গিয়েছেন, আর সেটা ক্ষমার অনুরোধেই। আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে গেল, তাই। মিটিং চলাকালে তিনি ফিরতেও পারেন, নাও পারেন।”

“কই, আপনি উপরে তো এটা বলেছিলেন না” একজন সদস্য বলল। “আপনি আরও জানতে চাইলেন যে অ্যাশবি কোথায়!”

এলিজা নিজেকে বোঝাল যে এখানের নারীপুরুষ যারা আছে তারা বেকুব না। তাদেরকে এভাবে বোকা ভেব না এলিজা, “আমি জানতাম তিনি যাবেন, কিন্তু তখন বুরে উঠে পারিনি যে ততক্ষণে তিনি চলে গেছেন।”

“কোথায় গেছেন তিনি?”

“হিসাবের বাইরে যে সম্পদের কথা বলেছিলাম আপনাদের, কিছুক্ষণ আগে, ওটার খোঁজে আছে আছেন লর্ড অ্যাশবি। সম্প্রতি একটা নতুন সূত্র পেয়েছেন, তাই এখানে এসেই আগে আমার কাছে সেটা বলে অনুরোধ করেছিলেন যেন আমি তাকে যাওয়ার সুযোগ দেই।”

কষ্টে শীতলতা ধরে রাখতে চাইছে এলিজা, একই সাথে দৃঢ়তাও। অনেক আগেই সে এটা শিখেছে যে তুমি কী বললে সেটাই শুধু গুরুত্বপূর্ণ না, কিভাবে বললে সেটাও বিবেচনার বিষয়।

“আমরা তাহলে আলোচনাটা নিয়ে যাই সামনে?” একজন প্রশ্ন করল।

প্রশ্নের মাঝে উচ্ছ্বাসটা ধরতে পারল এলিজা। “অবশ্যই, কেন নয়?”

“আমরা যে আরেকটু হলেই মরতে বসেছিলাম, তার কী হবে?” বলল ম্যান্স্রয়ানি।

এই সব ভয় এখন তার মন থেকে দূর করে দিতে হবে, এবং সবচে ভালো হয় ভবিষ্যতের দিনগুলোর দিকে মনোযোগটা স্থির করতে পারলে। “আমি জানি আপনাদের প্রত্যেকেরই প্রতিটা দিন কোনো না কোনো ঝুঁকি সামলাতে হয়। আর এই কারণেই কিন্তু আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি, সেই ঝুঁকিটা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে। আমাদের যেমন অনেক আলোচনা এখনো বাকি, ঠিক তেমন কোটি-কোটি ইউরো আমাদের হাতের মুঠোয় আনাও বাকি আছে। তাই এখন সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ না? আমাদের সামনে যে নতুন দিন আসছে সেটার জন্য এখনই প্রস্তুত হতে হবে আমাদের। বোঝাতে পেরেছি?”

▲

চপারের পেছনের কামরায় বসে আছে ম্যালন, হিটার থেকে আসা গরম হাওয়াটা দারুণ লাগছে তার।

“প্রেনগুলোয় যে সিগন্যাল আসছে, তা পাঠানো হচ্ছে নটর ডেমের আশেপাশের কোনো এক ভবনের ছাদ থেকে। বুঝলে?” হেডফোনে বলল স্টেফানি। “লে সেইন্ট লুইসে ওটা, ক্যাথেড্রালের ঠিক পেছনে। পুলিশ পুরো বিল্ডিংটা নজরে রাখছে। আর আমরা ন্যাটোর সাহায্যে ঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করেছি।”

“এখন আসল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।”

সে দেখল স্টেফানি বুঝতে পেরেছে তার কথা।

“জানি আমি,” বলল তার বস। “বোঝা খুবই সহজ কিন্তু লায়নকে ধরব কী, সে তো আমাদের থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে। আমরা শুধু অস্ত ছায়ার পেছনে ছুটছি।”

“না। তার চেয়েও খারাপ। তার ছায়া আমাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।”

“বুঝতে পারছি, ম্যালন। কিন্তু এ ছাড়া যে আমাদের হাতে আর কিছুই নেই।”

▲

ক্যাব থেকে বের হয়ে ড্রাইভারের ভাড়া মেটাল স্যাম। চ্যাম্পস এলাইসেস থেকে এক ব্লক দূরে সে। জায়গাটা শপিং করার তীর্থস্থান, নানান রকমের মার্কেট আর নামকরা সব ব্র্যান্ড, তাদের মাঝে লুইস ভ্যাটিন, হারমেস, এবং শ্যানেলও আছে। মিগ্যান যে পথে তাকে যেতে বলেছে সে পথেই এসেছে সে। এখন সে দাঁড়িয়ে আছে ফোর সিজন নামের আটলা এক হোটেলের সামনে, ১৯২০ এর দশকে ডিজাইন করা

চারপাশে চোখ বুলাতেই রাস্তার ওপারে মিগ্যানকে দেখতে পেল স্যাম। পোশাক বদলানোর জন্য সময় নেয়ানি সে, কিন্তু আইফেল টাওয়ার থেকে পালিয়ে আসার সময়ে কোট আর বাকি কাপড়-চোপড় নিয়ে এসেছে সাথে। মেয়েটা গায়ে এখনো শার্ট, তার উপর রেস্টুরেন্টের ইউনিফর্ম জড়ানো। মিগ্যানের কাপড়ও নিয়ে এসেছে সে।

“থ্যাঙ্কস,” কোট গায়ে জড়াতে-জড়াতে বলল মেয়েটা।

রীতিমত কাঁপছে মিগ্যান। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, সত্ত্বি বলতে, কনকনে ঠাণ্ডা। কিন্তু এটাই কি কাঁপার কারণ? বুঝতে পারছে না স্যাম। একটা হাত মেয়েটার পিঠে রেখে তাকে স্বাভাবিক করতে চাইল সে, মেয়েটার ভালো লাগল এতে।

“তুমি উপরে ছিলে তখন?” জিজ্ঞেস করল স্যাম।

সায় দিল সে।

“একেবারে কানের কাছ থেকে প্লেনটা গেল, স্যাম।”

আবারো সায় দিল সে। কিন্তু যা গেছে, গেছে। “এদিকের কী খবর বল?”

অ্যাশবি তার দলবল নিয়ে এই হোটেলে চুকেছে।

“কিন্তু এখন যে কী করা উচিত, সেটাই বুঝতে পারছি না।”

“ভেবে বের কর, শারলক, ততক্ষণে আমি কাপড়টা বদলে নেই।” দুই বিল্ডিংরে মাঝে একটা সরু গলির দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা, তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন যেকোনো রকমের খারাপ কিছুর মুখোমুখি হতে প্রস্তুত সে।

তার এমন আত্মবিশ্বাস দেখে একটু হাসল স্যাম, নিজের জন্যেও এমন শক্তি খুঁজল মনে-মনে। স্টেফানি বা ম্যালনকে ফোন দিলে আরও ঝামেলা হতে পারে। তাকে বলা হয়েছিল কাউকে অনুসরণ করা যাবে না। কিন্তু সে করেছে, এটা এটাও সত্যি যে স্টেফানি নেলেই কল্পনাও করতে পারেনি আইফেল টাওয়ারে প্লেন হামলা হতে পারে। তাই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সে যেটা সবচেয়ে ভালো মনে করেছে, সেটাই করেছে, আর এখন পর্যন্ত সে কারো চোখেও পড়েনি।

অথবা পড়লেও পড়তে পারে, কে জানে।

থ্রিভান্ডসেন তাকে সভাকক্ষে দেখে ফেলেছে। কিন্তু তার কী দোষ? এই ডেনিশ ভদ্রলোক যে এখানে থাকবে সে কথা কেউ বলেনি তাকে।

তাই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল স্যাম

এমন একজনের কাছ থেকে পরামর্শ চাইবে সে, যে একসময় তার পরামর্শ চেয়েছিল।

▲

নটর ডেমের পেছনের একটা খোলা জায়গায় হেলিকপ্টার নামলে ম্যালন লাফ দিয়ে নিচের সবুজ ঘাসের উপর পড়লো। পাথার নিম্নমুখী বাতাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল তারা। ইউনিফর্ম পরা পুলিশের এক ক্যাপ্টেন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে।

“আপনার কথাই ঠিক,” স্টেফানিকে বলল পুলিশটা। “বাড়ির মালিক নিশ্চিত করেছে যে হলদে চোখের এক লোক পাঁচ তলায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছিল এক সপ্তাহ আগে। তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়েছিল সে।”

“বিল্ডিংটা ভালো করে দেখেছেন? নিরাপদ তো?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

“আমরা পুরো বিল্ডিংটাই ঘিরে রেখেছি। কাউকে কিছু জানতে দেইনি। আপনার কথামত সব করেছি।”

ম্যালন আবারো একটা অস্বস্তিকর নিয়ন্ত্রণ বা বাধা অনুভব করছে। যে নিয়ন্ত্রণের ফাঁদে পড়ে গেছে সে এবং স্টেফানি। যা হচ্ছে তার কোনোটাই সুবিধার না। কী সূচতুরভাবে লায়ন আবারো নিজেকে ইচ্ছে করেই সবার চোখের সামনে দিয়ে দেখিয়ে নিয়ে গেল। তার পথ গোপন করার চেষ্টা বিন্দুমাত্র করছে না সে।

ময়লা মাথা ফ্লাইট স্যুট আর পড়নে নেই তার। সেটা খুলে তার চামড়ার জ্যাকেট গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বেরেটা গুঁজে দিয়েছে পকেটে।

অপছন্দের হলেও লায়নের খেয়াল-খুশী মতোই চলতে হচ্ছে এখন।

সামনে এগিয়ে গেল সে।

“দেখি, এই সান-অফ-আ-বীচ এবার কী সাজিয়ে রেখেছে এখানে।”

ষাট

ফোর সিজন হোটেলের একটা রয়্যাল স্যুটে বসে আছে অ্যাশবি।

“মুরেইদের এখানে আনার ব্যবস্থা কর,” গিল্ডগলকে আদেশ দিল সে। “রাতের মধ্যেই আমি ওদেরকে ফ্রাসে দেখতে চাই।”

ক্যারলাইন একটু চিন্তিত চোখে দেখছে তাকে। মুখের জাঁল আর একটু ফোলা লাগছে অ্যাশবির। শীতের কারণে হতে পারে, ভাবল স্টেফন্স তার কষ্টটাও বেশ ক্লান্ত আর কেমন একটু বসে গেছে মনে হচ্ছে।

“কোনো সমস্যা হয়েছে, গ্রাহাম?” জিঞ্জেস করল মেয়েটি।

এই নারীকে একজন বন্ধুর মতোই ভাবতে চায় অ্যাশবি, তাই কিছু সত্যি তাকে বলে দিল সে। “ব্যবসা নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছে। ম্যাডাম লাঘক হয়ত এটা নিয়ে আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন, আমার অনেক বড় ক্ষতি করতে চাইছেন তিনি।”

“কী করেছ তুমি?” মাথা নেড়ে জিঞ্জেস করল মেয়েটি।

একটু হাসল সে। “অন্যের করায়ত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার একটু চেষ্টা করছিলাম।”

ক্যারলাইনের নিখুঁত পা দুটো আর কোমরের সুগঠিত বাঁকে নিজের দৃষ্টি আটকে গেল তার, বলা যায় আটকে যেতে দিল ইচ্ছা করেই। সবকিছু যেন ভুলে যাচ্ছে সে এতে, এক মুহূর্তের জন্যে হলেও।

“এর জন্য আমাকে দোষ দিতে পারবে না তুমি,” আরও বলল সে। “অনেক করেছি তার জন্য, এখন তার সাথে সবকিছু মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম আমি। সে একটা পাগল চরিত্রের মহিলা, কী আর বলব।”

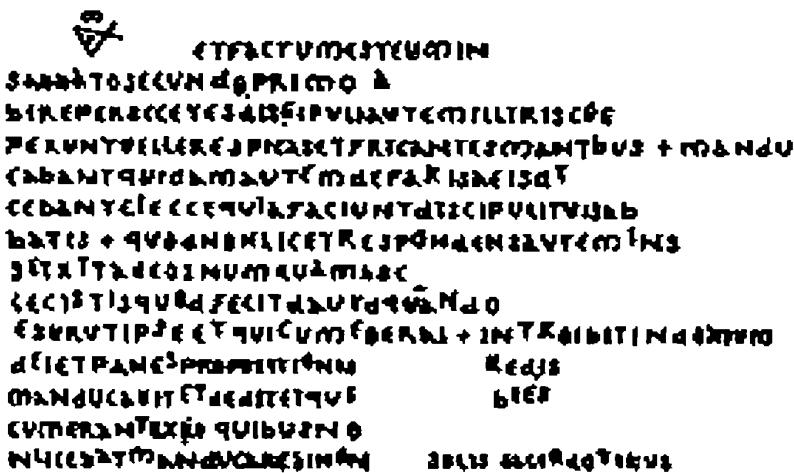
“তাই এখন মুরেইদের লাগবে আমাদের, তাই তো? এবং গিল্ডহলকেও?”

“হ্ম, তবে প্রয়োজনে আরও মানুষ লাগবে। চালবাজ মহিলাটা ভীষণ ক্ষেপে যাবে আমার ওপর।”

“তাহলে আর কী, তাকে ভালো-মন্দ কিছু দেওয়ার ব্যবস্থাই করতে হবে আমাদের। এবার নিজে একটু ঝুলে দেখুক, কেমন লাগে।”

ঠিক, ভাবল অ্যাশবি। এখন তার ভাবনাটা ক্যারলাইনের নতুন আবিষ্কারের দিকে আনাই যৌক্তিক।

দাঁড়িয়ে কাছের চেয়ারের উপর থেকে চামড়ার একটা ব্যাগ তুলে নিল মেয়েটা। সেটার ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল যেটায় মেরোভিনজিয়ান বই থেকে নেওয়া নেপোলিয়নের লেখা চৌদ্দ লাইনের একটা লেখা দেখা যাচ্ছে।



“এটা ঠিক কসিকায় যেমন একটা পেয়েছিলাম সেরকমই,” ব্ল্যারলাইন বলল। “উচু-উচু অক্ষরের লেখাটার সাথে মিল ছিল বাইবেলের ৩৫ মৰ্ম্মৰ শ্লোকের সাথে, ওটাও নেপোলিয়নের লেখা। যখন আমি প্রতিটা লাইনের মিচে সোজা রেখা টেনে নিয়ে দেখলাম, তখন আসল বিষয়টা স্পষ্ট হলো। দেখছু আপনাকে।”

একটা ঝুলার বের করে নিয়ে তাকে দেখান ওটা।

ରୁଳାରଟା ଲାଇନେର ନିଚେ ଧରତେଇ ଅଶ୍ଵବି ଦେଖିଲ କିଛୁ ଅକ୍ଷର ଅନ୍ୟଗୁଲୋର ତୁଳନାୟ ଏକଟ ଉପରେର ଦିକେ ଓଠିଲୋ ।

“এতে কী বোকা যাচ্ছে?”

তার হাতে আরও এক টুকরো কাগজ দিল ক্যারলাইন, ওখানে যে অক্ষরগুলো
একটু উপরের দিকে উঠিয়ে লেখা ছিল সেগুলো এক জায়গায়, এক সারিতে লেখা
হয়েছে।

ADOGOBERTROIETASIONESTCETRESORETI LESTLAMORT

“এখান থেকে কোনো শব্দ বানানো কঠিন কিছু না,” সে বলল। “শুধু একটু স্পেস দিতে হবে আপনাকে।”

আরও একটা কাগজ বের করল এটা বলার পর।

A DOGOBERT ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA MORT

ফরাসি ভাষা থেকে অনুবাদ করে নিল অ্যাশবি। “‘মহারাজা ড্যাগোবার্ট এবং সায়নের কাছে, সম্পদ বিরাট লুকিয়ে আছে। চুপচাপ পড়ে আছে মৃত রাজার কাছে।’” হতাশা প্রকাশ করে এমনভাবে কাঁধ জোড়া ঝাঁকাল সে। “এটার মানে কী?”

একটা দুষ্ট হাসি ছড়িয়ে পড়লো তার আকর্ষণীয় ঠোঁট-জোড়ায়।

“বিরাট কোনো কিছু।”

▲

বিল্ডিঙে ঢুকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছে ম্যালন, হাতে বেরেটা পিস্তল।

স্টেফানি তার পেছনেই।

প্যারিসের পুলিশ অপেক্ষা করছে বাইরে।

তাদের কেউই জানে না ভেতরে কী অপেক্ষা করছে, তাই যত্ক্ষম লোক নিয়ে কাজ করা যায়, ততই মঙ্গল। জনগণ নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজটা দ্রুত কঠিন হয়ে পড়ছে, আর সেটাই স্বাভাবিক কারণ একই দিনে প্যারিসের দুর্দশা জাতীয় স্থাপনায় প্লেন দিয়ে হামলা করা হলো। আবার সেগুলোকে আকাশের গুড়িয়ে দেওয়া হলো—এসব কিছুই ঘটল সাধারণ মানুষের চোখের সামনে। প্রতিক্রিয়া তো হবেই। তবে প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েলস জানিয়েছে যে ফ্রান্স সরকার মিডিয়াকে সামাল দেবে। তার কথা হলো, এখন সব চিন্তা বাদ দিয়ে লায়নকে খুঁজে নেওয়ার ক্ষেত্রে হবে, আর এটাই তার আদেশ।

পাঁচ তলায় পৌঁছে লায়নের ভাড়া নেওয়া অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পৌঁছাল তারা। বাড়ির মালিক তাদেরকে পাস-কী দিয়েছে ঢোকার জন্য।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখে নিল ম্যালন। স্টেফানি একপাশে সরে গেল বন্দুকটা হাতে নিয়ে। স্টেফানির বিপরীত পাশে নিজে একটু সরে গিয়ে দরজায় সজোরে ধাক্কা দিল ম্যালন। কেউ উত্তর দেবে এমন আশা তার নেই, তাই অপেক্ষা না করে চাবিটা ঢোকাল সে দরজায়। তারপর নবটা ঘুরিয়ে দরজাটা ভেতর দিকে ঠেলে খুলে দিল।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে দরজার ফাঁকা দিয়ে ভেতরে তাকাল সে।

অ্যাপার্টমেন্টটা বলতে গেলে খালি, শুধু একটা জিনিস চোখে পড়লো ভেতরে।

একটা ল্যাপটপ, রাখা আছে কাঠের মেবের উপর, ক্রিনটা খোলা দরজার দিকে মুখ করা, এবং সেখানে একটা কাউন্টারে সময়টা উল্টো পথে হাঁটছে।

2:00 minutes

1:59

1:58

▲

ম্যালনের ফোনে সাতবার কল দিয়েছে থ্রিভান্ডসেন, আর প্রতিবারই কলটা ডাইভার্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভয়েস মেইলে, আর প্রতিবারই তার ভেতরের ক্রোধ বেড়ে গেছে ভয়ঙ্কর গতিতে।

ম্যালনের সাথে তার কথা বলতেই হবে।

আর তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, গ্রাহাম অ্যাশবিকে খুঁজে বের করা। নিজের বেতনভুক্ত ইনভেস্টিগেটরদের সে আদেশ করেছিল অ্যাশবির পেছনে আর না লাগতে, কারণ অ্যাশবি ইংল্যান্ড ছেড়ে ফ্রাসে আসার পর সে মনে করেছিল তাকে আর চোখে-চোখে রাখার দরকার নেই, আইফেল টাওয়ারে তাকে হাতের নাঁগালেই পাওয়া যাবে। হয়েছেও তাই, কিন্তু সেটা দুপুর পর্যন্ত। ততক্ষণে তার অ্যদ্যাতারা ফ্রাস ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

কিন্তু অ্যাশবি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিকল্পনা এঁটে বৃষ্টিশীল আগে থেকেই।

রিটজ এর নিজের ঘরে একা বসে আছে থ্রিভান্ডসেন। কী করবে এখন সে? নিজেকে এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টের, বিশেষ করে সন্তান্য সব রকম ঝুঁকির কথা বিবেচনা করার পরও যদি এমন পরিস্থিতি আসে, তখন। প্যারিস ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর সবকিছু কিভাবে সামাল দেবে সেটা ভেবে রেখেছিল সে, কিন্তু ক্লাবের সবাইকে যে মেরে ফেলার ফন্দি করা হয়েছে এটা মাথায় আসেনি। আসলেই, তুখোড় খেলোয়াড় অ্যাশবি। এলিজা লাঘক বিপদে পড়েছে, ভীষণ রকমের বিপদ। এই নারীর সুন্দর পরিকল্পনাও ভেস্টে যেতে বসেছে। তবে এলিজা লাঘক এখন অন্তত বুরবে যে তার এই বিশ্বাসী ত্রিটিশ লর্ড অ্যাশবিকে নিয়ে প্রথম থেকেই সে সত্য বলে এসেছে। আর অ্যাশবি নিজেই এখন তার পেছনে দু'জন মানুষকে ডেকে এনেছে—থ্রিভান্ডসেন এবং এলিজা। আর দু'জনেই তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে চায়।

এটা ভাবতেই ম্যালনের কথা মনে এল আবারো, সাথে বইটা এবং মুর্যাদের কথাও।

প্রফেসরটা কিছু জানতেও পারে।

সেলফোনটা বেজে উঠল তার।

ক্রিনে কোনো নামারের পরিবর্তে *BLOCKED NUMBER* লেখা উঠেছে, তবু রিসিভ করল সে।

“হেনরিক,” স্যাম কলিপের গলা, “আপনার সাহায্য চাই।”

তার চারপাশের সবাই তার সাথে মিথ্যে বলছে কিনা তা যাচাই করা দরকার, ভাবল হেনরিক। “কী খবর তোমার? কোথায় কী করছ?”

ফোনের উপর প্রান্তে একটু নীরবতা নেমে এল। তারপর, উত্তর দিল স্যাম। “জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট আমাকে কাজে লাগিয়েছে।”

এটা শুনে সে স্বস্তি পেল যে এই তরুণ সত্যি কথাই বলেছে। তাই সে-ও সত্যি কথার বিনিময় করল। “আমি তোমাকে আইফেল টাওয়ারে দেখেছিলাম। মিটিং হলে।”

“আমিও ভাবছিলাম যে দেখে থাকবেন আমায়।”

“এখন তুমি কী করছ?”

“অ্যাশবিকে অনুসরণ করছি আমি।”

সব খবরের সেরা খবর শুনল সে। “স্টেফানি নেলেইর জন্য?”

“ঠিক সেটাও না। কিন্তু এটা না করেও উপায় ছিল না।”

“স্টেফানির সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে তোমার?”

“একটা ডিরেষ্ট নাম্বার দিয়েছে সে আমায়, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি নাকি করব, কল দেব কিনা। তাই আপনার সাথেই প্রথমে কথা বলে নেবো ভাবলাম।”

“তুমি এখন ঠিক কোথায় আছ, বল।”

ল্যাপটপের কাছে এগিয়ে গেল ম্যালন। স্টেফানি রাঙ্গি ঘর দুটো দেখেছে।

“কিছু নেই,” জোরে বলল সে।

হাঁটু ভর দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল ম্যালন, সময় কমেই চলেছে ক্রিনে। ল্যাপটপের একটা ইউএসবি পোর্টে একটা ডাটা কার্ড ঢোকানো, এটা দিয়েই ওয়্যারলেস কানেকশন পাচ্ছে ল্যাপটপে। ক্রিনের ডান পাশের উপরের অংশে ব্যাটারি ইনডিকেটরে দেখাচ্ছে 80 percent চার্জ আছে। তার মানে এটা খুব বেশী সময় আগে রাখা হয়নি এখানে।

41 seconds

“আমাদের যাওয়া উচিত না, ম্যালন?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

“লায়ন জানত যে আমরা আসব। ঠিক ইনভ্যালিদেসের মতো। যদি আমাদের সে মারতেই চাইত, তাহলে অনেক সহজ উপায়ই আছে তার হাতে।”

28 seconds

“তুমি ভালো করেই জানো পিটার লায়ন একটা বাস্টার্ড, নীতি বলে কিছু নেই ওর ভেতর।”

19 seconds

“হেনরিক সাতবার ফোন দিয়েছে আমায়,” সে বলল স্টেফানিকে। দু'জনেই তাকিয়ে আছে স্ক্রিনের দিকে।

“তার সাথেও কাজ আছে কিছু,” উত্তর দিল স্টেফানি।

“আমি জানি।”

12 seconds

“এখানে কোনো বোমা নেই—এরকম ভাবনায় ভুলও হতে পারে তোমার,”
বিড়বিড় করে বলল তার বস।

9 seconds

“ভুল আমি আগেও করেছি।”

6 seconds

“কোট অফ অনারে তো এই কথা বলনি।”

একটা ৫ ভোসে উঠল, তারপর 4, 3, 2, 1

একষষ্ঠি

ক্যারলাইনের ব্যাখ্যার অপেক্ষায় আছে অ্যাশবি। মেয়েটা খুবই উপভোগ করছে বিষয়টা।

“কিংবদন্তী যদি বিশ্বাস করতেই হয়,” বলল সে। “তাহলে বলতে হয়, শুধুমাত্র নেপোলিয়নই জানত সম্পদ কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে। সবুজ এই কথাটা বলার মতো কাউকে বিশ্বাস সে করেনি, অন্তত আমাদের জানামতে কাউকে না। কিন্তু যখন সে বুঝল যে সেন্ট হেলেনায় তার মৃত্যু আসল্ল, সে তখন সেই সম্পদের কথা তার ছেলেকে জানিয়ে যেতে চেয়েছিল এরকম চিঠির মাধ্যমে।”

চৌদ্দ লাইনের লেখাটার দিকে দেখাল ক্যারলাইন। “‘To King Dagobert and to Sion belongs the treasure and he is there dead’ এটার অর্থ একেবারেই সহজ।”

সহজ হতে পারে তার মতো ইতিহাসের উপর একাধিক ডিহীধারীর কাছে, কিন্তু অ্যাশবির কাছে না।

“ডেগোবার্ট একজন মেরোভিনজিয়ান শাসক ছিল, সময়টা ৭ম শতকের প্রথম দিকে। ফ্রাঙ্কসদের একীভূত সে-ই করেছিল, আর প্যারিস ছিল তার রাজধানী। দেশের জনগণের উপর তার বিশাল প্রভাব ছিল, তার পরে আর কোনো মেরোভিনজিয়ান এতটা ক্ষমতার অধিকারি হতে পারেনি। এর পরে যে রাজারা এসেছে তারা তাদের প্রতিপত্তি, প্রভাব ধরে রাখতে পারেনি, কারণ প্রায় সবাই একের পর এক ক্ষমতায় বসেছে বাল্য বয়সে, আর পুরুষ উত্তরাধিকারী জন্ম দেওয়া পর্যন্তই তারা বেঁচে ছিল। এভাবেই চলেছে। সত্যিকারের ক্ষমতা তখন চলে যায় সম্ভান্ত পরিবারগুলোর হাতে।”

তার মাথার ভেতর পিটার লায়ন এবং এলিজা লাঘকের কথা ঘুরছে শুধু। ভুলতে পারছে না নিজের ভয়াবহ পরিকল্পনার কথাও। এখন কাজ করার সময়, বসে

বসে কথা শোনার সময় না! কিন্তু নিজেকে শান্ত থাকার আদেশ দিল সে। কারণ এই বঙ্গ কখনো তাকে হতাশ করেনি।

“ডেগোবাট একটা প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল সেইন্ট-ডেনিসে, প্যারিসের উত্তরে ওটা। প্রথম রাজা হিসেবে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল সেখানে।” একটা ছোট বিরতি। “আর সে এখনো সেখানেই আছে।”

এই ক্যাথেড্রাল নিয়ে অ্যাশবি যতটা জানে, মনে করার চেষ্টা করল। ভবনটা স্থাপন করা হয়েছিল সেইন্ট-ডেনিস নামের একজন স্থানীয় বিশপের সমাধির উপর, রোমানরা তাকে হত্যা করেছিল তৃতীয় শতকে, এরপর থেকে প্যারিসের জনগণ তাকে আরও বেশী পরিমাণে শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। নির্মাণশৈলী ও নকশায় একটা ব্যতিক্রমী স্থাপনা এটা, এবং পৃথিবীর বুকে গথিক স্থাপত্যের মাঝে এটাকেই প্রথম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার মনে পড়লো একবার তার এক পরিচিত ফরাসি গর্ব করে বলছিল যে এখানে বিশ্বের সবচে জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় সমাধিস্থন দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে অ্যাশবিরও এখন এই রাজকীয় সমাধিসৌধকে সমীহের চোখেই দেখা উচিত।

“তবে নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারে না যে ড্যাগোবাট এখনেও আদৌ সমাহিত কিনা,” আরও খোলাসা করে বলল ক্যারলাইন। “বিল্ডিংট প্রথমে নির্মাণ করা হয়েছিল ৫ম শতাব্দীতে। ড্যাগোবাটের শাসনামল ৭ম শতকের মাঝামাঝি। প্রচুর অর্থ সে দিয়েছে এই প্রাসাদের উন্নয়নের জন্য। এবং এই কারণেই ৯ম শতকে তাকে এটার স্থপতি আখ্যা দেওয়া হয়। এবং ১৩ শতকে গির্জার পুরোহিতেরা তার সম্মানে নির্দিষ্ট একটা কক্ষ উৎসর্গ করে।”

“বুঝলাম, কিন্তু ড্যাগোবাট কী ওখানে স্থানেকি নেই?”

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। “তাতে কী আসে যায়? এই কক্ষটাই ড্যাগোবাটের সমাধি হিসেবে এখনো বিবেচনা করা হয়। আর সে ওখানেই আছে বিশ্বাস করা হয় এবং অবশ্যই মৃত।”

তার কথার গভীরতা ধরতে পারল সে। “তার মানে নেপোলিয়নও এটাই বিশ্বাস করত?”

“এটা ছাড়া তার অন্য কিছু ভাবার অবকাশ দেখি না আমি।”

▲

কাউন্টডাউন শেষ হবার পরও ল্যাপটপের দিকে চেয়ে আছে ম্যালন। সেখানে একটা শব্দ ভেসে উঠেছে এখন, অক্ষরগুলো সব বড় হাতের, আর শেষে তিনটা বিশ্ময়বোধক চিহ্ন।

BOOM!!!

“মজার ব্যাপার তো,” বলল স্টেফানি।

“বোমা ছাড়া আর কিছু বোঝে না লায়ন।”

স্কিনটা বদলে গিয়ে সেখানে নতুন একটা বার্তা ভেসে উঠল।

এসব পরিস্থিতিতে আমেরিকানরা যেন কী বলে?

ও, হ্যাঁ-ইশ্, দেরী হয়ে গেল। একটুর জন্য ধরতে পারলাম না।

পরেরবার আর ভুল হবে না!

“এবার কিন্তু মেজাজটা আসলেই খারাপ হচ্ছে,” বলল ম্যালন, কিন্তু রাগের সাথে আরও বেশী হতাশা দেখতে পাচ্ছে স্টেফানির চোখে, এবং এটাও সে জানে তার বস এখন কী ভাবছে।

প্যারিস ক্লাব ফসকে গেল। লায়নও ফসকে গেল। কিছু নেই।

“যা-ই হোক, বিষয়টা খুব বেশী খারাপ হয়নি।” বলল ম্যালন।

স্টেফানি তাকাল ম্যালনের দিকে, তার চোখদুটো পিটিপিট করছে এখন। “তোমার মাথায় কিছু এসেছে, তাই না?”

সায় দিল মাথা নেড়ে। “লায়নকে না হলেও তার ছায়াকে ধরার একটা পথ দেখতে পাচ্ছি।”

▲

ড্যাগোবাটের সমাধিস্থলের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাশবি ক্যারলাইন অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে দিয়েছে ওটা। গোথিক নকশায় ভূমির আছে পুরো স্থাপনাটা।

“এই নকশার ভেতরে কাহিনী আছে,” ক্যারলাইন বলল। “এটা জন দ্য হারমিট এর সেই বিখ্যাত স্বপ্নের গল্পটা ফুটিয়ে তুলেছে। দেখলেই বুঝতে পারবেন। সেইন্ট হারমিট একবার স্বপ্ন দেখল যে ড্যাগোবাটের আত্মাকে শয়তানের দল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, এখন নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কবল থেকে সেই আত্মাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে সেইন্ট-ডেনিস, মরিস এবং মারচিন। এদিকে দেখুন, সম্পূর্ণ স্বপ্নটাই নকশায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।”

“আর এগুলো সেইন্ট-ডেনিসের সেই প্রাসাদের ভেতরে আছে?”

নড় করল সে। “প্রধান বেদীর কাছেই। কোনো একভাবে এটা ফরাসি বিপ্লবের আগ্রাসন থেকে বেঁচে যায়। ১৮০০ শতকের আগ পর্যন্ত, ফ্রাসের প্রায় প্রতিটা রাজাকেই এখানে সহামিত করা হত। আর সেগুলোর উপর তামার প্রলেপ দেওয়া হত, কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের সময়ে সেই ধাতব সমাধিগুলো গলিয়ে সমান করে দেওয়া হয়। বাকিগুলো ভেঙ্গেচূড়ে সূপাকারে বিল্ডিঙের পেছনের বাগানে রেখে দেওয়া হয়। বারবন রাজাদের অবশিষ্ট অংশগুলো কাছের একটা কবরস্থানে গর্ত করে ফেলে দেয় ওরা।”

এরকম বন্য প্রতিশোধের কথা শুনে এলিজা লাঘকের কথা মনে পড়ে গেল অ্যাশবির। “ফরাসিরা তাহলে ভালোই ক্ষেপেছিল।”

“নেপোলিয়ন এরকম হানাহানি বন্ধ করে দেয়, এবং চার্টাকে আবারো ঠিকঠাক করে,” মেয়েটা বলল। “এবং সে এটাকে পুনরায় রাজকীয় ব্যক্তিদের কবরস্থানে রূপান্তর করে।”

শেষ বাক্যটার তাৎপর্যটা ধরতে পারল অ্যাশবি। “তার মানে, নেপোলিয়ন এই সমাধিক্ষেত্রে সবকিছু ভালো করে জানত?”

“এই স্থানের সাথে মেরোভিনজিয়ানদের একটা সম্পর্কের কথা সে জানত, আর এটাই তাকে আকৃষ্ট করেছিল। কিছু মেরোভিনজিয়ান এখানে কবরও দেওয়া আছে, তাদের ভেতর, তার বিশ্বাস, ড্যাগোবার্টও আছে।”

স্যুটের দরজাটা খুলে গেল, গিন্ডহল এসেছে। মাথাটা একটু নেড়ে ছোট্ট সংকেত দিয়ে সে অ্যাশবিকে বুঝিয়ে দিল যে মুরেইরা ফ্রান্সের পথে রওয়ানা দিয়েছে। চারপাশে বিশ্বস্ত লোকজন থাকলে ভালো লাগে তার। এখন এলিজা লাঘকের সাথে কিছু বোঝাপড়া করতে হবে তাকে। তার কাঁধের উপর থেকে বারবার পেছনে ফিরে দেখার অবসান করা দরকার, বিশেষ করে আজকের পর থেকে এই দৌড় শুরু হবার আগেই এলিজাকে থামাতে হবে। কিন্তু কিভাবে? তার সাথে মধ্যস্ততা করা যেতে পারে, কারণ এরকম মানসিকতা আছে~~যেটো~~ নারীর। কিন্তু অ্যাশবি তাকে প্রাণে মারতে চেয়েছিল, এই তথ্যটা সেজেনে গেছে এতক্ষণে। কিছু যায় আসে না। এটা নিয়ে তার সাথে পরে বুকুর্সে সে। কিন্তু এই মুহূর্তে...

“ঠিক আছে, সবই বুঝলাম ডার্লিং। এখন বল, স্টেইন-ডেনিসে যদি আমরা গিয়ে হাজির হই, তাহলে ঠিক কী ঘটার আশা করতে পারি?”

“ওখানে আমরা পৌছানোর পর যদি উত্তরাঞ্চল দেই, তাহলে কেমন হয়?”

“উত্তরটা কি তোমার কাছেই আছে?”

“আমার মনে হয়, আছে।”

।

ক্যাব থেকে বের হয়ে রাস্তার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা স্যামকে দেখতে পেল থ্রিভান্ডসেন। একটা মেয়েও দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। খালি হাত দুটো কোটের পকেটে চুকিয়ে রাস্তাটা পার হলো সে। গাছের শাখার মতো আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলো একেবারে ফাঁকা। ক্রিসমাসের জন্য দোকানপাট বন্ধ।

খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে স্যামকে। পাশের মেয়েটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সে সবার আগে।

“তোমাদের দু’জনকেই মনে হচ্ছে বিরাট ঝামেলার ভেতর আছ,” বলল থ্রিভান্ডসেন।

“এতে নামা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমাদের,” উত্তর দিল মিগ্যান মরিসন।

“অ্যাশবি কি এখনো ভেতরে?” হোটেলের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা নাড়ল স্যাম। “যতক্ষণ না সে আরেক দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার পরিকল্পনা করছে।”

ফোর সিজনের দিকে তাকাল সে, আর ভাবল, না জানি এই ধড়িবাজ এখন কী ফন্দিফিকির করছে।

“হেনরিক, আমি টাওয়ারের উপরে ছিলাম,” স্যাম বলল। “অ্যাশবি নেমে আসার পর আমিও নেমে আসি। ঐ প্লেনটা-ক্লাবকে শেষ করার জন্যই আসছিল, তাই না?”

নড করল সে। “হাঙ্গেড পারসেন্ট। তা, তুমি ওখানে কী করছিলে?”

“আমি আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম, কিছু হলো কিনা আপনার।”

এই কথাগুলো শুনে সাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল তার। যদি আজ সে বেঁচে থাকত, তাহলে স্যামের বয়স ওর কাছাকাছি হত। এই আমেরিকান ছেলেটা অনেকভাবেই তার ছেলের কথা মনে আনিয়ে দেয়, নিজের অজান্তেই। আর হয়ত এই কারণেই, ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করে সে তার প্রতি। মাত্র দু'জনের আগেও এরকম অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, আর ভালবাসার কোনো স্থানই ছিল না তার জীবনে।

কিন্তু এখন সেগুলো গ্রাস করে নিয়েছে তাকে।

এত তিক্তায় ভরা সময়ের মাঝেও ক্ষীণ আশার মাঝেও অনেক বড় মনে হয়, যেটা তাকে বলতে থাকে বুঝে-শুনে পা ফেলার কথা। তাই সে স্যামের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, “দুর্ঘটনাটা কটন থামিয়েছে। প্লেনটা সে-ই চালাচ্ছিল।”

অবিশ্বাসে ভরা দৃষ্টি পড়লো হেনরিকের উপরে।

“তুমি ধীরে সবই জানতে পারবে যে স্টেফানি আর কটন দুজনেই খুব করিতকর্মা মানুষ, অনেক কিছুই করতে পারে তারা। সৌভাগ্যবশত, সবকিছু তারাই দেখভাল করছে এখন।” একটু বিরতি নিল সে। “তুমিও যেমনটা করলে খুব সাহসের একটা কাজ করেছ তুমি। আমার খুব ভালো লেগেছে।” মূল আলোচনায় ফিরে এল সে। “তুমি বললে যে স্টেফানির সাথে যোগাযোগের পথ আছে তোমার কাছে, তাই না?”

সায় দিল স্যাম।

“আপনি চেনেন তাকে?” জিজ্ঞেস করল মিগ্যান।

“আমি আর সে মিলে অনেক কাজ করেছি এক সময়ে। আমাদের বেশ ভালো জানাশোনা আছে।”

মেয়েটা এতে খুশী হতে পারল না, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। “একটা বজ্জাত মহিলা।”

“হলেও হতে পারে।”

“তাকে কল দেওয়ার ইচ্ছা হয়নি আমার,” স্যাম বলল।

“এরকম করা উচিত হবে না তোমার। এখন হোক, বা একটু পরে হোক, অ্যাশবিকে সে খুঁজে বের করবেই। এখন এটা দীর্ঘায়িত কেন করবে তুমি? ফোনটা বের করে তাকে কল দাও, তারপর এক সাথেই কথা বলব তার সাথে।”

বাষ্পি

লা স্যালে গুস্তাভ আইফেল টাওয়ার থেকে একে-একে ক্লাবের সবাইকে বিদায় জানাল এলিজা। নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হয়েছে সে মিটিঙের সময়টুকুতে। এবং অন্যান্যদের মাঝে বয়ে যাওয়া দুশ্চিন্তার ছায়াকেও দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছে। থ্রিভাল্ডসেনের দিয়ে যাওয়া ভয়ের বাণীগুলো মনে হচ্ছে সবাই ভুলে গিয়েছে, বা অন্তত সেগুলো হজম করে নিয়েছে বৈঠক শেষ হবার আগেই।

তবে তার নিজের ভেতরে যে শঙ্কা জমেছে, সেটার কথা ভিন্ন।

তাই দুই ঘণ্টা আগে, বিরতির সময়ে, এক জায়গায় ফোন দিয়েছিল সে।

যে লোকটাকে এলিজার দরকার, সে এলিজার ফোন পেয়ে খুব খুশী হয়েছে। লোকটার নীরস কষ্টে আবেগের কোনো ছায়াই নেই, শুধু একটু নিশ্চয়তা আছে যে সে এলিজার সাথে কাজ করতে রাজি, ও প্রস্তুত। এই মানুষটার সাথে কষ্টেক বছর আগে তার পরিচয় হয়েছিল এক লোকের কাছে বেশ কিছু টাকা আটকেছিল এলিজার, সেটা ফেরত আনতে পারছিল না সে। তখন এটা আদায় করার জন্য একটু ভিন্ন পথে সাহায্য পাওয়ার জন্য এই লোকের সাথে যোগাযোগ করে সে। পরে তার সাথে ভালো মতো কথা বলে বুঝতে পারে তার সক্ষমতার কথা, এবং সর্বশেষে তার সাথে সরাসরি দেখা করে তার ইচ্ছাটা প্রকাশ করে। ঠিক চারদিন প্রেক্ষটাকা ধার নেওয়া লোকটা সুদে-আসলে কয়েক মিলিয়ন ইউরো পরিশোধ করে দেয় এলিজাকে। কিভাবে কাজটা করেছে সে এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি কখনো, টাকাটা ফেরত এসেছে এতেই খুশী। এর পর আরও তিনবার “বিশেষ পরিস্থিতি” তৈরি হয়েছিল, আর প্রতিবারই এই মানুষটার শরণাপন্ন হয়েছে সে, এবং প্রতিটা কাজই একেবারে মনের মতো করেই সম্পন্ন হয়েছে।

আর আজকেও একইরকম প্রত্যাশা নিয়েই কথা শেষ করেছে এলিজা লাঘক।

লোকটা থাকে মন্টমাঘতেঘে, খুব উঁচু পাহাড় এটা, আর এই নামেই আশপাশের অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে। প্যারিসের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু উঁচু ভবন, শীর্ষের গম্বুজের ছায়ায় ঢেকে থাকে অঞ্চলটা। এক সময়ে এটা ত্তীয় নেপোলিয়নের রাজ্য ছিল, এখন সেখানে খুব নামী-দামী দোকান, ক্যাফে আর বহুতল ভবন গড়ে উঠেছে।

সিঁড়ি ধরে চার তলায় উঠে একটা দরজায় হালকা করে টোকা দিল সে। দরজায় ৫ লেখা। ছোটখাট গড়ন ও ছিপছিপে দেহের একজন মানুষ দরজাটা খুলে দিল। মাথার ধূসর রঙের চুলগুলো খুবই পাতলা বাঁকা নাক এবং চোয়ালের কাঁটা দাগ দেখে

চিল বা বাজপাখির কথা মনে আসে এলিজার। তবে এটাই যেন মানানসই পাওলো অ্যাম্হেসি নামের এই মানুষটার সাথে।

ভেতরে আসতে আমন্ত্রণ জানানো হলো এলিজাকে।

“কী করতে পারি আপনার জন্য আজ?” খুব শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অ্যাম্হেসি।

“সব সময় সরাসরি কাজের কথায় চলে আসেন আপনি, তাই না?”

“আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি। আপনার সময় খুব মূল্যবান। তাই আমার ধারণা এই ক্রিসমাসের দিনে আপনি সাদামাটা কোনো কারণ বা সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসেননি।”

না বলা কথাটা ধরতে পারল এলিজা। “আর আপনার চাহিদামত ফি-টাও সাদামাটা কারণে দেওয়া হয়নি, তাইতো?”

অন্ন একটু মাথা নেড়ে সায় দিল লোকটা। তার দেহের তুলনায় মাথাটা একটু ছোট মনে হয় এলিজার কাছে।

“এবারেরটা একটু বিশেষ ধরণের,” সে বলল। “খুব দ্রুতই সেরে ফেলতে হবে এটা।”

“দ্রুত শব্দটাকে বুঝিয়ে বলুন।”

“আজকের ভেতর।”

“সঠিক প্রস্তুতির জন্য সব রকমের তথ্য আপনার কাছে আছে অশ্বে করি।”

“দরকার হবে না বেশী কিছুর, আমি সরাসরি আপনাকে টাষ্টে নিয়ে যাব।”

অ্যাম্হেসির গায়ে কালো রঙের পোলোনেক সোয়েটার, পুরু ও চওড়া কলারটা তার গলার চারপাশটা ঢেকে রেখেছে উপরে কালো খুসর সুতোয় বোনা কোট। কড়ের মোটা ফুলপ্যান্টের গাঢ় রঙটা শরীরের ফলকাশে রঙের উপর দারুণ ফুটে উঠেছে। লোকটার কথা ভেবে অবাক হয় এলিজা। কিসের জোরে চলে এই মানুষটা? এত কঠোরই বা হয়েছে কিভাবে? তবে এন্ডলো জিজ্ঞেস না করলেও বুঝতে পারে সবকিছুর পেছনে লম্বা কাহিনী আছে।

“কিভাবে কাজটা করব তা নিয়ে আপনার ব্যক্তিগত কোনো পরামর্শ বা পছন্দ আছে?”

“শুধুমাত্র যন্ত্রণাদায়ক এবং ধীর গতির করলেই হবে।”

তার চোখ কঠোর হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। “বেস্টমানিটা বোধহয় একেবারেই আশা করছিলেন না?”

মনের গভীরে উঁকি দিয়ে সত্যি কথাটা বুঝতে পারায় খুশী হলো এলিজা। “এভাবে বললেও কম হয়ে যায়।”

“আর এ সেজন্যই পরিত্পত্তি দরকার?”

“ঠিক ধরেছেন।”

“তাহলে আর কী! নিশ্চিত থাকুন, কৃতকর্মের জন্য সে অবশ্যই অনুতপ্ত হবে।”

সেলফোনের ডায়াল বাটনে চাপ দিল স্যাম। রিং হচ্ছে ওপাশে, তবে সেটা দীর্ঘ হলো না।

“কী অবস্থা, স্যাম?” প্রথমেই প্রশ্ন স্টেফানির।

“অ্যাশবির খোঁজ পেয়েছি আমি।”

এরপর আইফেল টাওয়ার ত্যাগ করার পর্য থেকে যা হয়েছে বর্ণনা করল তাকে।

“তার পিছু-পিছু যাওয়ার কথা ছিল না তোমার,” আবারো পরিষ্কার বলে দিল স্টেফানি।

“আর একটা প্লেনেরও উড়ে আসার কথা ছিল না আমাদের দিকে।”

“হ্ম, তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়, হয়ত ঠিক কাজটাই করেছ। এখন যেখানে আছ সেখানেই—”

ফোনটা নিজের হাতে নিয়ে স্যামকে রেহাই দিল হেনরিক। স্যামের এই বক্স স্টেফানি নেলেইর সাথে কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, আর এর কারণটাও জানতে হবে তাকে, তাই ফোনটা দিয়ে একটু পেছনে সরে এসে শুনতে পাইল তাদের কথা।

“সব কাজে আমেরিকান সরকার খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছে এটুজনে খুব ভালো লাগছে,”
প্রভাসেন বলল।

“আর তোমার সাথে কথা বলেও ভালো লাগছে হেনরিক,” উত্তর দিল স্টেফানি,
গলার স্বরটাই বলে দিচ্ছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সে

“আমার কাজে তুমি হস্তক্ষেপ করেছ,” হেনরিকের দ্বিতীয় কথা।

“অন্যভাবে দেখলে, হস্তক্ষেপ তুমি আমাদের কাজে করেছ।”

“সেটা কিভাবে সম্ভব? এই কাজের সাথে আমেরিকার কোনো মাথাব্যথা থাকতে পারে না।”

“এত নিশ্চিত হও কী করে? তুমি-ই একমাত্র লোক না যে অ্যাশবির বিষয়ে আগ্রহী।”

মনে হলো, পেটটা যেন খালি হয়ে গেল। “সে তোমার কাছে মূল্যবান কিছু, তাইতো?”

“তুমি তো জানোই, আমি হ্যাঁ বা না কোনোটাই বলতে পারব না।”

তার কোনোটাই বলতে হবে না, প্রয়োজন নেই হেনরিকের জানার। আইফেল টাওয়ারের ঘটনাই বলে দিচ্ছে সবকিছু। “এখানে কে কোন উদ্দেশ্যে কাজ করছে তা বোঝাটা কঠিন কিছু না।”

“হতে পারে,” মন থেকেই বোঝাতে চাইছে স্টেফানি। “তবে শুধু এটুকুই বলব, এখানে আরও অনেক কিছুই এখন ঝুঁকির ভেতর আছে, যেগুলো তোমার ব্যক্তিগত প্রতিশোধের থেকেও অনেক-অনেক গুরুত্বপূর্ণ।”

“হতে পারে, তবে সেগুলো আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না।”

“যদি বলতাম যে হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি, তাহলে কি ভালো হত? যদি আমার স্থানে তুমি আর তোমার স্থানে আমি হতাম, এই একই কাজটাই কি করতাম?”

“তারপরও তুমি বাধা হয়েই দাঁড়াচ্ছ।”

“তোমার জীবন কে বাঁচাল? এটাও বাধা হয়ে দাঁড়ানো?”

“তুমি অ্যাশবিকে বইটা কেন দিলে?”

“বইটা দিয়ে খুব ভালো করেছি। ওটা পেয়েই ওর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে। তোমার ভাগ্যটা ভালো যে ওটা ওর হাতে এখন। না হলে এতক্ষণে বেঁচে থাকতে কিনা সন্দেহ।”

কৃতজ্ঞতা জানানোর মেজাজ এখন নেই। “কটনও আমার সাথে বেঙ্গলিনি করল। এটা নিয়ে এখন দেন-দরবার করার সময় আমার নেই, তবু বলে রাখলাম, আমি এরও বিহিত করে ছাড়ব।”

“কটন বুদ্ধি খরচ করে চলে। তোমারও তাই করা উচিত, হেনরিক।

“আমার ছেলেটা ঘরে গেছে, জানো?”

“আমায় সেটা মনে করিয়ে দিতে হবে?”

“মনে হচ্ছে স্টেই করা দরকার।” একটা বিরতি পিলু হেনরিক, বুক ভরে দম নিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিল। “আমি আবারো বলি। এটা আমার বিষয়, তোমার না, কটনেরও না, এবং ইউএস সরকারেরও না।”

“হেনরিক, কী বলছি মন দিয়ে শোন। বিষয়টা কিন্তু তোমার নিজের দিকে টেনে নিও না শুধু। একটা বড় সন্ত্রাসী এই ঘটনার সাথে যুক্ত। তার নাম পিটার লায়ন। প্রায় এক দশক ধরে ওকে ধরার চেষ্টা করছি আমরা। আর এখন সে আমাদের ধরা-ছেঁয়ার ভেতরেই আছে। আমাদেরকে তাই আমাদের কাজটা শেষ করতে দাও। কিন্তু এটা করতে অ্যাশবিকে দরকার আমাদের।”

“আর যখন সব শেষ হবে? আমার ছেলের খুনির কী হবে?”

ফোনের অপর প্রান্তিয় নীরবতা নেমে এল। যে নীরবতা তাকে তার জানা কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিল আবারো। “আমিও এটাই ভেবেছিলাম। গুডবাই, স্টেফানি।”

“তুমি তাহলে এখন কী করবে?”

ফোনের সুইচটা অফ করে সে স্যামের হাতে দিল। এই তরুণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মিগ্যানের পাশে। দু’জনেই খুব চিন্তিত চোখে তাকিয়ে আছে হেনরিকের দিকে।

“তুমিও কি আমার সাথে বেঙ্গলিনি করবে?” স্যামকে জিজ্ঞেস করল সে।

“না।”

উত্তরটা খুব দ্রুতই এল। সম্ভবত অতি দ্রুত। কিন্তু স্যামের ভেতরের সন্ত্বাটা যেন মুখিয়ে আছে এটা প্রমাণ করার জন্য যে সে বিশ্বাস ভাঙবে না।

“ওদিকে দেখ, কী হচ্ছে,” মিগ্যান বলে উঠল।

ঘুরে গিয়ে হোটেলের দিকে তাকাল সে।

অ্যাশবিকে দেখা গেল, ডোরম্যানকে কী যেন বলে একটা ক্যাবের দিকে এগিয়ে গেল। থ্রান্ডসেন ঘুরে গিয়ে অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়াল। তাকে দেখলে চিনতে দেরী হবে না অ্যাশবির।

“সে একটা গাড়িতে উঠেছে,” বলল স্যাম।

“আমাদের জন্যেও একটা নাও।”

তেষ্টি

প্রমোদতরী পন্টদেল আলমার ডেকে পা রাখল অ্যাশবি। পূর্বের উঁচু টাওয়ারগুলোয় ক্যারিয়ন ফণ্টা বেজে উঠে জানিয়ে দিল ঢটা বাজার কথা। এর আগে সে কোনো জলঘানে করে সেইনে নদী ভ্রমণ করেনি। কিন্তু জানে, এখানের নৌকা~~মুদ্রণ~~টা বেশ জনপ্রিয়। আজকে মাত্র কুড়ি জনের মতো যাত্রী ঘুরতে বেড়িয়েছে আলমার চড়ে, সবাই প্লেক্সিগ্লাসে ঘেরা একটা কেবিনে বসে আছে, নৌকার বাকি অঙ্কুরেও বেশী অংশ খালি এখনো। দেখা করার জন্য এরকম সন্তামানের, জলঘেরা জীবিত কেন বেছে নিল লায়ন সেটাই ভাবছে অ্যাশবি। কলটা এসেছিল এক ফাঁস্টামাগে। কর্কশ কঢ়ে তাকে জানান হলো কোথায় কখন আসতে হবে। আসার সময় আরলাইনকে সে বলে এসেছে তার কাজ চালিয়ে যেতে, এবং অন্ন কিছুক্ষণের মেঝে কেউ সে ফিরছে। লায়নের সাথে দেখা করতে চায়নি সে প্রথমে, কিন্তু দেখা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভাবল সে। আর তাছাড়া, ব্যর্থ হয়েছে লায়ন, সে না। এবং তাকে ইতিমধ্যে যে টাকাটা পরিশোধ করা হয়েছে সেটাও মাথায় রাখার বিষয়, এবং বাকি যে টাকা দেওয়া হয়নি সেটাও।

দশ মিনিট হলো অপেক্ষা করছে অ্যাশবি, চারপাশের সবাই ভ্রমণটা উপভোগে ব্যস্ত, অনেকে ছবিও তুলছে। লায়নকে আন্তে-ধীরে খুঁজতে শুরু করল সে। ভদ্রলোক এবার কোন বেশে হাজির হয় কেউ জানে না। একরকমের খেলাই মনে হয় তার কাছে এটা।

একজনের কাঁধের উপর দিয়ে দীর্ঘকায় এক লোকের দিকে দৃষ্টি থামল তার দেখতে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক শহরে জীবনযাপন করে, চুলগুলো সোনালী রঙের বয়স ষাটের মাঝামাঝি, ঘন-কালো গোঁফ-দাঁড়িতে টেকে আছে তার মুখটা। অন্যান্য দিনের থেকে বেশ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে আজকের বেশভূষায়। তবে হলদে চোখ দুটো ওরকমই আছে গায়ে পশমি কোট জড়ানো, কড়ের মোটা প্যান্ট, সবমিলিয়ে একজন পুরুদন্তুর ইউরোপিয়ান।

অ্যাশবি বের হয়ে এল প্রেক্সিগ্লাসে ঘেরা কেবিন থেকে, পেছনে গাইড বাকি সবার মনোযোগ ধরে রাখছে তার বর্ণনা দিয়ে।

“আজকে কী নামে ডাকব আপনাকে?” জিজ্ঞেস করল অ্যাশবি।

“নেপোলিয়ন হলে কেমন হয়?” কণ্ঠটা আজ খসখসে, গভীর, এবং আরও বেশী আমেরিকানদের মতো।

নৌকাটা নিরবে রাইট ব্যাকে দাঁড়িয়ে থাকা গ্র্যান্ড প্যালাইসকে অতিক্রম করল।

“তো, এবার কি আমি জিজ্ঞেস করতে পারি যে কী হয়েছিল?”

“না, পারেন না।” মুখের উপর বলে দিল লায়ন।

এমন বাজে আচরণ হজম করতে পারে না সে এখন। “আপনি পুরোপুরি ব্যর্থ, শুধু তাই না, আমাকেও ফাঁসিয়ে দিয়েছেন। আমেরিকানরা এখন ভীষণ চাপ সৃষ্টি করছে আমার উপর। আপনার কোনো ধারণা আছে যে আপনি কি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন?”

“আমেরিকানরাই কাজে হস্তক্ষেপ করেছে।”

“এতে কি আপনি অবাক হয়েছেন? আপনি ভালো করেই জানেন যে ওরা এতে আগে থেকেই জড়িত আছে। আর শুধু তাদের সম্প্রতির জন্যেই আপনার ফি তিনগুণ করতে হয়েছে আমাকে, তো আপনাকে এরকম ক্ষতিপূরণ দিয়েও ফলাফল কৈ হলো?” ক্রোধ বের হয়ে আসছে ভেতর থেকে, কিন্তু পরোয়া করে না সে। “আপনি বলেছিলেন এটা দেখার মতো কিছু একটা হবে।”

“আমি ঠিক জানি না এখনো, ঠিক কাকে দোষ দেব?” বলল লায়ন। “আমার পরিকল্পনায় চুল পরিমাণ ভুল ছিল না।”

অ্যাশবির নোংরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে লায়নকে ব্যবহার করছে এটা অ্যাশবি কখনোই জানায়নি তাকে। “এখন এই পরিস্থিতির স্থামাল দেওয়ার জন্য কী করা যেতে পারে, বলুন?”

“ওটা আপনার বিষয় আমার দায়িত্ব শেষ।”

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। “আপনি এটা—”

“আমি এখন যেটা জানতে চাই,” কথার মাঝখানে অ্যাশবিকে থামিয়ে বলল লায়ন। “ঐ মানুষগুলোকে টাওয়ারের উপর মেরে ফেলে আপনার কী লাভ হত?”

“আপনি জানেন কিভাবে যে আমি তাদেরকে মারতে চেয়েছি?”

“আমেরিকানদের কথা আপনি আমায় না বলা সত্ত্বেও যেভাবে জেনেছি, সেভাবে।”

এই লোকটা অনেক কিছুই জানে। কিন্তু আজ তার কষ্টে আত্মবিশ্বাস পাওয়া গেল না অন্যান্য দিনের মতো। শ্যাতানও যে কালেভদ্রে ব্যর্থ হয়, সেটা জেনে ভালোই লাগল অ্যাশবির। কিন্তু এটা নিয়ে বেশী কচলাতে চাইল না সে, কারণ লায়নকে এখনো প্রয়োজন তার।

“ওদের হাত থেকে কোনোভাবেই মুক্তি পেতাম না আমি,” বলল সে। “বিশেষ করে লাঘকের কথাই বলছি। তাই আমি আমাদের সম্পর্ককে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম, আর সেটা এমনভাবে যাতে লাঘকেরও পছন্দ হয়।”

“আর এর সাথে কী পরিমাণ টাকা জড়িত?”

হাসল অ্যাশবি। “তার মানে আপনি আসল কথায় আসতে চাইছেন, তাইতো?”

“টাকাই তো সব।”

“কুবের কোটি কোটি ইউরো আমার ব্যাক্ষেই ডিপোজিট ফান্ডে জমা করা, তাই সেখানে আমার হাত দেওয়াটা কঠিন কিছু না। আর ওই টাকা থেকেই আপনাকে ফি দেওয়া হয়েছে। আপনি কী পরিমাণ টাকা চাইবেন.সেটা নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাইনি। তারপরও ফান্ডে এখনো যে পরিমাণ আছে, তার পুরোটাই আমার হয়ে যেত যদি আপনার ফ্লাইটটা ঠিক জায়গায় অবতরণ করত।” কথাগুলো তাকে হজম করার সময় দিল অ্যাশবি। এই ব্যর্থ লোকটার সাথে আবারো সে আলোচনায় বসেছে। একদিকে সবার সাথে নাটক করে যেমন ক্লান্ত, অন্য দিকে ক্যারলাইনের কথায় একটু সাহসও পাচ্ছে সে, আর এখন সামনের এই লোকটার উদ্ধৃত আচরণে ভীষণ বিরক্ত লাগছে তার।

“কোন জিনিসটা ঝুঁকির মধ্যে আছে, লর্ড অ্যাশবি? আপনার হাত থেকে কী এমন ফসকানোর ভয়, বলুন?”

সব বললেও এটা বলা যাচ্ছে না তাকে। “এমন লাভ হত যে তার পরিমাণ আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ওই লোকগুলোকে মেরে ফেলতে যে ঝুঁকি নিতে হয়েছে, সেটা ওই লাভের তুলনায় কিছুই না।”

চুপ করে শুনল লায়ন।

“আপনার প্রাপ্য যা ছিল তা দিয়ে দিয়েছি আপনাকে,” স্পষ্ট বলে দিল অ্যাশবি, “কিন্তু আমার প্রাপ্য সেবা আমি পাইনি। আমি জানি, নীতিবোধ বা চরিত্রের বিষয়ে আপনি খুবই সচেতন, এবং এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনার কাছে। স্রষ্টাতেও বিশ্বাস করেন হয়ত। আর এই নীতি, চরিত্র, বা স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন বলেই বলছি, আপনি ব্যর্থ হ্বার পরও কি লোকের কাছ থেকে নেওয়া টাকাটা হজম করে দেন? তখন আপনার নীতি কোথায় থাকে?”

“ওদেরকে এখনো মেরে ফেলতে চান আপনি?” একটা বিরতি নিল লায়ন। “ধরে নিন আমি কাজটা এগিয়ে নিতে আগ্রহী।”

“তাদেরকে সবাইকে মারতে হবে না আপনাকে। শুধু লাঘক হলেই চলবে। এই কাজের জন্যই টাকা দেয়া হয়েছিল আপনাকে, এবং বাকি টাকাটাও আপনার কাছে যাওয়ার অপেক্ষায়।”

অ্যাশবির সাথে নৌকায় চড়াটা সম্ভব ছিল না প্রভান্ডসেনের। তাকে সাহায্য করার জন্য যারা আসছে তারা ইংল্যান্ড থেকে সবে রওনা দিয়েছে, তার মানে এখনো কয়েক ঘণ্টা লাগবে। তাই অ্যাশবিকে অনুসরণ করার জন্য একটা ক্যাবে চড়ে বসেছে সে। সেইনে নদীটা রাস্তার প্রায় সমান্তরালে যাওয়ায় ধীর গতির নৌকাটার উপরে নজর রাখতে পারছে তারা।

প্রথমে সে ভেবেছিল স্যাম এবং মিগ্যানকে পাঠাবে, কিন্তু অ্যাশবি তাদের দেখে থাকতে পারে টাওয়ারে, এটা ভেবে ঝুঁকি নেয়নি সে। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ? তাই স্যামের দিকে ফিরে সে বলল, “নৌকাটা সামনের যে ঘাটে থামবে সেখানে তুমি আগে থেকেই গিয়ে অপেক্ষা কর, দেখ যে অ্যাশবি কী করছে ওখানে। এবং ওখানে পৌছানোর পথটা তৎক্ষণাত জানিয়ে দেবে আমায়।”

“আমি কেন?”

“স্টেফানি নেলেইর জন্য ছদ্মবেশ নিয়ে হোটেলবয় হতে পারলে, আমার জন্যে কেন পারবে না?”

কথাটা যে স্যামের বেশ লেগেছে, তা বুঝতে পারল প্রভান্ডসেন।

মাথা নাড়ল স্যাম। “ঠিক আছে, পারব। কিন্তু অ্যাশবি আমাকে মিটিং রুমে দেখেছে হয়ত।”

“এখন দেখ, এটা কিন্তু একটা সুযোগ, কাজে লাগাতে হব। আমার মনে হয় না এত মানুষের ভিড়ে তোমার দিকে খেয়াল করতে পারবে নেই সামনেই বাঁ দিকে লুভ্যর, আর ডানে নদীটা তো আছেই। স্যাম দেখল নৌকাটা সামনের ঘাটের দিকে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। আর কিছু ভাবার সময় নেই তার ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল সে।

দরজাটা খুলেই বিকেলের শীতল বাতাসে বৈরিয়ে পড়লো স্যাম।

“সাবধানে থেক,” বলল হেনরিক। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ড্রাইভারকে সামনে এগোতে বলল, কিন্তু ধীরে, কারণ নৌকাটা হারিয়ে ফেলা যাবে না।

A

“আমার প্রশ্নের উত্তর এখনো দেননি আপনি,” লায়ন বলল অ্যাশবিকে। “মূলত আপনার নজর কিসের দিকে, বলুন?”

আর পারা যাচ্ছে না, লায়নের কাছ থেকে ধারাবাহিক সহযোগিতা পেতে হলে কিছু অন্তত বলতেই হবে অ্যাশবিকে। “এমন এক সম্পদ যা গুণে বা মেপে শেষ করা যাবে না। আপনাকে যে টাকা ফি দিয়েছি তার থেকেও বহুগুণ বেশী।” অ্যাশবি এই ভয়ঙ্কর লোকটাকে আর ভয় পায় না এটাই বোঝাতে চাইছে।

“আর আপনি লাঘক এবং বাকিদেরকে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন শুধু এটা হাতানোর জন্য?”

কাঁধ জোড়া ঝাঁকাল অ্যাশবি। “শুধু লাঘককে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে ভাবলাম, যেহেতু আপনাকে মানুষ মারতেই হচ্ছে, সেহেতু সবাইকেই মেরে দিলে ক্ষতি কী?”

“আমি সত্যিই আপনাকে ছোট করে দেখেছিলাম, লর্ড অ্যাশবি। আপনি আসলেই একটা জিনিস।”

কথা ঠিক।

“আর আমেরিকানদের কী অবস্থা? মানে ওদেরকেও আপনি বোকা বানিয়েছেন?”

“ঠিক পুরোপুরি না। ওদের চাপে পড়ে যতটা যা বলেছি সেটা না বলে উপায় ছিল না। আর আরও একটা কথা বলি এখন, আমি কিন্তু কখনোই আপনার কথা ওদের বলতাম না, বা আপনাকে ওদের হাতে দিতাম না, এরকম ইচ্ছাই ছিল না আমার। যদি সবকিছু ঠিকঠাক মতো হয়ে যেত, তাহলে আমি আমার স্বাধীনতা ফেরত পেতাম, সম্পদটা খুঁজে নিতাম, আর ক্লাবের টাকাতো আছেই। ওদিকে আপনিও আপনার তিনগুণ বেশী ফি নিয়ে কাজ শুরু করতে পারতেন নতুন ক্লায়েন্টের সাথেও।”

“আমি যতটা ভেবেছিলাম, আমেরিকানরা তার থেকেও চতুর।”

“তাহলে মনে হচ্ছে যে এটা আপনারই ভুল। ঠিক বুঝে উঠে পারেননি কিভাবে খেলতে হবে ওদের সাথে। এখন আসল কথা হলো, আমার দিকের ~~ক্লাব~~ ক্লাবের তা করেছি, এবং আপনার ফির বাকি টাকাও দিয়ে দিতে প্রস্তুত আমি। যদি ~~এখন~~ শুধু—”

লুভ্যরের ঘাটে ধামল নৌকাটা। নতুন যাত্রীরা উঠছে সারি ~~বেঁকে~~ একে-একে চুক্তি যাচ্ছে কাঁচের কেবিনে। অ্যাশবি চুপ করে আছে। ইঞ্জিনের আবারো গর্জে ওঠার অপেক্ষায় আছে সে।

“তাহলে অপেক্ষায় থাকলাম আমি,” সে বলল।

নৌকার পেছনের দিকে না বসে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তলায় ব্যস্ত যাত্রীদের ভেতর নিজেকে মেশানোর চিঞ্চা করল স্যাম। আচ্ছাদনের নিচের পরিবেশটা বেশ চমৎকার, হিটার থেকে গরম হাওয়া আসছে। অ্যাশবি একটা লোকের সাথে কথা বলছে এখন। লোকটার গায়ে ইংলিশ কোট, চুলগুলো একটু সোনালী মনে হচ্ছে দূর থেকে। কেবিন থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। স্যাম বুঝতে পারছে ওখানে শীতটা বেশ তীব্র অনুভব হবার কথা।

লে দে লা সিতে এবং আরও কিছু দর্শনীয় স্থান এসে পড়তেই তাদের গাইড সেটা জানিয়ে দিল যাত্রীদের। লাউডস্পিকারে, তার কষ্ট শুনেই নদী-পাড়ের দিকে তাকাল স্যাম। সব উপভোগ করছে এরকম ভান করে সাবধানে মানুষ দু'জনের দিকে খেয়াল করছে সে। তাদের গাইড আবারো ঘোষণা করল যে তাদেরকে লে দে লার চারপাশে ঘুরিয়ে নটর ডেম অতিক্রম করবে, এবং তারপর এগিয়ে যাবে বিল্ডিং ও থিক ফ্রাঙ্কোইস মিতার্যান্দ অভিমুখে।

ফোনটা বের করে ডায়াল করল সে, সবকিছু জানিয়ে দিল তৎক্ষণাত ।

▲

লাইনটা কাটার শব্দ শেষ হতেই সামনের রাস্তার দিকে তাকাল থ্রিভার্ণসেন ।

“নদীটা পার হও,” ড্রাইভারকে বলল সে, “তারপর বাঁয়ে যাও, ঠিক ল্যাটিন কোয়ার্টারের দিকে, তবে খুব বেশী দূরে যেও না ।”

নৌকাটাকে চোখের আড়াল করতে দিতে চাইছে না সে ।

“এখন ঠিক কী করবেন আপনি?” মিগ্যান মরিসন জিজ্ঞেস করল ।

“কত বছর হলো তুমি প্যারিসে আছ?”

প্রশ্নটায় মনে হলো যেন মেয়েটা অবাক হলো বেশ এবং এটাও বুঝতে পারল যে ওর প্রশ্নের উত্তর দেবার ইচ্ছা থ্রিভার্ণসেনের নেই ।

“কয়েক বছর ।”

“তাহলে বল তো, নটর ডেমের ঠিক পরেই আর কোন ব্রিজ আছে, যেটা দিয়ে লেফট ব্যাক্সে যাওয়া-আসা করা যায়?”

একটু ইত্তেজ করল মেয়েটা, কৌতুহলটা বুঝতে চাইছে সে । থ্রিভার্ণসেনও বুঝতে পারছে, উত্তর না জানার কারণে সে এরকম করছে না, সে আসলে জানতে চায় যে তথ্যটা জানা কেন জরুরী ।

“ওটার পার হলেই একটা আছে । দ্য পন্ত দে লাঘশেঙ্কেশ্বৰ ।”

“ভিড় কেমন?”

মাথাটা একটু দোলাল মেয়েটা, “মূলত পথচারীর থাকে । কিছু গাড়িও যায় ক্যাথেড্রালের পেছনে লে সেন্ট লুইসের দিকে ।”

“তাহলে ওদিকেই যাও,” ড্রাইভারকে বলল থ্রিভার্ণসেন ।

“আপনি ঠিক কী করতে যাচ্ছেন, বলবেন?”

মেয়েটার প্যানপ্যানানি কানে না তুলে উত্তর দিল সে, “যেটা করা আবশ্যিক ।”

চৌষট্টি

অ্যাশবি তার মনের কথাটা লাঘনের মুখ থেকে শোনার অপেক্ষায় আছে ।

“এলিজা লাঘককে সরিয়ে দিতে পারব,” চাপা স্বরে স্পষ্ট জানিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটা ।

তারা সবাই নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, দেখছে নৌকার পেছন থেকে ফেনার মতো জল বের বাদামি-ধূসর জলের সাথে মিশে যাচ্ছে ।

দুটো যাত্রীবাহী এবং কিছু ব্যক্তিগত জলযান দেখা গেল তাদের পেছনে আসতে ।

“এটা করে দেখাতে হবে,” আরও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল অ্যাশবি, “আর সেটা আজকেই। বড়জোর আগামীকাল। এর ওপাশে যাওয়া যাবে না। এই মহিলাকে কিন্তু ভীষণ রকমের বেপরোয়া হয়ে উঠবে।”

“সেও এই সম্পদের আশায় আছে, তাই না?”

সত্যিটাই আরও বাড়িয়ে বলতে হবে। “আপনি কল্পনাও করে পারবেন না তার চাওয়াটা কেমন। এগুলো সে চায় পারিবারিক ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার জন্য।”

“সম্পদ, গুণ্ঠন। আমি আরও জানতে চাই বিষয়টা নিয়ে।”

উত্তর দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতাই নেই, কিন্তু উপায় নেই। “সম্পদটা আসলে নেপোলিয়নের ছিল, এটাকে হারানো সম্পদ বলাই ভাল। তবে পরিমাণটা বিরাট অংকের। দু’শ বছর এটার হাদিস কেউ পায়নি। তবে আমার মনে আমি পেয়েছি।”

“আপনার ভাগ্য ভালো যে এই সব গুণ্ঠনে আমার আগ্রহ নেই। বাস্তবে কাজে লাগার মতো বৈধ টাকাই আমার কাছে পছন্দের।”

প্যালাইস দে জাস্টিস অতিক্রম করে একটা ব্রিজের নিচ দিয়ে গেল তাদের নৌকাটা। মাথার উপর দিয়ে অনেক যানবাহন পারাপার হচ্ছে ব্রিজে ভর করে।

“আপনার কাজটা পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে হয় মৃত্যু-পয়সায় হাত দিতে হবে না আমাকে।” বলল অ্যাশবি।

“আমি কেমন চরিত্রের সেটা বোঝানোর জন্য এতেই আমি লুক। কিন্তু কালকের ভেতরেই লাঘক শেষ, এটাই আসল কথা।” একটু থামল সে “আর এটাও জেনে রাখুন, লর্ড অ্যাশবি। হামেশা ব্যর্থ হই না আমি। তাঁর মন্ত্রেন আমাকে এগুলো মনে করিয়ে দেওয়াটা আমার অপছন্দের।”

বার্তাটা বুঝতে পারল সে। কিন্তু তারও একটু বিষয় আছে যেটা এখন সব চিন্তার কেন্দ্রস্থল।

“জাস্ট কিল হার।”

▲

কেবিনের শেষ প্রান্তের আসনগুলোর দিকে ধীরে এগিয়ে যাবার চিন্তা করল স্যাম। এক নজরে এগিয়ে আসতে থাকা নটর ডেমকে দেখে নিল বাঁ দিকে। আর ডানে ল্যাটিন কোয়ার্টার এবং শেঞ্চিপিয়ার অ্যান্ড কম্পানি, এখান থেকে গতকাল সবকিছুর সূচনা হয়। টুয়ার গাইডকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, তবে স্পিকারে দুই-ভাষায় তার বর্ণনা শোনা যাচ্ছে। আরও একটু ডানের দিকে রাইট ব্যাঙ্ক, ওখানে কসিয়ারজেরির কথা বলে গেল গাইড, যেখানে ম্যারি অ্যান্ডওনেতেকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগ পর্যন্ত।

একেবারে পেছনের সারির দিকে এগিয়ে গেল স্যাম। চারপাশের দৃশ্য দেখছে মন দিয়ে। মানুষের কথা-বার্তা, ক্যামেরার ক্লিকের শব্দ, দূরের দিকে দেখানো বিভিন্ন স্থাপনার কথা-সবই কানে আসছে তার। সবাই ব্যস্ত, শুধু একজন বাদে। একটা সারির

একেবারে শেষ প্রান্তে বসে আছে সে, সারিটা শেষের দিক থেকে তিনি নম্বরে। মুখটা খসখসে দেখালেও একটা মোলায়েম ভাব আছে সেখানে, থুতনি নেই বললেই চলে। গাঢ় সবুজ রঙের কোট, জিন্সের কালো প্যান্ট আর কালো বুট গায়ে-পায়ে। নিলচে কালো চুলগুলো পেছনে ঝুঁটি করে বাঁধা। হাত দুটো পকেটে ভরে বসে আছে সে, তাকিয়ে আছে সামনে, চারপাশে কী হচ্ছে তা নিয়ে অগ্রহ নেই কোনো। চুপচাপ অমণ্টা উপভোগ করছে মনে হচ্ছে।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে কাঁচের ঘেরাটা পার হলো স্যাম। ঠাণ্ডা বাতাস নৌকার পেছন থেকে, আর কেবিনের ভেতর থেকে উষ্ণ বাতাস। দূরে তাকাতেই আরও একটা ব্রিজ কাছে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, সেইনের দু-প্রান্তকে জুড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছু একটা গড়িয়ে গেল ঢালু ডেকের উপর দিয়ে, এবং দেওয়ালে বাধা পেয়ে থেমে গেল সেটা।

ভালো করে তাকাতেই স্যাম বুঝতে পারল, এটা একটা ক্যানিস্টার।

সিক্রিট সার্ভিসে অন্ত সম্পর্কে অনেক পড়তে হয়েছে তাকে, সেই আলোকে বললে এটাকে কোনো গ্রেনেড বলা যায় না।

তাহলে কী এটা?

শ্মোক বস্তু।

চিনতে দেরী হলো না আর।

সবুজ কোট পরা লোকটার দিকে তাকাল সে। লোকটা তাকিয়ে আছে তার দিকে, ঠোঁট জোড়া বাঁকা করে হাসছে এখন।

লালচে-বেগুনী ধোঁয়া বের হতে শুরু করল ক্যানিস্টার থেকে।

একটা দুর্গন্ধ এসে নাক ভরে দিল অ্যাশবির।

সে পেছনে ঘুরে প্রেক্ষিণাসের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল কেবিনটা ধোঁয়ায় ভরে আছে।

চিত্কার-চেঁচামেচি হচ্ছে চারদিকে।

ধোঁয়ায় ঢাকা অঞ্চল থেকে সবাই দৌড় দিল তার দিকে, খোলা জায়গায়। কাশছে ক্রমাগত।

“কী হচ্ছে এখানে?” বিড়বিড় করে বলল অ্যাশবি।

ক্যাব থেকে বের হয়ে ভাড়া দিল থ্রিভান্ডসেন। পন্থ দে লাঘশেভেইশেতে চলে এসেছে তারা। মিগ্যান মরিসনের কথাই ঠিক। দুই লেনের পাথরের এই ব্রিজে মানুষজন খুব

কম। হাতে গোনা অল্ল কিছু মানুষ ওটার উপর দাঁড়িয়ে নটর ডেমের পেছনের অংশটা উপভোগ করছে।

ড্রাইভারকে আরও পঞ্চাশ ইউরো দিয়ে তাকে বলল, “এই মেয়েটা যেখানে যেতে চায়, গিয়ে নামিয়ে দেবে।” পেছনের খোলা দরজা দিয়ে পেছনে তাকাল সে। “শুভকামনা রইল তোমার জন্য, বিদায়।”

দরজাটা লাগিয়ে দিল সে।

ক্যাবটা ধীরে-ধীরে রাস্তার অন্য গাড়ির সাথে গিয়ে মিশল। লোহার রেলিঙের দিকে এগিয়ে গেল থ্রিভাল্ডসেন, রেলিঙের ওপাশে দশ মিটার নিচেই নদী। হাত দুটো কোটের পকেটে চুকিয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটা শুরু করল সে। পকেটের ভেতর রাখা বন্দুকটা হাতে লাগল তার। ক্রিস্টিনাগেড থেকে জেস্পার এটা পাঠিয়েছে গতকাল। সাথে কয়েকটা ম্যাগাজিনও ছিল।

কিছুক্ষণ আগেও অ্যাশবি এবং আরও একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে নৌকার পেছন দিকটায়। দূর থেকে চেনার উপায় ছিল না কিন্তু স্যাম বলে দেওয়ায় শুধু অবয়বগুলো বোঝা গিয়েছিল। নৌকাটা এখন তার থেকে দুইশ মিটার দূরে, ধীরে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে আসার পর অ্যাশবিকে গুলি করে দেওয়া হচ্ছিল কিছু হবে না, তারপর বন্দুকটা সেইন্তে ফেলে এখান থেকে সরে পড়লেই হ্যাম্প কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাজ শেষ।

অন্ত চালানো তার কাছে এখন জলের মতো। কাজটা সমস্যাই হবে না।

পেছনে একটা গাড়ির ব্রেকের শব্দ হলো, ঘুরে গেল সে।

গাড়িটা থেমেছে কাছেই।

পেছনের দরজাটা খুলে গেল, মিগ্যান ম্রিজাস্টোরিয়ে এল সেখান থেকে। তার কোটের বোতামগুলো এখন লাগানো, সোজা হেঁটে এল সে থ্রিভাল্ডসেনের দিকে।

“ওল্ড ম্যান,” ডাক দিল মেয়েটা। “দাঁড়ান, আপনি বিরাট বড় রকমের ভুল করতে যাচ্ছেন, বুঝলেন?”

“নাহ, আমার কাছে এটা ভুল না।”

“আপনি যদি এরকম নাছোড়বান্দাই হন, ভালো, তবে অন্তত আমায় একটু সাহায্য করতে দিন।”

▲

স্যাম সবার সাথে ছুটে পেছন দিকে সরে গেল। নৌকা থেকে ধোঁয়া এমনভাবে বের হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে।

কিন্তু এরকম কিছু হয়নি।

মানুষ ঠেলে-ঠুলে বাইরে যাওয়ার সময় সবুজ কোটের লোকটাকে একবার দেখল সে-সে-ও এগিয়ে যাচ্ছে আতঙ্কিত যাত্রীদের ভেতর দিয়ে, ঠিক অ্যাশবি ও তার পাশের লোকটা যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে।

বন্দুকটা শক্ত করে ধরে আছে থ্রিভাল্ডসেন, আর দেখছে, নৌকাটা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

মিগ্যানও দেখতে পেল এটা। “দেখুন, এগুলো কিন্তু প্রতিদিন ঘটে না।”

আরও কিছু গাড়ি থেকে থামতেই ক্যাচক্যাচ শব্দ হলো পেছনে, ও দু'পাশে।
সবাই গাড়ি থেকে নেমে দেখছে ধোঁয়ায় ভরা নৌকাটাকে।

আরও একটা গাড়ি গর্জন করে থামল ব্রিজের ঠিক মাঝখানে।

পেছনের দরজাটা খুলে গেল।

স্টেফানি নেলেই উপস্থিত।

▲

অ্যাশবি দেখল, সবুজ কোট জড়ানো এক লোক ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই
পিটার লায়নের পেটে সজোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। নাক-মুখ থেকে বাতাস বের
হয়ে এল ঘুসি খেয়ে, ধপাস করে ডেকের উপর পড়ে গেল আফ্রিকানটা।

একটা বন্দুক দেখা গেল সবুজ কোটের হাতে, এবং অ্যাশবির দিকে ফিরে বলল
সে, “ওই দিকে চল।”

“কিসব তামাশা শুরু করেছ।”

“ওই দিকে যেতে বলেছি।” জলের দিকে দেখাল লোকজন।

অ্যাশবি ঘুরে জলের দিকে তাকাতেই সেখানে আরু একটা ইঞ্জিনের ছোট নৌকা
দেখতে পেল, তাদের কাছেই ভাসছে ওটা, একজন কমিককেও দেখা গেল।

পেছনে ঘুরে সবুজ কোটের দিকে কঠিন দৃষ্টিদিয়ে তাকাল সে।

“আমি আর একবারও বলব না।”

অ্যাশবি রেলিঙ্গের উপর দিয়ে বাইরে ঝুঁকে নিজেকে সামলে নিয়ে লাফিয়ে পড়ল
মিটারখানেক নিচের দ্বিতীয় নৌকার ডেকে।

সবুজ কোটও লাফ দেওয়ার জন্য রেলিঙ্গের উপরে উঠল, কিন্তু লাফিয়ে আর নিচে
পড়তে পারল না।

পরিবর্তে তার শরীরটা পেছনের দিকে টান দিয়ে নামিয়ে নেওয়া হলো।

ପୌରସ୍ତି

ଘୁସି ଖେଯେ ପଡ଼େ ଯାଓୟା ଲୋକଟା ପାଯେ ଭର ଦିଯେ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ିଯେଇ ସବୁଜ କୋଟକେ ହ୍ୟାଁଚକା ଟାନ ଦିଯେ ନାମିଯେ ନିଲ ରେଲିଂ ଥେକେ । ସ୍ୟାମ ଦେଖିଛେ ଚୁପଚାପ । ଅୟାଶବି ଇତିମଧ୍ୟେ ଲାଫ ଦିଯେଛେ । ସ୍ୟାମ ଭାବରେ ସେ ଲାଫିଯେ ପଡ଼ିଲୋ କୋଥାଯ । ନଦୀର ଜଳ ଏଥିନ ଜମେ ଯାଓୟାର ମତୋ ଅବଶ୍ୟାୟ, ଓଇ ନିର୍ବୋଧଟା ଅବଶ୍ୟାୟ ସେଥାନେ ଭୁବ ଦେଯନି ।

ଦୁଇ କୋଟ ପରା ଦୁଇ ଲୋକ ଏକେ ଅପରେର ସାଥେ ଧନ୍ତାଧନ୍ତି ଶୁରୁ କରେଛେ ଡେକେର ଉପରେ ।

ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀରା ସରେ ଗିଯେ ଜାଯଗା କରେ ଦିଲ ତାଦେର ।

କିଛି ଏକଟା କରତେ ହବେ, ଭାବଳ ସ୍ୟାମ । ତବେ ଆଗେ ଧୋଯାଟା ସରାନୋ ଦରକାର । ସେ କୋନମତେ ଚୋଖ-କାନ ବୁଜେ କ୍ୟାନିସ୍ଟାରଟା ଖୁଜେ ବେର କରଲ, ତାରପର ଓଟା ଛୁଟେ ଦିଲ ଫେଲେ ଦିଲ ବାଇରେ ।

ଲୋକଦୁଟୋ ଏଥନୋ ଚାଲିଯେ ଯାଚେ, କିନ୍ତୁ ଧୋଯା ପାରଲ ନା, ଖୁବ ଦ୍ରୁତଇ ଶୀତଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ବାତାସ ଶୁଷ୍ମେ ନିଲ ସବ୍ଟୁକୁ ।

କୀ କରବେ ଠିକ ବୁଝେ ଉଠେ ପାରଛେ ନା ସ୍ୟାମ ।

ଇଞ୍ଜିନଗୁଲୋ ଥେମେ ଗେଲ । ସାମନେର କାମରା ଥେକେ ଦରଜା ଖୁଲେ ଏକଜନ କ୍ରୁ ଛୁଟେ ଏଲ ତାଦେର ଦିକେ । ଦୁଇ କୋଟ ଏଥନୋ କୁଣ୍ଡି କରେ ଯାଚେ, କେଉଁଇ ଠିକ ମୁରବ୍ବା କରତେ ପାରଛେ ନା । ତବେ ଏବାର ଦାଡ଼ିଓୟାଲାଟା ନିଜେକେ ଛାଡ଼ିଯେ ନିଲ, ତାରପର ଘାଡ଼ିଯେ ଦୂରେ ସରେ ଗେଲ, ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତେଇ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଲ ମୋଜା ହେଁ । ସବୁଜ କୋଟା ଦାଁଡ଼ିଯେ ଗେଲ, ତବେ ପ୍ରତିପକ୍ଷେର ଦିକେ ନା ଛୁଟେ ସେ ଦର୍ଶକଦେର ଠେଲେ ରେଲିଙ୍ଗେ ଦିକେ ଚଲେ ଗିଲ ।

ଏହି କୋଟଓୟାଲା ଛୁଟେ ଗେଲ ତାକେ ଧରାର ଜମ୍ବୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଗେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଁ ଗେଲ ସେଥାନ ଥେକେ ବୁଁଟିଓୟାଲା ଲୋକଟା ।

ଡେକ ପାର ହେଁ ରେଲିଙ୍ଗେ ଦିକେ ଏଗିଯେ ଗେଲ ସ୍ୟାମ, ନିଚେ ଦେଖ ଏକଟା ଛୋଟ ନୌକା ଗତି କମିଯେ ଘୁରେ ଗେଲ, ତାରପର ଉଲ୍ଟୋ ଦିକେ ଛୋଟା ଶୁରୁ କରଲ ।

କୋଟଓୟାଲାଓ ଦେଖିଲ ଏଟା ।

ତାରପର ଲୋକଟା ମାଥା ଥେକେ ପରଚିଲାଟା ଟାନ ଦିଯେ ଖୁଲେ ନିଲ, ଏରପର ଖୁଲିଲ ମୁଖେର ଦାଡ଼ି-ଗୋଫାଓ ।

ତଥନାଇ ତାକେ ଚିନତେ ପାରଲ ସ୍ୟାମ ।

କଟନ ମ୍ୟାଲନ ।

▲

ହାତେ ଧରେ ରାଖା ବନ୍ଦୁକଟା ପକେଟେଇ ବିଶ୍ରାମେ ରେଖେ ଆପ୍ତେ କରେ ହାତ ବେର ଆନଳ ଥ୍ରାନ୍ତିକାନେ । ସ୍ଟେଫାନି ନେଲେଇ ଠିକ ତାର ଦିକେଇ ଏଗିଯେ ଆସଛେ ।

“କପାଲେ ଏବାର ଆମାଦେର ଦୁଃଖ ଆଛେ,” ବିଡ଼ିବିଡ଼ କରେ ବଲିଲ ମିଗ୍ୟାନ ।

ଠିକ କଥା ବଲେଛେ ମେଯେଟା, ଏକମତ ସେଓ ।

নৌকাটা বিজের দিকে এগিয়ে আসছে। ধোঁয়ার উৎসটা কেউ একজন জলের মাঝে ছুঁড়ে দিয়েছে, তারপর দুটো লোক ছোট একটা নৌকায় লাফিয়ে পড়েছে। সবই দেখেছে থ্রিভাল্ডসেন। ওই দুজনের একজন অ্যাশবি সেটাও বোৰা গিয়েছে স্পষ্ট। তাদের নিয়ে ছোট নৌকাটা বিপরীত দিকে চলে গেছে সোজা। তারপর সেইনের বাঁক ধরে প্যারিসের আরও ভেতরে হারিয়ে গেছে ওরা।

নৌকাটা ধীরে বিজের নিচ দিয়ে চলে গেল। তখন সেটার পেছনের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা স্যাম এবং কটন ম্যালনকে দেখতে পেল থ্রিভাল্ডসেন। তাদেরকে ঘিরে রয়েছে মানুষজন। থ্রিভাল্ডসেন উপরে থাকার কারণে, এবং ছোট নৌকার দিকে তাদের তাকিয়ে থাকার কারণে থ্রিভাল্ডসেনকে দেখতে পেল না তারা।

মিগ্যান ও স্টেফানিও দেখল তাদেরকে।

“তাহলে এখন কি বুঝতে পারছ যে তুমই বরং আমাদের কাজে হাত ঠেলে দিয়েছ?” স্টেফানি বলল তাকে, মিটারখানেক দূরে দাঁড়িয়ে সে।

“আপনি কিভাবে জানলেন আমরা এখানে?” জানতে চাইল মিগ্যান।

“তোমাদের সেলফোনগুলো বলে দিয়েছে,” বলল স্টেফানি। “ওগুলোর সাথে ট্র্যাকার লাগানো আছে। সব জানা যায় কে কোথায় আছে। হেনরিক ~~মাস্ট্রি~~ কিছুক্ষণ আগে লাইনে এল, তখনই বুঝতে পেরেছি একটা গুগোল হতে ~~প্রারে~~। আমরা তোমাদের চোখে-চোখে রেখেছি।”

পাশের লোকটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল স্টেফানি। “কী করতে যাচ্ছিলে, তুম? এখান থেকে অ্যাশবিকে গুলি করতে?”

খুব কঠোর একটা দৃষ্টি দিয়ে তাকাল সে। “খুব ~~মহাঙ্গ~~ একটা কাজ এটা

“বিষয়টা আমাদেরকে তুমি দেখতে দিতে চাইছোনা, তাইতো?”

সে ভালো করেই জানে আমাদের বলতে সে কী বোঝাতে চাইছে। “কটনের তো আমার ফোন ধরার সময় হয় না, কিন্তু তোমার কাজে নামার জন্য ঠিকই সময় হয় তার।”

“সে আমাদের সবার সমস্যাই সমাধান করার চেষ্টা করছে। এমনকি তোমারটাও।”

“তার কোনো সাহায্য আমার দরকার নেই।”

“তাহলে তাকেই কেন এই কাজে টেনে আনলে?”

কারণ এক সময়ে তার মনে হয়েছিল সে একজন বন্ধু। এমন একজন যে বিপদে পাশে দাঁড়াবে। ঠিক সেও যেমন ম্যালনের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

“নৌকায় কী ঘটল?” জিজ্ঞেস করল থ্রিভাল্ডসেন।

মাথাটা বাঁকাল স্টেফানি। “আমি যদি সেটা তোমায় ব্যাখ্যা করি, আর তোমার কাছেও যদি করি,” মিগ্যানকেও যোগ করল সে, “তুমি কী একজন মানুষকে খুন করতে দেবে?”

“আমি আপনার কাজ করি না।”

“ঠিক বলেছ স্টেফানি ঘুরে একজন পুলিশের দিকে তাকাল। “একে এখান থেকে নিয়ে যাও।”

“তার আর দরকার হবে না,” বলল থ্রিভাল্ডসেন। “আমরা দু’জনেই চলে যাচ্ছি।”

“তুমি আমার সাথে আসছ।” মিগ্যানের উদ্দেশ্যে বলল স্টেফানি।

এরকম কথাই বলবে সে বুঝতে পারছিল থ্রিভাল্ডসেন। আর এই কারণেই সে ডান হাতটা পকেটে ভরে বন্দুকটা হাতের মুঠোয় নিল সে।

তারপর সেটা বের করে আনল।

“কী চাও তুমি? আমাকে শুলি করবে?” শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

“আমি চাই না তুমি আমাকে চাপ সৃষ্টি কর। এই মুহূর্তে আমাকে তোমার যতই পাগল মনে হোক, আমি আমার পাগলামিটা একেবারে মন দিয়েই করে যেতে চাই, স্টেফানি। এটা আমার সমস্যা, তোমার বা তোমাদের না। আর আমি যেটা শুরু করেছি সেটা আমিই শেষ করতে চাই।”

উত্তর দিল না সে।

“একটা ক্যাব ডাক।” মিগ্যানকে আদেশ দিল থ্রিভাল্ডসেন।

সে দৌড়ে সামনের মোড় থেকে প্রথমেই যে গাড়িটাকে পেল সেটাকে থামার সংকেত দিল।

স্টেফানি চুপ করে আছে। কিন্তু তার চোখে যেন না বলা ক্ষিয়গুলো জড়ে হয়ে আছে, আর সেগুলো দেখতেও পাচ্ছ থ্রিভাল্ডসেন। একটা অস্তর্মুখী ৩০° সজাগ আত্মরক্ষার অভিযন্ত। এবং আরও কিছু আছে হয়ত এই লোকটারে নারী কোনো ইচ্ছাই নেই তার।

সে যা করছে তা হট করেই, যেখানে পরিকল্পনার পরিবর্তে আতঙ্কই কাজ করছে বেশী, আর বিষয়টা স্টেফানিও বুঝতে পারছে, আর বুঝেই তার মনের এরকম সংকটময় পরিস্থিতির প্রতি সহানুভূতি দেখাতে চাইছে। অভিজ্ঞ ও সতর্ক এই নারী একদিকে যেমন সাহায্য করতে পারছে না লোকটাকে, অপরদিকে তাকে থামাতেও চাইছে না।

“জাস্ট গো,” ফিসফিস করে বলল সে।

যত দ্রুত সম্ভব অপেক্ষমাণ ক্যাবের দিকে এগিয়ে গেল সে। ভেতরে ঢোকার পর, সে মিগ্যানকে বলল, “তোমার সেলফোনটা?”

ওটা তার হাতে দিল মিগ্যান।

জানালার কাঁচটা নামিয়ে ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে বাইরে।

▲

মারাত্মক ভয় পেয়েছে অ্যাশবি।

মোটর বসানো নৌকাটা লে দে লা সিতে অতিক্রম করে গেল, আরও অনেক নৌকা পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে তারা।

সবকিছুই ঘটে গেল অনেক দ্রুত ।

সে পিটার লায়নের সাথে কথা বলছিল, তারপর ধোয়ার বিরাট একটা ঢেউ ঢেকে দিল তাদেরকে । সবুজ কোটের লোকটা এখন বন্দুক ধরে আছে হাতে । কে এই লোক? আমেরিকানদের কেউ?

“আপনি সীমাহীন নির্বোধ একটা লোক,” লোকটা বলল তাকে ।

“কে আপনি?”

বন্দুকটা নেমে এল নিচে ।

তখন সেই হলদে চোখ জোড়া দেখতে পেল সে ।

“আমি সেই লোক, যাকে এখনো অনেকগুলো টাকা দেওয়া বাকি আছে আপনার ।”

▲

মুখ থেকে বাকি চুল আর আঠা তুলে ফেলল ম্যালন । তারপর এক-এক করে দুই চোখ থেকেই হলদে রঙের কন্ট্যাক্ট লেন্স খুলে ফেলে দিল সে ।

কাছের ঘাটেই নৌকাটা থেমেছে, এবং ভীত যাত্রীদের দল ধীরে-ধীরে নেমে যাচ্ছে সেখানে । ম্যালন এবং স্যাম সবার শেষে নামল । স্টেফানি অপেক্ষা করছে তাদের জন্য । নদীর পাড় থেকে পাথরে বাঁধানো একটা সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে, স্টেফানি সেখানেই দাঁড়িয়ে ।

“কী হলো ওদিকে বলতো?” জিজ্ঞেস করল সে ।

“বিরাট কাণ্ড-কারখানা,” উত্তর দিল ম্যালন । “ত্রেকমটা ভেবেছিলাম, হলো না ।”

স্যামের মাথা ঝুরছে ।

“অ্যাশবিকে না হলে আমাদের চলবে না,” বলল ম্যালন । “তাই আমি লায়ন হয়ে তাকে ফোন দিয়ে দেখা করার আয়োজন করি ।”

“আর সাজসজ্জা?”

“ফ্রাঙ্গ সরকার সাহায্য করেছে এই কাজে । ওদের ইন্টেলিজেন্সের বিভাগের লোক একজন মেকআপ আর্টিস্ট দিয়েছিল সাজানোর জন্য । কিন্তু পিটার লায়ন তো অন্য পরিকল্পনা আগেই করে রেখেছিল ।”

“ওই লোকটাই-সে, তাই না?” জিজ্ঞেস করল স্যাম । “সবুজ কোট পরা?”

নড় করল ম্যালন । “সে-ও যে অ্যাশবিকে চাইবে এটাই স্বাভাবিক । আর বুদ্ধি করে শ্মোক বম্বটা সরিয়ে ভালো করেছ ।”

“হেনরিক এসেছিল এখানে,” স্টেফানি জানাল তাকে ।

“বেচারা, কী অবস্থা তার এখন? ”

“খুব কষ্ট পেয়েছে, কটন । ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবতে পারছে না ।”

তার বন্ধুর সাথে কথা বলা দরকার তার, কিন্তু সারাটা দিনে একটু ফুসরত পায়নি সে। নৌকায় ওঠার আগে সে ফোনটা সাইলেন্ট করে নিয়েছিল, এবং হেনরিকের কাছ থেকে বেশকিছু মিসড কল পেয়েছিল সে, সাথে আরও একটা নাস্তার থেকে তিনটা কল এসেছিল। তবে সেটা চিনতে পেরেছিল কার নাস্তার।

ডষ্ট্র জোসেফ মুর্যাড।

রি-ডায়াল বাটনে চাপ দিল ম্যালন। প্রথমবার রিং বাজতেই ধরল প্রফেসর।

“ওটা পেয়েছি,” মুর্যাড বলল। “সমাধান হয়ে গেছে।”

“ওটার অবস্থানটা জানতে পেরেছেন তো?”

“আমার ধারণা, হ্যাঁ।”

“হেনরিককে জানিয়েছেন?”

“এইমাত্র জানালাম। আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না, তাই তাকে ফোন দিয়েছিলাম। সে দেখা করতে চায়।”

“প্রফেসর, পরিস্থিতি এখন অন্যরকম। এই অবস্থায় আপনার সেখানে যাওয়া উচিত হবে না। চিন্তা করবেন না। আপনি শুধু আমাকে হেনরিক কোথায় আছে তা বলুন, বাকিটা আমি সামলে নিছি।”

ছেষটি

বিকাল ৩:৪০

নৌকা থেকে অ্যাশবিকে নামিয়ে আনা হলো বন্দুকের মুখে, তারপর পুরনো সিটি সেন্টারের দিকে আনা হলো। জায়গাটা লে সেইন্ট জারমেইনে প্রক্ষেপণে সে বুকতে পেরেছে যে লোকটার হাতে এখন সে পড়েছে সে পিটার লায়ন। আর নৌকার উপর যে ছিল সে খুব সম্ভবত আমেরিকার এজেন্ট। ডাঙায় তাদের জন্য একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে। তেতরে দু'জন লোক বসেছিল। লায়ন ইশার্ল করতেই বেরিয়ে গেল তারা। তাদের ভেতর একজন দরজাটা খুলে ধরে ভেতর থেকে টান দিয়ে বের করে আনল ক্যারলাইনকে।

“আপনার ডান হাত মিস্টার গিল্ডহল আমাদের সাথে যোগ দিতে পারছেন না,”
বলল পায়ন। “আমার ধারণা তাকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।”

এটার অর্থ কী সেটা জানে অ্যাশবি। “তাকে মেরে ফেলার কোনো যুক্তি ছিল না।”

হাসল লায়ন। “উহ, ভুল বললেন। এটাই একমাত্র পথ ছিল।”

পরিস্থিতি এখন কঠিন থেকে হতাশাজনকে পরিণত হয়েছে। এখন এটা স্পষ্ট যে লায়ন অ্যাশবির সব কাজ চোখে-চোখে রেখেছে, কোথায় গেলে ক্যারলাইন এবং গিল্ডহলকে পাওয়া যাবে সেটাও জানত সে।

ক্যরোলাইনের সুন্দর মুখে রাজ্যের ভয় জড় হয়েছে, দেখতে পেল অ্যাশবি।

ভয় পাচ্ছে সে নিজেও ।

সামনের দিকে তাকে এগিয়ে নিয়ে গেল লায়ন, তারপর ফিসফিস করে বলল, “ভাবলাম মিস ডডকে আপনার কাজে লাগতে পারে । শুধু এই কারণেই তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে । আমি বলি কী, তাকে আমি যে প্রস্তাবটা দিয়েছি সেটা ফিরিয়ে দেবেন দেবেন না আপনি ।”

“ওই সম্পদটাই আপনি চান, তাইতো?”

“কে না চাইবে, বলুন?”

“গত রাতে, লভনে আপনি আমায় বলেছিলেন যে এধরণের কোনো কিছু আপনাকে আকর্ষণ করে না ।”

“দেখুন, এটা সম্পদের এমন একটা উৎস যেটার খবর কেউ জানে না, কোনো সরকারও না, কোনো দাবিদারও নেই । এখন এরকম অর্থ দিয়ে আমি অনেক কিছুই করতে পারব, অনেক কিছুই । এবং আপনার মতো এরকম দুই নম্বর লোকের সাথেও আর কাজ করতে হবে না আমাকে ।”

ব্যস্ত রাস্তাঘাটের কোলাহল থেকে বেশ কিছুটা দূরে আছে তারা । তাদের গাড়িটা একসারি গাছের মাঝে পার্ক করা । আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না । জায়গাটা বানিজ্যিক অঞ্চলের অংশ । নৌকা, বা ছোট জাহাজ মেরামতও করা হয় এখানে । কোটের নিচ থেকে বন্দুকটা বের করে নিল লায়ন, তারপর শুরুনরোধক অংশটা লাগিয়ে নিল ছোট ব্যারেলের সাথে ।

“একে গাড়িতে ঢোকাও,” ক্যারলাইনকে দেখিয়ে বলল লায়ন ।

পেছনের সিটে তাকে টেনে নেওয়া হলো । লায়ন এগিয়ে গেল খোলা দরজার কাছে, তারপর বন্দুক ধরে রাখা হাতটা গাড়ির ক্ষেত্রে নিয়ে গেল সে, তাক করল ক্যারলাইনের দিকে ।

দম ফুরিয়ে আসছে মেয়েটার । “ওহ গড, মো ।”

“শাট আপ,” বলল লায়ন ।

কেঁদে ফেলল ক্যারলাইন ।

“লর্ড অ্যাশবি,” লায়ন বলল । “এবং মিস ডড আপনিও । আমি মাত্র একবার জিজ্ঞেস করব । যদি বিশ্বাসযোগ্য উত্তরটা সাথে-সাথেই দিতে না পারেন, তাহলে আমি শুলি করব । সবাই বুঝতে পেরেছেন?”

কিছুই বলল না অ্যাশবি ।

কিন্তু তার দিকেই এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে লায়ন । “আপনার কথাটা শুনতে পেলাম না এখনো ।”

“না বোঝার কিছু আছে এখনে?”

“এবার আমাকে বলুন, সম্পদটা কোথায় লুকানো?” বলল লায়ন ।

হোটেলে ক্যারলাইনকে রেখে আসার সময়েই সে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল এই বিষয়ে অন্তত শুরুটা কোথা থেকে হবে সেটা জানে দুজনেই । এতক্ষণে

ক্যারলাইন হয়ত আরও অনেক কিছুই জেনে গিয়েছে, আর সেগুলো এখন দু'জনের জীবনের জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ।

“সেইন্ট-ডেনিসে, ক্যাথেড্রালের ভেতর,” দ্রুত বলে দিল ক্যারলাইন।

“আপনি কি জানেন ঠিক কোথায় ওটা?” জিজ্ঞেস করল লায়ন, তার চোখ দুটো আটকে আছে অ্যাশবির উপর, বন্দুকটা গাড়ির ভেতর তাক করা এখনো।

“হ্যাঁ, আমার মনে হয় জানি। কিন্তু আমাকে সেখানে নিজে যেতে হবে নিশ্চিত হবার জন্য। আমাকে দেখতে হবে বিষয়টা। সঁবেমাত্র আমরা ওটার অবস্থান জেনেছি—”

হাতের বন্দুকটা সরিয়ে নিল লায়ন। “আমার বিশ্বাস, আপনাদের নিজ-নিজ জীবনের কথা বিবেচনা করেই, সঠিক স্থানটা খুঁজে বের করবেন আপনারা।”

অ্যাশবি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এখনো।

লায়ন এবার বন্দুকটা তার দিকে তাক করল। “এবার আপনার পালা। দুটো প্রশ্ন আপনার জন্য, এবং আমাকে সহজ উত্তর দেবেন। আমেরিকানদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ আছে আপনার?”

খুব সহজ প্রশ্ন। সায় দিল সে।

“ফোন আছে আপনার কাছে?”

আবারো মাথা নাড়ল সে।

“ফোন আর নাস্বারটা দিন।”

স্যামের সাথেই দাঁড়িয়ে আছে ম্যালন, পরবর্তী পদক্ষেপকী হবে সেটা নিয়ে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে সে। তখন স্টেফানির ক্ষেপটা বেজে উঠল। ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে সে বলল, “অ্যাশবি।”

জানা কথা, মনে-মনে বলল ম্যালন। “মনে হচ্ছে, লায়ন কথা বলতে চায় আপনার সাথে।”

লাউড-স্পিকারটা অন করল স্টেফানি।

“আমার মনে হয়, আমি দায়িত্বরত কারো সাথেই কথা বলছি,” একটা পুরুষ কষ্ট বলল।

“আমারও সেরকমই মনে হয়,” বলল স্টেফানি।

“গত রাতে আপনি লভনে ছিলেন?”

“জি, ওটা আমিই।”

“আজকের শো কেমন লাগল?”

“দারুণ, আপনার পেছনে ছুটে ভীষণ মজা পাচ্ছি।”

হাসল লায়ন। “হ্যাঁ, এটাই তো আপনাকে একটু ব্যস্ত রাখল, আর সেই সুযোগে আমি লড় অ্যাশবির সাথে বাকি কাজটা সারতে পারছি। লোকটাকে বিশ্বাস করাই যায় না, আর আমি নিশ্চিত যে আপনিও এটা জানেন।”

“সে আপনাকে নিয়েও একই কথাই ভাবছে হয়ত এই মুহূর্তে।”

“আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আপনাকে আমি বেশ সহযোগিতা করেছি। অ্যাশবির সাথে কালকে ওয়েস্টমিনিস্টারে কথা বলার সময়ে আপনি আমাদেরকে দেখছিলেন, আর সেটা আমি না চাইলে হত না। জ্যাক দ্য রিপার টুরে আমি যোগ দিয়েছিলাম যেন আপনি আমাকে অনুসরণ করতে পারেন। ছোট টাওয়ারগুলো ফেলে গেলাম যেন সেগুলো খুঁজে পান আপনারা। এমনকি আপনার এক এজেন্টকেও আক্রমণ করেছি আমি। এত কিছু করলাম, আর কী দরকার ছিল আপনাদের, বলুন তো? কিন্তু তারপরও আপনি এটা জানতে পারলেন না যে অ্যাশবির আসল টার্গেট আইফেল টাওয়ার। তবে আপনি কোনো একভাবে সেটাকে থামিয়েছেন।”

“আর আমরা যদি এটা না-ও পারতাম, তাতে আপনার কী হত? নিজের পাওনা টাকা ঠিকই বুঝে নিয়েছেন, এখন পরবর্তী কাজে আপনি মন দেবেন, এটাই স্বাভাবিক।”

“আপনার উপর আমার বিশ্বাস ছিল।”

“আশা করি এই বিশ্বাসের কারণে আপনি কিছু প্রত্যাশা করবেন না।”

“মাথা খারাপ, কথনোই না। আমি শুধু দেখতে চাইনি যে এই নিয়ে অ্যাশবি
এই কাজে সফল হোক।”

পিটার লায়নের উদ্ধৃত আচরণের প্রদর্শনী দেখছে ম্যালন এবং স্টেফানি। লোকটা এখন তাদের থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে থাকাই যথেষ্ট না, তাকে কবজা না করা পর্যন্ত স্বত্ত্ব নেই কারো।

“আপনার জন্য আরও একটা তথ্য আছে আমার কাছে,” লায়ন বলল। “আর এটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। কোনো ছলচাতুরী নেই। আপনি জানেন, যা কিছু হলো, সেসবের জন্য ফ্রাঙ্গের যেসব চরমপন্থীদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে, বা হবে, তারা কিন্তু আপনাতেই এই কাজে জড়াতে চায়নি, একটা শর্ত দিয়েই এটা করতে রাজি হয়েছে। এটা আমি কথনোই অ্যাশবিকে বলিনি। এখন এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ফ্রাঙ্গ সরকারের হাতে দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়িত হয়ে আসছে। এই মানুষগুলো এদেশের অনেক আইনকে তীব্র ঘৃণা করে, এবং তারা এগুলো বর্ণবাদী বা বৈষম্যমূলক আচরণ হিসেবেই বিবেচনা করে। আর এগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তারা এখন ক্লান্ত। হিসেব করলে দেখা যায় যে এগুলো করে তাদের অর্জন কিছুই হয়নি, উপরন্তু তাদের বেশ কিছু মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্যারিসে, গত কয়েক বছর ধরে তাদের সক্রিয় আন্দোলনের কারণে। ইনভ্যালিন্ডেসে ওরা আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল, সেটা কিভাবে আপনি জানেন। আর এই সহায়তার বিনিময়ে ওরা একটা তীব্র, মর্মভেদী বাণী ছড়িয়ে দিতে চায় সবার মাঝে।”

যা শুনছে, সেটা ভালো লাগছে না ম্যালনের।

“একটা আত্মাতী বোমা হামলা খুব শীত্যাই করতে যাচ্ছে ওরা,” বলল লায়ন।

একটা শীতল স্নোত বয়ে গেল ম্যালনের মেরুদণ্ডের মাঝ দিয়ে।

“ক্রিসমাস চলাকালে প্যারিসের একটা গির্জায়। ওদের ধারণা এরকম স্থানই
উপযুক্ত, কারণ তাদের উপাসনালয় একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন।”

মাথা ঘুরে উঠল ম্যালনের। প্যারিসে কয়েকশ গির্জা আছে।

“তিনটে ব্যর্থ পরিকল্পনার পর আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু আছে
বলে আমি মনে করি না,” স্পষ্ট জানিয়ে দিল স্টেফানি।

“আপনার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু এটা আসলেই ঘটবে। আর আপনি কিন্তু
সেখানে পুলিশ নিয়ে ছুটেও যেতে পারবেন না। কারো কিছু বোঝার আগেই, বা এটা
থামাতে চেষ্টা করার আগেই আক্রমণটা করা হবে। তবে শুধু আপনি এটা থামাতে
পারেন।”

“অসহ্য, এসব বাজে বকা বন্ধ করুন,” বলল স্টেফানি। “এগুলো বলে আপনি
আসলে নিজের জন্য সময় নিচ্ছেন।”

“একদম ঠিক কথা। কিন্তু আমি যে মিথ্যে বলছি এটা নিয়ে বাজি ধরার সামর্থ্য কি
আপনার আছে?”

ম্যালন স্টেফানির চোখে সেটাই দেখল যেটা এখন তার নিজের মনেও উঁকি
দিয়েছে।

আর কোনো উপায় নেই আমাদের হাতে।

“কোথায়?” জিজ্ঞেস করল স্টেফানি।

হাসল লায়ন। “এত সোজা না। এটা কিছুটা শিকার-সঙ্কলনের মতো হতে যাচ্ছে।
মনে রাখতে হবে, এক গির্জা ভরা মানুষ আপনার ওপরেই এখন নির্ভর করে আছে।
তাই সময়মত সব হবার কোনো বিকল্প নেই। কোনো পদ্ধতি আছে আপনার কাছে?”

“হ্যাঁ, আছে।”

“একটু পরেই আমি যোগাযোগ করছি।”

কলটা কেটে দিল সে।

ক্রোধ ফেটে পড়ছে স্টেফানির চোখে-মুখে, কিন্তু সেটাকে গ্রাস করে নিল এমন
এক আত্মবিশ্বাস যেটা ইন্টিলিজেন্স তাকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে গড়ে দিয়েছে।

স্যামের দিকে ফিরে তাকাল সে। “হেনরিকের খোঁজ নাও।”

প্রফেসর মুর্যাড তাদের আগেই জানিয়েছে যে সেইন্ট দেনিসের ক্যাথেড্রালে যাবে
হেনরিক।

“তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবে আমরা ওখানে পৌছান পর্যন্ত। এলোমেলো
কিছু না করে বসে খেয়াল রাখবে।”

“কিভাবে তাকে সামলাব?”

“তা জানি না। খুঁজে বের করবে।”

“ইয়েস, ম্যাম।”

এরকম বিদ্রূপাত্মক সাড়া দিতে দেখে হাসল ম্যালন। “আমিও ঠিক এভাবেই বলতাম একটা সময়ে। স্যাম, তুমি হেনরিককে সামলাতে পারবে। একটু শুধু কোনোভাবে তাকে ধরে রাখবে, আর সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবে।”

“হেনরিকের ক্ষেত্রে এটা বলা সহজ, করা কঠিন।”

একটা হাত এই তরুণ এজেন্টের কাঁধে রাখল ম্যালন। “সে তোমাকে পছন্দ করে। আর এখন সে বিপদে পড়েছে। সাহায্য করা তোমার দায়িত্ব।”

সাতষ্ঠি

প্যারিসে নিজের এপার্টমেন্টে পায়চারী করছে এলিজা লাইক, বিছিন ভাবনাগুলোকে একসুতোয় বাঁধার চেষ্টা করছে সে। ইতিমধ্যেই সে তার পুরনো পথ-প্রদর্শক সেই দৈব-বাণীর সাহায্যে নির্দিষ্ট একটা প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছে। তার প্রশ্ন ছিল, আমার শক্র কি জিতবে? উত্তরে তার বইটা যা বলেছে সেটা বেশ হতবুদ্ধিকর। বন্দীকে শীঘ্ৰই স্বাগত জানানো হবে বাড়িতে, যদিও সে কষ্টে ভুগবে তার শক্রুর শক্তির ছায়াতলে।

কী অদ্ভুত কথা এটা!

পাওলো অ্যারোসি তার আদেশের অপেক্ষায় আছে, বলা মাত্রই কাজে নেমে পড়বে। গ্রাহাম অ্যাশবিকে সে মেরে ফেলতে চায়, কিন্তু তার আগে কিছু প্রশ্নের উত্তর তার কাছ থেকে পেতে হবে। অ্যাশবির বেঙ্গানির পরিধিটা কভার কর্তৃক সেটা জানতে হবে আগে। তাহলেই এলিজা বুঝতে পারবে লোকটার দ্বারা ক্ষেত্রে কতটা ক্ষতি হয়েছে। সবকিছু যেন বদলে গেছে মুহূর্তেই। চোখের সামনে একটো সেই প্লেনটার ছুটে আসার দৃশ্য ভেসে উঠছে। কে করল, কেন করল, জানতে হবে। আরও একটা কারণে নিজের মনের সাথে যুদ্ধ চলছে তার। প্যারিস ক্লাবের কয়েকশ মিলিয়ন ইউরো অ্যাশবির ব্যাঙ্কে রাখা, সেগুলোও এখন ঝুঁকির ভেতর আছে।

কিন্তু আজকে ছুটির দিন। টাকাগুলোর কোনো ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। আগামীকাল সকালেই প্রথমে এটা করে নিতে হবে।

অতি মাত্রায় বিশ্বাস করা হয়েছিল অ্যাশবিকে। আর হেনরিক থ্রিভাল্ডসেন লোকটাই বা কেমন? কিসব বলে গেল। আমেরিকানরা নাকি সব জানে। তার মানে কি ভেতরের সব খবরই আছে তাদের কাছে? সবকিছুই কি তাহলে এখন বিপদের মুখে? অ্যাশবির সাথে কোনো যোগাযোগ হয়ে থাকে তাদের, তাহলে সেটা এলিজা পর্যন্তই পৌছাবে।

পাশের টেবিলে রাখা ফোনটা বেজে উঠল। কিছু বন্ধ ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়া মাত্র কয়েকজন মানুষ তার নাম্বার জানে।

অ্যাশবির ফোন।

উত্তর দিল এলিজা।

“ম্যাডাম লাঘক, আমি সেই ব্যক্তি যাকে লর্ড অ্যাশবি ভাড়া করেছিল আজ
সকালে আপনার প্রদর্শনীটা ঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য।”

কিছু বলল না সে।

“আপনার জায়গায় হলে, আমি নিজেও সতর্ক থাকতাম!” কষ্টটি বলল। “ফোন
দিয়েছি এটা জানাতে যে লর্ড অ্যাশবি এখন আমার কাস্টডিতে আটক আছে। তার
সাথে আমার কিছু কাজ বাকি থেকে গেছে তাই সে এখানে। কাজ শেষ হয়ে গেলে
তাকে আমার মেরে ফেলার পরিকল্পনা। তাই এটা নিশ্চিত বলা যায় যে এতে করে
আপনি তাকে যা দিতে চেয়েছেন সেটা পুরোপুরিই দেওয়া হয়ে যাবে।”

“এগুলো আমাকে কেন শোনাচ্ছেন আপনি?”

“আমি ভবিষ্যতেও আপনার সাথে কাজ করতে চাই, আপনাকে আমার সেবা
দিতে চাই। এই কাজের শুরু থেকেই আমি জানতাম যে আসলে টাকাটা কে দিচ্ছে,
এবং অ্যাশবি একজন এজেন্ট মাত্র। আর খুবই দুঃখিত আজকে যে দুর্ঘটনা হলো সে
জন্য। বলাই বাহুল্য যে আমাদের ব্রিটিশ ভদ্রলোক লর্ড অ্যাশবি আমার সাথেও প্রচুর
মিথ্যে বলেছেন। তিনি আপনাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিলেন, সাথে আপনার
সহযোগীদেরও, এবং সেই দোষটা তিনি আমার উপর চাপাতে চেয়েছিলেন। ভাগ্য
ভালো যে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি।”

শারীরিকভাবে হয়নি, ভাবল এলিজা। কিন্তু ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে।

“আপনাকে কিছুই বলতে হবে না, ম্যাডাম। শুধু ~~জেন্টেন্স~~ রাখুন যে সমস্যার
সমাধান হয়ে যাবে।”

ফোনটা কেটে গেল।

লাঘকের কাছে অ্যাশবিকে নিয়ে পিটার লায়নের বিদ্রূপাত্মক কথাগুলো শুনে গেল
অ্যাশবি। একটা কথায় সে নিজেই হিম হয়ে গিয়েছে শুনে; আমি তাকে মেরে ফেলতে
চেয়েছি। ক্যারলাইনও শুনেছে এটা। তখন তার ভয় আতঙ্কে রূপ নিয়েছিল কিন্তু
অ্যাশবি তার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্ষ করেছে তাকে।

সেলফোনটা বন্ধ করে হাসল লায়ন। “আপনি এলিজার কাছ থেকে মুক্তি
চেয়েছিলেন, মুক্তি পেয়ে গেলেন। এখন আর কিছুই করার নেই তার, আর এটা সে
জানেও।”

“আপনি তাকে চেনেননি।”

“তা না। আমি বরং আপনাকে চিনতে পারিনি। এবং এই ভুল আর করব না
আমি।”

“আমাদেরকে মারার প্রয়োজন নেই আপনার,” হৃষ্ট করেই বলল ক্যারলাইন।

“সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে কতটা সাহায্য করছেন আমাকে তার ওপর।”

“আর যদি আমরা আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা করি, তারপরেও যদি আমাদেরকে মেরে ফেলতে চান, তখন আর কী করার থাকবে?”

পাকা দাবা খেলোয়াড়ের মতো হয়ে গেল লায়নের মুখের অভিব্যক্তি। খুব সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করছে প্রতিপক্ষের পরবর্তী চাল কেমন হতে পারে। “আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, সহযোগিতা করা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই আপনাদের।”

▲

সেইন্ট-ডেনিসের ব্যাসিলিকার সামনে ক্যাব থেকে নামল থ্রিভাল্ডসেন। গির্জাটায় একটা মাত্র টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে, পাশেরও একটা ছিল এক সময়, এখন না থাকায় সেটাকে অঙ্গহীন এক মানুষের মতো লাগছে।

“বাকি টাওয়ারটা ১৯ শতকে পুড়ে যায়,” মিগ্যান বলল তাকে। “বজ্রপাত হয়েছিল। পরে আর ঠিক করা হয়নি।”

এখানে আসার সময়টুকুতে এই স্থান নিয়ে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছে মিগ্যান। সে জানিয়েছে যে এখানে ফ্রাসের রাজাদের কবর দেওয়া হত কয়েকশ বছর ধরে। যেটার শুরু হয়েছিল ১২ শতকে, নটর ডেমের পঞ্চাশ বছর পূর্বে, এটা একটা জাতীয় সম্পদ। গোথিক স্থাপত্যের গোড়াপত্তন এখানেই হয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে অনেক কবর ধ্বংস করে দেওয়া হয়, কিন্তু পরে সেগুলো মেরামত করা হয়। আর এখন এটা সরকারের মালিকানায় চলে গেছে।

“দেখে মনে হচ্ছে এটার কাজ চলছে,” থ্রিভাল্ডসেন বলল।

“এই শহরে কোথাও না কোথাও কাজ চলতে থাকে।”

আকাশের দিকে তাকাতে ঘন চাইল থ্রিভাল্ডসেনের। তামাটে-ধূসর রঙের মেঘগুলো সূর্যকে আড়াল করে দিয়েছে, চারদিকে ঘন ছায়া, তাপমাত্রাও কমে যাচ্ছে ধীরে।

কুয়াশা ঘন হতে শুরু করেছে।

“আবহাওয়াটা খুব ভোগাবে বোঝা যাচ্ছে,” বলল মিগ্যান।

চার্চের সামনের মানুষগুলো দ্রুত বের হয়ে আসছে।

“এটা কর্মজীবী মানুষের এলাকা,” বলল মিগ্যান। “শহরের এই অঞ্চলে পর্যটকেরা আসতে চায় না। এই কারণে সেইন্ট-ডেনিস নিয়ে আপনি খুব বেশী কিছু শুনবেনও না লোকের মুখে। যদিও আমার কাছে নটর ডেমের চাইতেও এটা বেশী পছন্দের।”

ইতিহাসে তার আগ্রহ নেই, কিন্তু অ্যাশবির অনুসন্ধানের সাথে এটা জড়িত তাই নিজেও একটু সম্পৃক্ত হয়েছে। প্রোফেসর মুর্যাড অনেক ঘেঁটে কী পেয়েছে সেটা একটু জানিয়েছে তাকে, আর মুর্যাডের প্রাণিগুলো অ্যাশবির জানবে কারণ ক্যারলাইন ডড কাজ করছে তার হয়ে।

কুয়াশা আরও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিতে রূপ নিল।

“এখন কী করার?” জিজেস করল মিগ্যান। “ব্যাসিলিকাও তো বন্ধ হয়ে গেছে।”

থ্রিভাল্ডসেন বুবতে পারছে না মুর্যাড এখনো আসছে না কেন। আরও প্রায় ঘন্টাখানেক আগে প্রফেসর তাকে ফোনে জানিয়েছে সে রওনা দিচ্ছে তখন।

ফোনটা বের করে আনল সে, মুর্যাড কত্তুর সেটা জানতে হবে তাকে, কিন্তু তার আগেই ফোনটা বেজে উঠল। হয়ত মুর্যাড ফোন দিয়েছে, ভাবল সে। কিন্তু ক্রিনে আরেকজনের নাম। কটন ম্যালন।

রিসিভ করল সে।

“হেনরিক, আমি যা বলি, তা শোন মন দিয়ে।”

“আমাকে সেটা কেন করতে হবে?”

“আমি সাহায্য করতে চাইছি।”

“তোমার সাহায্য করার ধরণটা বড়ই অস্তুত। স্টেফানিকে বইটা দিয়ে দেওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে। এই পর্যন্ত যা করেছ, সব অ্যাশবিকেই সাহায্য করার জন্য।”

“তুমি যা বলছ এর বাইরেও অনেক কিছুই আছে, আর সেগুলো তুমিও জানো।”

“না, জানি না।”

কঞ্চিটা গর্জে উঠল তার। অবাক হলো মিগ্যান। “আমি শুধু জানিয়ে তুমি বইটা ওই স্টেফানিকে দিয়েছ। তারপর তুমি নৌকায় উঠলে অ্যাশবির স্থানে, কী সব করলে যেগুলো তোমার সাবেক বস করতে বলেছে। এর কোনোটা স্থানেই আমার সম্পৃক্ততা নেই। আমার দেখা হয়ে গেছে, কটন।”

“হেনরিক, এটা আমাদেরকে সামলাতে দাও।”

“কটন, আমি ভাবতাম তুমি আমার বন্ধু। স্বত্য বলতে, তোমায় আমি সবচে সেরা বন্ধুই ভাবতাম। সব সময় আমি তোমার পাশে থেকেছি, পরিস্থিতি যেরকমই থাকুক না কেন। আমি তোমার কাছে ঝণীই ছিলাম।” আবেগের বিশাল স্নোতের সাথে যুদ্ধ করল সে। “সাই চলে গেলে, তুমিও আমার জন্য করেছ। ওর খুনিদেরকে তুমি থামিয়েছ। আমি তোমায় ভালবাসি ও শুন্দা করি। আমি আটলান্টায় গিয়েছিলাম তোমায় ধন্যবাদ জানাতে, দুই বছর আগে, আর সেখানে তোমার মতো বন্ধুও পেলাম।” একটু বিরতি নিল আবারো। “কিন্তু তুমি আমার সাথে একইরকম শুন্দাশীল আচরণ করনি। তুমি বেঙ্গলানি করেছ আমার সাথে।”

“আমার যেটা করা উচিত ছিল আমি সেটাই করেছি।”

যুক্তি-বুদ্ধির তাড়নার কথা শোনার ইচ্ছে নেই তার। “আর কিছু চাওয়ার আছে তোমার?”

“মুর্যাড আসছে না।”

দুই সন্তার এই মানুষটার কাজগুল ভীষণ আঘাত করছে তাকে।

“সেইন্ট-ডেনিসে যা-ই থাকুক না কেন, সেটা তোমার নিজেরই খুঁজে বের করতে হবে, তাকে ছাড়াই।” স্পষ্ট জানাল ম্যালন।

নিজের আবেগকে সামলে নিল সে অতি কষ্টে। “গুডবাই, কটন। আমরা আর কোনো দিন কথা বলব না।”
লাইনটা কেটে দিল সে।

চোখ দুটো বন্ধ করল ম্যালন।

খুব তীক্ষ্ণ একটা ঘোষণা—আমরা আর কোনো দিন কথা বলব না—ভেতরটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে তার। হেনরিকের মতো কোনো মানুষ এই রকমের কথা হালকাভাবে বলে না।

একজন বন্ধুকে হারাল সে।

গাড়ির পেছনের সিটে বসে ম্যালনের দিকে তাকিয়ে আছে স্টেফানি। নটর ডেম ছেড়ে তারা এখন এগিয়ে যাচ্ছে গেয়ার দৃশ্য নরদের ব্যস্ত একটা টার্মিনালে। লায়নের সাথে প্রথম কথা হবার পর আবার ফোন দিয়ে এখানে আসতে বলেছে সে।

সামনের কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ছে।

“হেনরিক ঠিক হয়ে যাবে, ওটা নিয়ে ভেব না,” স্টেফানি বলল। “তুম ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবলে আমাদের চলবে এখন? নিয়মটা তুমি জানোই। আমাদের কাজটা ঠিক রেখে বাকি সব।”

“সে আমার বন্ধু। আর তাছাড়া, অতো নিয়ম আমার স্টেল্লাগে না।”

“তুমি কিন্তু তাকেই সাহায্য করছ, হিসেব করে দেখ।”

“সে তো এটা বুবাতে পারছে না।”

গাড়ি-ঘোড়া বেশ ভালোই আছে রাস্তায়। এদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৃষ্টির গতি। রেলিং থেকে ব্যালকনি, সেখান থেকে ছাদ-সবই চোখে পড়ছে তার। রাস্তার দু'পাশে প্রায় প্রতিটা ভবনের ছাদ যেন ধূসর আকাশের গায়ে মাথা ঠুকে দিয়েছে আজ। কিছু পুরনো বইয়ের দোকান চোখে পড়লো তার। সেখানে পোস্টার, আদি আমলের ছাপা বই-পত্র, আর রহস্যগল্লের সমগ্র সাজিয়ে রেখেছে।

তার নিজের ব্যবসার কথা মনে পড়ে গেল তার।

থ্রিভাউন্সেনের কাছ থেকে কিনেছিল ব্যবসাটা। এই মানুষটাই তার বাড়ির মালিক, এবং তার বন্ধু। প্রতি বহুস্থিতিবার সন্ধ্যায় কোপেনহেগেনে তার সাথে ডিনার, ক্রিস্টিনাগোড়ে তার অসংখ্যবার বেড়াতে যাওয়া, এক সাথে কত অ্যাডভেঞ্চার, আরও অনেক কিছুই তারা করেছে এই দীর্ঘ সময়ে।

“বিরাট সম্পদের মালিক হয়ে যাবে স্যাম,” বিড়বিড় করে বলল সে।

গাড়ির স্রোত জানান দিচ্ছে গেয়ার দৃশ্য নরদে এসে পড়েছে তারা। লায়ন বলেছিল স্টেশনে পৌছে তাকে কল দিতে।

নিজের ফোনটা বের করল স্টেফানি।

মেট্রো স্টেশন থেকে বের হয়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করল স্যাম। দোকানগুলোর সামনের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া একচালা ছাউনিগুলোকে ছাতা হিসেবে ব্যবহার করে হাঁটছে সে। বাঁয়ে সেইন্ট-ডেনিস এর ব্যাসিলিকা। মেট্রো রেল ধরে দ্রুত এখানে এসেছে সে, ছুটির দিনের শেষ বিকেলে গাড়ির যে জ্যাম সেটা পোহাতে হয়নি তাকে।

প্লাজাগুলোর সামনে ভালো করে দেখতে লাগল, থ্রিভান্ডসেনকে খুঁজে পেতে হবে তাকে। রাস্তা-ঘাট ভেজা, যেন কালো চামড়ায় মোড়া হয়েছে পুরোটা জায়গা, ল্যাম্পপোস্টের হলদে আলোয় চকচক করছে সেগুলো।

লোকটা কি তাহলে চার্চের ভেতরে গেল?

এক তরুণ দম্পত্তিকে থামিয়ে জিজেস করল সে ব্যাসিলিকা সম্পর্কে, তারা জানাল যে এটা গত গ্রীষ্মকাল থেকে বন্ধ আছে বড় ধরণের সংক্ষারের কাজ চলছে সে জন্য। তাদের কথার সত্যতা পাওয়া গেল চার্চের বাইরের দেওয়ালে অনেকগুলো অঙ্গুয়ী মাচা দেখে।

তখনই সে থ্রিভান্ডসেন এবং মিগ্যানকে দেখতে পেল। বাঁ দিকে ফেরে লোকটা টেলার পার্ক করা, ঠিক তার কাছেই ওরা দাঁড়িয়ে, হয়ত দু'শ ফিট দূরে হবে তার থেকে।

তাদের দিকে এগিয়ে গেল স্যাম।

বৃষ্টির জন্য কোটের কলারটা ভাঁজ খুলে উপর দিকে তুলে দিল অ্যাশবি। ক্যারলাইন এবং পিটার লায়নের সাথে হাঁটছে সে, রাস্তা-ঘাট ফাঁকা। আকাশ ভরা ঘন মেঘ নিচের পৃথিবীকে অন্য এক রঙে ঢেকে দিয়েছে। ইঞ্জিনের নৌকায় করে সেইনে নদীর উপর দিয়ে আসছিল তারা। নদীটা যখন বাঁক নিল উভারে, তখন সেটা ছেড়ে একটা সরু খাল ধরে একটা ঘাটে এসে থেমেছে তারা। জায়গাটা সেইন্ট-ডেনিস ব্যাসিলিকা থেকে কয়েক মুক দক্ষিণে।

বড়-বড় বিল্ডিংগুলোর বাড়িয়ে দেওয়া ব্যালকনির নিচ দিয়ে তাদেরকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে লায়ন।

ফোনটা বেজে উঠল আফ্রিকানের।

রিসিভ করল লায়ন, তারপর এক মুহূর্ত শুনে নির্দেশনা দিল সে, “উভারে দেখবেন ব্যুল্ভারড দে ম্যাগেন্টা, ওটা দিয়ে এগিয়ে রখেখোআর্ট রাস্তা ধরে এলেই দেখবেন প্লেস দে ক্লিছি, ওখানে এসে আমায় ফোন দেবেন।”

ফোনটা কেটে দিল লায়ন।

ক্যারলাইন ভয়ে এখনো কাঠ হয়ে আছে। অ্যাশবি আশঙ্কা করছে মেয়েটা আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে পালাতে না শুরু করে। খুব বোকামি হবে সেটা। লায়নের মতো মানুষের পক্ষে তৎক্ষণাতে গুলি করে মেরে ফেলাটা খুব সহজ কাজ। হয় সম্পদ পাবে, না হলে না। কিন্তু এ দুয়ের মাঝে কিছু নেই। একটু ফাঁকফোকর, বা কোনোরকম একটু ভুল করলেই সেই সুযোগটা নিতে হবে তার। কিন্তু সেরকম কিছু না ঘটলে, লায়নকে খুব দামী কিছুর প্রস্তাৱ দিতে হবে। সেক্ষেত্ৰে একটা গোটা ব্যাঙ্ক দিয়ে দিতে পারে তাকে, যার মাধ্যমে ইচ্ছেমত টাকা বিভিন্ন জায়গায় পাচার করতে পারবে সে, আৱ কেউ তা নিয়ে কোনো প্রশ্নই কৰতে পারবে না।

দৰকাৱ হলে এটাই কৰবে অ্যাশবি।

তবে এই মুহূৰ্তে, সে মনে-প্রাণে আশা কৰছে ক্যারলাইন যেন লায়নের পৱন্তী প্ৰশ্ৰে উত্তৰগুলো জেনে থাকে।

আটষ্ঠি

থৰ্ভান্ডসেন এবং মিগ্যান ব্যাসিলিকাৱ উত্তৰ পাশে এখন। আলগা পাথৰ মিঞ্জনো পথে খুব ধীৱে হাঁটতে হচ্ছে তাদেৱকে। প্ৰাজা থেকেও বেশ কিছুটা দূৰে তার।

“একটা পুৱনো মঠ আছে এখানে,” ত্যাকে বলল মিগ্যান দক্ষিণ দিকটায়। ব্যাসিলিকাৱ মতো অতটা পুৱনো না। উনিশ শতকে বানানো সৰ্বিও ওটাৱ কিছু অংশ আৱও আগেৱ কৱা। এখন ওটাকে কলেজ বানানো হচ্ছে। মঠটা একেবাৱে এই জায়গাৱ ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। মন্টমাৰত্ৰে নৰমেস্ক একটা পাহাড়ি অঞ্চল আছে কাছেই, আৱ ওখানেই ধৰ্মপ্ৰচাৱক সেইন্ট-ডেনিস শিৱচেদ কৱা হয়েছিল। কিন্তু শিৱচেদেৱ পৱ সেইন্ট-ডেনিস তার মাথাটা হাতে নিয়ে হাঁটা শুৱ কৱে, এবং প্ৰচলিত আছে যে প্ৰায় দশ কিলোমিটাৱেৱ মতো সে হেঁটে যায়, এৱ পৱ সে যে স্থানে পড়ে যায় সেখানেই তাকে সমাহিত কৱা হয়। এক ধাৰ্মিক নাৱী প্ৰ্যারিসেৱ এই প্ৰথম বিশপকে কৱৰ দেয়। এৱপৱেই একটা মঠ বানানো হয় ওই স্থানেৱ উপৱ, যেটা পৱবৰ্তীতে,” চাৰ্চেৱ দিকে ঘুৱে দেখাল সে—“এই বিৱাট দৈত্যাকাৱ স্থাপনায় রূপান্তৰিত কৱা হয়।”

থৰ্ভান্ডসেন শুনছে, কিন্তু মাথায় তার ভাবনা কিভাৱে ভেতৱে ঢোকা যায় সেটা নিয়ে। উত্তৰ দিকে তিনটা প্ৰবেশপথ, লোহাৱ পুৱ শিক আটকে আছে সবগুলোতেই। সামনেই হাঁটাৱ জন্য একটা অ্যামুলেটিৱ, পাথৱে বানানো অৰ্ধ-বৃত্তাকাৱ একটা পথ, নানান রঙেৱ কাঁচ লাগানো ওটাৱ গায়ে।

বৃষ্টি ঝৱেই পড়েছে।

কিছুৱ নিচে দাঁড়াতে হবে তাদেৱ।

“চল ওদিকটা ঘুৱে দক্ষিণ দিকটায় যাই।” সে বলল।

ব্যাসিলিকা দেখে প্রশংসা না করে পারল না অ্যাশবি। কী নিপুণ শিল্প দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে ভবনটাকে। পাথর বিছানো পথটা ধরে দক্ষিণ দিক দিয়ে চার্চের সামনে পৌছাল তারা। সংস্কারের কাজ চলার জন্য বেশ কিছু মাচা স্থাপন করা হয়েছে দেওয়ালের বিভিন্ন প্রান্তে, তারই একটার ভেতর দিয়ে ঢুকেছে তারা।

তার চুলগুলো ভিজে জবজব করছে, শীতে চোখদুটো মনে হচ্ছে যেন জমে গেছে। কপাল ভালো মোটা কোট, চামড়ার মোজা আর লম্বা আভারওয়ার গায়ে দিয়ে বের হয়েছিল সে। ক্যারলাইনও শীতের পোশাক পরা, কিন্তু তার সোনালী চুলগুলো ভিজে মাথার সাথে সমান হয়ে লেগে আছে। চারদিকে নানান রকমের প্লাস্টার, ইট-পাথরের টুকরো, মার্বেল, সিমেন্ট পড়ে আছে। একটা টেলার গাড়ি থামানো রাস্তার উপর, সেটাও নির্মাণকাজের জন্য। ওটার একটু দূরে দশ বা বার ধাপের একটা সিঁড়ি উঠে শিয়েছে দুই কপাট ওয়ালা দুটো দরজার দিকে।

লায়ন সিঁড়ি উঠে গেল সেখানে, তারপর দরজাটা টেনে দেখল।

বন্ধ।

“ওখানে একটা লোহার পাইপ আছে, দেখতে পাচ্ছেন?” লায়ন বলল, একটা স্তুপের দিকে দেখিয়ে। “ওটা লাগবে আমাদের।”

কী করবে সে সেটা জানতে হবে অ্যাশবির। “আপনি কি ভেঙ্গে-চুরে ঢুকবেন?”
নড় করল লায়ন। “কেন নয়?”

দ্বিতীয়বারের মতো অ্যাশবির নাম্বারে স্টেফানিকে ডায়াল করতে দেখল ম্যালন। প্লেস দে ক্লিচ এর ব্যস্ত রাস্তায় এসে পড়েছে তারা। কয়েক দিক থেকে সরু রাস্তা এসে এখানে বড় রাস্তায় ঘিশেছে। চারদিকে ব্যস্ততা।

“গেয়ার সেন্ট ল্যাজারে পার হয়ে রুই দামস্টারদামে ঢলে যান,” স্পিকারফোনে দিক-নির্দেশনা দিল লায়ন। “যে চার্চ আপনারা খুঁজছেন সেটা স্টেশন থেকে একটু সামনে। আমি রাখছি, একটু তাড়া আছে। আপনাদের হাতে সময় আধা ঘণ্টা, এর মধ্যেই ওটা ঘটবে। আরেকটা কথা, আমায় আর কল দেবেন না, আমি ধরব না।”

ড্রাইভার জানে জায়গাটা সামনেই আসছে। তিনি মিনিটেরও কম সময়ে গেয়ার সেন্ট ল্যাজারেতে পৌছে যাবে সে।

স্টেশনের কাছেই দুটো চার্চ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

“কিন্তু কোনটা?” বিড়বিড় করে বলল স্টেফানি।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হেনরিক এবং মিগ্যানকে অনুসরণ করছে স্যাম। তারা ইতিমধ্যে একটা চক্র দিয়ে ফেলেছে। প্লাজার দিকে ব্যাসিলিকার অংশটা সোজা ও খাড়া, কিন্তু অন্য দিকটায় গোলাকার গঠনের।

খুব সাবধানে এগিয়ে গেল সে, এখনই থ্রিভান্ডসেনকে তার উপস্থিতি জানাতে চাইছে না।

চার্চের অর্ধেকটা ঘুরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেল সে।

ঘুরেই তাদেরকে দেখতে পেল স্যাম। ব্যাসিলিকা থেকে ছাদের মতো একটা অংশ পাশের স্থাপনার সাথে মিশেছে, আর ওটার নিচেই গাদাগাদি করে আছে দুজন। হঠাত একটা শব্দ এল থ্রিভান্ডসেন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তারও পেছন থেকে। মনে হলো যেন ধাতব বা শক্ত কিছু দিয়ে একইরকম কিছুর উপর আঘাত করা হয়েছে।

তারপর আরও শব্দ হলো সেদিকে।

।

ধাতব পাইপটা দিয়ে দরজাকে আটকে রাখা খিলটা ভেঙ্গে ফেলল অ্যাশবি।
খিলের বাকি অংশটা আপনাতেই খুলে পড়লো পাথরের সিঁড়ির ওপর
লায়ন আসতে করে খুলল দরজাটা। “খুবই সহজ কাজ।”
হাতের পাইপটা ছুঁড়ে দিল অ্যাশবি।
বন্দুকটা আবারো ভালো করে ধরল লায়ন, যত যা-ই ছেক, কোনো ঝুঁকি নেবে না
সে। ক্যারলাইনের দিকে ঘুরে গেল তারপর।
“তার অনুমান কতটা সঠিক এবার খুঁজে দেখা যাবে তাহলে।”

একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ম্যালন। “লায়ন যে সব সহজ করে দেবে এরকম আশা
করেছেন আপনি?” আপনি ডান পাশেরটায় যান, আমি বামে যাই।”

গাড়িটা থামল, এবং দু'জনেই বেরিয়ে পড়লো বৃষ্টির মাঝে।

।

ভেতরে চুক্তি পেয়েছে অ্যাশবি। ব্যাসিলিকার ভেতরটা শুকনো ও উষ্ণ। অল্লিকিছু।
বাতি জ্বলছে উপরে, কিন্তু ভেতরের অসাধারণ কারুকার্য বুঝতে অতুকু আলোই
যথেষ্ট। কলামগুলো সোজা উঠে গেছে উপরে, প্রায় ত্রিশ মিটারের মতো, দৃষ্টিনন্দন
খিলানপথ, সিলিং ধরে রাখা সূচালো ভল্টিং, সবকিছু যেন চোখ দুটো জুড়িয়ে দিচ্ছে।
রঙিন কাঁচের জানালাগুলো সংখ্যায় অগণিত, এখন কালো হয়ে আছে যিমিয়ে পড়া
আবহাওয়ার কারণে। চারপাশের দেওয়ালগুলো সোজা উঠে গেছে উপরে, কিন্তু
সেগুলোকে শক্ত করে ধরে রাখা পিলার বা এরকম কিছু চোখে পড়ছে না। কিন্তু অ্যাশবি

জানে এগুলোকে বাইরে থেকে ধরে রাখা হয়েছে একরকম পিলার দিয়ে। একরকম জোর করে সে এগুলোর দিকে মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করছে সে মানসিক চাপ থেকে একটু হলেও মুক্তি পাওয়ার জন্য। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে তাকে, যেন প্রস্তুত থাকতে পারে সুযোগটা এলেই সেটা কাজে লাগানোর।

“মিস ডড,” বলল লায়ন। “এবার তাহলে কী করব?”

“ওই বন্দুক ধরে রাখলে আমি চিন্তা-ভাবনা করতে পারব না,” কিছু না ভেবেই বলে দিল ক্যারলাইন। “কোনোভাবেই পারব না। বন্দুক আমি পছন্দ করি না। আপনাকেও পছন্দ করি না। এখানে থাকতেও ভালো লাগছে না।”

লায়নের নিষ্ঠুর চোখদুটো সরু হয়ে গেল। “যদি তা-ই হয়, তাহলে নিন।” হাতের বন্দুকটা কোটের ভেতর রেখে দিয়ে খালি হাত দুটো দেখাল তাকে। হাতে এখন শুধু হাতমোজা। “হয়েছে?”

খালি হাত দেখেই যে তার ভেতরটা শান্ত হবে সেটা আশা করেনি ক্যারলাইন। তবু চেষ্টা করছে মাথা ঠাণ্ডা রেখে, ধৈর্য ধরে কাজটা করে যেতে। “যেটাই করি, শেষমেশ আপনি আমাদের মেরেই ফেলবেন, জানি। তাহলে আপনাকে সব জানিয়ে কী হবে?”

নমনীয় ভাবটা লায়নের চোখ-মুখ থেকে হারিয়ে গেল এটা ঘনে। আমরা যেটা খুঁজছি সেটা পেয়ে গেলে, আমার মনটা পরিবর্তনও হতে পারে। আর তাছাড়া, লর্ড অ্যাশবি আমার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন, কোনো ভুল আপনি করলেই সেটার সুযোগ নেওয়ার অপেক্ষায় আছেন তিনি। এখন সে আসলেই একজন পুরুষ কিনা সেটা দেখার একটা সুযোগ থাকছেই আমাদের।”

শেষ কথাগুলো ধরে রাখল অ্যাশবি। “হয়তো সেরকম সুযোগ আমি পাব।”

লায়নের ঠোঁট দুটো আলাদা হয়ে গেল একটা বিস্ময়ের হাসি দিতে দিয়ে। “আমিও সেরকমই আশা করছি। তাহলে এখন, মিস ডড, কোনদিকে যেতে হবে?”

।

আধ-খোলা দরজায় কান পেতে শুনছে প্রভান্ডসেন। অ্যাশবি কিছুক্ষণ আগে দরজাটা ভেঙ্গে ঢোকার পর সে এবং মিগ্যান খুব ধীরে এগিয়ে এসেছে দরজার কাছে। অ্যাশবির সাথে ক্যারলাইন ডডও আছে, এবং সবুজ কোট গায়ে দেওয়া এক লোক। তাকে চিনতে প্রভান্ডসেনের কষ্টই হয়নি। এই লোকই অ্যাশবির সাথে নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল।

“এখন কী করব?” তার কানের একেবারে কাছে মিগ্যানের মুখ।

যৌথ-কারবার বন্ধ করতে হবে তাকে। প্রস্তানের জন্য ঘুরে দাঁড়াল সে।

দরজা ছেড়ে সরে এল তারা, আবারো বৃষ্টি মাথায় করে আগের সেই অল্প একটু ছাউনি দেওয়া স্থানে ফেরত এল দু'জন। একপাশে টয়লেট এবং একটা অফিসরুম

চোখে পড়লো থ্রিভাল্ডসেনের, বুবল যে এখান থেকেই টিকিট নিতে হয় ব্যাসিলিকায় চুকতে।

মিগ্যানের হাতটা ধরে ফেলল সে “আমি চাই এখান থেকে চলে যাও তুমি। এখনই।”

“সবকিছু সামলানোর মতো শক্তি আপনার নেই, মিস্টার ওল্ড ম্যান। আমাকে নিয়ে ভাববেন না।”

“শক্তির বিষয় না, তোমার এই কাজে জড়ানোর প্রয়োজনই নেই।”

“ওই মহিলা এবং সাথের লোকটাকেও মেরে ফেলবেন?”

“দরকার হলেই তাই।”

মাথাটা বাঁকুনি দিল সে। “সে সুযোগ হারিয়েছেন আপনি।”

“ঠিক। হারিয়েছি। তাহলে এবার চলে যাও।”

বৃষ্টি ঝরেই চলেছে, জলের ধারা ছাদ গড়িয়ে নিচে এসে পড়ছে, ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে চারপাশের সবকিছু। সবকিছুই যেন মনে হচ্ছে সমোহিত হয়ে ধীর গতিতে ঘটছে। সারাজীবনের বিচার-বিবেচনাবোধ প্রায় মুছে যেতে চলেছে অপরিসীম কষ্টের স্নোতে। সাই এর মৃত্যুর পর একটু সুখের জন্য সে কি কম চেষ্টা করেছে বিকল্প পথে? কাজ? ডুব দিতে পারেনি তাতে। রাজনীতি? নষ্ট জগত। জনদরদি কাজ? তাতেও শান্তি নেই এমনকি নিঃসঙ্গ কেউ, কটন বা স্যামের মতো, তার ভেতরে ক্ষণিকত জ্বলতে থাকা আগুন নেভাতে পারেনি। তাই এই কাজটা শুধু তার একার কারোরই এতে হাত লাগানো চলবে না।

“আমি ওদের হাতে মরতে চাই না,” বলল মিগ্যানের।

কথায় যেন তিরক্ষার বেজে উঠল মিগ্যানের।

“তাহলে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও।” নিজের সেলফোনটা ছুঁড়ে দিল মিগ্যানের দিকে। “এটার আর দরকার নেই আমার।”

বলেই ঘুরে গেল সে।

“ওল্ড ম্যান,” ডাকল সে।

থামল সে, কিন্তু ফিরল না মেয়েটার দিকে।

“ইউ টেক কেয়ার।” নিচু ও কোমল কষ্টে সত্যিকারের দুচিষ্ঠা।

“ইউ টু,” বলল সে।

তারপর বৃষ্টির ভেতর পা চালাল থ্রিভাল্ডসেন।

উন্সেন্টের

ওক কাঠের ভারী দরজা ঠেলে চার্চ অফ সেন্ট আন্দ্রের ভেতর ঢুকল ম্যালন। প্যারিসের গতানুগতিক চার্চের মতো এটাও, বহুজের মতো অনেকগুলো দেওয়াল একটার সাথে আরেকটা মিশে আছে, তাদের শীর্ষস্থানগুলো মিলেছে এক বিন্দুতে। ফ্লাইং বাট্টেস

খিলান দিয়ে উঁচু দেওয়াগুলো বাইরে থেকে ধরে রাখা হয়েছে। গথিক স্থাপত্যের একটা পরিপূর্ণ সমারোহ।

চার্চের মাঝি বরাবর রাখা দুই সারি আসনের সবগুলোই মানুষজনে পরিপূর্ণ। ভেতরটা গরম করার ব্যবস্থা থাকলেও বাতাসটা অনেক ঠাণ্ডা হওয়ায় গায়ের কোটগুলো যেন জমে যাচ্ছে শ্রোতাদের। উপাসনায় আসা বেশীরভাগ মানুষই, কেউ শপিং ব্যাগ, কেউ ব্যাকপ্যাক বা কেউ বড় পার্স নিয়ে এসেছে। যেগুলোর অর্থই হলো বোমা, বা যেকোনো ধরনের অস্ত্র খোঁজার কাজটা কয়েক লক্ষ গুণ কঠিন হয়ে গেল।

খুব ধীরে মানুষের জটলার কিনার ধরে এগিয়ে গেল ম্যালন। ভেতরটা কুঠুরি আর ছায়ায় ঘেরা। উঁচু কলামগুলো শুধু যে ছাদকে ধরে আছে তা না, কোনো আক্রমণকারীর লুকিয়ে থাকার পক্ষে যথেষ্ট স্থানও সরবরাহ করেছে ওগুলো।

ম্যালনের অস্ত্র ও সে নিজে উভয় প্রস্তুত।

কিন্তু কিসের জন্য?

ফোনটা কেঁপে উঠল। একটা কলামের আড়ালে চলে এল সে, চ্যাপেলের এদিকটা খালি। ক্রিনের দিকে একবার দেখে নিচু স্বরে উত্তর দিল সে।

“এখানকার কাজ শেষ,” বলল স্টেফানি। “লোকজন বেরিয়ে যাচ্ছে।”

এখানে ঢোকার সময়েই মনের ভেতর কেমন যেন একটা করেজ্জল ম্যালনের। তাহলে কি এখানেই?

“এদিকে চলে আসুন,” উত্তর দিল ম্যালন।

▲

প্রধান বেদীর দিকে এগিয়ে গেল অ্যাশবি। ব্যাসিলিস্কার ভেতরে পাশের এক প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকেছে তারা। সারি সারি চেয়ার পরিপাটি করে রাখা প্রধান বেদী থেকে একেবারে প্রধান দরজা পর্যন্ত। উত্তর পাশের দেওয়ালে বিরাট এক জানালা মেঘে ঢাকা দিনের কারণে অঙ্ককার হয়ে আছে। চেয়ারগুলোর মাঝে মাঝে কবর, সবদিকেই, আর প্রতিটা মার্বেল পাথর দিয়ে ঢাকা। বিভিন্নরকমের মূর্তি, স্তুতি চার্চের এক প্রাত থেকে কেন্দ্র হয়ে আরেক প্রাত পর্যন্ত একের পর এক দাঁড়িয়ে আছে, হয়ত একশ মিটার হবে ব্যন্তিতে।

“নেপোলিয়ন চেয়েছিল তার ছেলে এই সম্পদের মালিক হোক,” ক্যারলাইন বলল, তার কঠে ভয়। “এই সম্পদ সে খুব সতর্কতার সাথে লুকিয়ে রেখেছিল যেটার খোঁজ কেউ পাবে না। তবে কেউ খোঁজার মতো খুঁজলে অবশ্যই পাওয়ার কথা।”

“ক্ষমতায় থাকা যে কেউ-ই এরকম চাইবে,” বলল লায়ন।

বৃষ্টি ঝরেই চলেছে। তামায় মোড়া ছাদের উপর ঝনঝন শব্দ সৃষ্টি হয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে বৃষ্টির জলের মতই।

“নির্বাসনে পাঁচ বছর পার হয়ে যাবার পর, সে বুঝতে পারে যে ফ্রান্সে আর কোনদিন ফেরার সুযোগ নেই তার। সে এটাও জানত যে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। তাই সে তার ছেলের সাথে যোগাযোগ করে স্থানটা জানিয়ে দিতে চেয়েছিল।”

“অ্যামেরিকানরা একটা বই দিয়েছিল আপনাকে লভনে,” লায়ন বলল অ্যাশবিকে। “সেটা কি এর সাথে কোনভাবে সম্পৃক্ত?”

সায় দিল সে।

“আমায় তো বলেছিলে যে ওটা লাঘক তোমাকে দিয়েছে,” ক্যারলাইন অবাক হয়ে বলল।

“মিথ্যে বলেছে,” স্পষ্ট করে দিল লায়ন। “কিন্তু তাতে এখন কিছু যায় আসে না। বইটা গুরুত্বপূর্ণ কেন সেটা বলুন।”

“ওটার ভেতর একটা বার্তা আছে,” বলল ক্যারলাইন।

খুব অকপটে অনেক কিছুই বলে দিচ্ছে মেয়েটা, কিন্তু অ্যাশবির কোনো সুযোগই নেই তাকে মুখে লাগাম দিতে বলার।

“আর আমার ধারণা নেপোলিয়নের চূড়ান্ত বার্তাটার রহস্য সমাধান করে ফেলেছি,” যোগ করল ক্যারলাইন।

“বলুন আমাকে,” লায়নের লোভ ঠিকরে পড়ছে।

স্যাম দেখল থ্রিভান্ডসেন এবং মিগ্যান একসাথে বাইরে এসে দাঁড়াল, তারপর কিছু কথার পর মিগ্যান ফেরত আসতে শুরু করল এদিকে আর থ্রিভান্ডসেন গেল চার্টের দিকে। মিগ্যানকে আসতে দেখে স্যাম একটু পেছে সরে গিয়ে ঠাণ্ডা ও ভেজা দেওয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল। একটু প্রাতি ঘুরলেই মেয়েটা সামনে চলে আসবে তার। ঠিক জমে যাওয়ার মতো ঠাণ্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও ভেতরের উত্তেজনা তার ম্বায়গলোকে সজাগ রাখছে, শীত বা বৃষ্টি কোনোটাই এখন খুব গুরুত্বের না।

এসে পড়েছে মিগ্যান।

“কোথায় যাচ্ছ?” খুব নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল স্যাম।

থেমেই ঘুরে গেল মেয়েটি, ভালোই চমকে গেছে। “ওহ, স্যাম। ভয়ে তো মরেই যাচ্ছিলাম।”

“কি হচ্ছে এদিকে?”

“খুব বিরাট একটা ভুল করতে যাচ্ছে তোমার বন্ধু।”

সে নিজেও এটা বুঝতে পারছে। “ওদিকে শব্দ হলো কিসের?”

“অ্যাশবি সাথে আরও দু’জন নিয়ে চার্টের দরজা ভেঙ্গে ঢুকেছে ভেতরে।”

অ্যাশবির সাথে লোকটা কে, সেটা জানার দরকার স্যামের। তাই সে কিছুক্ষণ আগে যেগুলো হয়েছে সেগুলো জানাল মিগ্যানকে। নৌকার উপর যে ঘটনা হলো সেটাও বলল, এবং অ্যাশবিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া লোকটার বর্ণনা দিল তাকে। মিগ্যানের কাছ থেকে সব শুনতেই সে বুঝতে পারল সাথের লোকটি অবশ্যই লায়ন

হবে। বোধা মাত্রই স্টেফানিকে জানাতে হবে ভাবল সে। নিজের পকেট হাতড়ে ফোনটা বের করল দ্রুত।

“তাদের সাথে ট্র্যাকার সিস্টেম আছে,” বলল মিগ্যান, ফোনটা দেখিয়ে। “তারা জানেই তুমি কোথায় আছ এখন।”

জানার দরকার এখন নেই তাদের। স্টেফানি এবং ম্যালন এখন ব্যস্ত আছে লায়ন কী সব ভয়ঙ্গিতি দেখিয়েছে সেটা নিয়ে, এই বদমাশ তাদেরকে দৌড়ের উপর রেখেছে। আর এদিকে স্যামকে পাঠিয়েছে থ্রিভাঙ্গসেনকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে, কোনো ওয়ান্টেড ক্রিমিন্যালের মুখোমুখি হতে নয়। তাই স্যামের উপর নজরদারি এখন খুবই গৌণ বিষয় তাদের কাছে।

সমস্যা আরও আছে একটা।

এখানে পাতালটেনে করে এসেছে সে, সময় লেগেছে কুড়ি মিনিট। প্যারিসের কেন্দ্র থেকে সে এখন অনেক দূরের মফস্বলে, এবং ঝড়-বৃষ্টিতে একাকার।

তার মানে হলো এখন এই সমস্যাটা তার নিজেরই মোকাবেলা করতে হবে। চাইলেই ছট করে কেউ আসতে পারছে না এখানে।

এটা কখনো ভুলবে না, স্যাম। নির্বুদ্ধিতাই তোমার মরণ দ্রেকে আনবে। নরস্টামের কথাই ঠিক-খোদা তাকে শাস্তিতে রাখুন-কিন্তু হেনরিকের তাকে প্রয়োজন।

ফোনটা আবার পকেটে রেখে দিল সে।

“তুমি তো ভেতরে যাচ্ছ না, যাচ্ছ?” জিজেস করল মিগ্যান, মনে হচ্ছে যেন স্যামের মনের কথা পড়ে ফেলছে সে।

মুখে সেটা বলার আগেই, নিজের ভেতরে সে ক্ষণ্যত পারল যে কথাটা কতটা বেকুবের মতো শোনাচ্ছে। “যেতে হবে আমাকে।”

“আইফেল টাওয়ারে যাওয়ার মতো? যেখানে তুমি মরতে বসেছিলে সবার সাথে?”

“হ্রম, কিছুটা ওরকমই।”

“স্যাম, ওই বুড়ো অ্যাশবিকে খুন করতে চায়। আর কোনোকিছুই তাকে থামাতে পারবে না।”

“আমি থামাব।”

মাথাটা ঝাঁকাল মিগ্যান। “স্যাম, তোমাকে আমি পছন্দ করি, খুবই পছন্দ করি। কিন্তু তুমি একটা উন্মাদ, পাগল। এবার ক্ষান্ত দাও, যথেষ্ট হয়েছে।”

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, আবেগের স্তোত নেমে এসেছে সারাটা মুখে। গতকাল সুড়ঙ্গের ভেতর তাকে চুমু খাওয়ার কথা মনে পড়লো স্যামের। তখন থেকেই কিছু একটা অনুভব করছে সে, কেমন যেন একটা সম্পর্ক, একটা যোগাযোগ, একটা আকর্ষণ। আর এখনো সেগুলো তার চোখেই দেখতে পাচ্ছে স্যাম।

“আমি পারব না,” কঠটা ভেঙ্গে গেছে মেয়েটার।

আর কিছু বলতেও পারল না সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে চলে গেল বৃষ্টি ভেজা রাস্তা ধরে।

A

খুব সতর্কতার সাথে সামনে এগোনোর সিন্ধান্ত নিচে প্রভাসেন। অ্যাশবি ও তার সাথি দু'জনকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। বাইরের অন্ধকারের সাথে ভেতরের আঁধারি পরিবেশ প্রায় মানিয়ে গেছে, তাই ভেতরে চুকে পড়াটা খুব কঠিন হলো না। বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দ সাহায্য করছে তাকে।

চোকার পথটাই চার্টের প্রায় মাঝ-বরাবর গেছে। দেরী না করে বাঁ দিকে সরে গিয়ে একটা স্তম্ভের পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছাল সে। সেখানেই দুটো সমাধি, যেগুলোর গায়ের লেখা বলছে ১৬শ শতকের প্রথম ফ্রান্সিস এবং তার রানীর ওগুলো।

কিছু কথা-বার্তা শুনতে পেল সে। কিন্তু স্পষ্ট বোৰ্জা গেল না সেগুলো। চারপাশে আরও কিছু সমাধি স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোখে। সাথে সারিসারি চেয়ারও। খুব কাছ থেকেই কথার শব্দ আসছে কিন্তু আগের মতো শ্রবণশক্তি আর নেই তার, সাথে ছাদের উপর বৃষ্টির শব্দ বিষয়টাকে কঠিন করে তুলছে।

তাই আরও একটু এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আগের জায়াগাটা সামনের আরেকটা স্তম্ভের পেছনে লুকাল সে। একটা নারী মূর্তি এটা, আকারে ছোট আগেরটার থেকে। ভেজা কোট থেকে পানি লালমস্টোনের মেঝের উপর পড়ছে। সে খুব সাবধানে কোটটার বোতাম খুলে দেয়ে রেখে দিল নিচে তবে পকেট থেকে বন্দুকটা বের করে নেওয়ার পর।

কয়েক মিটার সামনে একটা কলামের দিকে প্রস্তুত গেল সে, দক্ষিণ অংশকে আলাদা করে দিয়েছে কলামটা। খুব সাবধানে, ক্ষেত্রে চেয়ারে শব্দ না করেই নিজেকে আড়াল করে নিল নিল সে।

একটা শব্দ মানেই তার সুযোগ ফসকে যাওয়া।

অ্যাশবি চুপচাপ শুনে যাচ্ছে ক্যারলাইন কিভাবে ভয়কে ঠেলে রেখে যা সে জানে তার সব লায়নকে বর্ণনা করে দিচ্ছে! পকেট থেকে একটা কাগজও বের করেছে মেয়েটা।

“এই রোমান সংখ্যাগুলো একটা ম্যাসেজ,” বলল ক্যারলাইন। “এটার নাম মুরস নট। এটা কর্সিকানরা শিখেছিল আরব জলদস্যদের কাছ থেকে যারা কর্সিকান উপকূলে ডাকাতি করত। এটা একটা কোড।”

কাগজটা হাতে নিল লায়ন।

CXXXIV || CXLI|| LI|| LXIII|| XVII||
|| VII|| IV|| VII|| IX||

“তারা এগুলোর মাধ্যমে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা নাম্বার, লাইন ও শব্দের কথা বলে দিত,”
ব্যাখ্যা করল ক্যারলাইন। “প্রেরক ও প্রাপকের কাছে একই রকমের বই থাকত।
যেহেতু শুধু তারাই জানত যে কোন বইটা ব্যবহার করা হচ্ছে, তাই অন্য কারো পক্ষে
এটার মর্মোদ্ধার করা অসম্ভব।”

“তাহলে আপনি কিভাবে এটা করলেন? ”

“নেপোলিয়ন তার ছেলের কাছে এই সংখ্যাগুলো ১৮২১ সালে পাঠিয়েছিল।
তখন ছেলের বয়স মাত্র দশ বছর। মৃত্যুর আগে নেপোলিয়ন তার উইলে ৪০০ বইয়ের
কথা উল্লেখ করে এবং বিশেষ করে একটা বইয়ের নাম সে বলে যায়। কিন্তু ছেলের
বয়স ঘোল না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো তার হাতে পৌছায় না। এখন এই কোডগুলো
অসম্পূর্ণ কারণ এখানে মাত্র দুই সারি সংখ্যা আছে, যেগুলো দিয়ে শুধু পৃষ্ঠা ও লাইন
নাম্বার বোঝা যাবে। এখন পাঠোদ্ধার করতে হলে, তার ছেলেকে, সঠিকভাবে বললে
ছেলের যা অর্থাৎ নেপোলিয়ন যার কাছে লিখেছিল তাকে ঠিক কোন শব্দ ব্যবহার করা
হয়েছে সেটাও জানতে হবে। এখন সেটা যে বই থেকেই হোক সেটা যে উইলের
কোনো বই থেকে হবে না তা নিশ্চিত, কারণ নেপোলিয়নের স্ত্রী বা ছেলে কেউই তখনও
জানে না উইলে কোন বই আছে বা নেই, কারণ নেপোলিয়ন তখনও জীবিত।”

ভয়ে কাঁপছে মেয়েটা, কিন্তু অ্যাশবি কিছু করতে পারছে না। বলুক ফ্যাবলার।

“তাই, আমি অনুমান করলাম আর ভাবলাম যে নেপোলিয়ন একটা সার্বজনীন
লেখাকেই বেছে নিয়েছে হয়ত। এমন একটা লেখা যা সব জুয়াগতেই পাওয়া যায়।
সহজেই পাওয়া যায়। তারপর আমি বুঝতে পারলাম যে ক্ষেত্রে সেটা খুঁজতে হবে তা
নেপোলিয়ন বলেও গেছে।”

লায়নকে মনে হচ্ছে যেন খুবই অবাক ও খুশী। “আপনি তো একেবারে
ডিটেকটিভের মতো কাজ করেছেন।”

এমন প্রশংসা তার অস্ত্রিতাকে দূর করতে পারল না।

অ্যাশবি এখন যা শুনছে, তা তার কাছেও নতুন, নতুন যেমন লায়নের কাছেও।

“বাইবেল,” বলল ক্যারলাইন। “নেপোলিয়ন বাইবেল ব্যবহার করেছিল।”

সম্ভব

সমবেত-মানুষের দিকে, একজন-একজন করে দেখতে লাগল ম্যালন। কয়েক সেকেন্ড
এভাবে দেখে প্রধান প্রবেশদ্বারের সামনে দৃষ্টি গেল তার, আরও কিছু মানুষের জটলা
সেখানেও। সুন্দর করে সাজানো এক প্রান্ত থেকে কিছু মানুষ আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে
নিজের উপর ক্রুস এঁকে নিচ্ছে। ওদের দিক থেকে ঘুরে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে
একজন মানুষকে দেখা গেল ক্রুশ আকার আনুষ্ঠানিকতা পাও না দিয়ে হেঁটে চলে
গেল। ছোট গড়নের লোকটার গায়ের রঙ ফর্সা, চুলগুলো কালো আর লম্বা ও বাঁকা
একটা নাক। হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে আছে গায়ের কালো কোটটা, হাতে চামড়ার মোজা, আর

মুখে কেমন একটা বিরক্তিকর অভিয্যান্তি । বেশ মোটাসোটা একটা ব্যাকপ্যাক ঝুলছে কাঁধে ।

একজন যাজক দু'জন সহকারি সাথে নিয়ে প্রধান বেদীতে হাজির হলো ।

সব উপাসনাকারীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য পিএ সিস্টেমের মাইকে একটা নারীকর্তৃ ঘোষণা দিল ।

চুপচাপ হয়ে গেল সবাই ।

ম্যালন এগিয়ে গেল বেদীর দিকে, তারপর বসার আসনের পেছনে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে শুনতে থাকল ধর্মীয় আলোচনাটা । এখানে দাঁড়িয়ে সুবিধাই হলো ম্যালনের । মাঝে কোনো আড়াল না থাকায় লম্বা নাকের লোকটাকে সহজে দেখা যাচ্ছে । লোকটা এখন উপর প্রান্তে বসা মানুষজনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । চার্চের সন্তগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছে তাকে এগিয়ে যেতে ।

আরও একটা সন্দেহভাজন মনে হওয়া লোকের দিকে মনোযোগ গেল তার । সে-ও চার্চের অপর অংশে । গায়ের রঙ অনেকটা গাঢ় জলপাই রঙের মতো, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, আকারের তুলনায় বড় এক কোট গায়ে, হাতে কোনো মোজা নেই । নিজেকে গালি দিতে লাগল ম্যালন, এত কিছু ঘটছে তার জন্যেই । ~~কোনো প্রস্তুতি বা~~ কোনো চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়নি, এক দুর্ঘট খুনি তার খেলায় দৌড়ের উপর রেখেছে তাদেরকে । এক অশরীরীর পেছনে ছুটছে তারা, যেটা ~~ত্রিকুই~~ একসময় ভ্রম, মিথ্যা প্রমাণিত হবে । এভাবে কোনো অপারেশন চলতে পারেনা ।

জলপাই রঙের দিকে মনোযোগটা আবারো ফিরিয়ে~~অন্তিম~~ ম্যালন ।

লোকটার ডান হাত কোটের পকেটে ঢোকান্তে~~আর~~ বাঁ হাতটা বাইরে । তার হাবভাব ভালো লাগল না ম্যালনের । কিন্তু তাকে~~কিছু~~ বলাটা যেন শেষমেশ অযৌক্তিক প্রমাণিত না হয় সেই আশঙ্কাই হচ্ছে ম্যালনের তেতর ।

নীরবতা ভেঙ্গে গেল একটা জোরাল কঢ়ের চিঞ্কারে ।

মাঝ-দ্রিশে থাকা এক নারী, কালো চুল, অমসৃণ মুখমণ্ডল, আসনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সে । কী যেন বের করে পাশের লোকটাকে দিচ্ছে । ফরাসি ভাষায় কী যেন বলছে সেগুলোর কিছু বুঝতে পারল ম্যালন ।

তারপর একটা হউগোল ।

তারপর চিঞ্কার দিয়ে যেয়েটা কিছু একটা বলল এবং আসন ছেড়ে দৌড়ে চলে গেল ।

▲

সেইন্ট-ডেনিসে খুব সাবধানে চুকল স্যাম, আশা করছে কেউ যেন না দেখে থাকে তাকে । ভেতরটা একেবারে শান্ত । থ্রিভাল্ডসেন, অ্যাশবি বা পিটার লায়ন কাউকে দেখা যাচ্ছে না ।

কাছে কোনো অস্ত্র নেই, কিন্তু তার বন্ধুকে একা বিপদের মোকাবেলা করতে দিতে পারে না সে। ডেনিশ বন্ধুটি তার জন্য যা করেছে সেটার প্রতিদান এখন দিতে হবে তাকে।

খুবই কম আলো থাকায় কিছু পার্থক্য করা যাচ্ছে না, সাথে বাইরে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় শব্দটাও শোনা যাচ্ছে না ভালো করে। বামে তাকাল সে। তখনই থ্রিভাল্ডসেনকে দেখা গেল, একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরুট একটা স্তম্ভের আড়ালে। প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরে আছে সে।

চার্চের মাঝ বরাবর থেকে কথা ভেসে এল।

ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কিছু শব্দ।

তারপরই আলোর দিকে তিনজন মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

থ্রিভাল্ডসেনের দিকে এগিয়ে ঝুঁকি নিল না সে, তাই নিচু হয়ে আরও কয়েক ফিট সামনে এগিয়ে গেল। প্রতিটা পদক্ষেপে বুকের ধকধকানি বাড়ছে তার।

▲

নেপোলিয়ন শেষ পর্যন্ত কী করেছিল, সেটার ব্যাখ্যা ক্যারলাইনের মুখ থেকে শোনার অপেক্ষায় আছে অ্যাশবি।

“আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে,” মেয়েটা বলে চলেছে। “নেপোলিয়ন বাইবেলের কিছু শ্লোক বা স্তবক ব্যবহার করেছিল।” রোমান সংখ্যাগুলোর প্রথম সারির দিকে দেখাল সে।

CXXXV

II

“১৩৫ নাম্বার স্তবক, শ্লোক বা চরণ নাম্বার দুই,” মেয়েটা বলল। “আমি লাইনটা বাইবেল থেকে লিখে নিয়েছিলাম।”

পকেট থেকে আরও একটা কাগজ বের করল সে।

“‘হে পরমেশ্বরের দাসগণ, তোমরা পরমেশ্বরের মন্দিরে  আমাদের ঈশ্বরের সৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাঁহার ধন্যবাদ কর।’”

লায়ন একটু হাসল। “দারুণ। তারপর?”

“পরের সংখ্যা দুটো ১৪২ নাম্বার স্তবকের নাম্বার চরণ। ‘আমার দক্ষিণে তাকাইয়া দেখ।’”

“আপনি কিভাবে জানলেন যে—” কথা শুরু করেছিল লায়ন, কিন্তু একটা শব্দ হলো, প্রধান বেদীর কাছেই, এবং যেন্দ্রজো দিয়ে তারা চুকেছে সেদিক থেকে সম্পূর্ণ মনোযোগটা ওদিকে চলে গেল লায়নের।

ডান হাত অস্ত্রটা তুলে নিয়েছে, আর সাঁই করে দেহটা ঘুরে গিয়েছে সেদিকে

“বাঁচান!” চিৎকার দিল ক্যারলাইন। “আমাদেরকে বাঁচান! গুলি করে আমাদের মেরে ফেলল!”

অন্তর্টা এবার ক্যারলাইনের দিকে তাক করল লায়ন।

কিছু একটা করতে হবে অ্যাশবিকে।

“গুলি চালালে বোকামি হবে,” বলল অ্যাশবি। “জায়গাটার কথা সে ছাড়া কেউ জানে না।”

“তাকে চুপচাপ দাঁড়াতে বলুন, আর একটা শব্দ যেন না করে,” আদেশ দিল লায়ন, বন্দুকটা ক্যারলাইনের দিকে।

নিজ প্রেমিকার দিকে তাকাল অ্যাশবি। তারপর একটা হাত উঁচু করে তাকে থামানোর চেষ্টা করল। “পিজি, ক্যারলাইন, থাম, যেও না।”

মনে হলো যেন আদেশের গভীরতাটা বুঝতে পারল সে, তারপর থামল।

“হয় সম্পদ পাব, না হলে না,” বলল লায়ন। “কিন্তু আর একটা শব্দ যদি সে করে, তার অবস্থা শেষ।”

নিজের জীবনকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে যে ঝুঁকিটা নিল ক্যারলাইন^{ডেড}, সেটা নিজ চোখে দেখেছে থ্রিভাল্ডসেন। শব্দটা সে নিজেও শুনেছে, দরজার দিক থেকে এসেছে। পঞ্চাশ মিটারের মতো দূরে, বেশকিছু সমাধি রেখে আরও পেছন থেকে এসেছে শব্দটা।

কে বা কারা এসেছে ভেতরে।

এবং তাদের উপস্থিতির জানানও দিয়েছে।

পেছনের শব্দে স্যাম ঘুরে তাকাল দরজার দিকে একটা কালো অবয়ব দেখা গেল সেখানে, এগিয়ে আসছে একটা সিঁড়ির দিকে যেটা প্রধান বেদীর পেছনে উঠে গিয়ে আরেক লেভেলে গিয়ে মিশেছে।

ছায়ার আকার ও গঠন থেকে মানুষটার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল।

মিগ্যান মরিসন।

অ্যাশবি লক্ষ্য করল, বাইরে ঝড়-বৃষ্টির গতি আরও বেড়েছে। যে দরজা ভেঙ্গে তাড় চুকেছে, সেটা আরও মেলে আছে এখন।

“বাইরে তুফান হচ্ছে,” লায়নকে বলল সে।

“একেবারে চুপ।”

অবশ্যে লায়নকে খ্যাপান গেল। একটু হাসতে চাইল অ্যাশবি, কিন্তু এই ভুল কাজ মোটেও করা যাবে না এখন।

লায়নের হলদে চোখ দুটো ঠিক যেন ডোবারম্যান কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে কিছু, এই মৃদু আলোর গুহার ভেতর, যেটা এখন তাদেরকে ঘিরে আছে সবদিক থেকে। নিজে যেদিকে ঘুরে যাচ্ছে বন্দুকটিও সেদিকে তাক করছে সে।

অ্যাশবি এবং লায়ন একই সময়ে দেখল কিছু একটা।

তাদের থেকে ত্রিশ মিটারের মতো দূরে, প্রধান বেদীর ডান দিকের সিঁড়ির উপর দিয়ে, কেউ বা কিছু উঠে যাচ্ছে বেদীর উপরের দিকে।

কেউ একজন আছে ওখানে।

গুলি করল লায়ন। পরপর দুইবার। শব্দগুলো মনে হলো যেন বেলুন ফাটার মতো। শব্দ শুষে নেওয়া বন্দুকের সাইলেন্সারকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল অ্যাশবি।

চাপা শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে না যেতেই শুন্য থেকে একটা চেয়ার উড়ে এসে পড়লো সরাসরি লায়নের ওপর।

এবং তারপর আরও একটা।

একান্তর

মানুষজন ধাক্কা দিয়ে জায়গা করে নিয়ে ছুটে গেল মহিলাটি, ম্যালন দেখছে চুপচাপ। যে লোকটার সাথে তার কথা কাটাকাটি হলো সে-ও আস্তে ছেড়ে মহিলাটির পেছনে ছুটছে। প্রধান বেদীর থেকে বিপরীত দিকে তাদের গুরুত্বার্থমানে প্রধান দরজার দিকে ছুটছে দু'জনই। লোকটার গায়ে নাইলনের পাতলা কেটা, সামনের অংশ খোলা, এবং সন্দেহ করার মতো কিছুই চোখে পড়লো না ম্যালনের।

দৃষ্টি তার ফিরে এল উপস্থিত মানুষের দিকে।

লম্বা নাকের লোকটা এখন প্রধান বেদীর দিকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, তারপর হাঁটু ভেঙ্গে বসেছে প্রার্থনার জন্য। তার আশেপাশের আসনগুলোর অর্ধেকটাই মানুষে ভরা।

জলপাই রঙের লোকটাকে আবারো দেখা গেল, ছায়া ছেড়ে এখন সে বেদীর কাছে তবে ম্যালনের ঠিক বিপরীত পাশে। লোকটা আরও এগিয়ে গেল এবং সবচে সামনে বসা দর্শককে ঠেলে নিজেকে একেবারে বেদী থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া ভেলভেটের পাদদেশে নিয়ে গেল। সামনে আর যাবার রাস্তা নেই।

যা দেখছে ম্যালন সেটা ভালো লাগছে না তার।

হাতটা জ্যাকেটের ভেতর চলে গেল ম্যালনের, তারপর বন্দুকটা হাতে নিল সে।

স্যাম পরিষ্কার দেখতে পেল লায়নকে মিগ্যানের দিকে গুলি ছুড়তে। বুলেটগুলো পাথরে আছড়ে পড়ার শব্দ শুনে মনে-মনে আশা করল সে মিগ্যান অক্ষত আছে।

নতুন আরেকটা শব্দ হলো চার্চের ভেতর।

এবং তার পরে আরও একটা।

▲

অ্যাশবির চোখের সামনেই লায়নের উপর ভাঁজ করা চেয়ার দুটো আছড়ে পড়লো। এমন অতর্কিত আক্রমনে পুরোপুরি হতচকিত সে। নিজের ভারসাম্য ঠিক রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে লায়নকে। চার্চে কে চুকেছে সেদিকে মনোযোগটা যেতেই ক্যারলাইন দুটো চেয়ার ছাঁড়ে মেরেছে লায়নের ওপর।

তারপরেই অন্ধকারে পালিয়েছে মেয়েটা।

নিজেকে আরও একটু সামলে নিয়ে লায়ন বুঝতে পারল ক্যারলাইন ভেগেছে।

বন্দুকটা নেমে এল একটু, ঠিক অ্যাশবির দিকে এখন।

“আপনি যেহেতু বললেন যে,” লায়নের কষ্টে চাপা উত্তেজনা। “সে ছাড়া ওটার আসল অবস্থা আর কেউ জানে না, তাই আপনাকে আর কোনো দরকার নেই আমার।”

বিষয়টা লায়ন বুঝলেও ক্যারলাইন মনে হচ্ছে বুঝল না।

“ওকে-ফিরিয়ে-আনুন।”

“ক্যারলাইন,” চিত্কার দিল সে। “তোমার ফিরে আসুন দরকার।” এর আগে কোনো দিন নিজের দিকে বন্দুক তাক করেনি কেউ। আঞ্চলিক বেশ ভয়ের অনুভূতি এটা।

আর খুব খারাপও লাগছে এতে।

“এখনি আস। প্লিজ!”

BanglaeBook.Org

▲

থ্রভাল্ডসেন দেখল দুটো চেয়ার লায়নের দিকে ছাঁড়ে মেরেছে ক্যারলাইন। এরপর মেয়েটা চার্চের পশ্চিমের অংশে ছুটেছে। সমাধি, স্তৰ্প এবং কলামগুলোকে ব্যবহার করতে হয়েছে নিজেকে আড়াল করা জন্য, এবং একই সাথে সামনে এগোনোর জন্য। অন্য কোনো পথ নেই, কারণ বিপরীত দিকে গেলে সেটা পিটার লায়নের খুব কাছে হয়ে যাবে, আর ওদিকটায় আলোও বেশী।

কম আলোয় নিজের চোখ মানিয়ে গেছে থ্রভাল্ডসেনের, তাই সহজেই নিজের অবস্থানে থেকে একদিকে লায়ন এবং অ্যাশবির দিকে নজর রাখতে পারছে, আবার ডানের নীরব পরিবেশের দিকেও দেখে নিতে পারছে সতর্ক থাকতে।

ঠিক তখনই মেয়েটাকে দেখতে পেল সে।

পা টিপে তার দিকেই এগিয়ে আসছে সে। মনে হচ্ছে দক্ষিণের খোলা দরজাটাই তার লক্ষ্য বাইরের ঘড়-বৃষ্টি এখনো তাদের অবস্থান জানান দিচ্ছে ওই দরজা দিয়ে।

আর বের হবার পথ ওটাই এখন শুধু ।

সমস্যা হলো, লায়নও সেটা জানে ।

।

আঙুলগুলো বেরেটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে । যদিও শুট করার ইচ্ছা নেই, কিন্তু দরকার হলে জলপাই রংকে সেটাই করবে ম্যালন ।

টার্গেটটা এখন তার থেকে ত্রিশ ফিটের মতো দূরে, এবং তার কোনোরকম নড়ে-চড়ে ওঠার অপেক্ষায় আছে ম্যালন । একটা মহিলা এগিয়ে গেল জলপাই রঙের কাছে, গিয়েই নিজের বাহু দিয়ে দিয়ে লোকটার বাহু জড়িয়ে ধরল । তারপর তার গালে একটা চুম্ব দিল সে । লোকটার চোখে-মুখে বিস্ময়, কিন্তু তারপরেই তারা কথা শুরু দিল ।

এরপর তারা ঘুরে গিয়ে হাঁটা শুরু করল প্রধান দরজার দিকে ।

হাতের বন্দুকটার উপর শিথিলতা নেমে এল ম্যালনের ।

ফলস অ্যালার্ম, ভাবল মনে-মনে ।

তার দৃষ্টি এবার মানুষজনের ভিড়ের দিকে । লম্বা নাকের লোকটাকে দেখা গেল আসন ছেড়ে মাঝের সারির দিকে যেতে ।

ম্যালনের চোখ দুটো বিরতিহীন খুঁজে চলেছে বিপদটাকে । পুরো জীয়াগাটা খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া উচিত তার, কিন্তু এটা করলে আকর্কটা জিনিস ঘটে যেতে পারে ।

নাক-লম্বাটা আসন ছাড়ার পর সেখানে একটা মহিলাটাড়িয়ে গেল, তার হাতে একটা ব্যাকপ্যাক । লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল মহিলাটি, দেখাচ্ছে যে ব্যাগটা ফেলে গেছে সে । নাক-লম্বাটা তাকে পাত্রা না দিয়ে হাঁটতে থাকল । হাল ছাড়ল না মহিলাটাও । মাঝের সারি ছেড়ে লোকটার পেছনে ছুট দিল সে ।

ম্যালন এখনো এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে সব ।

পেছনে তাকাল নাক-লম্বাটা, দেখল এক মহিলা তার দিকে আসছে, হাতে একটা ব্যাকপ্যাক । তার দিকে ছুটে গেল লোকটা, তারপর হাঁচকা টানে কালো নাইলনের ব্যাগটা কেড়ে নিয়েই সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল সে । মার্বেলের পিছিল মেঝের উপর দিয়ে ব্যাগটা সড়াৎ খেয়ে গিয়ে থামল বেদীতে ওঠার সিঁড়ির মুখে ।

ঘুরে গিয়েই নাক-লম্বাটা ছুট দিল দরজার দিকে ।

মস্তিষ্কের পর্দায় মেঞ্চিকো সিটির ভাবনাটা উঁকি দিল ম্যালনের ।

এটাই খুঁজছে সে ।

কিছু কর, ম্যালন ।

হামাগুড়ি দিয়ে থ্রিভাল্ডসেনের দিকে এগিয়ে আসছে ক্যারলাইন। এটারই অপেক্ষায় আছে থ্রিভাল্ডসেন। মেয়েটা খুব বুদ্ধি করে দেয়ালের খাঁজগুলো ব্যবহার করছে ধীরে দক্ষিণ দিকের দরজার দিকে এগোনোর জন্য। নিজেকে একটু এগিয়ে নিয়ে প্রস্তুত করে নিল থ্রিভাল্ডসেন, এক হাতে বন্দুকটা ধরা। মেয়েটা এখন সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ধরে ফেললেই হবে। চোখের সামনে দিয়ে একে যেতে দেওয়া যায় না। গত কয়েক বছর ধরে এই মেয়ে অ্যাশবির সাথে অনেক শলা-পরামর্শ, অনেক বড়বগ্র করেছে যার প্রায় সবটাই শুনেছে অ্যাশবি তার গুঙ্গচরের কল্যাণে। অ্যাশবি যা করেছে সে তুলনায় তাকে ছাড় দেওয়া গেলেও একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা না মেয়েটা।

রেনেসাঁর সময়ে করা একটা মার্বেলের শবাধার ধরে নিজেকে আরও আড়াল করে নিল থ্রিভাল্ডসেন। সমাধির যে পাশটা বেশী প্রশংসন, সেখান দিয়ে যাচ্ছে ডড, এখানকার স্তুপটা অনেক বড় হওয়ায় তাকে দুর্দিক দিয়েই দেখতে পাওয়া কঠিন। আরেকটু মেয়েটা এগোতেই একটা বাহু দিয়ে তার গলাটা পেঁচিয়ে ধরে হাতের তালুটা মুখের উপর চেপে ধরল থ্রিভাল্ডসেন।

এক ঘটকায় তাকে নিচের দিকে নামিয়ে এনে অন্য হাতের বন্দুকটা গলার সাথে লাগিয়ে ধরল সে, তারপর ফিসফিস করে বলল, “চুপ; একেবাক্তৃচুপ। নইলে আমি ওই লোককে জানিয়ে দেব তুমি এখানে। আমার কথা বুঝে থাকলে মাথা নাড়ো।”

সেটাই করল সে, হাতটাও আলগা করে দিল থ্রিভাল্ডসেন।

একটু পেছনে সরে গেল মেয়েটা।

“কে আপনি?” নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

তার প্রশ্নের মাঝে কেমন একটা আশার উপস্থিতি বুঝতে পারল সে, যেন মেয়েটা ভাবছে লোকটা তার বন্ধু বা উদ্ধার করতে এসেছে তাকে। আর এই সুযোগটাই নিতে হবে তাকে, ভাবল থ্রিভাল্ডসেন।

“এমন কেউ যে তোমার জীবন বাঁচাতে পারে।”

▲

নিজের অভিব্যক্তিটা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে চাইছে অ্যাশবি। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাক করা বন্দুকের দিকে, আর ভাবছে এটাই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত কিনা।

তাকে বাচিয়ে রাখার কোনো কারণই নেই লায়নের।

“ক্যারলাইন,” আরও জোরে চিন্কার দিল অ্যাশবি। “জলদি ফিরে এস। তোমার দোহাই লাগে। তুমি না আসলে এই লোকটা আমায় মেরে ফেলবে।”

▲

প্রভাসেন যে কাজ করার জন্য এসেছে সেটা পিটার লায়ন করবে এটা হতে দিতে পারে না সে।

“লায়নকে বল যে এখানে এসে তোমায় নিয়ে যেতে,” ফিসফিস করে বলল প্রভাসেন।

নাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করল ক্যারলাইন ডড।

তাকে নিশ্চয়তা দিতে হবে। “তুমি বললেই সে ছুটে আসবে না। কিন্তু এটা করলে অ্যাশবি আরও খানিকটা সময় পাবে।”

“আপনি আমাদেরকে চেনেন কিভাবে?”

ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় নেই তার, তাই বন্দুকটা তাক করল মেয়েটার দিকে। “যা বললাম কর, নইলে গুলি করে দেব।”

।

এবার কিছু করার দরকার, ভাবল স্যাম। তাকে জানতে হবে মিগ্যান ঠিক আছে কিনা। বেদীর পেছনে সিঁড়ির উপরে আর কোনো নড়াচড়া দেখতে পায়নি সে। লায়নকে মনে হচ্ছে ক্যারলাইন ডডের দিকেই বেশী খেয়াল এখন, অব্যাহত চাপ স্টিক্যু যাচ্ছে অ্যাশবিকে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

লায়ন যেহেতু অন্য খেয়ালে আছে, সেহেতু এখন কিছু একটা ক্ষুরা যেতে পারে।

“হেই, স্টুপিড,” হাঁক দিয়ে উঠল মিগ্যান অঙ্ককার থেকে, “কেমন গুলি ছুড়লে, একটাও লাগল না।”

কী হচ্ছে এসব!

“তো আপনি কে বলছেন, শুনি?” অঙ্ককারকে জিজ্ঞেস করল লায়ন।

প্রশ্নের উত্তরটা অ্যাশবিরও জানা দরকার।

“সেটা জেনে ভালো লাগবে না তোমার।”

পাথরের দেওয়ালে কথার প্রতিধ্বনি এমনভাবে হচ্ছে যে বোৰা কঠিন মহিলাটি ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অ্যাশবি নিশ্চিত যে সিঁড়িতে উঠতে দেখা মানুষটাই এই কথাগুলো বলছে।

“তাহলে মরার জন্য প্রস্তুত হন,” লায়ন বলল।

“আগে তো আমাকে পেতে হবে, তারপরে মারার হিসাব। তার মানে আমাকে খোঁজার আগে লর্ড অ্যাশবিকে মারতে হবে আপনার।”

মেয়েটা তার নামও জানে। কে সে?

“আমি কে সেটাও জানেন, আপনি?”

“কুখ্যাত সন্তাসী পিটার লায়ন।”

“আপনি কি অ্যামেরিকানদের লোক?” জিজ্ঞেস করল লায়ন।

“আমি কারো সাথেই নেই, আমি একাই সব।”

লায়নের দিকে তাকাল অ্যাশবি। লোকটার মাথা খারাপ হবার উপক্রম সেটা বোঝা যাচ্ছে। বন্দুকটা এখনো তার দিকেই তাক করা কিন্তু মনোযোগটা ভেসে আসা কঠের দিকে।

“কী চান আপনি?” প্রশ্ন লায়নের।

“তোমার চামড়াটা।”

হেসে দিল লায়ন। “এই পুরস্কারটা অনেকেই ব্যাকুলভাবে চায়।”

“আমিও এরকমই শুনি। কিন্তু পার্থক্য হলো আমিই সেই মানুষ যে এটা নিয়েই ছাড়বে।

▲

মিগ্যান এবং লায়নের বাতচিত শুনে গেল থ্রিভাল্ডসেন। সে বুঝতে পারছে মেয়েটা আসলে একটা ঘোলাটে পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে, কোনো একটা ভুল করতে বাধ্য করছে লায়নকে। বেশ বেপরোয়া হতে হচ্ছে মেয়েটাকে। কিন্তু সে হয়ত পরিস্থিতিটাকে ভালোই মেপে নিতে পেরেছে। লায়নের ভাবনা জুড়ে এখন সম্ভাব্য ত্রিমুক্তি বিপদের আশংকা। অ্যাশবি, ক্যারলাইন, এবং অপরিচিত কঠের মানুষটি। যেজনে একটাকে বেছে নিতে হবে তার।

থ্রিভাল্ডসেনের বন্দুকটা এখনো ক্যারলাইন ডডের উপর তাক করা। মিগ্যান যেরকমটা বলল সেটা হতে দেওয়া যাবে না। হাতের ক্ষেত্রে দিয়ে সামনের দিকে দেখাল সে, তারপর ফিসফিস কঠে বলল। “তাকে বলতে তুমি ধরা দিচ্ছ।”

প্রস্তাবটা সে বিবেচনা করেছে বলে মনে হচ্ছে। মোটের উপর, বন্দুকের সামনে বিবেচনা না করেই বা উপায় কি।

“ঠিক আছে, লায়ন,” অবশ্যে চিন্কার দিল ক্যারলাইন। “আমি ফিরে আসছি।”

▲

সবচে কাছের বেঞ্চ-সারির মাঝ দিয়ে কোনোমতে নিজেকে ঠেলে সামনে নিয়ে যাচ্ছে ম্যালন, সামনে-পেছনে সব জায়গায় মানুষজন বসে আছে। সে অনুমান করল হাতে এক থেকে বড়জোর দুই মিনিট সময় আছে। মাক-লম্বাটা আক্রমণ থেকে নিজে বাঁচার পরিকল্পনা করেই নিয়েছে আগে, তার মানে দুর্ঘটনা ঘটার আগেই চার্চ থেকে বের হয়ে যাবার সময়টা তার হাতে আছে। কিন্তু ওই সদয় ভদ্রমহিলা ব্যাগটা নিয়ে লোকটার সাথে দেন-দরবার করতে গিয়ে বেশ কিছুটা সময় খেয়ে নিয়েছে।

মাঝের সারিতে পা দিয়েই বেদীর দিকে ঘুরে গেল সে।

সবাইকে সতর্ক করার জন্য মুখটা খোলার সাথেই তার মনে পড়লো কাজটা বিরাট বড় বোকামি হয়ে যাবে। যেকোনো ধরণের সংকেতই তাকে এখন ব্যর্থ করে দিতে পারে। একমাত্র উপায় হলো বোমাটাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া।

সবার দিকে খেয়াল রাখার মাঝেই চারপাশের গঠনটা ভালো করে দেখে নিল সে।
বেদীর ঠিক সাথেই একটা সিঁড়ি, উঠে গেছে, তার দেখে মনে হচ্ছে, একটা
সমাধিকক্ষের দিকে। প্রায় প্রতিটা পুরনো চাচেই একটা করে এরকম ক্রিপ্ট থাকে।

সে দেখল প্রিস্ট তাকে এরকম ছুটতে দেখে বক্তব্য থামিয়ে দিয়েছে।

ব্যাকপ্যাকের কাছে পৌছাল ম্যালন।

ঠিক-বেঠিকের হিসাব করার সময় এখন নেই।

ওটা তুলে নিল হাতে মেঝে থেকে-ওজন ভালোই-তারপর বাঁ দিকে ছুটে গিয়েই
ছুঁড়ে দিল সেটা দশ ফিট নিচের সিঁড়ির উপর, লোহার একটা গেট খোলা রয়েছে শুধু
ওখানে, আলো খুব সামান্য।

ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল যেন কেউ না থাকে ওখানে।

“সবাই শুনুন,” ফরাসি ভাষায় হাঁক দিল ম্যালন। “সাবধান, ওটা একটা বস্তু।
নিচের ফ্লোরে, বেঞ্জের পেছনেই।”

অনেকেই চোখের আড়াল হয়ে গেল, আর বাকিরা দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে।

“গেট ডাউন—”

বিস্ফোরিত হলো বোমাটা।

তেহাত্তুর

আরও একবার হাঁফ ছাড়ল অ্যাশবি। ক্যারলাইনের কথা বৃষ্টিতে পেয়েছে লায়ন, এবং
অ্যাশবির দিকে তাক করে রাখা বন্দুকটা নামিয়ে ফেলল পুরু।

“এই চেয়ারটায় বসে থাকুন,” আদেশ দিল প্লাটিন। “একটুও নড়বেন না।”

ব্যাসিলিকা থেকে বেরোবার পথ যেহেতু একটাই, এবং পালানোর সুযোগটাও
যেহেতু আসেনি, তাই আদেশ মেনে নেওয়াই নিরাপদ হবে তার জন্য।

“হেই,” প্রথম নারীকষ্টটা বলে উঠল অন্ধকার থেকে। “তুমি কি সত্যিই মনে
করছ মেয়েটা তোমার কাছে এত সহজে ধরা দেবে?”

উভয় দিল না লায়ন।

পরিবর্তে সে এগিয়ে গেল বেদীর দিকে।

৫

A

স্যাম বিশ্বাসই করতে পারছে না মিগ্যান সত্যি-সত্যি লায়নকে তার দিকেই ডেকে নিয়ে
যাচ্ছে। একটু আগেও বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে সে যে আমি পারব না বলল, সেটা এত
দ্রুত বদলে গেল কিভাবে? চার্চের মাঝের সারিটা পার হলো লায়ন, এক হাতে বন্দুক
ধরা। তার উভয় পাশে সারি সারি চেয়ার খালি পড়ে আছে।

“আমার সব বন্ধুরা যদি ব্রিজ থেকে লাফ দেয়,” নরস্ট্রাম বলল। “আমি তাদের সাথে লাফাব না। আমি থাকব একেবারে নিচে, ব্রিজের নিচে, ওদের সবাই কে ধরে ফেলব মাটিতে পড়ার আগেই।”

যা শুনল সেটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করল সে।

“সত্যিকারের বন্ধুরা মরলেও একসাথে মরে, বাঁচলেও একসাথে বাঁচে।”

“আমরা কি সত্যিকারের বন্ধু?” জিজেস করল সে।

“অবশ্যই।”

“কিন্তু আপনি সবসময় বলেন যে একটা সময় আসবে যখন আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।”

“হ্যাঁ, এটা হতে পারে। কিন্তু বন্ধুরা একে অপরের থেকে দূরত্বের বিচারে দূরে থাকলেও, হৃদয়ের থেকে দূরে যায় না। মনে রেখ, স্যাম, প্রতিটা ভালো বন্ধুই একসময় একজন অপরিচিত ছিল।”

মিগ্যান মরিসন মাত্র দু'দিন আগেও একজন অপরিচিত ছিল। কিন্তু এখন সে নিজেকে টেনে আনছে বিপদের একেবারে মাঝখানে। তার জন্য? না কী প্রভাবসনের জন্য? সেটা মুখ্য বিষয় না।

মরুক-বাঁচুক একসাথেই থাকবে তার পাশে স্যাম।

ঠিক এই মুহূর্তে সহজলভ্য যে হাতিয়ারটা আছে, সেটাই ব্রহ্মার করার সিদ্ধান্ত নিল সে। ঠিক এই হাতিয়ারই ক্যারলাইন ডড ব্যবহার করেছে কিছুক্ষণ আগে। তাই শরীর থেকে ভেজা কোটটা খুলে ফেলে কাঠের একটা চেম্পুর তুলে নিল সে, তারপর সেটা ছুঁড়ে মারল পিটার লায়নের দিকে।

একটা চেয়ার লায়নের দিকে ছুটে গেল, দেখল প্রভাবসেন। চেয়ার ছোড়ার মতো কে থাকতে পারে ওখানে? মিগ্যান বেদীর পেছনে, উপরের লেভেলে ডড মিটারখানেক দূরে, আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর অ্যাশবি চার্চের পশ্চিম পাশে।

আরও একটা চেয়ার ছুটে আসতে দেখল লায়ন, এবং চট করে ঘুরে গিয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল সে। মেঝের উপর আছড়ে পড়লো চেয়ারটা। সাথে সাথেই বন্দুকটা কয়ার সঙ্গীত গাওয়ার স্থানের দিকে ও বিশপের আসনের দিকে তাক করে একটা গুলি চালাল সে।

ছুঁড়ে দেওয়া চেয়ারটা থেকে লায়ন নিজেকে বাঁচিয়ে নেওয়ার পরই স্যাম নিজের স্থান ছেড়ে বাঁ দিকে সরে গেল, তারপর স্তুতি ও সমাধির মাঝে নিজেকে লুকিয়ে নিয়ে অ্যাশবি যেদিকে বসা সেদিকে এগিয়ে গেল।

আরও একটা গুলির শব্দ।

বুলেটটা তার কাঁধ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে অতিক্রম করে পাসের পাথরের দেওয়ালে লাগল, তার মানে তাকে দেখে ফেলেছে লোকটা ।

এবং আরও একটা গুলি ছুটল ।

আরও পাথরের সাথে ধাক্কা খেল গুলিটা, কিন্তু তার মনে মনে হলো যেন কাঁধে কিছু একটা বিধিহে। তীব্র যন্ত্রণা সারা বাহুতে ছড়িয়ে পড়লো, আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না স্যাম, পড়ে গেল মেঝের উপর। একটু গড়িয়ে নিজেকে আড়াল করে আঘাতের পরিমাণটা বোঝার চেষ্টা করল সে। তার শান্তের বাম হাতাটা ছিঁড়ে গেছে।

রক্ত বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা চোখের পেছন থেকে পর্দা টেনে অক্ষ করে দিতে চাইছে যেন। ক্ষতটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল সে গুলিটা বেঢ়েনি তার শরীরে, গভীরভাবে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে, তবে অসহ্য যন্ত্রণা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট এটা ।

ডান হাত দিয়ে রক্ত আসার মুখটা চেপে নিয়ে আসতে করে উঠে দাঁড়াল স্যাম।

▲

লায়ন ঠিক কাকে গুলি করল সেটা দেখার চেষ্টা করছে প্রভান্ডসেন। কেউ প্রভান্ডসেন আরও একটা চেয়ার ছুঁড়ে দিয়েছিল তার দিকে। এরপরেই একটা কালো অবয়ব ছোড়ে যায় পেছন দিকে এবং একটা বড় স্তম্ভের দিকে ওটার পেছনেই নিজেকে লুকিয়ে নেয়।

ডডও দেখেছে এটা, ভয় পেয়ে সরে গিয়ে দুই সমাধির মাঝে লুকিয়েছে সে।

কালো অবয়বটা আরও একটু পেছনে সরে যেতেই এক সেলক স্টোর মুখটা দেখতে পেল প্রভান্ডসেন।

স্যাম !

আরও দুটো গুলির শব্দ, তারপরেই হাড়-মাংসের কাউকে মেঝের উপর ধপাস করে পড়ার শব্দ হলো।

হায়, খোদা ! রক্ষা কর !

হাতের বন্দুকটা পিটার লায়নের দিকে তাক করল সে।

▲

নিজেকে বাঁচাতে মেঝের উপর ঝাপ দিল অ্যাশবি। চার্চের ভেতর এখন সব দিক থেকেই গুলি চালানো হচ্ছে। সে দেখল লায়নও মেঝের উপর শয়ে পড়েছে, চেয়ারগুলো দিয়ে আড়াল করছে নিজেকে।

ক্যারলাইন কোথায় গেল?

মেয়েটা এখনো ফিরে আসছে না কেন?

স্যামের কোনো কিছু হতে দেবে না থ্রিভাল্ডসেন। কিন্তু মিগ্যানও যুক্ত হয়ে পড়েছে এদিকে। ক্যারলাইন ডডও লাপাত্তা, বোমাই যাচ্ছে খোলা দরজার দিকেই যাবে মেয়েটা। ঝড়-বৃষ্টি চলছে এখনো সমান তালে। লায়ন নিজেকে সামলে নিয়ে পাল্টা আঘাত করতে এক মুহূর্ত লাগতে পারে বড়জোর, তাই এখান থেকে সরে গেল থ্রিভাল্ডসেন, তারপর স্যামের যাওয়া দিকে এগিয়ে গেল সে।

▲

অন্তর্টাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে মাথাটা ঢেকে নিল ম্যালন। প্রকট শব্দে কেঁপে উঠেছে গোটা চার্চ। কিন্তু তার ছুঁড়ে দেওয়া জিনিসটা যে বোমাই ছিল সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল, এবং এই ছুঁড়ে দেওয়ার কারণেই তারা শুধু ধোঁয়াই দেখতে পেল যেটা সিঁড়ির উপর ঢেকে আছে এখন।

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে।

সবাই ঠিকঠাক আছে মনে হলো।

তারপর আতৎকটা আরও কেটে যেতেই লোকজন দরজার দিকে ছুটে^{গেল}। যাজক এবং দুই সহকারি কয়ারের পেছনে লুকিয়েছে।

প্রধান বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে হটগোলটা দেখছে সে, হামলাকুরী এতক্ষণে পালিয়ে যাওয়ার কথা। মানুষজন আরও পাতলা হয়ে গেলে মাঝে সারু^{বেঞ্চের} একেবারে শেষ প্রান্তে স্টেফানিকে দেখা গেল, হাতের বন্দুকটা একেবারে ঝুকে^{বেঞ্চের} সাথে লাগিয়ে ধরে আছে নাক-লম্বা লোকটার।

তিনজন প্যারিস পুলিশ আসছে প্রধান ~~বর্জন~~ দিয়ে। একজন স্টেফানির হাতে অটোমেটিক পিস্টল দেখেই নিজের অন্তর্টাও ছাড়িয়ে নিল সেকেন্ডের ভেতর।

বাকি দুজনও একই কাজ করল।

“বেছি ভোতখাম ইম্বিদিয়েতমো, এক্ষণই অন্ত ফেলে দিন।” স্টেফানির দিকে চিংকার দিয়ে বলল এক অফিসার।

আরেকজন সাদা পোশাকের অফিসার দেখা গেল তাদের পেছনে। তার সামনের অফিসারদের থামতে আদেশ দিল হাত নেড়ে। হাতের অন্ত নামাল তারা, তারপর সামনের দিকে ছুটে গিয়ে নাক-লম্বাকে হাতকড়া পরাল।

মাঝের সারি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এল স্টেফানি।

“ভালই ধরেছেন,” বন্দীর দিকে দেখিয়ে বলল ম্যালন।

“ছোড়াটা যে আরও ভালো হয়েছে।” বোমার কথা বলছে স্টেফানি।

“তো এখন কী করব আমরা?” জিজ্ঞেস করল সে। “লায়নের শেষ কথাগুলো মনে আছে নিশ্চই।”

“হঁয়া, আছে।”

পকেটে হাত ঢোকাল ম্যালন তারপর সেলফোনটা বের করে আনল। “আমার মনে হয় এখন হেনরিকের দিকে খেয়াল দেওয়া উচিত আমার। স্যামও তার সাথে আছে।”

চার্চে আসার সময় গাড়িতে নিজের ফোনটা সাইলেন্ট করে নিয়েছিল সে। এখন সেখানে একটা মিসড কল দেখা যাচ্ছে, এসেছে কুড়ি মিনিট আগে।

প্রত্যালোচনে।

তাদের কথোপকথনের পরে এসেছে কলটা।

ক্রিনে ভয়েস মেইল’র আইকনটা উঠে আছে। শোনার জন্য নির্দিষ্ট নামারে প্রেস করল সে।

“আমি মিগ্যান মরিসন বলছি। আইফেল টাওয়ারে আজকে আমি স্যামের সাথেই ছিলাম আপনি যখন ওখান দিয়ে উড়ে গেলেন। হেনরিক তার ফোনটা আমায় দিয়েছে, তাই আপনার নামারেই আমি ফোন দিয়েছি। আমি আশা করছি কটন ম্যালন আমার কথা শুনছেন। ওই বুড়ো লোকটা সেইন্ট-দেনিসের ভেতর গেছে অ্যাশবিকে মারতে। ওখানে আরও একটা লোক ও এক মহিলা আছে। স্যাম বলছে যে ওই লোকটা পিটার লায়ন। স্যামও ভেতরে গেছে। তাদের সাহায্য দরকার। আমি ভেবেছিলাম এটা প্লান্টের উপর ছেড়ে দেব। কিন্তু... আমি পারলাম না। ওর কোনো বিপদ হয়ে বসতে পারে। তাই, আমিও যাচ্ছি ভেতরে। আর এটা আমার মনে হলো আপনার জানা উচিত।”

“এখনই ওখানে যেতে হবে আমাদের,” ম্যাসেজটা শোনার পরে করেই বলল ম্যালন।

“মাত্র আট মাইল দূরে ওটা, কিন্তু রাস্তায় এখন প্রচুর জন্ম। আমি প্যারিস পুলিশকে বলে দিচ্ছি। তারা এখনই লোক পাঠাচ্ছে ওখানে। একটা প্রেলিকপ্টারও আসছে আমাদের জন্য। বাইরেই নামবে ওটা। রাস্তা ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে ওটা নামার জন্য।”

সব কিছু ভেবে নিল স্টেফানি।

“আমি তো সেখানে সাইরেন বাজান পুলিশ পাঠাতে পারছি না এখন,” বলল স্টেফানি। “লায়নকে আমার দরকার। এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ। তাই যারা যাচ্ছে খুব চুপচাপ যাবে ওদিকে।”

ম্যালন জানে খুব ভালো বুদ্ধি এটা।

কিন্তু ভেতরের মানুষগুলোর জন্য ভালো না সেটা।

“ওদেরকে ওখানেই ধরব আমরা,” বলল স্টেফানি।

“তাহলে আর দেরি কেন! যাওয়া যাক।”

চুয়ান্তর

হাতটা’ চেপে ধরে নিয়ে চার্চের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে স্যাম। দেওয়ালের ওপাশেই প্লাজার খোলা প্রান্তের, সে অনুমান করল। মিগ্যানের উপর থেকে পিটার লায়নের

মনোযোগটা সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে সে, কিন্তু নিজেকে আহত করার ক্ষেত্রেও সফলতা এসেছে। তার এখন একটাই আশা। সবাই লায়নকে ব্যস্ত রাখবে যতক্ষণ বাইরে থেকে সাহায্য না আসে।

প্রভাসেন তাকে বাঁচানোর জন্যই লায়নের দিকে গুলি ছুড়েছে এতে সন্দেহ নেই। তাকে পালাবার পথ করে দিতে চাইছে লোকটা।

কিন্তু এখন এই ডেনিশ বন্ধুটি কোথায়? দেখা যাচ্ছে না।

কলামের শেষ সারির কাছে চলে এসেছে স্যাম। একটু সামনেই বেশখানিক খোলা জায়গা। ঝুঁকি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল সে।

লায়ন এখন ছুটছে সিঁড়ির দিকে, প্রধান বেদীর বাঁ পাশে। মিগ্যানও লুকিয়ে আছে সেখানে।

“নো,” চিংকার দিল স্যাম।

▲

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না অ্যাশবি, কী শুনল সে এটা? লায়ন আর ধারেকাছে নেই, সে এখন চার্চের উপর প্রান্তে, দরজা দিয়ে অ্যাশবির পালিয়ে যাওয়ার ~~প্রক্ষেপ~~ যথেষ্ট দূরে আছে সে। খুব দৈর্ঘ্য ধরে অপেক্ষা করেছে সে এতক্ষণ। দেখেছে হারামিটা কিভাবে দক্ষিণ দিক দিয়ে ছুটে আসা গুলি থেকে নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল ~~অ্যাশবি~~ জানে না কে গুলি করেছে কিন্তু সে যে-ই হোক, একেবারে দারূণ কাজ করেছে।

কিন্তু এখন কী শুনল এটা?

ঠিক তার ডান দিক থেকে কেউ একজন চিংকার দিয়েছে।

যেন লায়নকে বলতে চাইছে, ওদিকে না, এদিকে নে।

▲

আরও এক রাউন্ড গুলি ছুড়ল প্রভাসেন, ভীষণ বিরক্ত হচ্ছে স্যামের কার্যকলাপে। লায়নকে তার দিকে ডাকছে কেন সে?

প্রধান বেদীর কাছে একটা কবরের আড়ালে লুকাতে চাইছে লায়ন।

তাকে আর সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না, ভাবল প্রভাসেন। ওদিকেই মিগ্যান লুকিয়ে আছে। আর দেরী না করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে, দক্ষিণ দিক ঘেঁষে। অ্যাশবি এবং স্যামের থেকে দূরে, সোজা লায়নের দিকে।

▲

চেয়ার ছেড়ে কাছের একটা অঙ্ককারে লুকাল অ্যাশবি। মাত্র ত্রিশ মিটার দূরে লায়ন, চারপাশে শক্তির ঘনত্ব বাড়ছে। ক্যারলাইনকে আর দেখা যায় নি, এবং সে বুঝতে পারল মেয়েটা পালিয়ে গেছে এখান থেকে। এখন তাকে অনুসরণ করাই উচিত তার। গুপ্তধনের চিন্তা এখন বাদ, অন্তত এখনকার মত।

পলায়ন এখন একমাত্র ধ্যানজ্ঞান তার ।

তাই আরও একটু নিচু হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে, খোলা দরজাটা পর্যন্ত
পৌছাতেই হবে তাকে ।

▲

বেল্টটা ভালো করে আটকে নিল ম্যালন । হেলিকপ্টারটা মাত্র শহরের উপরে উঠেছে ।
দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, খুব সামান্য আলোর ঝলক বৃষ্টির মেঘ ভেদ করে
আসতে পারছে এখানে ।

স্টেফানি তার পাশেই বসা ।

দুজনেই গভীর চিন্তায় মগ্ন ।

একজন তিক্ত, ক্রোধাপ্তি বাবা প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত, সাথে একজন কমবয়সী
এজেন্ট । এই মানুষজোড়া যথেষ্ট অভিজ্ঞ না হয়েও পিটার লায়নের মতো হাড়-পাকা
সন্ত্রাসীর মুখোমুখি হচ্ছে । একজনও ভাবছে না যে অপরজন কী চিন্তা করতে হবে সেটা
শেখেনি । এত কিছু মাথায় নিয়ে, ম্যালনের আর দ্বিতীয় সুযোগ নেই চিন্তা করার যে তার
এবং প্রভান্তসেনের মাঝে সম্পর্কটা এখন পর্যায়ের । ম্যালনের যেটা ঠিক মনে হচ্ছে করার,
সেটাই করেছে, কিন্তু এই সিদ্ধান্তটাই তার সবচে কাছের বন্ধুকে আহত করেছে ভীষণভাবে ।
তার আর প্রভান্তসেনের মাঝে আগে কোনদিন কথা কাটাকাটি হয় নি । সামান্য দু-একবার
বিরক্তিকর পরিস্থিতি, আর কিছু হতাশাজনক মুহূর্ত দেখেছে তার, কিন্তু একেবারে কঠিন
রাগারাগি হয়নি কখনো ।

তাই হেনরিকের সাথে তার কথা বলে সব মিটিয়ে ফেলতে হবে ।

স্টেফানির দিকে তাকাল সে । তার এই বস স্যান্ডিকে ওখানে পাঠিয়ে যে ভুল করেছে
তার জন্য নিজেকে দোষারোপ করছে মনে মনে ম্যালন সেটা জানে । ওই মুহূর্তে ওটা
করাই ঠিক ছিল ।

আর এখন এটাই প্রাণঘাতী সিদ্ধান্ত হয়ে ধরা দিয়েছে ।

▲

মন্দের মাঝে একটু ভালো লাগল এটাই যে লায়ন এখন নিজেই দ্বিধাত্ব হয়ে পড়েছে ।
এখনো পর্যন্ত লায়ন সিডিতে পা রাখেনি, যেটা ঠিক মিগ্যানের দিকে উঠে গেছে । একটা দম
ছাড়ল স্যাম । হাতের যন্ত্রণাটা একেবারে মেরে ফেলছে তাকে । ডান হাত দিয়ে এখনো
রক্ত-ঝরা ক্ষতস্থানটা চেপে আছে শক্ত করে ।

উপায় বের কর, স্যাম, উপায় ।

আরেকটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে ।

“হেনরিক,” চেঁচিয়ে উঠল সে । “বন্ধুক হাতে ওই লোকটা একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী ।
সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে । তুমি ওকে আটকে রাখ । খুব দ্রুতই হেঁল চলে আসবে ।”

স্যাম ঠিক আছে জেনে থ্রিভান্ডসেন শাস্তি পেল ।

“ওর নাম পিটার লায়ন,” যোগ করল মিগ্যান ।

“আরেবাহ,” বলল লায়ন । “সবাই আমাকে চেনেন দেখছি ।”

“আমাদের সবাইকে মারার চিন্তা বাদ দাও,” বলল স্যাম ।

“দিলাম, কিন্তু আপনাদের দু-একজনকে অন্তত মারতে পারছি এখনই ।”

থ্রিভান্ডসেন বুঝতে পারল তার এই হিসাবটা ঠিকই আছে, বিশেষ এটা যখন লোকটা জেনেই গেছে তার বিরুদ্ধে অন্ত আছে মাত্র একজনের হাতে ।

চলমান কিছু একটা তার মনোযোগ আকর্ষণ করল । আর সেটা লায়ন না । ডান দিকের দরজার কাছে একটা মানুষের অবয়ব, সোজা এগিয়ে যাচ্ছে বের হবার পথ ধরে । প্রথমে তার মনে হয়েছিল সেটা ক্যারলাইন ডড, কিন্তু পরেই বুঝতে পারল এটা একটা পুরুষের অবয়ব ।

অ্যাশবি ।

চারপাশের হট্টগোলের সুযোগটা ভালোই নিয়েছে লোকটা । তারপর একটু একটু করে এগিয়ে গেছে ওদিকে । লায়নের দিক থেকে ঘুরে গেল থ্রিভান্ডসেন, অবশ্যই এগিয়ে গেল দরজার দিকে । দরজাটা তার কাছে হওয়ায়, অ্যাশবির থেকেও আগে পৌঁছাল সে সেখানে । ফ্রান্সিসের মৃত্তিটাকে আরও একবার জড়িয়ে ধরে নিজের আড়াল করে নিল সে, তারপর অপেক্ষা করল এই ব্রিটিশ ভদ্রলোকের অন্ধকার ছেড়ে বের হয়ে আসার ।

আপটা দেওয়া বাতাসের জন্য মার্বেলের মেঝেটা ভিজে আছে জলে ।

কোটটা খুলে ফেলায় শীত লাগছে তার

স্তম্ভের ঠিক বিপরীত পাশে অ্যাশবি, থামিয়ে দেয়ে হাঁটা ।

হয়ত নিশ্চিত হতে চাইছে এই শেষ দশ মিটারের মতো পথটাও সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পার হয়ে যেতে পারবে কি না ।

পাথরের শিল্পকর্মের প্রান্ত দিয়ে তাকে দেখে নিল থ্রিভান্ডসেন ।

আবারো সামনে হাঁটতে শুরু করল অ্যাশবি ।

সাঁই করে কবরের পাশ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল থ্রিভান্ডসেন, এবং হাতের বন্দুকটা চেপে ধরল অ্যাশবির মুখের সাথে ।

“কোথাও যাচ্ছেন না আপনি ।”

অ্যাশবি, সম্পূর্ণ বজাহত । নতুন বিপদে নিজের ভারসাম্যটা রাখতে পারল না ভেজা মেঝের ওপর ।

মাথা ঘুরে উঠেছে অ্যাশবির। “থ্রান্ডসেন?”

“উঠে দাঁড়াও,” আদেশ দিল ডেনিশ।

উঠে দাঁড়াল সে পায়ে ভর দিয়ে। বন্দুকটা এখনো তার দিকে তাক করা।

“আপনিই লায়নের দিকে গুলি করেছিলেন?” জিজ্ঞেস করল সে।

“যেটা আমি করতে এসেছি স্টো সে করে ফেলুক তা আমি চাইনি।”

“কি করতে এসেছেন?”

“তোমাকে শেষ করতে।”

▲

প্রায় শ'খানেক ফিট দূর থেকে কথা ভেসে আসছে। ঠিক দরজার কাছ থেকে। কিন্তু ঝড় আর চার্চের ভেতরের প্রতিষ্ঠানির কারণে ঠিক পার্থক্য করা যাচ্ছে না কথাগুলোকে। থ্রান্ডসেন আছে ওখানে এটুকুই শুধু বুঝতে পারছে স্যাম। অ্যাশবি পালিয়েছে, তাই এটা বোঝাই যাচ্ছে হেনরিক ওই ব্রিটিশকে থামিয়ে চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু লায়ন এখানে এখনো উপস্থিতি।

এবং এই লায়ন হয়ত এটাও বুঝে গিয়েছে যে তিনজনের মাত্র একজনের কাছেই অস্ত্র আছে, কারণ বাকি দুই দিক থেকে এখনো একটা গুলিশৃঙ্খলাটোনি তার দিকে।

স্যাম দেখল লায়ন আড়াল থেকে বের হলো, তারপর চার্চের মাঝ-বরাবর এগিয়ে গেল স্তুপগুলোয় নিজেকে আড়াল করে। ভেজে আসা কঢ় যেদিক দিয়ে আসছে সেদিকেই তার গতি; তার মানে হেনরিক ও অ্যাশবির সাথে যোগ দিতে চলেছে সেও।

▲

হাতের ঘড়িটা দেখে নিল ম্যালন। খারাপ আবহাওয়ার সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে উডুক্কু যানটাকে। বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে অবোরে জানালার কাঁচে। ঘূর্ণায়মান রোটরের সাথেই যেন তার চিন্তামগ্ন মনটা পাঁক খেয়ে চলেছে। প্যারিসকে তারা পেছনে ফেলে এসেছে। গন্তব্য উত্তরের মফঃস্বল জনপদ সেইন্ট-দেনিস।

বহুদিন হলো এরকম অসহায় নিজেকে মনে হয়নি ম্যালনের।

স্টেফানিও ঘড়িটা দেখে নিল, তারপর চারটা আঙুল দেখাল তাকে।

পাঁচ মিনিটও লাগবে না পৌছাতে।

খুব দ্রুতই কাজটা সারতে হবে, জানে থ্রিভান্ডসেন। কিন্তু এই বাস্টার্ড কেন মারা যাচ্ছে সেটা তাকে জানতে হবে আগে।

“দুই বছর আগে,” বলল সে। “মেঝিকোতে, যে সাতজন খুন হলো তার ডেতর আমার ছেলেও ছিল। তোমার নির্দেশেই ওদেরকে গুলি করা হয়। কাজটা করেছিল তোমারই লোক অ্যামান্দো ক্যাব্র্যাল। আর তোমার জন্যই তাকে আমি খুন করেছি। এবার তোমার পালা।”

“মিস্টার থ্রিভান্ডসেন, আপনার বড় রকমের ভুল হচ্ছে—”

“চুপ। ফালতু কথা বলার চেষ্টা করবে না,” কঠ চেতে উঠল তার। “আমাকে বা আমার একমাত্র ছেলের স্মৃতিকে মিথ্যা দিয়ে অপমান করবে না। যা-যা হয়েছে আমি সবই জানি। দুই বছর ধরে আমি তোমার পেছনে লেগে আছি, শুধু এই দিনটার অপেক্ষা করেছি।”

“দেখুন, ক্যাব্র্যাল কী করবে সেটা আমি কিছুই জানতাম না। বিশ্বাস করুন। আমি শুধু বলেছিলাম ওই দুই আইনজীবীকে একটু সতর্ক করে দিতে যেন তারা আর সামনে অগ্রসর না হয়।”

একটু পেছনে সরে গেল থ্রিভান্ডসেন, ফ্রাঙ্গিসের কবরের স্তম্ভের আড়ালে নিয়ে গেল নিজেকে। লায়ন লুকিয়ে থাকতে পারে অ্যাশবির পেছনে কোথাও

এখনই শেষ করে দাও, নিজেকে বলল সে।

এখনি।

সামনে এগিয়ে গেল স্যাম, হাতটা এখনো চেপে ধরা আছে তার। লায়ন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, সর্বশেষ তাকে দেখা গেছে প্রধান বেদীর সামনে দিয়ে যেতে থ্রিভান্ডসেন এবং অ্যাশবি থেকে পঞ্চাশ ফিট দূরে আছে হয়ত।

বন্দুকে সতর্ক করতেই হবে, তাই একটা সুযোগ নিল স্যাম।

“হেনরিক, সাবধান। লায়ন আপনার দিকেই যাচ্ছে।”

মহা আতঙ্কের মাঝে পড়েছে অ্যাশবি। এই মরার জায়গাটা ছাড়তে পারলেই তার রক্ষা।

বন্দুক হাতে দু'জন লোক তাকে মারতে চায়, এবং কেউ একজন এইমাত্র জানিয়ে দিল যে লায়ন এদিকেই আসছে।

“থ্রিভান্ডসেন, আমার কথা শুনুন। আমি আপনার ছেলেকে মারিনি।”

একটা গুলির শব্দ হলো চার্টের ভেতর জুড়ে, কান ঝালাপালা হয়ে গেল অ্যাশবির। সে বুঝল থ্রিভাউন্ডসেন ইচ্ছা করেই মেঝেতে গুলিটা করেছে, তার পায়ের ঠিক কাছেই। পাথরের ছোট টুকরো ছিটকে গেল, ভয়ে কিছুটা দরজার দিকেই পিছিয়ে যেতে হলো তাকে। কিন্তু সে জানে এখান থেকে দৌড়ানৰ চেষ্টা কৰার বিপরীতে কী হতে পারে।

এক পা এগোনোৱ আগেই নির্ঘাত মৃত্যু।

▲

একটা গুলির শব্দ শুনল স্যাম।

“ওখান থেকে একটুও নড়বে না,” বাড়-বৃষ্টি ছাপিয়ে থ্রিভাউন্ডসেনেৰ হংকার শোনা গেল। “এখন তুমি একজন মানুষেৰ জন্য দুঃখ প্ৰকাশ কৰছ। কিন্তু তুমি কী কৰেছ তা কি জান? আমাৰ ছেলেৰ চেয়ে নিখুঁত কোনো সন্তান আৱ আসতে পাৰে না কাৰো জীবনে। কিন্তু তুমি তাৰ বুকেই গুলি চালালে।”

একটু থামল স্যাম, পুৱো পৱিষ্ঠিতিটা বোৰাৰ চেষ্টা কৱল। খুব বুদ্ধি কৱে কাজ কৱতে হবে। এই অবস্থায় নৱস্তুম কী কৱত, সেটাই কৱবে সে। মানুষজনৰ সময় বুদ্ধি দিয়ে কাজ কৱত।

আৱও এক সারি কলামেৰ দিকে এগিয়ে গেল সে, এবং চার্টেৰ মাৰ-বৰাবৰ তাকাল।

বেদীৰ ডান দিকে লায়ন, একটা স্তম্ভেৰ কাছে দাঁড়িয়ে স্তৰ দেখছে ও শুনছে।

“একটুও নড়বে না বলেছি,” বলল থ্রিভাউন্ডসেন। “পৱেৱ বুলেটটা আৱ মেঝেতে পড়বে না।”

এই মুহূৰ্তটাৰ কথা অনেকভাৱে কল্পনা কৱেছে সে, ভাবাৰ চেষ্টা কৱেছে সাই এৱ খুনিৰ মুখোমুখি হবাৰ চূড়ান্ত অনুভূতিটা কেমন হবে। কিন্তু এদিকে স্যাম সতৰ্ক কৱেই চলেছে, ছেলেটা ভাবছে লায়ন ধাৰে-কাছেই কোথাও ঘাপটি মেৱে আছে।

“থ্রিভাউন্ডসেন,” অ্যাশবি বলল। “এখন এদিকে খেয়াল দিন। লায়ন আমাদেৱ দু'জনকেই মেৱে ফেলবে সুযোগ পেলে।”

এখন শুধু এটাই প্ৰাৰ্থনা কৱতে পাৱে সে স্যাম এবং মিগ্যান যেন তাকে অন্য বিপদ থেকে রক্ষা কৱে, যদিও ওদেৱ কেউই এখানে নেই অনেক আগেই বিলিয়নিয়াৰ হয়েছে সে, কিন্তু সেখান থেকে একটা ইউৱোও কাজে আসবে না এখন। প্ৰতিশোধেৰ আণন নিজেই জ্বালিয়েছে, এবং তাতে ঝাঁপড় দিয়েছে নিজেৰ ইচ্ছাতেই। অন্ধকাৰেৰ মাৰেই যেন শিশু সাইৰ ছবিটা দেখতে পেল সে, তাৱপৰ সেটা কিশোৱে পৱিণত হলো লিজেটেৱ কাছে কথা দিয়েছিল সাইকে বড় কৱে তুলবে সে। চাৰশ বছৱেৱও

বেশী সময় ধরে থ্রিভাল্ডসেনরা ডেনমার্কে বসবাস করছে। হিটলারের নার্থসি বাহিনী তাদের বংশটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার সব চেষ্টাই করেছে, কিন্তু সেই আক্রমণ থেকে কোনোভাবে বেঁচে গিয়েছিল তারা। সাই যখন জন্ম নিল তখন সে সীমাহীন খুশী। একটা বাচ্চা। সামনে এগোনোর একটা হাতিয়ার। ছেলে বা মেয়ে হোক। মাথা ঘামায়নি সে।

সুস্থ একটা বাচ্চা। ঠিক এরকম কিছুর জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল সে।

বাবা, নিজের যত্ন নিও। কয়েক সপ্তাহ পরেই দেখা হচ্ছে তোমার সাথে।

সাইর সাথে শেষ কথোপকথনের সর্বশেষ কথা ছিল এগুলো।

কয়েক সপ্তাহ পর দেখাও হলো সাইর সাথে।

একটা কফিনে শোয়ান অবস্থায়।

আর এই সব কিছুই হয়েছে কয়েক মিটার দূরে দাঁড়ানো এই আবর্জনার কারণে।

“এক মুহূর্তের জন্যেও কী ভেবেছিলে,” জিজ্ঞেস করল অ্যাশবিকে। “আমি এই মৃত্যুর কোনো বদলাই নেব না? নিজেকে কি তুমি অনেক চালাক মনে কর? খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাব? যে এরকম কেউ হয়ে পড়েছ যে ইচ্ছামত মানুষ খুন করবে আর তার কোনো ফল ভোগ করবে না কোনো দিন?”

কিছুই বলল না অ্যাশবি।

“উত্তর দাও,” হংকার দিল সে।

নিজের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে অ্যাশবি।

এই বুড়ো লোকটা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে মেনটা ভরে আছে ঘৃণায়। এরকম পরিস্থিতিতে সবচে বুদ্ধিমানের কাজ হলো চুপ না থেকে সেটার মুখোমুখি হওয়া। বিশেষ করে এটা মাথায় রাখা লাগছে যে লায়নকে দেখেছে সে, দূরের এক সারি কলামের পেছনে, ঠাণ্ডা মাথায় দেখেছে খেলার শেষ পরিণতি কী হয়। থ্রিভাল্ডসেনও লায়নের উপস্থিতিটা জানে।

আর ভেতরে যারা আছে তাদেরকে মনে হচ্ছে থ্রিভাল্ডসেনের লোক।

“দেখুন, আমার যা করার ছিল, তা-ই করেছি,” স্পষ্ট জানিয়ে দিল অ্যাশবি।

“একেবারে ঠিক। আর আমার ছেলেটাও মরল তাতে।”

“আপনার বুবতে হবে যে আমি কখনোই এরকম কিছু ঘটুক তা চাইনি। ওই আইনজীবী নিয়েই আমার যত চিন্তা-ভাবনা ছিল। কিন্তু ক্যাব্র্যাল আরও জটিল করে ফেলেছে বিষয়টা। এই মানুষগুলোকে হত্যা করার কোনো যুক্তি ছিল না।”

“কোনো ছেলেমেয়ে আছে তোমার?”

মাথাটা দোলাল সে, নেই।

“তাহলে এটা বোৰা তোমার পক্ষে সম্ভব না।”

আরও সময়ক্ষেপণ করতে হবে তাকে। লায়ন এখনো চুপচাপ আছে কলামগুলোর পেছনে। বাকি দু'জন কোথায় গেল?

“দুই বছর ধরে তোমার উপর নজর রাখছি,” বলল থ্রিভান্ডসেন। “তোমার সব কাজেই ব্যর্থ। তোমার ব্যবসায় লোকসান হয়ে সব টাকা শেষ। তোমার ব্যাঙ্কও ঝামেলায় পড়েছে। দিন-দিন ছোট হয়ে আসছে তোমার সম্পদের পরিমাণ। আমি দেখি আর অবাক হই যে তুমি আর তোমার মিস্টেস কিভাবে এতকিছুর পরও নেপোলিয়নের সম্পদ খুঁজে বেড়াও। আর এখন এখানেও এসেছ এই লোভেই। এখনো ধন খুঁজে বেড়াচ্ছ।”

এই নির্বোধটা অনেক বেশী তথ্য ফাঁস করে ফেলছে লায়নের সামনে।

তাই আবারো মুখটা থামানোর উদ্যোগ নিল অ্যাশবি।

“আপনার ভুল হচ্ছে। আমার সম্পত্তির পরিমাণ বিরাট। সেগুলোর খোঁজও আপনি জানেন না। আর টাকার কথা বলছেন? গত কয়েক দিনেই আমি যে পরিমাণ সোনা লাভ করেছি তার মূল্য হবে কয়েকশ মিলিয়ন ইউরো।”

লায়নকে এটা শুনিয়ে রাখল অ্যাশবি যেন লোকটা যৌক্তিক কারণেই তাকে বাচিয়ে রাখতে চায়।

“আমি তোমার টাকা চাই না,” ঘৃণা ভরে বলল থ্রিভান্ডসেন।

“কিন্তু আমি চাই,” লায়ন বলল অঙ্ককার থেকে বেরিয়ে, এবং গুলি করল হেনরিক থ্রিভান্ডসেনকে।

সাইলেঙ্গার লাগানো পিস্তল থেকে পরিচিত চাপা শব্দটা বের হতেই থামল স্যাম। সে জানে না কাকে গুলি করা হলো, কারণ সে এখনো তাদের থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরে।

চার্চের মাঝে তাকাল সে।

পিটার লায়ন নেই।

বুলেটটা বুকে তোকার সময় কিছু টের পেল না থ্রিভান্ডসেন, কিন্তু সেটা বের হবার সময় দুঃসহ যন্ত্রণার সৃষ্টি করল, তারপর সেই যন্ত্রণা মস্তিষ্ক, স্নায় হয়ে সব মাংসপেশিকে অকেজ করে দিল। পা দুটোর উপর আর ভর দিয়ে থাকতে পারল না সে, নিরাকৃণ যন্ত্রণা মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে স্নোতের মতো।

সাইও কি ঠিক এরকমটাই অনুভব করেছিল? এই কষ্ট কি ছেলেটাকেও গ্রাস করে নিয়েছিল? কী ভয়ঙ্কর একটা অনুভূতি এটা।

চোখের মণি দুটো উপরের দিকে ঘুরে গেল তার।

শরীরটা এক দিকে কাত হয়ে গেল।

হাতটা আলগা করে দিল বন্দুকটাকে। তারপর ধীরে-ধীরে মেঝের উপর পড়ে
গেল তার শরীরটা। মাথাটা আছড়ে পড়ল মাটিতে।

প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাস ফুসফুসকে ছিঁড়ে ফেলছে একটু-একটু করে।

বুকের আঘাতটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইল সে।

শব্দ মিলিয়ে গেল নিজের ভেতরে।

কোথায় হাত রাখবে সেটাও খুঁজে পেল না।

তারপর সব রঙ উবে গেল তার জগত থেকে।

ছিয়াস্তর

বৃষ্টির ভেতর দিয়ে সেইন্ট-ডেনিস ব্যাসিলিকা ম্যালনের চোখে ধরা পড়লো, এখনো
প্রায় এক মাইল দূরে ওটা। বাইরে কোনো পুলিশের গাড়ি দেখা যাচ্ছে না, সামনের
খোলা প্লাজাও মানবশূন্য। চার্চের চারদিকেই অন্ধকার, এবং শান্ত, যেন কোনো মহামারী
আক্রমণ করেছে।

নিজের বেরেটা পিস্তল ও দুটো অতিরিক্ত ম্যাগাজিন নিয়ে নিল সে।

একেবারে প্রস্তুত এখন।

শুধু এই হেলিকপ্টারটা এখন মাটিতে নামলেই হয়।

হাফ ছেড়ে বাঁচল অ্যাশবি। “কাজটা আরও আগেই করা ন্তর্চিত ছিল আপনার।”

মাটিতে পড়ে আছে প্রভাস্তসেন, বুকের ম্যাটে থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে
স্নোতের মতো। এই নির্বোধকে নিয়ে অ্যাশবির বিন্দু পরিমাণ মাথাব্যথা নেই। সব
চিন্তার মূলে এখন লায়ন।

“এক মিলিয়ন ইউরোর সোনা?” জিজ্ঞেস করল লায়ন।

“রোমেলের গুণ্ঠন ওটা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ওটা হারিয়ে যায়, কেউ জানত না
কোথায়। আমি খুঁজে বের করেছি।”

“আর আপনি মনে করেন যে এটার বিনিমিয়ে আপনি প্রাণে বেঁচে যাবেন?”

“মনে করাটা অযৌক্তিক?”

বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দকে দূর করে দিল নতুন আরেক শব্দ।

থাম্প, থাম্প, থাম্প।

ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে ওটা।

খেয়াল করল লায়নও।

একটা হেলিকপ্টার।

হামাগুড়ি দিয়ে আরেকটু কাছে এগিয়ে স্যাম দেখল অ্যাশবি এবং লায়ন দাঁড়িয়ে আছে, লায়নের হাতে বন্দুক। তারপরেই দেখতে পেল মেঝেতে পড়ে আছে প্রভান্ডসেন, রক্ত বেরিয়ে আসছে প্রচুর পরিমাণে।

ওহ, গড়।

নো।

▲

“সোনা কোথায় রাখা?” লায়ন জিজেস করল অ্যাশবিকে।

“একটা ভল্টের ভেতর। শুধু আমিই খুলতে পারব ওটা।”

আরও একটু সময় পাবে অ্যাশবি।

“আপনাকে ভীষণ অপছন্দ করি আমি,” বলল লায়ন। “একেবারে শুরু থেকেই আপনি নানান রকমের ফন্দি করে আসছেন।”

“তাতে আপনার কিছু আসে যায় কি? আপনাকে ভাড়া করেছি কাজের জন্য। টাকাও দিয়েছি আমি। এখন আমি কী চাই বা করি সেটা নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন?”

“আমাকে বোকা বানিয়ে আমার বাঁচার পথ বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন আপনি,” বলল লায়ন। “আমার সাথে কাজে নেমে আপনি ওদিকে অ্যামেরিকামদের সাথেও হাত মিলিয়েছেন। তারাও কিন্তু আপনাকে অপছন্দ করে, কিন্তু আমাকে ধরার জন্য যে কোনোকিছুই করতে পারে তারা।”

রোটরের শব্দ আরও গাঢ় হয়েছে এখন, ঠিক যেন আমার উপর থেকে আসছে।

“এখনই সরে পড়া দরকার আমাদের,” অ্যাশবি বলল। “আপনি ভালো করেই জানেন কারা আসছে।”

একটা শয়তানি দৃতি খেলা করছে হলদে চোখ দুটোয়। “ঠিক বলেছেন আপনি। সরে পড়া দরকার আমার।”

গজে উঠল লায়নের বন্দুকটা।

▲

চোখ দুটো মেলল প্রভান্ডসেন।

অঙ্ককার পর্দা সরে গেছে দৃষ্টি থেকে, তারপরও সবকিছু যেন অস্পষ্ট কুয়াশার মতো। মানুষের কষ্ট শুনতে পেল সে, এবং একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখল অ্যাশবি একজন মানুষের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে বন্দুক।

পিটার লায়ন।

বন্দুকটা তাক করেই অ্যাশবিকে গুলি করে দিল লায়ন, স্পষ্ট দেখল প্রভান্ডসেন।
বাস্টার্ড।

একটু নড়তে চাইল থ্রিভাল্ডসেন, কিন্তু শরীরের একটা মাংশপেশীও সায় দিল না।
বুকের ক্ষত থেকে সব রক্ত বেরিয়ে গেছে। সাথে চলে গেছে শক্টিকুণ্ড। দমকা বাতাস
আর ঝড়ের শব্দের মাঝেও আরেকটা চাপা শব্দ নির্দিষ্ট একটা ছন্দে এগিয়ে আসছে
বাতাসে ভেসে।

আরেকটা বুলেট ছুটল।

কষ্ট করে দৃষ্টি স্থির রাখছে সে। দেখল অ্যাশবি যন্ত্রণায় কুঁচকে গেছে।

তখন পরপর আরও দুটো বুলেট বের হলো লায়নের বন্দুক থেকে।

তার ছেলের খুনির কপালে দুটো ছিদ্র হয়েছে, সেখান দিয়ে লালচে থকথকে তরল
বেরিয়ে আসছে ধীরে।

থ্রিভাল্ডসেনের শুরু করা কাজের শেষটা টেনে দিল পিটার লায়ন।

অ্যাশবি মেঝের উপর পড়ে যেতেই, কেমন একটা অবাক করা প্রশান্তি যেন
নিজের জেগে থাকা স্নায়ুগুলোর মাঝ দিয়ে বয়ে গেল।

▲

রুক্ষশ্বাসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম। পা দুটো জমে গেছে। সে কিন্তু পাছে
তাহলে? না, তার থেকেও বেশী কিছু। মৃত্যুর এক আতঙ্ক আক্রমণ করেছে তার
মাংসপেশীগুলোকে, মনটাকে চেপে ধরেছে নিদারণ ভয়।

লায়ন চারটে গুলি করেছে অ্যাশবিকে।

ঠিক চারটে শব্দই মনে আছে তার।

ব্যাম, ব্যাম, ব্যাম, ব্যাম।

অ্যাশবি ওখানেই মরে গেছে। কিন্তু থ্রিভাল্ডসেনের কী অবস্থা? স্যামের মনে হচ্ছিল
যেন অ্যাশবি গুলি খাওয়ার ঠিক আগে এই ডেনিশ নড়ে উঠেছিল। তার বন্দুর কাছে
এখনই ছুটে যাওয়া প্রয়োজন তার। খুব ভয়ঙ্কর গতিতে রক্ত বের হয়ে মার্বেলের
মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ছে।

কিন্তু নিজের পা দুটো চলছে না স্যামের।

একটা চিৎকার বেজে উঠল চার্টের ভেতর।

অন্ধকার থেকে মিগ্যান ছুটে এসেই জাপটে ধরল পিটার লায়নকে।

▲

“বাবা, বাবা।”

সাই এর ডাক শুনতে পাচ্ছে থ্রিভাল্ডসেন, ঠিক যেন কয়েক বছর আগে ফোনে কথা
বলার সময়ের ডাকের মতো।

“আমি এখানে, বাবা।”

“কোথায় সোনা?”

“সব জায়গায়, আস তো আমার কাছে।”

“আমি পারলাম না, সোনা। আমি ব্যর্থ।”

“আর রাগ পুষে রাখতে হবে না, বাবা। আর প্রয়োজন নেই। সে মারা গেছে।
ধর তুমি নিজেই তাকে মেরে ফেলেছ।”

“তোমার কথা খুব মনে পড়ে আমার।”

“হেনরিক।”

একটা নারীকষ্ট। অনেক দিন সে শোনেনি এটা।

লিজেট।

“কে?,” বলল সে। “কে, লিজেট?”

“আমিও এখানে আছি, হেনরিক। এই সাই এর সাথে। তোমার অপেক্ষায় আছি
সবাই।”

“কিভাবে পাব তোমাদেরকে?”

“আর ধরে রেখ না, যেতে দাও ওটাকে।”

তারা কী বলতে চাইছে সেটা বুঝতে চাইল সে। কী অর্থ এটা। কিন্তু তাদের
অনুরধের মাঝে যেটার ইঙ্গিত রয়েছে সেটাই তয় পাইয়ে দিচ্ছে তাকে। বিষয়টা কেমন
সেটা তাকে জানতে হবে। “ওখানে কেমন লাগে সবার?”

“খুবই শান্তিতে আছি সবাই,” উত্তর দিল লিজেট।

“অসাধারণ অনুভূতি, বাবা,” যোগ করল সাই। “আর একটুগুৱাকা লাগে না।”

একাকীভু বিহীন একটা সময়ের কথাও মনে করতে পারল না সে। কিন্তু ওদিকে
স্যামকে ফেলে এসেছে, সাথে মিগ্যান। সবাই চার্চের খন্ডকে। লায়নও আছে ওদের
সাথে।

একটা চিৎকার তার প্রশান্তিকে দূর করে দিল।

খুব কষ্ট করে চোখ মেলে দেখতে চাইল সেকী ঘটছে।

মিগ্যান চেপে ধরেছে লায়নকে।

মেরের উপর ধন্তাধন্তি চলছে ওদের।

এখনো একটুও নড়তে পারছে না সে। বাহু দুটো রক্তাক্ত বুকের দু'পাশে ছড়িয়ে
আছে। পা দুটোকে মনে হচ্ছে যেন কখনোই ছিল না তার। হাত আর আঙুলগুলো জমে
অসাড়। কিছুই কাজ করছে না। উষও একটা যন্ত্রণা চোখের পেছন থেকে ঠেলে উঠল
হঠাত।

“হেনরিক।” লিজেট ডাকছে।

“ছেড়ে দাও, ওদের সাহায্য করতে পারবে না তুমি।”

“কিন্তু আমাকে তো ওদের পাশে দাঢ়াতেই হবে।”

▲

স্যাম দেখল মিগ্যান এবং লায়ন মেরেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, পেরে উঠছে না কেউই।

“কুন্তার বাচ্চা,” মিগ্যানের চিৎকার শুনল সে।

ওদের সাথে যোগ দেওয়া দরকার, মেয়েটাকে সাহায্য করা দরকার। কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু ভয়ে তার পা একেবারেই জমে আছে। নিজেকে ক্ষুদ্র, বিরক্ত ও একইসাথে কাপুরূষ মনে হচ্ছে তার। ভীষণ ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু এভাবেও তো থাকা যায় না। তাই সোজা হয়ে দাঁড়াল সে পায়ে ভর দিয়ে, তারপর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দেওয়াল সরিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

এক ঝাঁকুনি দিয়ে মিগ্যানকে নিজের উপর থেকে সরিয়ে দিল লায়ন। একটা কবরের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লো মেয়েটা।

অঙ্ককারের তেতর খুঁজে থ্রিভান্ডসেনের বন্দুকটা দেখতে পেল স্যাম। তার বন্দুর শরীর থেকে দশ ফিট দূরে পড়ে আছে ওটা, ঠিক নিখর হয়ে পড়ে থাকা হেনরিকের মত।

সামনে ছুটে গেল স্যাম, তারপর অস্ত্রটা তুলে নিল হাতে।

▲

খোলা মাঠের মাটিকে হেলিকপ্টারের চাকাগুলো চুম্বন করতেই গায়ের সাথে লেগে থাকা হারনেসের বেল্টটা খুলে ফেলল ম্যালন। একই কাজ করল স্টেফানিও। তারপর দরজার হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে খুলে দিল সেটা।

হাতে বেরেটা নিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়লো ম্যালন।

বৃষ্টির শীতল ফোঁটা মুখে এসে ফুটল সুঁচের মতো।

▲

বন্দুকটা হাতে তুলে নিল স্যাম, নিজের রক্তে আপেষ্টে হাতটা ভিজে আছে। হেনরিক ও অ্যাশবি থেকে একটু দূরের অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম। লায়ন সজোরে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল মিগ্যানের মুখে, ছিটকে গিয়ে একটা কবরের বাইরের পাশে আছড়ে পড়লো মিগ্যান। শরীরটা মেরোর উপর কুঁচকে গেল মেয়েটার।

নিজের বন্দুকটা খুঁজছে লায়ন।

রোটোরের শব্দটা এখন ধরে এসেছে, তার মানে চপারটা প্লাজায় নেমে গেছে। আর এটা লায়নও বুঝতে পারছে। তাই বন্দুকটা হাতে নিয়েই প্রাণ বাঁচাতে ছুটে গেল লোকটা।

বাঁ কাঁধে এখনো ব্যাথা করছে স্যামের, তবু সেটা ভুলে অঙ্ককার থেকে অস্ত্রটা উঁচু করে ধরেই বেরিয়ে এল আলোতে। “অনেক হয়েছে।”

থামল লায়ন কিন্তু ঘুরল না পেছন দিকে। “হ্ম, তিন নম্বর ভদ্রলোক।”

“একটুও নড়বে না।” লায়নের ঠিক মাথা বরাবর বন্দুকটা তাক করে রেখেছে সে।

“আমার ধারণা, আমি একটু নড়লেই আপনি ট্রিগারে চাপ দেবেন, ঠিক?”
জিজ্ঞেস করল লায়ন।

পেছনে না ঘুরেও লায়ন বন্দুকের বিষয়টা বুঝে যাওয়াতে মনে-মনে তাকে সমীহ
করল স্যাম।

“ওই বুড়ো লোকের অস্ত্রটা আপনার হাতে, ঠিক?

“জি, আর তোমার মাথাটা টার্গেট হিসেবে একেবারে দারুণ হয়েছে।”

“আপনার বয়স অনেক কম, বোৰা যাচ্ছে কথা শুনে। আপনিও কি আমেরিকান
এজেন্ট?”

“শাট আপ,” স্পষ্ট ধর্মক দিল এবার।

“তো আমার অস্ত্রটা ফেলে দিলে কেমন হয়?

লোকটার ডান হাতে অস্ত্রটা এখনো দেখা যাচ্ছে, মেঝের দিকে তাক করা।

“তাই হোক।”

হাতটা আলগা করে দিল লায়ন, বন্দুকটা পড়লো পড়লো পাথরের মেঝের উপর।

“হয়েছে এবার?” এখনো পেছনটা স্যামের দিকে।

হঁা, হয়েছে ঠিকই।

“জীবনে কাউকে গুলি করেননি, আপনি, করেছেন?” জিজ্ঞেস করল লায়ন।

“বলেছি একবার চুপ থাকতে,” স্যাম বলল।

“আমিও এটাই ভেবেছি। দেখি আমার অনুমান কতটা ঠিক হয়। আমি চলে যাচ্ছি।
আর একজন নিরস্ত্র মানুষকে আপনি গুলি করতে পারেন না, বিশেষ করে পেছন থেকে তো
নয়ই।”

এত ত্যাড়া-ত্যাড়া কথা শুনে ক্লান্ত স্যাম, বিদ্রপেরও প্রেকটা সীমা থাকে। “ঘুরে
দাঁড়াও।”

একেবারে গ্রাহ্য না করে লায়ন সামনের দিকে একটা পা এগিয়ে গেল।

ট্রিগারে চাপ দিল স্যাম, বুলেটটা লায়নের সামনের মেঝের উপর শব্দ করে আঁচড়ে
পড়লো। “এর পরেরটা তোমার মাথায় চুকবে।”

“নাহ, সেটা মনে হয় না আমার; আপনাকে আগেও দেখেছি আমি, অ্যাশবিকে গুলি
করার আগেই। সবকিছু চুপচাপ দেখে গেলেন, ওই দিকে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কিছুই করেননি।”

আরও এক পা সামনে এগিয়ে গেল লায়ন।

ট্রিগার চাপল স্যামও।

▲

চার্চের ভেতর থেকে দুটো গুলির শব্দ এল, পরিষ্কার শুনতে পেল লায়ন।

সে এবং স্টেফানি প্লাইউডের একটা বেষ্টনী পার হলো দৌড়ে। চার্চকে ঘিরে রেখেছে
এটা। দরজা খুঁজে পেতে হবে তাদের এখন, যেটা দিয়ে মানুষগুলো ভেতরে চুকেছে।

সামনের তিনটা দরজাই বন্ধ করা।

বৃষ্টির শীতল জল ভূ বেয়ে পড়ছে নিচে।

দ্বিতীয় বুলেটটা আছড়ে পড়লো মেঝেতে ।

“আমি থামতে বলেছি,” চিংকার দিল স্যাম ।

ঠিকই বলেছে লায়ন । কারো দিকে গুলি চালায়নি সে আগে । সে প্রশিক্ষণ নিয়েছে যন্ত্রপাতি সম্পর্কে, কিন্তু মানসিক প্রশিক্ষণ তার নেই এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মোকাবেলা করার । তবু এইসব চিন্তা-ভাবনা ঘেড়ে ফেলে দিল সে । নিজেকে আরও গোছান ও উচ্চ মর্যাদার একজন হিসেবে মনে করল তারপর ।

এবং প্রস্তুত হয়ে গেল পুরোপুরি ।

আবারো সামনে এগিয়েছে লায়ন ।

দু'পা সামনে এগিয়ে এল স্যাম, তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি কসম করে বলছি, আমি গুলি করে দেব ।” নিজের কষ্টটা খুব শীতল রাখল সে, যদিও ভেতরে রেসের ঘোড়া দৌড়াচ্ছে ।

আরও একটু সামনে গেল লায়ন । “আপনি গুলি করতে পারবেন না, জানি ।”

“আমাকে চিনতে পারনি তুমি ।”

“হয়ত চিনি না, কিন্তু ভয়কে চিনি ভালো করেই ।”

“কে বলল যে আমার ভয় করছে?”

“আমি শুনতে পাচ্ছি এটা : কে বলল তা মুখ্য না ।”

ব্যথায় কাতরে উঠল মিগ্যান ।

“আমাদের মাঝে দুই ধরণের মানুষ আছে । একদল কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যে কারো জীবন শেষ করে দিতে পারে, আর বাকির শ্রারা আপনার মতো, এগুলো করতে পারে না, বা নিজেদেরকে এই পর্যায়ে স্থানিয়ে আনতে পারে না যতক্ষণ না তাদেরকে এটা করতে বাধ্য করা হচ্ছে । আর আমি এখন সেরকম কিছুই করছি না । আপনাকে রাগাচ্ছি না আমি ।”

“হেনরিককে তুমি গুলি করেছ, আমার সামনেই ।”

থামল লায়ন । “আহ, তাহলে এটাই তার নাম । হেনরিক ! হ্যাঁ, করেছি । আপনার বন্ধু সে?”

“নড়বে না একটুও ।”

খোলা দরজাটা থেকে লায়ন মাত্র দশ ফিট দূরে ।

আরও একটা পদক্ষেপ সামনের লোকটার । কোনো তাড়াহড়া নেই তার ভেতর । শীতল কঢ়ের মতোই ধীরস্থির সবকিছু ।

“আরে, চিন্তা করবেন না,” বলল লায়ন । “আমি কাউকে বলব না যে আপনি আমায় গুলি করেননি ।”

পাঁচ ফিট দূরে দরজাটা ।

“বাবা ! চলে আস আমাদের কাছে।” একটা কম্পমান নীল দীপ্তির মাঝ থেকে সাই ডাকল তাকে।

অদ্ভুত এবং একইসাথে অপূর্ব এক ভাবনা তাকে হরণ করছে। কিন্তু থ্রিভাল্ডসেন কিভাবে তার স্ত্রী আর ছেলের সাথে কথা বলবে? এটা তো অসম্ভব। কথোপকথনটা নিশ্চই তার ব্যথাতুর মনের অলিক কল্পনা।

“আমাকে প্রয়োজন স্যামের,” জোরে বলে উঠল সে

“তুমি কিছুই আর করতে পারবে না, বুবতে চেষ্টা করল ডার্লিং।” লিজেট বলল তাকে।

একটা সাদা পর্দা নেমে এল নিঃশব্দে। শক্তির অবশিষ্ট যেটুকু ছিল তা মুছে গেল।
খুব কষ্ট হচ্ছে একটু দম নিতে।

“সময় হয়েছে, বাবা ! আবার একসাথে হবার সময়।”

▲

স্যামকে ক্রমেই শক্ত করে ফেলছে লায়ন। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, দক্ষতা—সকলিছুর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছাঁড়ে দিয়েছে লোকটা।

বুদ্ধিটা ভালোই করেছে লায়ন। খোঁচান কথা বলে সেটা নিয়ে স্যান্ত রাখছে তাকে, খারাপ কিছু ঘটার সম্ভাবনা কমে আসছে এতে। তার মানে এইসব যে সে ঠিক কাজটাই করেছে। আর তাছাড়া, কারো কথার অধীনে থাকতে ভাল অপছন্দ বলেই নিজের ক্যারিয়ারটাও শেষ হয়ে গেছে।

দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে লায়ন।

তিন ফিট বাকি।

দুই।

মর তুই এবার, লায়ন।

টিগার চাপল সে।

BanglaBook.Org

▲

এক জোড়া দরজা খোলা দেখল ম্যালন, আর সেখানেই একজন লোককে দেখা গেল বেরিয়ে আসতে। তারপর এক পা এগিয়েই গড়িয়ে পড়লো সামনের ভেজা পথের ওপর।

সে এবং স্টেফানি দৌড়ে উপরে উঠে গেল পাথরের সিঁড়ি ধরে, এবং স্টেফানি ঝুকে গেল লোকটার উপর। মুখটা মিলে গেল নৌকার উপর দেখা সেই লোকটার সাথে যে অ্যাশবিকে তুলে নিয়েছিল ওখান থেকে। পিটার লায়ন।

মাথায় বড়-সড় একটা গর্ত।

একটু উপরে তাকাল ম্যালন ।

দরজার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে স্যাম, হাতে বন্দুক, একটা কাঁধ রক্তে একাকার ।

“তুমি ঠিক আছ?” জিজ্ঞেস করল ম্যালন ।

মাথা নাড়ল তরুণ এজেন্টটি, কিন্তু তার মুখের যে কষ্টের অভিযন্তিটা দেখলে সে, তাতে ম্যালনের মনটা ভেঙে গেল একেবারে ।

পেছনে সরে গেল স্যাম । সে এবং স্টেফানি দৌড়ে গেল ভেতরে । কোনোমতে একটু দাঁড়িয়েছে মিগ্যান, স্টেফানি প্রথমেই ছুটে গেল তার দিকে তাকে সাহায্য করতে । ম্যালনের দৃষ্টি প্রথমে পড়লো একটা দেহের উপর-আশবি-তারপর আরেকটা ।

প্রভান্দসেন ।

“একটা অ্যাসুলেন্স ডাক,” চেঁচিয়ে বলল সে ।

“সে আর নেই,” শান্তভাবে বলল স্যাম ।

একটা শীতল অনুভূতি কাঁধ হয়ে গলা অবধি উঠে এল ম্যালনের । চোখ দুটোই বলে দিচ্ছে স্যামের কথাই ঠিক ।

সে এগিয়ে বন্ধুর পাশে বসে পড়লো ।

রক্ত জমে মাংস আর জামাকাপড়ে আটকে আছে । হাতের পালস শক্তিক্ষা করে দেখল সে, স্পন্দনহীন ।

ব্যাখ্যাতিত বিষাদে মাথাটা দোলাল ম্যালন ।

“অন্তত হসপিটালে নিয়ে যাই তাকে,” আবারো বলল সে ।

“কোনো লাভ নেই,” স্যাম বলল ।

একটা শক্তি কথায় ছেদ টানলেও, ম্যালন জানে এটাই সত্যি । কিন্তু বিষয়টা এভাবে মেনে নিতে পারছে না সে ।

মিগ্যানকে নিয়ে স্টেফানিও এসে দাঁড়িয়েছে কাছে ।

চোখ দুটো মেলে আছে প্রভান্দসেনের ।

“আমি চেষ্টা করেছি,” বলল মিগ্যান । “লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল... অ্যাশবিকে মারতেই হবে তার । আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম... ওখানে পৌঁছাতে, কিন্তু—”

ফুঁপিয়ে কেঁদেই ফেলল মেয়েটি । অশ্রু ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো চিবুকে ।

যখন সত্যিই একজন বন্ধুর দরকার হয়েছিল তার, প্রভান্দসেন ঠিক তখনই নিজেকে ম্যালনের জীবনে প্রবেশ করায়, দু'বছর আগে আটলান্টায় । ডেনমার্কে সবকিছু নতুন করে শুরু করার তাগিদ দেয় তাকে । যে প্রস্তাব সে গ্রহণ করেছিল লোকটার কাছ থেকে, সেটা নিয়ে এক বিন্দুও অনুশোচনা করতে হয়নি পরে । একসাথে গত চবিশটা মাস তারা পার করেছে, কিন্তু গত চবিশ ঘণ্টার বিষয়টা সম্পূর্ণই বিপরীতমুখী ।

We shall never speak again.

তাদের মাঝে এটাই ছিল শেষ কথা ।

ডান হাতটা দিয়ে গলাটা চেপে ধরল সে, যেন হাদয়ের গভীরে ঢুকে মেতে চাইছে একেবারে।

অবসাদ আর হতাশা গ্রাস করল ভেতরটাকে।

“ঠিক বলেছ, বন্ধু,” ফিসফিস করে বলল সে। “আর কোনো দিন কথা হবে না আমাদের।”

সাতাত্ত্ব
প্যারিস

রোববার, ডিসেম্বর ৩০

দুপুর ২৪৪০

সেইন্ট-ডেনিস ব্যাসিলিকায় প্রবেশ করল ম্যালন। সাধারণ জনগণ এবং নির্মাণকর্মী উভয়েরই এখানে আসা নিষেধ ক্রিসমাসের দিন থেকেই। সম্পূর্ণ জায়গাটা অপরাধপট হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

তিনজন মানুষ মারা গেছে এখানে। এদের দুজনের মৃত্যুতে কিছু ঝঝঝ আসে না তার।

কিন্তু তৃতীয় মৃত্যুটা কল্পনাতীত যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে।

তার বাবা মারা গেছে আটত্রিশ বছর আগে। তখন তার বয়স দশ। বাবাকে হারিয়ে সে একাকীভু পেয়েছে কিন্তু যন্ত্রণা না। প্রভান্তসেনেন্টে চলে যাওয়াটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। যন্ত্রণা তার ভেতরটাকে ক্ষয় করে দিচ্ছে অস্ত্র সাথে যোগ হয়েছে গভীর অনুশোচনা।

হেনরিককে তার স্ত্রী ও ছেলের কবরের পাশে কবর দেওয়া হয়েছে, ক্রিটিনাগেড এর একটা ব্যক্তিগত কবরস্থানে। তার উইলের সাথে হাতে লেখা একটা নোট যুক্ত করা ছিল। ওটায় উল্লেখ করা ছিল যে মৃত্যুর পর যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান না করা হয়। তারপরও সারা বিশ্বজুড়েই শোকের ছায়া নেমে এসেছে তার মৃত্যুতে। তার গড়া একাধিক কম্পানিতে চাকরিরত অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে হাজার-হাজার কার্ড, চিঠিপত্র এসেছে হেনরিকের ঠিকানায়, এখনো আসছে। তাদের সবার অভিভাবকের এমন চলে যাওয়ায় নিজেদের শোক প্রকাশ করছে তারা। ক্যাসিওপিয়া ভিট এসেছিল, যোগ দিয়েছিল মিগ্যান মরিসনও। মেয়েটার মুখে এখনো আঘাতের দাগ স্পষ্ট ম্যালন, মিগ্যান, ক্যাসিওপিয়া, স্টেফানি, স্যাম এবং জেস্পার মিলে সমাধিতে মাটি ফেলেছে। প্রত্যেকেই বেলচা দিয়ে কবরের ভেতর রাখা চকচকে পাইন কাঠের কফিনের উপর মাটি ফেলেছে, কেউ কোনো শব্দ করেনি সেদিন।

গত কয়েক দিন ধরে নিজের একাকীভু নিজের ভেতরেই রেখেছিল ম্যালন, গত দুই বছরের শৃঙ্খল রোম্বন করে চলেছে বারবার। অনুভূতিগুলো নিজের ভেতরই ঘুরে বেরিয়েছে, স্থপ্ত আর বাস্তবের মাঝে দুলে চলেছে শুধু। প্রভান্তসেনের মুখটা স্থায়ীভাবে

বসে গেছে তার মনের ভেতর। মুখের প্রতিটা খুঁটিনাটি প্রতিটা মুহূর্তেই মনে থাকবে তার। কালো এক জোড়া চোখ, উপরে এক জোড়া ঘন অৰু, লম্বা নাক, প্রশস্ত নাসারক্ষা, শক্ত চোয়াল, দৃঢ় থুঁতনি-সবকিছু স্পষ্ট। মেরুদণ্ডটা একটু বেঁকে গিয়েছিল তার, কিন্তু সেটা মনে রাখার বিষয় না। মানুষটা সবসময় সোজা ও দৃঢ় হয়েই দাঁড়াত।

চার্চের ভেতর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল সে। অসংখ্য স্তুতি, মূর্তি ও সুনিপুণ নকশা একটা অসাধারণ নির্মলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। রঙিন স্টেইন-গ্লাসের ভেতর দিয়ে আলো এসে নিচের জগতটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে শৃষ্টা, প্রকৃতির সৌন্দর্য, এবং জীবনের অবসানের কথা মনে না আসাটাই কঠিন। তবে কারো জীবন একটু দ্রুতই ফুরিয়ে যায়।

ঠিক হেনরিকের যেমন।

কিন্তু নিজেকে এখন সে বোঝাল কাজে মন দিতে হবে।

পকেটে হাত দিয়ে কাগজটা বের করে আনল সে, তারপর ভাঁজ খুলল।

CXXXV II CXLII LII LXIII XVII II VIII IV VIII IX II

প্রোফেসর মুর্যাড তাকে বলে দিয়েছে ঠিক কী খুঁজতে হবে প্রেনপোলিয়ন তার ছেলের জন্য এই সংকেত রেখে গিয়েছিল। সে শুরু করেছিল ১৫৩৫ নাম্বার শ্লোকের ২ নাম্বার চরণ থেকে।

হে পরমেশ্বরের দাসগণ, তোমরা পরমেশ্বরের মন্দিরে ও আমাদের ঈশ্বরের সূহের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাহার ধন্যবাদ কর।

তারপর ২ নাম্বার শ্লোকের ৮ নাম্বার চরণ।

আমি তোমার অধিকারের নিমিত্তে ভিন্নভিন্ন যদিগকে ও তোমার রাজ্যের নিমিত্তে ভূমণ্ডলের প্রাত্মস্থিত সকলকে তোমাকে দিব।

নেপোলিয়নের জন্য এমন কথাই মানায়।

পরের অংশটা ১৪২ নাম্বার শ্লোকের ৪ নাম্বার চরণ।

আমার দক্ষিণে নিরীক্ষণ করিলে আমার মিত্র কেহই নাই।

ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকাতে হবে সেটা বোঝা বেশ কঠিন ছিল। সেইন্ট-দেনিস লম্বায় প্রায় একটা ফুটবল মাঠের মতো, আর চওড়ায় প্রায় অর্ধেক। কিন্তু পরের স্তবকেই এই সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হয়েছে। শ্লোক নাম্বার ৫২, চরণ নাম্বার ৮।

কিন্তু আমি ঈশ্বরের মন্দিরে স্থিত সতেজ জিত-বৃক্ষস্বরূপ; আমি সদা সর্বক্ষণে ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রত্যাশা করিব।

বাইবেলের শ্লোক সম্পর্কে মুর্যাডের সংক্ষিপ্ত ক্লাস করার সময় আরও একটা শ্লোকের কথা মনে এসেছিল ম্যালনের, যেটা খুব যথাযথভাবে গত সপ্তাহের ঘটনাবলির সাথে মিলে যায়। ১৪৪ নাম্বার শ্লোকের ৪ নাম্বার চরণঃ মনুষ্য বাস্পের তুল্য, ও তাহার দিবস দ্রুতগামী ছায়ার ন্যায়। প্রার্থনা করল ম্যালন হেনরিক যেন শান্তিতে থাকে।

কিন্তু আমি ঈশ্বরের মন্দিরে স্থিত সতেজ জিত-বৃক্ষস্বরূপ; আমি সদা সর্বক্ষণে ঈশ্বরের অনুষ্ঠানে প্রত্যাশা করিব।

ডান দিকে তাকাতেই একটা স্তুপ চোখে পড়লো তার। সম্পূর্ণ গোথিক নকশায় গড়া, প্রাচীন সব উপকরণে ভরা, খোদাই করা মন্দির, আর প্রার্থনারত অসংখ্য চরিত্র সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে ওটা। পাথরের দুটো প্রতিকৃতি খাড়া করে রাখা মাটির উপর, জীবনের শেষ মুহূর্তকে বোঝাচ্ছে ওগুলো। স্তুপের ভীতের চারপাশে ইটালিয়ান কার্ণশিল্পের ছোঁয়া স্পষ্ট।

কাছে এগিয়ে গেল সে, তার রাবারের-সোল লাগানো জুতাজোড়া একই সাথে কামড়ে ধরছে মেঝেটা এবং নীরবও থাকছে। স্তুপের ঠিক ডান পাশেই মেঝের উপর একটা মার্বেলের স্ন্যাব, যেটার গায়ে একটা জলপাই গাছ খোদাই করা। একটা লেখা ব্যাখ্যা করছে সমাধিটা ১৫শ শতকের। মুর্যাড তাকে জানিয়েছে এখানে গুজ্জোউমে দু চ্যাস্টেল শায়িত আছে। সপ্তম চার্লস এর খুব আস্থাভাজন ও ভালবাসা^১ পাত্র হওয়ায় চ্যাস্টেলের মৃত্যুর পর চার্লস তার সম্মানে তাকে এই সেইট-দেনিকে সমাহিত করে।

৬৩ নাম্বার শ্লোকের ৯ নাম্বার চরণটা দেখতে হবে এর পুরুষ

কিন্তু উহারা নিজ বিনাশার্থে আমার প্রাণ নষ্ট করিবেন্তে চেষ্টা করে; পৃথিবীর নিচে তাহাদের অধোগতি হইবে। তাহারা খড়গধারে পতিত কর্তৃত্ব শৃগালের খাদ্য হইবে।

ফ্রাসের সরকারের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই এসে অনুমতি পেয়েছে, এই ধাঁধা সমাধান করার জন্য যেকোনো কিছুই করতে পারবে সে। যদি এটার অর্থ এরকম হয় যে প্রয়োজনে চার্চের ভেতরে কিছু ধ্বংসও করা যাবে, তাহলে হোক সেরকমই। আর এই স্থাপনাগুলোর বেশিরভাগই ১৯ এর এবং ২০ এর শতকে মেরামত এবং পুনর্নির্মাণ করা। ম্যালন বলেছিল কিছু যন্ত্রপাতি ভেতরে রেখে যেতে যদি কাজে লাগে তার, আর পশ্চিমের দেওয়ালের ধারে সেগুলো দেখতে পেল সে।

চার্চের মাঝ বরাবর হেঁটে গিয়ে ওখান থেকে একটা স্লেজহ্যামার তুলে নিল সে। এই বড় হাতুড়িতেই কাজ হবার কথা।

প্রোফেসর মুর্যাড যখন ছোট-ছোট সূত্রগুলো তার কাছে ব্যাখ্যা করছিল, তখন চার্চের নিচে তারা যা খুঁজছে সেটা বাস্তব মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন সে বাইবেলের পঙ্কজগুলো পড়লো, সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গেল সে এটার অস্তিত্বের ব্যাপারে।

মেঝের উপর খোদাই করা জলপাই গাছের কাছে ফিরে এল সে।

সর্বশেষ ক্লু, নেপোলিয়নের ছেলের কাছে লেখা শেষ চিঠিটা। ১৭ নাম্বার শ্লোক, ২ নাম্বার চরণ।

তোমার সাক্ষাতে আমার বিচারের নিষ্পত্তি হোক, সরলতার প্রতি তোমার দৃষ্টি
বর্তুক।

হ্যামারটা দিয়ে মেঝেতে আঘাত করল সে।

মার্বেলের প্লেটগুলো ভাঙল না, কিন্তু সে নিশ্চিত হয়ে গেল ঠিকই। একটা ফাঁপা
আওয়াজ জানিয়ে দিল যে নিরেট কোনো পাথর নেই নিচে। পরপর তিনটা আঘাত
করল সে, আর ভেঙ্গে গেল পাথরটা। আরও দুটো মার্বেলের প্লেট ভেঙ্গে যেতেই একটা
আয়তাকার মুখ খুলে গেল চার্চের নিচ থেকে।

একটা শীতল প্রবাহ উঠে এল অঙ্ককার গর্তটা থেকে।

মুর্যাদ তাকে বলেছে নেপোলিয়ন কিভাবে ১৮০৬ সালে সেইন্ট-ডেনিসের
অপবিত্রকরণ থামিয়ে দিয়ে এটাকে আবারো রাজকীয় কবরখানা হিসেবে পুনরায়
ঘোষণা করে। পার্শ্ববর্তী একটা অ্যাবেও ঠিক করায় সে। উন্নয়ন কাজের সার্বিক
তদারকির জন্য একটা ধর্মীয় আইন প্রতিষ্ঠাও করা হয়েছিল তার দ্বারা, এবং এই সম্পূর্ণ
ব্যাসিলিকার ক্ষয়ক্ষতি সারাতে নতুন স্থাপত্যবিদ নিয়োগ দিয়েছিল নেপোলিয়ন। তাই
তার জন্য চার্চের কোথাও নিজের ইচ্ছামত গোপন একটা চেম্বার বানানো বা যেকোনো
কিছুই তৈরি করিয়ে নেওয়াটা সহজ ছিল একেবারে। এতগুলো বছর ধরে ভেঙ্গে
এরকম একটা গর্ত কিভাবে সবার দৃষ্টির আড়ালে থাকল সেটা ভেঙ্গে অবাক হলো
ম্যালন। তবে সম্ভবত এটার কারণ হিসেবে বলা যায় নেপোলিয়ন-পরবর্তী ফ্রান্সের
আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা। সম্মাটকে সেন্ট হেলেনায় পাঠানোর পর কিছুই আর শান্ত ছিল
না।

স্লেজহ্যামারটা রেখে এক গোছা দড়ি এবং একটু ফ্ল্যাশলাইট তুলে নিল সে।
তারপর গর্তের মুখে আলো ধরতেই বোঝা গেল একটি অনেকটা ঢালু পথের মতো, তিন
ফিট বাই চার ফিট হবে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে, এবং গভীর ছতে পারে কুড়ি ফিটের মতো। কাঠের
একটা মই-এর ভগ্নাবশেষ মেঝের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ব্যাসিলিকার কোথায়
কী আছে সেটা নিয়ে ঘাঁটতে গিয়ে ম্যালন জেনেছে একসময় একটা ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষ
ছিল এই চার্চে, যেটার অংশবিশেষ এখনো খোলা আছে, এবং সেটা দর্শকদের জন্য
উন্মুক্ত। কিন্তু এরকম কোনোকিছুই এতদূর পর্যন্ত টেনে আনা হয়নি, তার মানে এটা
কোনো সমাধিকক্ষের প্রবেশমুখ না। নেপোলিয়নও সম্ভবত বিষয়টা ধরতে পেরেছিল।

অন্তত মুর্যাদ এরকমই মনে করে।

কয়েক ফিট দূরের একটা কলামের গোড়ায় দড়িটা বাঁধল ম্যালন, এবং টেনে
দেখল ঠিক আছে কিনা। দড়ির বাকি অংশটুকু গর্তের মাঝে ছেড়ে দিল, তারপর
স্লেজহ্যামারটাও, কাজে লাগতে পারে ওটা। লাইটটা বেল্টের সাথে আটকে নিয়ে দড়ি
ধরে নামতে শুরু করল সে অঙ্ককার জগতের মাঝে।

নিচে নামার পর পাথরের দিকে আলোটা ধরল সে। শীতল, ধুলোমাখা পথের
শেষ দেখা গেল না, আলোটা যতদূর গেছে পথটা দেখা যাচ্ছে। সে জানে যে প্যারিস

শহরটা সুড়ঙ্গে ভৱা। মাইলের পর মাইল জুড়ে ভূগর্ভস্থ অলিগলি আর পথ। শহরটা আক্ষরিক অর্থে নিচ থেকে নিয়েই তৈরি করা হয়েছে।

সুড়ঙ্গের দু'প্রান্তে হাতড়ে আঁকাবাঁকা পথে প্রায় দু'শ ফিটের মতো এগিয়ে গেল। একটা পরিচিত গন্ধ নাকে আসছে, জর্জিয়ার সেই ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে গন্ধটা। পেটের ভেতর মোচড় দিল তার। পায়ের নিচে পাথর টুকরো কড়কড় শব্দ করছে। এখানকার নিরবতার মাঝে হারিয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, শুধু ঠাণ্ডা পরিবেশটাই সঙ্গ দিচ্ছে এই নিঃস্ব, খোলা জায়গাটাকে।

ম্যালন অনুমান করল সে ব্যাসিলিকার সীমানা পার হয়ে এসেছে এতক্ষণে, এখন সে ভবনের পূর্বদিকে আছে, সম্ভবত এখন সে ব্যাসিলিকার কাছের অঞ্চলের নিচে আছে, অনুমান সত্য হলে তার মাথার উপর এখন গাছের সারি আর ঘাসের চাদর বিস্তৃত জায়গা জুড়ে। আর এভাবে এগিয়ে গেলে সেইনে নদী এসে পড়বে সামনে।

একটু সামনে ডান পাশের দেওয়ালের গায়ে একটা খাঁজ চোখে পড়লো, বেশী গভীর না ওটা। নুড়িপাথর ঢেকে আছে পুরো পথটা জুড়ে।

সে সামনে এগিয়ে আলো ফেলল ওটার উপর। খাঁজের এক পাশের অমসৃণ পাথরের গায়ে একটা সিম্বল খোদাই করা। ওটা দেখেই ম্যালন চিনতে পারল; মেরোভিনজিয়ান বইতে নেপোলিয়নের একটা লেখায় আছে এটা, লেখাটা ছিল চৌদ্দ লাইনের।



কেউ একজন পাথরটাকে এভাবে এখানে রেখেছিল একটা চিহ্ন হিসেবে, আর পাথরটা দু'শ বছরেরও বেশী সময় অপেক্ষা করে আছে। ফাটলের ভেতর দিয়ে একটা ধাতব দরজা দেখতে পেল সে, অর্ধেকটা খোলা। একটা ইলেকট্রিক তার দরজার সামনে দিয়ে নোরই ডিগ্রী ঘুরে চলে গেছে সামনের টানেলের মাঝ দিয়ে।

তার ধারণা যে ঠিক হয়েছে, তাতে খুশী হলো ম্যালন।

নেপোলিয়নের ছোট-ছোট সূত্রগুলো তাকে এখানে, এই অঙ্ককার, শীতল পরিবেশে নায়িয়ে এনেছে। এরপর সিম্বলটা দেখিয়ে দিচ্ছে ঠিক কোথায় সেটা অপেক্ষা করছে। ভেতরে আলো ফেলে একটা ইলেক্ট্রিকাল বক্স দেখতে পেল সে, তারপর সুইচটা অন করে দিল।

হলদে আলো ছড়িয়ে পড়লো পুরো মেঝেটা জুড়ে, প্রকাশ করল চেম্বারটা পঞ্চাশ বাই চল্লিশ ফিট হবে, দশ ফিট উপরে সিলিং। সে গুণে দেখল, কমপক্ষে তিন ডজন কাঠের সিন্দুক সারি দিয়ে রাখা যাব কয়েকটার ডালা খুলে রাখা।

ভেতরে না তাকানোর যুক্তি আসে না। একটু কাছে এগিয়ে দেখল, সোনা ও রূপার অসংখ্য বার থেরে থেরে সাজিয়ে রাখা যার প্রতিটার উপর N অঙ্কর সিল করা, সেটার উপর একটা রাজমুকুট অঙ্কিত, স্মার্ট নেপোলিয়নের সরকারি প্রতীক ছিল এটা। কাঠের আরেকটা সিন্দুকের ভেতর স্বর্ণমুদ্রা। আরও দুটোয় রূপার প্লেট। তিনটার কানায়-কানায় ভরা নানান রকমের, ও নানান রঙের পাথর, বোঝাই যাচ্ছে খুব মূল্যবান সেগুলো।

দৃশ্যত, মহান স্মার্ট খুবই যত্নের সাথে তার সংগ্রহশালা পূর্ণ করেছে, বিশেষ করে ধাতু ও পাথরেই তার আগ্রহ।

ঘরটা ভালো করে একবার ঘুরে দেখল ম্যালন। চোখ দুটো সব পরীক্ষা করে নিচ্ছে, মনটা ভাবছে সেই ধৰ্ম ও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যের মালিকের রেখে যাওয়া সম্পদ এখন তার সামনেই।

নেপোলিয়নের গুণ্ঠ ভাগ্নার।

“আপনি নিশ্চয়ই কটন ম্যালন,” একটা নারীকষ্ট বলে উঠল।

ঘুরে দাঁড়াল সে। “এবং আপনি নিশ্চয়ই এলিজা লাঘক।”

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মহিলাটি। দীর্ঘকায় এবং আভিজাত্য প্রদৰ্শন সিংহের মতো ভাব-ভঙ্গী, আর সেটা লুকিয়ে কোমলতা আনার কোনো ইচ্ছাই নেই। তার ভেতর। গায়ে উলের লম্বা একটা কোট, হাঁটু পর্যন্ত নেমে আছে, উৎকৃষ্ট ও সুর্যার্জিত সেটা রঙ ও বুননে। তার পাশেই ছিপছিপে গড়নের রূক্ষ চাহনির একটা প্রজন্মী লোক দাঁড়িয়ে। উভয়ের মুখ থেকেই সব ভাবাবেগ মুছে গিয়েছে যেন।

“এবং আপনার বন্ধু পাওলো অ্যাহোসি,” বলল ম্যালন। “খুব মজার একটা চরিত্র ইনি। একজন প্রিস্ট যে অল্প কিছুদিনের জন্য প্রেম দ্বিতীয় পিটার এর সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু পোপের শাসন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে এই সেক্রেটারি ও হারিয়ে যায়, একেবারে লাপাত্ত। গুজব ছড়িয়ে পড়ে তার—” বিরতি নিল ম্যালন। “—সততা নিয়ে। আর এখন এই যে তিনি উপস্থিত।”

লাঘক পারলে ম্যালনের প্রশংসাই করত এখন মনে হচ্ছে। “আমাদেরকে এখানে দেখেও আপনি অবাক হননি দেখছি।”

“আসলে আপনাকেই প্রত্যাশা করছিলাম আমি।”

“সত্যি? আমাকে অবশ্য বলা হয়েছে আপনি একসময় বড় মাপের একজন এজেন্ট ছিলেন।”

“ছিলাম এক কালে।”

“আর হ্যাঁ, ঠিক। পাওলো আমার অনেক কাজ একেবারে ঠিকঠাক করে দেয়,” বলল লাঘক। “তাই ভাবলাম, এই মুহূর্তে তাকে আমার পাশে রাখাই সবচে ভালো হবে, বিশেষ করে গত সপ্তাহে যা হয়ে গেল সেটা বিবেচনার পর।”

“হেনরিক থ্রিভান্ডসেন মারা গেল আপনার কারণেই,” সোজা বলে দিল ম্যালন।

“সেটা কিভাবে সম্ভব, বলুন? সে আমার ব্যবসায় গায়ে পড়ে নিজেকে যুক্ত করেছে, এর আগে আমি তাকে চিনতামই না। আইফেল টাওয়ারে সে আমাদের ফেলে একাই চলে গেল, এরপর তার সাথে দেখাই হয়নি।” একটা বিরতি নিল সে। “যা-ই হোক, আপনি কিন্তু বললেন না যে এখানে আমি আছি সেটা জানলেন কী করে?

“এ জগতে আপনার থেকেও স্মার্ট লোক আছে এখনো।”

ম্যালন দেখল অপমানটা ভালোভাবে নিতে পারল না মেয়েটা।

“আমি নজর রাখছিলাম আপনার উপর,” বলল ম্যালন। “আমার ধারণার চেয়েও দ্রুত ক্যারলাইন ডডকে খুঁজে বের করলেন আপনি। এই জায়গা সম্পর্কে জানতে কত সময় লাগল আপনার?”

“মিস ডড খুবই কাজের একজন মেয়ে। সব ক্লু ব্যাখ্যা করে দিল বলা মাত্রই। কিন্তু এখানে পৌছানোর অন্য পথ খোঁজার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। আমার ধারণা ছিল যে এখানে যাওয়া-আসার জন্য আরও পথ থাকবে। আর সেটাই ঠিক। কয়েক দিন আগেই আমরা সেই সঠিক টানেল খুঁজে পেয়েছি, তারপর চেম্বারটা খুলেছি, এবং ইলেকট্রিক লাইনও টেনে এনেছি খুব আছের একটা পয়েন্ট থেকে।”

“হ্রম, আর ডড?”

মাথাটা একটু ঝাঁকাল সে। “মেয়েটা আমাকে খুব বেশী-বেশী মনে করিয়ে দিচ্ছিল লর্ড অ্যাশবির বেঙ্গলীনির কথা, তাই পাওলো বিষয়টা মিটিঙে দিয়েছে।”

অ্যাশেসির ডান হাতে একটা বন্দুক দেখা যাচ্ছে।

“আমার প্রশ্নের উত্তরটা এখনো দিলেন না,” লাঘক বলল।

“আপনি যখন আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, নিজের প্রকল্পগুলো দখলে নিতে, ঠিক কিনা? এবং আপনি এগুলো বের করে নেওয়ার জন্য চুক্তি করেছেন কিছু লোকের সাথে।”

“কঠিন বলতে এটাই ছিল সত্যি,” লাঘক বলল। “কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো যে পৃথিবীতে এখনো কিছু মানুষ আছে যারা টাকার বিনিময়ে সবই করতে পারে। এখন আমাদের শুধু এগুলো ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিতে হবে, ছোট-ছোট বাস্তু ভরে সেগুলো সীল করে দিতে হবে, তারপর হাতে-হাতে একেকজন একটা করে বাস্তু নিয়ে বের হয়ে যাবে এখান থেকে।”

“ওরা কাউকে বলে দিতে পারে, সেই ভয় নেই আপনার?”

“ওরা আসার আগেই তো বাস্তুগুলো সীল করে আটকে দেওয়া হবে।”

মাথাটা নেড়ে এই নারীর দূরদর্শিতার প্রতি একটু সমীহ জানাল ম্যালন।

“আপনি এখানে এলেন কিভাবে?” জিজ্ঞেস করল লাঘক।

উপর দিকে দেখাল ম্যালন। “সদর দরজা দিয়ে।”

“আপনি কি এখনো আমেরিকানদের হয়ে কাজ করছেন? জিজ্ঞেস করল সে। “থ্রিভান্ডসেন অবশ্য আপনার সম্পর্কে আমায় বলেছিল কিছু।”

“আমি আমার জন্যই কাজ করছি।” চারদিকে একটু ঘুরে নিল সে। “আমি এটার জন্যই এসেছি এখানে।”

“এরকম গুপ্তধন খুঁজে বেরায় যারা তাদের মতো আপনি হতে যাবেন কেন? আপনার সাথে দ্বন্দ্ব বাঁধাতে চাই না”

একটা সিন্দুকের উপর বসল ম্যালন, অবিদ্যা আর তার অনাকাঙ্ক্ষিত সঙ্গী হতাশা মিলে দুর্বল করে দেওয়া স্নায়গুলোর একটু বিশ্রাম দরকার। “ঠিক এখানেই আপনার ভুলটা হচ্ছে। দেখুন, আমিও এরকম ধন, সম্পদ ভালবাসি। কে বাসে না, বলুন? তবে এরকম মূল্যবান জিনিস থেকে অযোগ্য ও নোংরা মানুষদের বাঞ্ছিত করতে খুব ভালো লাগে আমার। আর এক্ষেত্রে সেই মানুষটা হলেন আপনি।”

নাটকিয় হাসিতে কথাটা উড়িয়ে দিল সে। “তাই? আমার তো বরং মনে হচ্ছে আপনিই বাঞ্ছিত হতে যাচ্ছেন এটা থেকে।”

মাথা নাড়ল ম্যালন। “আপনার খেলা শেষ। প্যারিস ক্লাব নেই। টাকা নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্রও নেই। নেই কোনো গুপ্তধন। জাস্ট জিরো।”

“এরকমটা হতে পারে সেটা আমার মনেই হয় না।”

কথায় কান দিল না ম্যালন। “তবে ভাগ্য খারাপ যে কোনো সাক্ষী^{অন্তর} জীবিত নেই, বা সেরকম শক্ত কোনো প্রমাণও নেই যা দিয়ে আপনাকে দোষী প্রমাণ করা যায়। তাই এখনকার কথা-বার্তাটা আপনি চাইলে জেল-মুক্তির ছাড়পত্র হিসেবে নিতে পারেন, তবে এটাই কিন্তু একমাত্র রাস্তা আপনার বাঁচার।”

তার এমন অভ্যন্তর কথা শুনে হাসল এলিজা লাঘক। “জোচ্ছ আপনি কি সব সময় এরকম মিশ্রক আর সামাজিক, বলুন তো? ধরুন, আপনি স্থুরাতে পারছেন আপনার মৃত্যু সামনেই দাঁড়িয়ে, তখনও এমন করবেন?”

কাঁধ ঝাঁকাল কটন ম্যালন। “আমি হলাম যা-হবে-হোক-কিছু-যায়-আসে-না ধরণের মানুষ।”

“আপনি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন, মিস্টার ম্যালন?” জিজেস করল সে।

“সত্যি বলতে কী...নাহ, করি না।”

“আমি করি। আরও ঠিক করে বললে, আমি আমার পুরো জীবনটাই ভাগ্যের দ্বারা পরিচালিত করি। আমার পূর্বপুরুষও ঠিক একই কাজই করে গেছেন শত-শত বছর ধরে। যখন জানলাম অ্যাশবি মারা গেছে, তখন আমার কাছে থাকা দৈর বাণীর সংকলনকে একটা প্রশংসন করেছিলাম আমি, সহজ একটা প্রশংসন। আমার নাম কি অমর হয়ে থাকবে এবং আমার বংশধরেরা কি আমার কর্মকে প্রশংসন করবে? উত্তর আমাকে কি দেওয়া হয়েছিল শুনতে চান?”

“অবশ্যই।” তাকে খুশী করতেই বলল ম্যালন।

“এক চমৎকার সঙ্গী তোমার সম্পদ হবে, যে সম্পদ দেখে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।” একটা বিরতি নিল সে। “পরের দিনই এটা পেলাম।”

সিন্দুকগুলোর দিকে দেখাল লাঘক।

আর কিছু শোনার ইচ্ছা নেই ম্যালনের।

একটা হাত উঁচু করল সে, তর্জনীটা নিচের দিকে। আঙুলটা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরাল কয়েকবার, এলিজাকে সংকেত দিল সে পেছনে ঘুরে তাকাতে।

অঙ্গভঙ্গিটা বুঝতে পেরে কাঁধের উপর পেছনে দৃষ্টি দিল লাঘক। স্টেফানি নেলেই এবং স্যাম কলিঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পেছনে।

উভয়ের হাতেই বন্দুক।

“ওহ, আমি কি বলেছিলাম যে আমি একা আসিনি?” জিজ্ঞেস করল ম্যালন। “আমাকে ভুল বুঝবেন না, তারা কিন্তু আপনার আসার আগেই এখানে এসে অপেক্ষা করছে।”

তার মুখের দিকে তাকাল লাঘক। তার চোখের ক্রোধ দেখেই ম্যালন নিশ্চিত হয়ে গেল যে তার অনুমানটা সত্যি। তাই, এলিজা এই মুহূর্তে যেটা নিয়ে হিসেব করছে, সেটা বলেই দিল ম্যালন। “যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে, ম্যাডাম, এই হলো আপনার সেই বন্ধু, চোখ দুটো জুড়াচ্ছে তো?”

অ্যাম্বোসির হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে নিল স্যাম। কোনো বাধা দিল না সে।

“আর আমি এটা এভাবেই রাখব,” ম্যালন বলল অ্যাম্বোসিকে। “এই স্যামকে দেখছেন, ওর কাঁধে গুলি লেগেছিল। তাতেই ওর অবস্থা খারাপ। কিন্তু এখন ঠিক আছে। এই ছেলেটাই পিটার লায়নকে গুলি করেছে। তার জীবনের প্রথম মানুষ মারার ঘটনা। আমি তাকে বলেছি যে দ্বিতীয়টা মারার সময় কাজটা অনেক সহজ মনে হবে।”

কিছুই বলল না অ্যাম্বোসি।

“হেনরিক থ্রিভাল্ডসেনকেও চোখের সামনে মরাতে দেখেছে সে। ছেলেটা এখনো মানসিক দৈনন্দিন ভেতরেই আছে। আছি অ্যদি এবং স্টেফানিও। আমরা তিনজনে আপনাদের দু'জনকে তুড়ির আগেই মেরে ফেলতে পারি, কিন্তু আমরা খুনি না। দুঃখের বিষয় হলো, এরকম কথা আপনারা বলতে পারবেন না।”

“আমি কাউকে মারিনি,” বলল লাঘক।

“না, মারেননি, কিন্তু অন্যকে এটা করার উৎসাহ দিয়েছেন, এবং এটা থেকেই নিজের ফায়দা লুটতে চেয়েছেন।” উঠে দাঁড়াল সে। “এবার এখান থেকে দূর হন।”

পিছু হটতে নারাল এলিজা। “তো, এগুলোর কী হবে?”

কঢ়ে কঠিন্য নিয়ে এল ম্যালন। “সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আমার বা আপনার না।”

“আপনি হ্যাত জানেন এগুলো আমার প্রাপ্য, আমার বংশের প্রাপ্য। আমার পূর্বপুরুষ নেপোলিয়নকে ধ্বংসের পেছনে সবচে গুরুদায়িত্ব পালন করেছিল। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত এটার খোঁজ সে করে গেছে।”

“আমি বলেছি একবার এখান থেকে বিদায় হতে।”

এই বিষয়টা থ্রিভাল্ডসেন কিভাবে পরিচালনা করত সেটা ভাবার চেষ্টা করল ম্যালন, আর এই ভাবনাটা একটুখানি স্বস্তিও দিল তাকে।

নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়ার শক্তি বা সুযোগ হারিয়ে এলিজা মনে হচ্ছে যেন ম্যালনের কথাই মেনে নেবে শেষমেশ। তাই সে আ্যাট্ৰোসিৰ দিকে ঘুৱে দাঁড়াল চলে যাবার জন্য। স্টেফানি এবং স্যাম দু'জন দু'দিকে সরে গেল তাদেরকে বের হবার জন্য জায়গা করে দিতে।

দরজার কাছে পৌছে, একটু ইতিষ্ঠত করল লাঘক, তারপর ঘুৱে দাঁড়াল ম্যালনের দিকে। “হ্যাত আমাদের আবারো দেখা হবে কোনো একদিন।”

“হলে হবে, তেমন আনন্দের কিছু নেই।”

“মনে রাখেন যে সেদিনের মুখোমুখি হওয়াটা আজকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের হবে।”

এটাই শেষ কথা, এরপর... চলে গেল সে।

“কপালে দুঃখ আছে এই মহিলার,” বলল স্টেফানি।

“পুলিশ এনেছেন তো বাইরে?”

নড় করল স্টেফানি। “ফ্রেঞ্চ পুলিশ তাদেরকে টানেলের বাইরে নিয়ে যাবে, তারপর এটা সীল করে বন্ধ করে দেবে।”

ম্যালনের মনে হলো, সব বুঝি শেষ হয়েছে, অবশেষে। গত তিনটাটাঙ্গাহ তার জীবনের অন্যতম ভয়ঙ্কর সময় হয়েই থাকবে।

একটু বিশ্রাম দরকার তার।

“আমি বুঝতে পারছি যে তোমার নতুন ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে, ঠিক?” স্যামকে বলল ম্যালন।

নাথা নাড়ল তরুণটা। “আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যাগেলান বিলের হয়ে কাজ করছি, একজন এজেন্ট হিসেবে। এবং সবাই শুনছি যে এর জন্য আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।”

“আরে নাহ, ধন্যবাদ তুমি নিজেকে দাও। হেনরিক খুবই খুশী হত, গব করত।”

“আমারও তাই মনে হয়।” সিন্দুকগুলোর দিকে দেখাল স্যাম। “এখন এই ধন-রত্নের কি হবে, জানেন কিছু?”

“ফ্রাঙ্গ নিয়ে নেবে এগুলো,” বলল স্টেফানি। “জানার কোনো উপায় নেই এগুলো কোথা থেকে এসেছে। এখানে এগুলো পাওয়া গিয়েছে, তাদের মাটিতে, তাই এগুলোর মালিক তারা। পাশাপাশি, এটাও শুনছি যে, এগুলো দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে সেই সব জায়গায় যেখানে এই কটন ম্যালন নানাবিধি-ক্ষয়ক্ষতি করেছে।”

এগুলো তার পক্ষে না শোনাই মঙ্গল। তাই, সে একমনে তাকিয়ে আছে খোলা দরজাটার দিকে। এলিজা লাঘক শীতল অভিব্যক্তির আড়ালে তৈরি একটা হৃষি দিয়ে গেল তাকে। যদি তাদের পথ এক হয় কোনো দিন, সবকিছু ভিন্নরকম হবে সেদিন। তবে জীবনে অনেকবার নানান হৃষি-ধামকি শুনেছে সে। হেনরিকের মৃত্যু এবং ম্যালনের ভেতর সৃষ্টি হওয়া অপরাধবোধ, উভয়ের জন্যই এলিজা লাঘক আংশিক দায়ী। ম্যালন ভয় পাচ্ছে যে অপরাধবোধটা হ্যাত আজীবন বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে

তাকে। এভাবে ভাবলে লাঘকেরও কিছু পাওয়া উচিত তার কাছ থেকে। আর ম্যালন
সব সময়ই যার যা প্রাপ্য তা মিটিয়ে দেয়।

“লায়নের বিষয়ে স্বাভাবিক হতে পেরেছ তো?” সে জিজ্ঞেস করল স্যামকে।

নড করল তরুণ এজেন্ট। “চোখের সামনে এখনো দেখি যে তারা মাথাটা
কিভাবে ফেটে ছড়িয়ে গেল, তবে আমার সয়ে গেছে এখন।”

“হ্রম, তবে এটা খুব সহজ হতে দিও ন্য কখনো। কাউকে মেরে ফেলাটা কিন্তু খুব
মারাত্মক পর্যায়ের কাজ, বুঝলে? কেউ শুলি খাওয়ার কাজ করে বসল, আর তুমিও
ট্রিগার চাপতে থাকলে-বিষয়টা কিন্তু এরকম হবে না সব সময়। নিজেকে সামলে
নেবার শক্তিও রাখতে হবে।”

“আপনার কথাগুলো ঠিক আমার অনেক আগের পরিচিত একজনের কথার মতো
শোনাচ্ছে।”

“খুব স্মার্ট সেও, তাই না?”

“কতটা, তা কোনো দিন বুঝিনি, একটু যা বুঝলাম তা এই কয়দিন আগে।”

“তোমার কথাই ঠিক ছিল, স্যাম।” বলল সে। “প্যারিস ক্লাব। ষড়যন্ত্র। কিছু
অন্তত বাস্তব।”

“আমার ভালো মনে আছে, আপনি আমায় পাগল ভেবেছিলেন।”

হাসল ম্যালন। “আরে, যাদের সাথে আমার পরিচয় হয় তাদের অধিকেই আমায়
ওটা মনে করে।”

“মিশ্যান ফরিসন আমাকে বিশ্বাস করিয়েছিল যেতার কথা ঠিক,” বলল
স্টেফানি। “খুব নাছোড়বান্দা মেয়ে।”

“ওর সাথে কিছু হবে নাকি তোমার?” ম্যালন জিজ্ঞেস করল স্যামকে।

“কে বলল আমার এরকম ইচ্ছা আছে?”

“তার কষ্টেই আমি শুনেছি যখন সে আমার ফোনে ভয়েস ম্যাসেজ পাঠিয়েছিল।
চার্চে আবার ফিরে গেল শুধু তোমার জন্য। এবং হেনরিকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষে তুমি
ওর দিকে কিভাবে তাকাচ্ছিলে আমি দেখেছি, মনে আছে। তোমাকে ওর প্রতি দুর্বল
মনে হলো।”

“কী জানি। হতে পারে। আপনার কোনো পরামর্শ আছে এই বিষয়ে?”

হাত দুটো আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে উঁচু করে ধরল ম্যালন। “নারীদের বিষয়ে
আমার জ্ঞান সীমিত। কিছুই বলতে পারছি না।”

“একেবারে ঠিক, একমত তোমার সাথে,” যোগ করল স্টেফানি। “তোমার
স্ত্রীদের তুমি প্লেন থেকে ফেলেও দিতে পার।”

হাসল সে।

“আমাদের যেতে হবে,” বলল স্টেফানি। “এই জায়গার নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়
ক্রান্ত।”

সবাই এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

“একটা বিষয় নিয়ে সেই শুরু থেকেই আমার খটকা লাগছে,” ম্যালন বলল তাকে। “স্টেফানি আমায় বলেছিল যে তুমি বড় হয়েছ নিউজিল্যান্ডে, কিন্তু কথা-বার্তা কিউইদের মতো না। এটা কেন?”

হাসল স্যাম। “লম্বা ঘটনা।”

ঠিক এটাই গতকাল ম্যালন স্যামকে বলেছিল যখন ছেলেটা তার কটন নামের কারণ জানতে চেয়েছিল। আর এই শব্দ দুটোই হেনরিকের কাছে সে বলেছে অনেকবার যখন তার বন্ধুটি কোনো বিষয়ে জানতে চাইত। লম্বা ঘটনা বলে তাকে থামিয়ে রাখত, বোঝাতে চাইত পরে ব্যাখ্যা করবে।

কিন্তু দুঃখের কথা হলো, পরে বলে আর কিছু আসবে কখনো না।

স্যাম কলিসকে পছন্দ হয়েছে তার। পনের বছর আগে সে যেরকমটা ছিল, এখন এই তরুণ এজেন্টও সেরকম, সেও ম্যাগেলান বিলেতে কাজ শুরু করেছিল সে সময়ে। স্যাম এখন একজন পুরাদন্তর এজেন্ট-তার চাকরির সুবাদে আসা অপরিসীম ঝুঁকিপূর্ণ যেকোনো কাজে নেমে পড়তে প্রস্তুত সে।

যেকোনো একটা দিনই হতে পারে তার জীবনের শেষ দিন।

“আচ্ছা, এরকম হলে কেমন হয়,” বলল স্যাম। “আমি ওটা বলব আপনাকে, যদি আপনারটাও আমাকে বলেন।”

“রাজি।”

--সমাপ্ত--